তন্ত্র-মীমাংসা।

সাংখ্য, পাতঞ্জল, শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা, ঘেরণ্ড সংহিতা, শিব সংহিতা,
দত্তাত্রেয় সংহিতা, দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা, নিবন্ধ, রুদ্রযামল,
আদিযামল, হংসমাহেশ্বর, যোগিনীহৃদয়, কালিকাহৃদয়,
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, সম্মোহন তন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র,
বিশ্বসার তন্ত্র, যোগিনী তন্ত্র, আত্মপুরাণ,
কালিকা পুরাণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন
দর্শন, সংহিতা, তন্ত্র ও
পুরাণ হইতে

শ্রীরাধারমণ মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
৯ নং শ্যামবাজারষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

"সমোধর্ম্মঃ সমঃ স্বর্গঃ সমোহি পরমং তপঃ।
যস্যৈব মানসং নিত্যং স নরঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

কলিকাতা, বাগবাজারষ্ট্রীটস্থ উদ্বোধনপ্রেস হইতে
ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৮

মূল্য দুই টাকা।

নির্ঘণ্ট।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

ঈশ্বরতত্ত্ব।

অবতারতত্ত্ব ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

জ্ঞানতত্ত্ব।

যোগতত্ত্ব।

উপদেশ।

তত্ত্ব মীমাংসা।

গুরুশিষ্যের সংবাদ।

শিষ্য। গুরু! মন কাহাকে বলে?

গুরু। সূক্ষ্ম কার্য্যই মন; মনকে সূক্ষ্মভাবে মহত্তত্ত্ব কহে। এমন শক্তি, সংসংযুক্ত বা স্বচ্ছপ্রকৃতিসংযুক্ত চৈতন্য, যাহার দ্বারা স্বভাব প্রকাশ হয় এবং যে তেজের ক্ষমতায় সুখ দুঃখাদি অনুভব হয়, তাহাকে মন কহে।

শিঃ। সুখ দুঃখ কি?

গুঃ। রিপুর বশীভূত হইয়া আহারাদি স্বভাবকে কলুষিত করাকেই গ্রাম্য সুখ কহে। ঐ গ্রাম্য রতিকেই তুচ্ছ বিষয়সুখ কহে। দুঃখ বলিতে পাপ অর্থাৎ বাসনার অপরিশুদ্ধতা।

শিঃ। সুখ দুঃখ উৎপাদন করে কে?

গুঃ। এই দেহে মন কর্ত্তা। তাহার মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্ম করিয়া এই দেহের সুখ দুঃখ উৎপাদন করিতেছে।

শিঃ। কিরূপ কর্ম্ম করিলে সুখ অনুভব হয়? ও কিরূপ কর্ম্ম করিলেই বা দুঃখ অনুভব হয়?

গুঃ। বহিরিন্দ্রিয়, অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মিলিত হইয়া মনের আজ্ঞায় কার্য্য করে, তাহা হইলে সুখ হয়। আর কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ে রিপুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মনকে পরাজয় করত মনের দ্বারা কার্য্য করিলে তাহাতে পদে পদে বিপদ হয়।

শিঃ। কর্ম্মেন্দ্রিয় কাহাকে বলে?

গুঃ। বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

শিঃ। রিপুগণ কাহাকে বলে?

গুঃ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের যে সমস্ত ক্রিয়া মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া জগতে প্রকাশ পায় তাহাকে রিপু কহে। সংসারিগণের উক্ত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও এই ছয় রিপুগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া বড় সহজ নহে। এই কারণে জ্ঞানময় চিত্ত হইবার কারণ যোগপথের সৃষ্টি হইয়াছে।

শিঃ। জ্ঞানদৃষ্টি কিরূপে হয় ?

গুঃ। অহঙ্কার যখন বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি যখন চিত্তে স্থির হয় তখনই জ্ঞানদৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বাসনা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষিত করিয়া মায়াজাত বিদ্যার সাহায্যে আত্মস্বরূপে আনয়ন করা। প্রেমে মগ্ন হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিঃ। মন একাই কি এই দেহের কর্ত্তা ?

গুঃ। হাঁ, সে কথা সত্য, কিন্তু মন চারি অংশে নির্ম্মিত,—মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার।

শিঃ। চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইহারা কিরূপ ?

গুঃ। চিত্তের আবার বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, স্তম্ভিত প্রভৃতি অনেক অবস্থা আছে। বুদ্ধি, যে শক্তির দ্বারায় সদসদ্বিবেচনা স্থির হয়। ইহাই জ্ঞানকক্ষে পঁহুছিবার দ্বার। অহঙ্কার, যে শক্তি দ্বারা "আমরা" "তোমরা" বোধ হয়। এই চারিটী ক্ষমতা লইয়া মন প্রতি জীবন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শিঃ। চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাদের মধ্যে বলবান্ কে ?

গুঃ। অহঙ্কারই দেহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। ঐ অহঙ্কারের বলে বুদ্ধিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ হয় এবং উহার দ্বারাও লোকে মায়ার বশীভূত হইয়া তুমি আমি রূপ স্নেহে মণ্ডিত হওতঃ জাগতিক পীড়া সহ্য করে। ঐ অহঙ্কার হইতে সকাম ক্রিয়া হইয়া থাকে। দান তপস্যা, প্রভৃতি ক্রিয়ায় জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, যদি ঐ সমস্ত ক্রিয়া নিষ্কাম হয়। যদি কাহারো অহঙ্কার হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান ; আত্মজ্ঞানে অহঙ্কার নাশ হইলে লোকে আত্মাকে যে পরমাত্মময় দেখে তাহাই স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল।

শিঃ। এস্থলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য. পাতাল কিরূপ ?

গুঃ। জ্ঞাননিবাস, ইন্দ্রিয়যোগ নিবাস, ও রিপুযোগ নিবাস। সংসারকে

রিপুযোগ নিবাস কহে। তপস্থাকে ইন্দ্রিয় যোগ নিবাস কহে। আত্মজ্ঞান পূর্ণ শক্ত্যাবস্থাকে জ্ঞাননিবাস কহে। ইহাদেরই রূপান্তরে, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, কহে।

শিষ্য। কিরূপে পরমাত্মা প্রাপ্ত হওয়া যায়?

গুঃ। যোগশাস্ত্রের নিয়ম মতে মৃত্যুকালীন বাসনা ভেদে জীবের জন্ম হয়। বাসনাই আত্মা গ্রহণ করে এবং ভূতাদি সমবেষ্টিত হইয়া ভিন্নরূপে জীবের জন্ম হয়। আত্মা যদি বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে পরমাত্মা প্রাপ্ত হয় বা পরমাত্মাময় হয়।

শিঃ। কি উপায়ে বাসনাহীন হওয়া যায়?

গুঃ। মন হইতেই বাসনার উৎপত্তি, মনকে স্থির করিতে পারিলেই বাসনাহীন হওয়া যায়। বিশ্বাস ভিন্ন মনকে স্থির করিতে পারা যায় না। প্রথমে উপদেশে রতি বা মতি চাই, পরে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি, ভক্তি স্থির হইলেই বিশ্বাস, বিশ্বাসের পরেই পবিত্র প্রেমের সাক্ষাৎ হয়। প্রেম ও জ্ঞান এই দুইটী উপায় সাধনা করা প্রয়োজন।

শিঃ। প্রেম ও জ্ঞান কি?

গুঃ। যে শক্তি দ্বারা ঈশ্বর ও আত্মার সংযোগে জগৎ সংসার জানা যায় তাহাকে জ্ঞান কহে। এই জ্ঞান সমূহবোধক শব্দ। ইহার চারিটী ক্রিয়া আছে—জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান। যে জ্ঞানের সহিত প্রেম মিলিলে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহাকেই জ্ঞানের বিজ্ঞান ক্রিয়া যাহা তুরীয় অবস্থা কহে। বিজ্ঞান লাভ হইলেই মনের ক্রিয়ারূপী অহঙ্কার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে, বুদ্ধি চিত্তে প্রবেশ করে, চিত্ত মনে প্রবেশ করে। তাহাতে প্রাণী রিপুপ্রাবল্যহীন হয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। সেই দৃষ্টিবলে ব্যক্তিগণ যে কি কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহা জানিতে পারে। জ্ঞানার্থে —যোগরূপ কর্ম্ম। প্রেমার্থে—ধর্ম্মোপদেশে রতি।

শিঃ। ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

গুঃ। যে উপায় দ্বারা সংসারে থাকিয়া সাংসারিক ক্রিয়াবশে আত্মাকে মুগ্ধ বা সুস্থ রাখা যায় তাহাকে ধর্ম্ম কহে। ধর্ম্মের দুইটী লক্ষণ। পরম ধর্ম্ম বা নিবৃত্তি। অপর ধর্ম্ম বা প্রবৃত্তি।

শিঃ। পরম ধর্ম্ম কিরূপ?

গুঃ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, যে ধর্ম্মে আত্মাকে সুস্থ রাখিয়া পরমাত্মায় মিলাইতে পারা যায়। এই ধর্ম্ম হইতেও ভোগকামনা উৎপন্ন হয়। ইহাকে ঈশ্বরপ্রেমসম্ভোগ কামনা কহে। এই সম্ভোগ হইতেও ইন্দ্রিয়সুখ ফল উৎপন্ন হয়। সে কিরূপ? না—যখন হৃদয়-পথে মন স্থির হইল তখন বহির্দৃষ্টি অন্তরে যাইয়া পরমাত্মার আবির্ভাব অপূর্ব্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন পরমাত্মাকে দেখিলেন। তখন নয়ন প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ স্থির হইয়া চরিতার্থ হইলেন। তখন যোগী প্রাণায়ামেই থাকুন বা প্রেমেই থাকুন মুক্ত হইলেন।

শিঃ। অপর ধর্ম্ম কিরূপ?

গুঃ। ফল কামনা করিয়া শ্রেয়ঃ বা স্বার্থলাভ করিতে যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হয় তাহাই অপর ধর্ম্ম বা প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি লক্ষণ হইতেই জীবের সংসারে মতি হয়। মায়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং ইহাতেই পাপ পুণ্যের পথিক হইতে হয়। এই ধর্ম্মে সংসারে মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক নিয়মে বাধ্য হইয়া ঐহিক সুখে আত্মাকে রাখা যায়। জীবের জীবন যাপনীয় উপায় যে অর্থও আহারাদি হইতে উদ্ভূত কামনা ইহা কেবল দেহার্থ ইন্দ্রিয়গণের চরিতার্থতা লাভ করিতে ইচ্ছা করে। এই অবস্থায় কলুষিত মনকে বাসনায় সাহায্যে নিবৃত্তি মার্গে না ফিরাইলে কখনই মুক্তি হয় না। অতএব জীবের পক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ।

শিঃ। কি উপায়ে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা হয়?

গুঃ। ঈশ্বর পক্ষে অনুষ্ঠান অর্থাৎ "তত্ত্ব জিজ্ঞাসা"।

শিঃ। "তত্ত্ব" কি?

গুঃ। ঈশ্বর অনুষ্ঠান বাসনার নামই তত্ত্ব। আর সেই তত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং ভগবান বলা যায়।

শিঃ। তত্ত্বকে ব্রহ্ম বা ভগবান, বলিলেন কেন?

গুঃ। জীবাত্মা, ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ ইহারা মন নামক কর্ত্তার অধীন। মনের একটী মন্ত্রী আছে তাহার নাম বাসনা। ঐ বাসনাই মনকে সুমন্ত্রণা বলে পরম তত্ত্বের অধীন করায়। মন যদি তত্ত্ব কথায় মুগ্ধ হইল তবে

আর রিপুকে প্রবল করে কে। রিপু অবশ্যই মনের দাস হইবে। রিপু বিলয়ে মন স্বাধীন হইয়া বৈরাগ্যভরে মগ্ন হইবে। সেই তত্ত্ব হইতেই মন ব্রহ্মের স্বরূপ পাইবে। এইরূপ তত্ত্বকেই বেদাদিতে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে।

শিঃ। ধর্ম্মের অর্থ কি?

গুঃ। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ ধাতুমতে আকর্ষণ। লঘু বস্তু আত্মত্রাণার্থ বৃহৎ বস্তুর শক্তি ধারণ করিতে প্রয়াস পায়। ইহা স্বভাবের নিয়ম। ঐ নিয়মকেই আকর্ষণ-শক্তি কহে। জীব যে ভাবে আত্মত্রাণের জন্য ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করেন সেই পবিত্র ভাবের নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম কাল্পনিক বস্তু নহে। প্রত্যেক জীবের স্বভাবে এই ভাব আছে সেই জন্যই বাসনা অপর বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া তৎধর্ম্মী হইয়া থাকে।

শিঃ। জীবদেহে সুখ দুঃখ ভোগ করে কে?

গুঃ। উপাধিগত অর্থাৎ মায়ামধ্যবর্ত্তী কর্ম্মের অন্তর্গত আত্মা বা ব্রহ্মসত্বাকে জীব কহে। সেই জীবের অঙ্গে বা স্বভাবে কষ্ট দুঃখ অহঙ্কারাদি কিছুই নাই। তবে তাহাতে উপাধিযোগ হওয়াতে নানা কষ্ট বোধ হয় মাত্র। এই যে মায়াগত উপাধি বা জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কষ্ট, ইহাকে পরীক্ষা করিতে বহুবিধ বিজ্ঞানবিদ্ ঋষিগণ চেষ্টা করিয়া নানা উদাহরণ ও যুক্তিতে এই দেখাইয়াছেন যে জীব ও উপাধি দুইটীর পৃথক স্বভাব যদি না হইত তাহা হইলে কখনই পরস্পরের বোধ হইত না। যেমন গৃহস্থিত স্বাধীন ব্যক্তিকে কোন কারাগারে রাখিলে তাঁহার কারণ উপাধিটী যে কষ্টদায়ক সে বুঝিতে পারে। কিন্তু একজনকে শৈশবাবধি কারাবাস করাইলে কারাকষ্ট তাহার পক্ষে কষ্টের কারণ বলিয়া বোধ হয় না, তদ্রূপ জীবেরও মায়া বা দেহগত উপাধি হইতে ভিন্ন স্বভাব, এইজন্য জীব ঐ উপাধির সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তন মতে যেটীতে সুখে থাকে তাহাতে আনন্দিত হয়, যেটীতে দুঃখ পায় সেইটীতে দুঃখিত হয় বুঝিতে হইবে।

শিঃ। মায়া কাহাকে বলে?

গুঃ। মায়াকে বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি কহে; অর্থাৎ যে মূর্ত্তি দেখিয়া সংসারবাসী রিপুবশে বশীভূত হইয়া সংসার দুঃখানুভব করিতে অক্ষম

হইয়া থাকে, অর্থাৎ মায়া কেবল আপনার রূপ অর্থাৎ মায়াময় ভাব দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখেন। আর যোগী ইন্দ্রিয়বলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রিপুকে মুগ্ধ করে। কারণ রিপুহীন ইন্দ্রিয়ের বাসনা হয় না। বাসনা হীন হইলে যোগী সিদ্ধ হয়। সিদ্ধযোগীগণকে দেবতারূপ বর্ণনা করা যায়।

শিঃ। বাসনা কাহাকে বলে?

গুঃ। ঐ মায়া উপাধিগুলিকে বিচার করিবার জন্য মন ও দশ ইন্দ্রিয় এবং দশটী ইন্দ্রিয়-শক্তি লইয়া বিজ্ঞানবিদ্ ঋষিগণ বহু আলোচনায় স্থির করিয়াছেন যে, মন এমন একটী স্বভাব যাহাতে কেবল অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয় এমন একটী ভূতময় স্থান যে যাহাতে মনশক্তি বা ইন্দ্রিয়-শক্তি সমূহ সক্রিয় হইয়া থাকে। তখন মন ও ইন্দ্রিয়াদির অতীত এমন এক অবস্থা আছে যাহার ক্ষমতায় এই সকল সক্রিয় মাত্রে কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই ক্ষমতাকে বাসনা কহে। সেই শক্তিটী হইতে শুভ ও অশুভ যে কোন প্রকার কর্ম্ম প্রকাশ হইয়া জীবকে কর্ম্মী করে। কর্ম্ম করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মমতে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত তেজ কর্ম্মজন্য ফলভোগ করে। এইরূপ বিচার স্থলে বহু বিচার দ্বারা স্থির হইয়াছে যেমন মদ্যের মাদকতা-শক্তি ইন্দ্রিয় ও মন আকর্ষণ করে বলিয়া জীব ঐ ইন্দ্রিয়াদি উপাধির জন্য আচ্ছন্ন থাকেন তদ্রূপ কর্ম্মগত শুভাশুভ ফল দ্বারা জীব আচ্ছন্ন নিশ্চয়ই থাকেন। সেই বাসনামূলক শুভাশুভ কর্ম্মফলই শোক, মোহ, ভয়, লোভাদি নামে জগতের সর্ব্বত্র পরিচিত। সত্ত্বতুরীয় তত্ত্ব বলিতে অন্তঃকরণ বৃত্তির স্বভাবের অতীতাবস্থা। আহার নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, মৈথুন এই পাঁচটীই জীবভাবের স্বভাব। ঐ পাঁচটী যে অতীত শক্তি হইতে বোধক হয়, তাহাকেই অন্তঃ-করণ বৃত্তি বা বাসনা কহে।

শিষ্য। শোক কাহাকে বলে?

গুঃ। বাসনার আকর্ষণমতে আত্মা ভিন্ন অপর বস্তুতে যে প্রেম বা পূর্ণাশক্তি জন্মায় তাহা নাশ হইলে ঐ আসক্তি বা প্রেমের বিচ্ছেদভাব উপস্থিত হয় তাহাকেই শোক কহে। যেমন পুত্রকে স্বাভাবিক স্নেহধর্ম্মে আকৃষ্ট রাখিতে রাখিতে সেই পুত্রের বিপদ বা মৃত্যু উপস্থিত হইলে পূর্ণা-সক্তির মহাবিচ্ছেদ উপস্থিত হয় এই জন্য সেই বাসনার বৈলক্ষণ্য স্বভাবকে

শোক কহে। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা আত্মীয় বিয়োগজনিত দুঃখকে শোক কহে। প্রণয়ের অপলাপ জনিত দুঃখকে বিরহ কহে।

শিঃ। ভয় কাহাকে বলে?

গুঃ। চৈতন্য যাহাতে স্তম্ভিত বা স্মৃতি যাহাতে মূর্চ্ছিত হয় এমন আকস্মিক বিস্ময়কে ভয় কহে। ভয়, নিদ্রা, আহার, ক্রোধ, মৈথুন এই পাঁচটী বাসনার স্বভাব। মনোরাজ্যে ভয় অতি উত্তম পদার্থ তেজ। ভয় দ্বারা জীবে আত্মরক্ষণ করিতে পারে। ভয় দুই প্রকার। ইন্দ্রিয়চেষ্টাবিরত ও ইন্দ্রিয়চেষ্টানিরত। প্রথমে লৌকিকে সাহসহীনতা কহে। দ্বিতীয়কে সাহস কহে। সাহসহীনতা দ্বারা রিপুপ্রাবল্য অধিক হইয়া জীবে দুঃখ ভোগ করে। সাহস দ্বারা ইন্দ্রাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া জীবে অতুল সুখভোগ করে। লৌকিকে এই ভাব প্রকাশ আছে বুঝিলেই দেখা যায়।

শিঃ। স্নেহ কাহাকে বলে?

গুঃ। অন্তঃকরণের প্রসন্নতাযুক্ত দ্রবভাবকে স্নেহ কহে।

শিঃ। স্পৃহা কাহাকে বলে?

গুঃ। বাসনার দ্বারা অপর স্বভাবাকর্ষণকে স্পৃহা কহে। অর্থাৎ এক জনের উত্তম পোষাক পরিধানে উত্তম আকৃতি হইয়াছে বলিয়া সেই স্বভাব দ্বারা আমারো আকৃতি উত্তম হইবে এই চিন্তা বা বাসনাকে স্পৃহা কহে।

শিঃ। ক্রোধ কাহাকে বলে?

গুঃ। হিংসাপরবশ হইয়া মনের সংকল্পকে যে ভাবে উত্তেজিত করে তাহাকে ক্রোধ কহে। সেই ক্রোধস্বভাব হইতে দ্বেষভাব প্রকাশ হইয়া জীবকে পরস্পর অনৈক্য করিয়া থাকে। বিজ্ঞানে ইহা বিশেষ পরিচিত আছে যে কি ক্রুদ্ধভাবে কি শান্তভাবে যে যে ভাবনা করে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নচেৎ ক্রোধী ক্রোধভাব কোথায় পাইবে? কামী কাম ভাব কোথায় পাইবে?

শিষ্য। লোভ কাহাকে বলে?

গুঃ। বিপুল লোভ বলিতে অপরের অবস্থার উপরে ঈর্ষান্বিত হইয়া স্বার্থের পূরণ করিবার জন্য বাসনা যে স্বভাবময় হয় তাহাকে লোভ কহে। যেমন আমার ধন না থাকাতে আমি উত্তমাবস্থায় হইতে পারিতেছি না,

অতএব যাহার উত্তমাবস্থা আছে, তাহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া আত্মস্বার্থ পূরণার্থ সেই ধনীর ধন কৌশল দ্বারা অপহরণ করনক কর্ম্মটীতে যে স্বভাবের দ্বারা বাসনাকে কর্ম্মপর হইতে হয় তাহাকে লোভ কহে। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে একটী বাসনা ও আর একটী কর্ম্মফল বা শোকাদি উদয় করণার্থ ভাব সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তখন বিচার করিলে ভাবসমূহকে কর্ম্ম বা অবস্থা মধ্যগত দেখা যায় এবং ঐ ভাবসমূহ বাসনার দ্বারা আকর্ষিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি স্বভাবসংযোগে জীবকে দুঃখিত করিতেছে ইহাও দেখা যায়।

শিঃ। বিজ্ঞানে দুঃখী কাহাকে বলে?

গুঃ। উপদেশ দ্বারাও যে পুরুষে হরিকে না বুঝিতে পারে বা পূর্ব্ব-জন্মজনিত পাপ দ্বারা জড় বুদ্ধি হওয়াতে সে ব্যক্তি ঈশ্বর বোধ করিতে না পারে তাহারা উভয়েই স্বভাবতঃ দুঃখী অপেক্ষাও দুঃখী হইতেছে!

শিঃ। স্বভাবতঃ দুঃখী কাহাকে বলে?

গুঃ। স্বভাবতঃ দুঃখী বলিতে পূর্ব্বকর্ম্মবশতঃ যাহাদের চিত্ত একেবারে জড়, তাহাদের স্বভাবতঃ পাপী বা দুঃখী কহে; ইহাদের স্বাভাবিক দুঃখী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—ইহারা কোন উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই, সেই জন্য তাহারা দুঃখী। কিন্তু উপদেশ পাইয়াও যাহারা ঈশ্বরকে বোধ করিতে না পারে তাহাদের ন্যায় দুঃখী আর কে হইতে পারে।

শিঃ। শোক, ভয় লোভাদি দুঃখ হইতে শান্তি লাভ করিবার উপায় কি?

গুঃ। এই দুঃখ ও সুখ প্রত্যেক চৈতন্য ও মনোময় জীবে অবধারণ করিতে পারে। তন্মধ্যে যে সকল জীবের জ্ঞান আছে; তাহারা অধিক অনুভব করিতে পারে। এই জন্য মানবগণের পক্ষে ঐ শোক, হর্ষ, ভয়, লোভাদিকেই মায়াগত উপাধি এবং জীবের পীড়াদায়ক অবস্থা কহে। ঐ অবস্থা হইতে জ্ঞানময় জীবে যদি অতীতভাব ধাবণ করিতে পারে তাহা হইলে সেই জীব শান্তি লাভ করিতে পারিবে। অর্থাৎ জ্ঞানময় জীবে যদি বিজ্ঞান তত্ত্ব বোধ করিয়া সেই বিজ্ঞানাধারকে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে জ্ঞানের তেজে মায়ামধ্যগত থাকিয়াও জীবে মায়াধর্ম্মে আকর্ষিত হয় না। ক্রমে মায়া ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বর ধর্ম্মে থাকিতে থাকিতে শুদ্ধ 'স্বভাব প্রকাশ হইয়া উত্তাপগত শীতল বস্তুর উত্তাপময় অবস্থার ন্যায় জীব ঈশ্বরময় হইয়া যায়।

শিঃ। জ্ঞান কাহাকে কহে ?

গুঃ। সংশক্তির স্বভাবে চৈতন্য মিলনে মায়াতে যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়াছিল, সেই সত্ত্বগুণের সহিত কাল, কর্ম্ম, স্বভাব মিশিয়া জ্ঞান প্রকাশ করিয়া ছিল। চৈতন্যময় অনুভবকারী শক্তিকে জ্ঞান কহে।

শিঃ। বিজ্ঞান কাহাকে কহে ?

গুঃ। যে শক্তি অজ্ঞান হইতে জ্ঞান পথে লইয়া যায়, তাহাকে বিজ্ঞান কহে। অজ্ঞানকে দূর সতত‌ই বিজ্ঞান শক্তি করিয়া থাকেন। ঐ বিজ্ঞান শক্তি ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য। কারণ, জ্ঞানাদি আত্মার সহিত নিত্য। আত্মা এই লীলাগত আত্মা অনুভবের জন্য যে শক্তিকে আশ্রয় করিয়া উপভোগ করিতেছেন. তাহাকে বিজ্ঞান কহে। ঈশ্বরানুভবাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি বিশেষকে তত্ত্বগ্রাহ্য শক্তি কহে। বুদ্ধি প্রভৃতি সেই য়াস্তর অনুযায়ী হইলে বিজ্ঞান সতত অন্তঃকরণে উদয় হইয়া থাকে।

শিঃ। আত্মা কাহাকে কহে ?

গুঃ। শক্তি ও ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ভোক্তাকে আত্মা কহে।

শিঃ। কিরূপে বিজ্ঞান প্রকাশ হয় ?

গুঃ। দেহের মধ্যস্থিত যে আজ্ঞাচক্র আছে, তাহার দক্ষিণে সূর্য্য ও বামে চন্দ্র আছে, চন্দ্র হইতে মনের ও সূর্য্য হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। ঐ আজ্ঞাচক্রকে ধারণা কহে ; ধারণা জ্ঞান দ্বারা বিগলিত হইলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য জ্ঞানের শাসন হইয়া বিজ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে।

শিঃ। বিবেক-শক্তি কাহাকে কহে ?

গুঃ। ঈশ্বরে বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি সমন্বিতা মায়াও আছেন। যে শক্তির সাহায্যে জীবাত্মা সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বোধ করিতে পারে, তাহাকে বিবেক-শক্তি কহে। ঈশ্বরকে আত্মারূপে যখন আরোপ করিয়া মানবীয় আত্মায় আনয়ন করা যায়, তখন জীবাত্মা যাহাতে উন্নত পথে গমন করে, এমন বোধ তিনি হস্তে করিয়া জীবকে সংসারী করিতেছেন বলিতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি পক্ষপাতী হইতেন। সেই বোধকেই পঞ্চীকরণ শক্তি-বোধক বিবেকশক্তি কহে।

শিঃ। আত্মজ্ঞান কি প্রকারে উপস্থিত হয় ?

গুঃ। হৃদয়ে মনস্থির হইলে বুদ্ধি জ্ঞান পথে যাইয়া আত্মজ্ঞান প্রকাশ করে। সে অবস্থা সাধক ভিন্ন প্রকাশ করিতে পারে না; তবে প্রমাণের কারণ এই বলিতেছি যে, নিদ্রিত ব্যক্তির মন যথার্থই নিরুদ্ধ হয়। নিদ্রায় বাহ্য জগৎ হইতে বুদ্ধি নিবৃত্তি হইয়া অন্তর্জগতে ব্যাপ্ত থাকে। চক্ষু মুদিলে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বাহ্য কর্ম্ম শূন্য হইলে তাহাদের ক্রিয়া অন্তরে প্রবল হয়। জীব নিদ্রাতে সেই সুখভোগ স্বরূপে ভোগ করিয়া থাকে। সেই কারণে স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহাতে জীব যে সংলিপ্ত ইহা বেশ বোধ করে। সেই রূপ নিদ্রিতের ন্যায় আত্মজ্ঞানীর অন্তর ও বহির্দৃষ্টি সমান হয়। তাহাতে জীব যে পরমাত্মায় সংলিপ্ত হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি ?

শিঃ। অবিদ্যা কাহাকে বলে ?

গুঃ। স্বভাবের যে ক্ষমতার দ্বারা লোকে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং দুঃখ সুখভোগ করিয়া কালের হস্তে কৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অবিদ্যা বলে।

শিঃ। বিদ্যা কাহাকে বলে ?

গুঃ। সংসারের যে ক্ষমতার দ্বারা লোকে সংসারে থাকিয়াও মায়ার মোহিনী শক্তিতে না ভুলিয়া, নাসা যেমন সকল গন্ধ আঘ্রাণ করে, কিন্তু কিছুতে অনুরত হয় না, তদ্রূপ ভাবে নিঃসঙ্গ থাকিয়া ঈশ্বরে মগ্ন হয়, তাহাকে বিদ্যা বলে। অবিদ্যা-বলে ক্রিয়া করিলে তাহার ফল সে কাল দ্বারা প্রাপ্ত হয়। বিদ্যার দ্বারা ক্রিয়া করিলে সে ব্যক্তি কালের বশীভূত হইয়াও কালের দ্বারা আরাধিত হয়। মদিরা পান করিলে কালের স্বভাবে তাহাকে যেমন উন্মত্ত হইতেই হয়, তেমনি অবিদ্যাজনিত পাপী কালস্বভাবে আপনিই পাপের দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বর কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন, তিনি সকলের সাক্ষি-স্বরূপ। তাঁহার নিকটে সমস্ত সমানভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শিঃ। মায়ার কার্য্য কি ?

গুঃ। মায়ার কার্য্য এই যে জীবসমূহ ত্রিগুণাত্মক আবরণে আবৃত হইয়া অর্থাৎ মায়াতে মোহিত হইয়া আপনাদিগকে অভিমানী করিয়া সুখ দুঃখ বোধ করে। মানে, ঐশ্বর্য্যে, বিপদে, সম্পদে দুঃখ ও সুখানুভব হইয়া থাকে। অভিমানীকে কর্ত্তা কহে। কোন ব্যক্তি আপনার সম্পদের

উপরে অভিমানী হইয়া 'আমি মহাধনী' যদি এইরূপ অভিমান করে, তবে সে তাহাপেক্ষা ধনবান্ দেখিয়া অবশ্যই কাতর হইবেই হইবে। তবে সম্পদ থাকিলেই বা অভিমানীর সুখ কোথা হইল? কেহ কাহারো প্রতি নীচ ভাবিয়া আপনাকে উচ্চ জানিয়া অভিমান করিলে যদি সেই নীচ নিরূপিত ব্যক্তি তাহাকে মান্য না করে, তবে অভিমানী ব্যক্তি রিপুপরবশে ক্রোধ ও হিংসারূপ দুঃখে দগ্ধ হইতে থাকে। যদি কেহ আত্মীয়ের উপরে অভিমানী হয় অর্থাৎ আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার মাতা ইত্যাদিভাবে অভিমানী; তাহাতে আত্মীয়গণের বিনাশে মহাশোকরূপা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সকলই মায়ার খেলা। যে ব্যক্তি সকলের মধ্যে থাকিয়া অসঙ্গভাবে অবস্থান করে, তাহাকে দুঃখ সুখ ভোগ করিতে হয় না।

শিঃ। 'আমি' কাহাকে বলে?

গুঃ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন; যথা "হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু কার্য্য করিবে, যাহা কিছু আহার করিবে এবং যাহা কিছু তপস্যা করিবে, সমস্তই আমাকে অর্পণ করিও" আমি শব্দে পরমাত্মা; অর্থাৎ যে জ্ঞানী আমাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, সে নিজ কৃত কর্ম্ম তপস্যাদি আমাকে অর্পণ করিলে বা আমার অনুমতি মতে করিতেছে, এমন ভাবনায় সাধন করিলে, সে কর্ম্মের দ্বারা মায়া উপস্থিত হয় না।

নাভিসরোজাদি পঙ্কক; ইহাকে বলে যথা নাভিপদ্ম সূক্ষ্ম-ব্রহ্মাণ্ড। আত্মা বা অহঙ্কার বা বাসনাযুক্ত মন ও আত্মা সত্তা যাহা সত্ত্বে জীবে আমি আছি; আমার স্বভাব এই, বোধ করিতে পারে।

শিঃ। কোন্ কর্ম্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করিতে হয়? সে কর্ম্ম কিরূপ?

গুঃ। সংসারীকে সেই বিষ্ণুময় হইতে হইলে আত্মজ্ঞানের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই জ্ঞান আবার উপাসনার অধীন এবং উপাসনা কর্ম্মের অধীন হইতেছে। অতএব ঈশ্বর পরিতোষণকারী কর্ম্ম করিলে তাহা হইতে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্ম করা উচিত।

শিঃ। নিষ্কাম কর্ম্ম কিরূপ?

গুঃ। কোন ব্রতাদি বা যজ্ঞাদি আরম্ভ করিয়া সাত্ত্বিক ভাবে আবরণ করিলে তাহা হইতেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহাকে ঈশ্বর পরিতোষ

কারী নিষ্কাম কর্ম্ম কহে। সকাম কর্ম্ম হইতে নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাস করিতে হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে হয়। যেমন জল আহরণ করিবার উদ্দেশে কেহ ভূমি খনন আরম্ভ করিল। এস্থলে ভূমিখননকে সকাম কর্ম্ম কহে। ঐ ভূমিখনন উদ্দেশ্যসিদ্ধির ফল স্বরূপ ভূতল হইতে জল প্রকাশিত হইলে যেমন আর খননে প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ সকাম হইতে নিষ্কাম কর্ম্মের উপাসনা লাভ স্থির হইলে আর সকাম কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। উপাসনা বা নিষ্কাম কর্ম্মের অধীনে জ্ঞান থাকে। তাহাকে আহরণ করিলে যেমন নির্ম্মাল্যরূপী মলা জলের মলাকে লইয়া একত্র হইয়া নিম্নে পতিত থাকে; তদ্‌যুক্ত জল পরিশুদ্ধ হইয়া যায়; তদ্রূপ জ্ঞানপ্রকাশে ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা লয় প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মজ্ঞান দ্বারা "তত্ত্বমসি" ভাব বিদিত হইয়া জীব ব্রহ্ম হয়। অতএব কর্ম্ম করা উচিত।

শিঃ। ভগবানকে কর্ম্ম সমর্পণ কি রূপে করিতে হয়?

গুঃ। ঈশ্বরই এই মায়া শক্তি দ্বারা আমাদিগকে ইন্দ্রিয় ও স্বভাব প্রদান করিয়াছেন, এবং তিনিও চৈতন্যরূপে অন্তরে রহিয়াছেন, চৈতন্য ও স্বভাব ভিন্ন যখন কোন ক্রিয়া হইবার উপায় নাই, তখন সমস্ত ক্রিয়াই তৎকৃত বলিয়া ভাবিতে হইবে। সেই ভাবিয়া হৃদয়স্থ ভাবনা মতে ভক্তিযোগ সহকারে কর্ম্ম করিলে তাহাতে তমোগুণের উৎপত্তি হয় না; কারণ, ঈশ্বর-দ্রষ্টা মায়াতে মুগ্ধ নহে; সে যে কার্য্য ঈশ্বরের পরিতোষণার্থ নিষ্কাম ভাবে আলোচনা করিবে, তাহাই ভগবানে অর্পিত বলিয়া বিবেচনা করিও।

শিঃ। কি উপায়ে ঈশ্বরপথে পথিক হওয়া যায়?

গুঃ। প্রথমে ভক্তি সংগ্রহ করা আবশ্যক। সেই ভক্তি ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণে উপস্থিত হয়। পরে তাঁহার গুণকীর্ত্তনরূপ কর্ম্ম করা উচিত। ঐ কর্ম্মদ্বারা উপাসনার উপায় হয় অর্থাৎ ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করিবার ক্ষমতা হয়। সেই ক্ষমতা সাধ্যায়ত্ত করিবার জন্য ধ্যান ও পূজা আবশ্যক।

শিঃ। নিরাকার ঈশ্বরকে কিরূপে ধ্যান পূজন বা হৃদয়ে ধারণ করিব?

গুঃ। যাহাতে ঈশ্বরের প্রভাব বুঝায়, এমন সাকার মূর্ত্তি চিত্তে ধারণা করিয়া ধ্যান করিতে করিতে হৃদয় স্থির করিতে পারা যায়, নচেৎ সংসার-মুগ্ধ মন অতি চঞ্চল, অন্যোপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের সাকার দেবমূর্ত্তি

সংসারে ব্যক্ত রহিয়াছে। সেই সাকার মূর্ত্তি মনঃস্থৈর্য্যের সহিত হৃদয়ে ধৃত হইলে নিদিধ্যাসন নামক পঞ্চমোপায় উপস্থিত হয়। তাহাতে আত্মার দর্শন হয়। আত্মার বলে পরমাত্মার দর্শন হয়। ইহাকেই জীবন্মুক্ত কহে। ভগবানের আরাধনা বা সাধনা করিতে হইলে পাঁচ প্রকার নিয়ম আছে। শ্রবণাসক্তি কীর্ত্তন, পূজন, ধ্যান ও নিদিধ্যাসন।

শিঃ। ভক্তি ভিন্ন ঐশ্বরীয় কোন কার্য্যে শ্রেয়োলাভ হয় না, কিন্তু সে ভক্তি কি প্রকার ?

গুঃ। ভক্তি দুই প্রকার। অন্তরপ্রকাশ্য ও অনুধ্যানপ্রকাশ্য। কোন বস্তুর উপর ভক্তি হইলে কারণ বশতঃ অন্তরে অন্তরে ভক্তি হইয়া থাকে। আন্তরিক ভক্তি যদিও বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন বটে, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয় একত্র হইয়া যে কার্য্য না করে, তাহা ক্ষণিকের কারণ হয়। ইহা মায়ার স্বধর্ম্ম। সেই কারণে যোগিগণ বহিরিন্দ্রিয়কে হঠযোগে আবদ্ধ করেন, আর অন্তরেন্দ্রিয়কে জ্ঞানযোগে আবদ্ধ করেন, পরে মনকে স্থির করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ হয়েন। সেই অন্তরে বহিরিন্দ্রিয়ের একত্র মিলনে মন হইতে যে প্রসাদগুণপরিপূর্ণ ভক্তিচিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহাকে অনুধ্যান প্রকাশ্য ভক্তি কহে। সেই ভক্তিতে যদি হরিকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ হইয়া সংসার গ্রন্থিতে আবদ্ধ জীব স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। তাহাতে মনের শান্তি পাইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিলে আত্মাকে ঈশ্বরময় করা যায়। আত্মা পরমাত্মাময় হইলে মহামুক্তি লাভ হয়।

শিঃ। আত্মা যে ঈশ্বরে মিলিলে পরমাত্মাময় হইবে তাহার লক্ষণ কি ?

গুঃ। ভক্তে জ্ঞান ও প্রেমভরে মগ্ন হইয়া আত্মার সাক্ষাৎ পাইলে তাহার দ্বারাই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিবার উপায় পায়। সেই উপায় স্বাভাবিক ও অন্তরস্থ, তাহা বাক্যে প্রকাশ বা ক্রিয়ায় প্রমাণ করিবার যো নাই। তবে কয়েকটী লক্ষণে বুঝা যায়। তাহার মধ্যে একটী এই যে:—হৃদয় যে সমস্ত সাংসারিক গ্রন্থিতে আবদ্ধ তাহা হইতে ছিন্ন হওয়া।

শিঃ। সাংসারিক গ্রন্থি কিরূপ ?

গুঃ। যে গ্রন্থি দ্বারা হৃদয় অর্থাৎ মনের আবাস আবদ্ধ আছে, তাহাই চিত্তের জড়তারূপী বন্ধন। চিত্ত যখন জড়ভাবাবলম্বন করে তখন মায়াতে

মনকে একেবারে উন্মত্ত করে। চিত্তের শাসনেই অহঙ্কার* শাসিত থাকে। চিত্তকে জড়ভাবে থাকিতে দেখিলে অহঙ্কার প্রবল ক্ষমতা প্রকাশ করে। চিত্তের জড়তা ও অহঙ্কার একত্র হইলেই কাহারও স্নেহাধিক্য হয়; কাহারও আমি বড় এই বিবেচনা হয়; কাহারও অস্থির বুদ্ধি হয়; পুত্র মরিলে কেহ কেহ স্নেহ বিরহে উন্মত্ত হয়; পার্থিবধনহীন হইলে কেহ ছোট বলিলে লোকের জীবনত্যাগের অভিমান হয়, অনিত্য প্রেম, অনিত্য বিশ্বাস প্রভৃতি অস্থির বুদ্ধিতে উৎপাদিত হইয়া ব্যক্তিকে নানাবিপদাপন্ন করে।

শিঃ। মন কি সাংসারিক গ্রন্থিতে আবদ্ধ থাকে?

গুঃ। হৃদয় অর্থাৎ মনই দেহের কর্ত্তা। সেই কর্ত্তা যদি এই সকল অনিত্য গুণরূপ গ্রন্থিতে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও সংসারে ভিন্ন কি? সেই কারণেই যাঁহারা আত্মাতে ঈশ্বরানুভব করেন, তাহাদের লক্ষণ জানিতে হইলে দেখিবে যে তাঁহাদের হৃদয়ের ঐ সকল সাংসারিক গ্রন্থি ভেদ হইয়াছে।

শিঃ। মনের কি আর কোন বন্ধন আছে?

গুঃ। মনের আর একটী বন্ধন, তাহার নাম সংশয়। এই সংশয় দ্বারা বুদ্ধিকে নিশ্চয় করা যায় না। বুদ্ধি নিশ্চিত না হইলে পাপরূপ মায়াময় আবদ্ধ থাকিতে হয়। কেবল সংশয়ই সেই জ্ঞানপথপ্রদর্শিনী বুদ্ধিকে এমন যে পীড়াময় সংসার তাহাকে ভাল দেখাইতেছে। আত্মজ্ঞানী বিশ্বাসী ব্যক্তির সংশয় সম্ভবে না।

শিঃ। অনেকে কেন ধর্ম্মমতে ফল কামনা করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে?

গুঃ। ফল কামনা করা হউক বা না হউক যে কোন কর্ম্ম করা যায়, সেই কর্ম্মকারীকে কখনই আত্মজ্ঞানী বলা যায় না। কর্ম্মদ্বারা বিজ্ঞান লাভ না হইলে কখনই আত্মা প্রত্যক্ষ হয় না। সেই কারণে কর্ম্মাদি যজ্ঞ সমস্ত যাহারা ঈশ্বর লাভ অভ্যাস করিতেছে তাহাদের পক্ষে, যাহারা ঈশ্বর লাভ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে নয়। অতএব আত্মজ্ঞানী হইলে কর্ম্মক্ষয়ই তাহার প্রধান লক্ষণ। কারণ, পর্ব্বত-শৃঙ্গে যে উঠে সে পার্শ্বস্থ নশ্বর গ্রামাদিকে সামান্য দেখে, মস্তকোপরি শৃঙ্গকে মহৎ দেখে।

* অহঙ্কার—অর্থাৎ আমার তোমার, ইত্যাকার জ্ঞান।

শিঃ। এই জগৎকাণ্ড বুঝিবার উপায় কি?

গুঃ। জগৎ বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে আগে বুঝা উচিত।

শিঃ। ঈশ্বর কি প্রকার?

গুঃ। ঈশ্বর কি প্রকার তাহা কেহ কখন স্থির করিয়া অন্তর হইতে প্রকাশ করিতে পারে নাই। ঈশ্বর সে ক্ষমতা মনুষ্যবুদ্ধিতে প্রদান করেন নাই।

শিঃ। যখন ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্থির হয় নাই, তখন কিরূপে তাঁহার উপাসনা করিব?

গুঃ। ন্যায় মতে বস্তুর দ্বারা কর্ত্তা সাপেক্ষ করিতে হইলে, ক্রিয়া দেখিয়া কর্ত্তাকে ক্রিয়াবান্ করিয়া লইতে হয়। মনুষ্য সাকার পদার্থ। সাকার পদার্থ বিচার কালে কোন বস্তু বিচারীকৃত করিতে হইলে, সাকারভাব ভিন্ন বিচার হয় না। সেই কারণে সাকার বুদ্ধিতে এই সাকার জগৎ প্রণেতাকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকেও সাকারত্ব অর্পণ করিতে হয়, নহিলে মীমাংসা হয় না।

শিঃ। এক ঈশ্বর হইতেই কি এই জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছে?

গুঃ। পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয় বটে। এক হইয়া তিনি সৃজন, পালন, হরণাদি এই বিশ্বকার্য্য করিবার নিমিত্ত সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যুক্ত হইয়াছেন।

শিঃ। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ ঈশ্বর কাহার নিকট হইতে লইলেন?

গুঃ। মায়া-প্রকৃতি হইতে তিনি ঐ গুণ গ্রহণপূর্ব্বক আপনি ঐ তিন গুণমণ্ডিত হইলেন।

শিঃ। মায়া-প্রকৃতি কে?

গুঃ। যে স্থানে নির্গুণ ঈশ্বর সগুণ হইয়া চৈতন্য ও সৎ এই ত্রিশক্তিময় হইয়াছেন, তাহাকে ত্রিসাম্যসদন কহে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম প্রধান অবস্থা বা মায়া। এই অবস্থা হইতে জগৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। মায়া ঈশ্বরের চৈতন্যে চৈতন্যবান্ কারণ সমূহ লইয়া ঈশ্বর হইতেই উৎপাদিত হন। মায়া প্রকাশ হইলে তাহাতে কালশক্তি* প্রবেশ করিলে মায়া ও কাল ত্রিগুণময় হইল। সেই কারণে যাবতীয় মায়া ও কালোদ্ভূত জীব ও ভূত ত্রিগুণময় হইয়া থাকে। ঈশ্বর আপনার রূপ সংপূর্ণ রূপে মায়াতে না দিয়া মায়া হইতে

* কালশক্তি—ইহাকে রুদ্রশক্তি কহে।

ঐ তিনগুণ লইয়া আবৃত করিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি তিনভাগে রূপান্তর হইল। প্রকৃতির পালনকারী সত্ত্বগুণ হইতে হরি মূর্ত্তি; সৃজনকারী রজোগুণ হইতে বিরিঞ্চি; ও হরণকারী তমোগুণ হইতে হরমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। ঐ তিনটী যে প্রকাশারূপ তাহা নয়। জগদ্বিচারের কারণ ঈশ্বরকে রূপান্তর করা হইল মাত্র।

শিঃ। সত্ত্ব, রজঃ তম এই তিনটী গুণের ক্রিয়া কিরূপ?

গুঃ। তমোগুণ হইতে রজোগুণের উদ্ভব হয়, রজঃ হইতে সত্ত্বের আবির্ভাব হয়, এবং সেই সত্ত্ব হইতে ব্রহ্ম দর্শন হইয়া থাকে।

শিঃ। মনুষ্য দেহে কি সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ আছে?

গুঃ। হাঁ, প্রথমাবস্থায় দেহী মাত্রেই দেহস্বধর্ম্মে (জ্ঞান স্বধর্ম্মে নহে) তমোগুণী। এই তমোগুণময় দেহে রজঃ ও সত্ত্বগুণ আছে। কি বৃক্ষ কি প্রস্তর কি মনুষ্য সকলেই তমোগুণী। যেমন কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে ধূম বিনির্গত হয়, পরে সেই ধূম হইতে অগ্নি প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকাশের পূর্ব্বে ঐ কাষ্ঠে অগ্নি ও অগ্নিপ্রকাশক ধূম অস্ফুট ভাবে থাকে। চেষ্টা না করিলে প্রকাশ হয় নাই, তদ্রূপ এই তমোগুণময় দেহে রজঃ ও সত্ত্বগুণ আছে, বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিলে মনসাহায্যে ক্রমে সত্ত্বগুণের সাক্ষাৎ হইলে মায়ার সমস্ত বুঝা যায়। মায়া বুঝিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবা মাত্রই ব্রহ্ম দর্শন হয়।

শিঃ। ঈশ্বর স্বীয় চৈতন্যকে ত্রিগুণময় করিয়া ত্রিদেব কল্পনা করিলেন বলিয়া তাহারা কি পূর্ণ ঈশ্বর?

গুঃ। তাঁহারা পূর্ণ ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের ফলাংশ বটে। ঈশ্বরের ক্ষমতা তাঁহারাই প্রকাশ করেন।

শিঃ। এই ত্রিদেবের উপাসনা করিলে কি লাভ হয়?

গুঃ। ত্রিদেব বলিতে হরি, হর ও ব্রহ্মা। প্রকৃতি জগৎ উৎপন্ন করে বলিয়া তাহার তেজকে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি কহে। আর কালদ্বারা সমস্ত বিনাশ হয় বলিয়া তাহার তেজকে হর বা ভূতপতি কহে। এই দুই মূর্ত্তিকে পূজা করিলে দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান লাভ মাত্র হইয়া থাকে। তাঁহাদের ক্ষমতা জানা যায়। তাঁহাদের ক্ষমতা সংসারের উপর বিন্যস্ত। অতএব তৎপূজাকারী

পরমাত্মা না পাইয়া সংসার ভাল বুঝিতে পারেন। সংসারে যাহারা ঐশ্বর্য্য পুত্র, ও রূপাদি কামনা করিবে, তাহারাই রজঃ ও তমো গুণাবলম্বি দেবগণকে পূজা করিয়া থাকে। আর যাঁহারা মুক্তিপথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কেবল সেই বাসুদেব হরিতে ভক্তি করিয়া থাকেন। কারণ সত্বগুণ না হইলে মুক্তিলাভ হয় না। হরিনামকীর্ত্তনে এই কলুষিত মন সত্বগুণ ধারণ করিতে পারে। বিশুদ্ধ সত্বগুণ প্রাপ্ত হইলে অষ্টসিদ্ধি* লাভ হয়। অষ্টসিদ্ধি লাভে আত্মা প্রত্যক্ষ হয়; আত্মার সাহায্যে পরমাত্মা অনুভব করিতে পারিলে জীবে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। হরিনামকীর্ত্তন ও হরি সেবা করাই কি উচিত?

গুঃ। বাসুদেব সেবা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, তাহার আর অপর কথা কি বলিব। সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যই একমাত্র সেই বাসুদেব। যজ্ঞার্থে আরাধ্য মন্ত্রই বাসুদেব। সকল প্রকার যোগাঙ্গ ও সমাধি প্রভৃতির একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তুই বাসুদেব। সমাধি সাধন করিবার জন্য যে সমস্ত বীজমন্ত্র, ধারণাদির ক্রিয়াদি, তাহারও তাৎপর্য্য বাসুদেব। সকল জ্ঞানশাস্ত্রের, সকল তপস্যার, সকল প্রকার ধর্ম্মের এবং সকল প্রকার গতির একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য সেই বই আর কিছু নহে।

শিঃ। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ?

গুঃ। ঈশ্বর সগুণ বটেন ও নির্গুণ বটেন।

শিঃ। যখন ঈশ্বর ক্রিয়াবান তখন নির্গুণ বলিব কি রূপে?

গুঃ। তিনি আপনি স্বভাবতঃ নির্গুণ থাকেন, কেবল বিশ্বসৃষ্টি করিবার কারণ সত্ত্বাদিগুণযুক্ত হয়েন। তাঁহারি বিরচিত এই মায়া ও গুণময় জগৎ পদার্থ বটে এবং তিনি স্বীয় তেজে সকলের অন্তে প্রবিষ্ট আছেন বলিয়া তাঁহাকে গুণবান্ বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি আপনাতে আপনি বিজ্ঞান স্বরূপই আছেন, তাঁহার চৈতন্য সমস্ত ক্রিয়া করিতেছে। তিনি না হইলে কিছুই চলিতেছে না, আবার তিনিই কিছুতে লিপ্ত নহেন। যেমন রাজার হুকুমে সৈন্যেরা সমর করিতে যায়, লোকে বলে রাজা সমর করিতেছেন।

---

* অনিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবশায়িতা॥

শিঃ। যদ্যপি ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ যে আত্মা তাহাও এক ও অদ্বিতীয় হইবে, কিন্তু তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন আত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রিয়া করিতেছে কেন?

গুঃ। বিশ্বের আত্মারূপী ভগবান্ প্রতি ভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট আছেন। কিন্তু ভূতক্রিয়া দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করেন। বিজ্ঞানমতে ভূতশক্তি সমস্তই এক বই দুই নহে। সেই মতানুসারে তেজও এক। তেজক্রিয়াকেই অগ্নি কহে। সকলের অন্তরে সমান ভাবে অগ্নি আছে। ভূত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভূত-ক্ষমতা তাহাতে নিহিত আছে জানিবে। আত্মাও ঈশ্বরের স্বরূপ, তাহা বেদাদির মতে এক। তোমাতে আত্মা, আমাতে আত্মা, ব্যাঘ্রে, উদ্ভিজ্জে সমস্তেই আত্মা আছেন। তাহা তাহাদের জীবিত শক্তি দেখিলেই প্রমাণ করা যায়। অতএব তুমি, আমি, ব্যাঘ্র, বৃক্ষ, সকলই সকল হইতেই ভিন্ন বটে, কিন্তু আত্মা ভিন্ন নহে। যেমন প্রতি বস্তুতে অগ্নি থাকিলে, অগ্নি এক বই দুই নহে। তদ্রূপ আত্মা প্রতি প্রাণীতে থাকিলেও তাহা এক বই দুই নহে। ইহা বিজ্ঞান-মীমাংসা।

শিঃ। মনুষ্য, গো, বৃক্ষ এই সকল বিভিন্ন সৃষ্টি এবং প্রতি সৃষ্টির বিভিন্ন ক্রিয়া কেন হয়? ও এই যে সৃষ্টি, ইহা প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বরের কি প্রয়োজন পূর্ণ হইল?

গুঃ। লোকে মায়াবলে অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বলে, আমি মনুষ্য, ইহা গরু, উহা বৃক্ষ। কিন্তু বল দেখি, এই মনুষ্য দেহের কোন অংশটী মনুষ্য, তাহা অদ্যাপি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সমস্ত অঙ্গই ঈশ্বরের লীলা খেলার স্থল। পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা নির্ম্মিত দেহধারী মাত্রকেই প্রাণী বলা যায়। বিজ্ঞানমতে প্রাণী চারি প্রকার, জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ। এই সকলকেই আত্মার গৃহ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমাত্মা তাঁহার উপভোগস্থলরূপী জগৎ প্রস্তুত করিয়া আত্মারূপে চারি প্রাণী দেহরূপ গৃহ মধ্যে থাকিয়া সমস্ত উপভোগ করিতেছেন।

শিঃ। ঈশ্বর জীবদেহে আত্মারূপে থাকিয়া উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু স্বয়ং তিনি কেন উপভোগ করিলেন না?

গুঃ। তাহার কারণ এই, যেমন একটী রাজার পালন, শাসন, গ্রহণ প্রভৃতি

বিবিধ কার্য্যক্ষমতা দ্বারাই শেষ করেন, তদ্রূপ যদি স্বয়ং ঈশ্বর উপভোগে উন্মত্ত হন, তাহা হইলে আর আর ক্ষমতা কে প্রদান করিবে। এই কারণে ঈশ্বর কাহাতেও সংলিপ্ত না থাকিয়া আত্মা দ্বারা উপভোগ করিবার কারণ এই জগৎ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্গুণরূপী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। মায়ায় তুমি আমি ভাবি। কিন্তু মায়া ত্যাগ করিলে কেহই কিছুই নহে, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের লীলা খেলা বলিয়া বোধ হয়। আমরা সকলেই তাঁহার ক্রীড়ার উপায় মাত্র।

শিঃ। প্রয়োজন ভিন্ন কার্য্য হয় না; ঈশ্বরের কি প্রয়োজনে এই জগৎ কার্য্য প্রকাশিত হইল?

গুঃ। যেমন আপনার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলে সম্ভোগ্য বস্তুর আহরণ করিতে হয়, আহার করিতে হইলে আহারীয় বস্তু আহরণ করিতে হয়, তেমনি এই জগদীয় লোক ও লোকপালগণকে তাঁহার উপহারের কারণ তিনিই প্রস্তুত করিয়াছেন।

শিঃ। যদি ঈশ্বর লোক ও লোকপালগণকে তাঁহার উপহারের কারণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ পায়?

গুঃ। সে ইচ্ছা কি রূপ:—যেমন ক্রীড়া করা ইচ্ছার বশীভূত বটে, কিন্তু তাহাতে আন্তরিক আশক্তি হয় না, অথাৎ ক্রীড়া না হইলে থাকিতে পারিব না, এমন ভাব হয় না। সেইরূপ ঈশ্বর এই জগৎ স্বীয় ক্রীড়ার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; জগদীয় জীবগণ ও বস্তু সকল তাঁহার ক্রীড়ার উপকরণ স্বরূপ। লোকে বাল্যকালে শিশুকে ক্রীড়ার উপকরণ দেয়, শিশু স্থিরমনে ক্ষণেকের জন্য ক্রীড়ার উপকরণ লইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করে, আবার তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। যদি তাহাতে শিশুর আশক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে কখন ভাঙ্গিত না। সেইরূপ ঈশ্বর ক্রীড়া করিতে এই জগৎ প্রণয়ন করিতেছেন, ইহাতে আশক্ত নহেন, তাহার চিহ্নের স্বরূপ তিনি স্বয়ংই ইহা বিনাশ করিতেছেন। অতএব মানবগণ তাঁহার জাগতিক বস্তুর মধ্যে গণ্য বলিয়া সেই স্বভাবাপন্ন হইয়াছে।

শিঃ। ঈশ্বর কি উদ্দেশে আত্মারূপে প্রতি জীব দেহে অবস্থান করেন?

গুঃ। এই শরীর দুই ভাগে বিভক্ত। একটী মনোময়, একটী ভূতময়।

স্থূলভাবে যাহা সর্ব্বদা দেখা যাইতেছে, তাহাকে ভূতময় কহে। সূক্ষ্মভাবে যাহা স্থূলভাগের প্রয়োজক হইয়া অদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাকে মনোময় কহে। স্বপ্নে ঐ মনোময় দেহের অনুভব কিয়ৎ পরিমাণে হয়। এই উভয় দেহই চৈতন্যময়। ঐ দুই দেহ ষোড়শ গুণে বিভক্ত। একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় আর, মনই মনোময় দেহের গুণ। চৈতন্য এই ষোড়শ জীবত্ব প্রদান-কারী ও উহাদের কৃতগুণের উপভোগকারী। সেই চৈতন্যের সংভাবই জীবাত্মা, অতএব জীব উপভোক্তা মাত্র; ঈশ্বররূপী পরমাত্মা তাহার সাক্ষী স্বরূপ। সাক্ষীভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য প্রকাশ হইল এবং আত্মাভাবে লীলা প্রকাশ হইল। ইহাতে তিনি সর্ব্বজ্ঞ প্রমাণিত হইলেন।

শিঃ। ভগবানের ইচ্ছায় কি কেবল সৃষ্টিই হইয়া থাকে?

গুঃ। ভগবানের সিসৃক্ষু, লিলিপ্সু ও জিহির্ষু, এই তিনটী ইচ্ছা আছে। সিসৃক্ষু ইচ্ছাতে আপনিই সৃষ্টিরূপে রূপান্তরিত হয়েন। লিলিপ্সু ইচ্ছাতে আপনিই লীলাময় হয়েন। জিহির্ষু ইচ্ছায় আপনিই আপনার অংশরূপী লীলার্থ জীব ও সৃষ্টার্থ ব্রহ্মাণ্ড হরণ করেন।

শিঃ। ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি কি রূপ?

গুঃ। ঈশ্বরকে বিরাট্ পুরুষ ভাবে ধারণা করিতে হয়।

শিঃ। সেই বিরাট্ মূর্ত্তি কি?

গুঃ। তাহা মহদাদি, ভূতাদি ও ষোড়শকলাংশাদিতে জগৎ-সৃজনের কারণ রূপে প্রস্তুত হইয়াছে।

শিঃ। মহদাদি, ভূতাদি ও কলাংশ কাহাকে কহে?

গুঃ। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতিকে মহদাদি কহে। পঞ্চভূতকে ভূতাদি কহে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও ঐ পঞ্চ ভূত মিশিলে ষোড়শ কলা হয়। এই সমস্তে যে আকার প্রস্তুত হয়, তাহাই ভগবানের বিরাট্ দেহ অর্থাৎ জগৎপ্রকাশক প্রকৃতিকে ঈশ্বরের বিরাট্ দেহ কহে। যে উপায়ে জগদীয় আমি, তুমি, জন্তু, বৃক্ষাদি সৃজিত হইল, তাহার, স্বরূপ ভাবকে বিরাট্ পুরুষ কহে। তাহার ভাবনাকে বিরাট্ পূজা কহে। বিরাট্ শব্দের অর্থ বিশেষ রূপে শোভিত। এই প্রতি জীব দেহ যে পদার্থ লইয়া বিশেষ রূপে শোভিত রহিয়াছে, তাহাই ভগবানের বিরাট্ দেহ।।

শিঃ। বিরাট্ অবস্থা কাহাকে বলে ?

গুঃ। কার্য্যশক্তি ও কার্য্যের উপাদানময় সমষ্টিবাচক অবস্থাকে বিরাট্ অবস্থা কহে। এই বিরাট্ ভাবই ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্ব ভাব।

শিঃ। এই জগৎ প্রকাশের পূর্ব্বে ঈশ্বরের বিরাট্ মূর্ত্তি কোন স্থানে ছিল এবং কি অবস্থায় ছিল ?

গুঃ। যখন প্রলয়ে সমস্ত পৃথিবী বারিতে মগ্ন হইল, তখন ভগবান্ যোগ নিদ্রায় তদুপরি শয়ন করিয়া ছিলেন।

শিঃ। শয়নই বা কি ? যোগনিদ্রাই বা কি ?

গুঃ। নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে বিশ্রাম করিতে দেওয়ার নাম শয়ন। অন্তরে ইচ্ছা বা ধারণা করিয়া অন্তরদৃষ্টি মনে প্রদান করিলে তাহাকে যোগনিদ্রা কহে।

শিঃ। প্রলয় হইবার কারণ কি ?

গুঃ। ভগবান্ এই জগৎ এক কালে প্রলয় দ্বারা বিনাশিত করিয়া আপনার লীলাজাত পরিশ্রমের শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ইহা বেদাদির মত ও প্রলয় বিজ্ঞানে প্রমাণ হইয়া থাকে।

শিঃ। প্রলয় কাহাকে বলে ?

গুঃ। প্রলয় তিন প্রকার, নিত্য প্রলয়, খণ্ড প্রলয়, ও মহাপ্রলয়। মৃত ও নিদ্রিত অবস্থাকে নিত্য প্রলয় কহে। দেশের কিয়দংশ দুর্ভিক্ষে ভূকম্পনে বা বৃষ্টি কিম্বা সমুদ্র নদ্যাদির বারিতে বিনাশিত হইলে, তাহাকে খণ্ড প্রলয় কহে। সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হইলে তাহাকে মহাপ্রলয় কহে।

শিঃ। মহাপ্রলয়ের কি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে ?

গুঃ। হাঁ, প্রতি চারি যুগান্তে হইয়া থাকে। ঈশ্বর চারি যুগান্তে আপন চৈতন্যশক্তি, মায়া শক্তি, কাল শক্তি ও কারণ সমূহকে নিশ্চেষ্ট ভাবে বিশ্রাম করাইবার কারণ মহাপ্রলয় করেন।

শিঃ। মহাপ্রলয় কি রূপে হয় ?

গুঃ। পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে ও সূর্য্যের আকর্ষণে সৌরক্ষেত্রে আপনার পথে সমান ভাবে ঘুরিতেছে। চন্দ্রে ক্রমে তেজ কমিলে চন্দ্র মৃত গ্রহ হয়। সেই সময়ে তাহার আকর্ষণী শক্তি হ্রাস হয়। সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি

থাকাতে পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়ই স্বীয় স্বীয় পথ হইতে স্খলিত হইয়া সূর্য্যের নিকটে গমন করে। যত সন্নিহিত হয়, ততো তেজ বলে সমস্ত পৃথিব্যাংশ রসে বিকারীকৃত হয়। ভূতাংশ সমস্ত রসে পরিপূর্ণ হইলে সমুদ্রের জল বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আপ্লুত করিয়া থাকে। পৃথিবীর গতি স্বীয় পথ অতিক্রম করিলে অপরাপর গ্রহগণ আপন আপন পথ হইতে স্খলিত হইয়া সূর্য্যোপরি পতিত হয়। অগ্নিতে যেমন মাখন গলিয়া ঘৃতে পরিণত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সমস্ত গ্রহপিণ্ড সূর্য্য তেজে গলিয়া যায়। সেই তেজোনামা ভূতও বায়ুতে গমন করে, বায়ুও শূন্যে প্রবেশ করে। এক প্রকৃতির বিলোপে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র শূন্য অবস্থান করে। সেই মহা-প্রলয়ে ঈশ্বর স্বীয় চিৎশক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সকল কারণ, মায়া ও কালশক্তিকে আপনার গর্ভে রাখিয়া আপনিই সেই প্রলয় বারিতে নিশ্চেষ্ট ভাবে শয়ন করেন।

শিঃ। ঈশ্বর কি প্রলয় বারিতে নিশ্চেষ্ট ভাবেই শয়ন করিয়া থাকেন ?

গুঃ। কালক্রমে যখন তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কালশক্তির দ্বারা কারণ সমূহকে চৈতন্যবান্ করিয়া স্বীয় নাভি হইতে একটী পদ্ম প্রকাশ করেন। ঐ পদ্মকে ত্রিলোকের কোষ কহে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন লোক প্রকাশিত হইলে, তাহাদের আধার স্থানকে পদ্ম কহে। প্রলয়ের পরে জগতের আধারস্থানকে পদ্ম বলিয়া অলঙ্কার শব্দ দেওয়া হইল, কারণ জলে পদ্ম কখন মগ্ন হয় না। সেই পদ্ম হইতে আপনি ভগবান্ পুরাকালে পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিবার কারণ জগতের আধারে অগ্রে প্রকৃতির তেজ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহা ভগবানের আর এক অবতার স্বরূপ।

শিঃ। মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি কি রূপে হইল ?

গুঃ। মায়াতে যে ভাবে তিন গুণের প্রকাশ হয়, সেই তিনগুণ মায়ায় পরিণত হইলে, কাল তাহাদের সাম্যাবস্থা ক্ষুভিত্ করিতে থাকে। কালের ক্ষোভণে ঐশিক স্বভাবে ঐ গুণ সকলের এক প্রকার পরিণাম হয়। সেই পরিণত অবস্থা ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ অদৃষ্ট নামক কর্ম্ম দ্বারা অপর একটি রূপে ও অবস্থায় প্রকাশ হয়। এই প্রকাশ্য অবস্থাকেই মহত্তত্ত্ব কহে। বিজ্ঞান-

বিদেরা কহেন ক্ষুদ্র বস্তুর উৎপত্তিও যে ভাবে হয়, মহৎ, বস্তুর উৎপত্তিও সেই ভাবে হয়। ঈশ্বরের কর্ম্ম বা অদৃষ্ট মায়ার মধ্যস্থ রাখিয়া তাহার সম্মিলনে প্রকাশ করিতে হইলে কাল দ্বারা মায়াজাত তিন গুণের ক্ষোভ এবং স্বভাব দ্বারা তাহার পরিণাম দেখাইতে হয়। এইরূপে যে অবস্থায় কারণ সৃষ্টি রূপান্তরিত হয়, তাহাকে মহত্তত্ত্ব কহে।

অঙ্গারে অগ্নি দিয়া ফুৎকার দিলে, ফুৎকারের ক্ষমতায় ও অগ্নির ক্ষমতায় অঙ্গার অগ্নিময় হইল, কিন্তু অগ্নিময় হইলে পূর্ব্বদত্ত অগ্নি বা ফুৎকারের প্রয়োজন থাকে না। তদ্রূপ সদসৎ শক্তি জগতের সূক্ষ্ম কারণ। উহাকে সহায় করিয়া অপরাপর ঐশিক শক্তি সমূহ ক্রিয়াপর হইয়া থাকে। এই প্রমাণে দেখা যায় যে সতের সহিত চৈতন্য ও কালের ক্ষোভ হইল বলিয়া ঈশ্বরের সকল চৈতন্য বা সকল কাল শক্তি সতের মধ্যে রহিল না। সৎকে ক্রিয়াপর করিয়া ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরেই রহিল। এই প্রমাণে এক সৎ, তাহার পরিবর্ত্তনে মায়া, মায়ার পরিবর্ত্তনে তিন গুণ। এমতে সৎ, মায়া, তিনটী গুণ এই পাঁচটী বিকারীকৃত কারণাবস্থা প্রকাশ হইলে তাহাতে আর তিনটী, কাল, কর্ম্ম, স্বভাব নামক ঐশিক শক্তি মিশ্রিত হইল। তাহাতে ঐ পাঁচটী আর তিনটী সাকল্যে আটটী কারণাবস্থা মিলিত হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রকাশ হইল।

শিঃ। এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন কোন বস্তু ছিল ?

গুঃ। প্রথমে ব্রহ্ম, তাঁহার সদসদাত্মিকা শক্তি, কাল, চৈতন্য ও তাঁহার ইচ্ছা শক্তি ছিল। ভূতচৈতন্যময় জগতের সূক্ষ্ম কারণকে সদসদাত্মিকা শক্তি কহে। প্রকাশক ও নিরোধক তেজকে কাল কহে। সকলকে সজীবত্ব রাখিবার তেজকে চৈতন্য কহে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধক শক্তিকে ইচ্ছাশক্তি কহে। এই ইচ্ছাশক্তি যখন ঈশ্বরে সম্মিলিত থাকেন, তখন ইনি বিশুদ্ধা মায়া নামে কথিতা হয়েন ; যখন কালের ক্ষোভণে মিশ্রিত হয়েন, তখনই ইনি অপরিশুদ্ধা মায়া নাম ধারণ করিয়া থাকেন।

শিঃ। অপরিশুদ্ধা মায়া কি রূপ ?

গুঃ। ব্রহ্ম যখন স্বরূপে থাকেন, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য বস্তু জগৎ তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মাংশে লীন থাকে, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য ইচ্ছারূপ মায়া প্রকাশ হয়। সেই কর্ত্তব্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কাল কর্ত্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য

ভূতচৈতন্যময় জগতের সূক্ষ্ম কারণরূপিণী সদসদাত্মিকা শক্তিকে ক্রিয়াপর করিতে চেষ্টা করেন। যে ক্ষণে কাল ক্রিয়াপর হইয়া সদসদাত্মিকাকে ক্ষোভ প্রদান করেন, তখনি তাহার অবস্থান্তর হয়। এই অবস্থাকে ক্রিয়াপর অবস্থা বা প্রধানাবস্থা কহে। যেমন অঙ্গারে অগ্নি দান করিয়া তাহাতে ফুৎকার আরম্ভ করিলে : অঙ্গার অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে এক প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ ইচ্ছাশক্তির পীড়নে কালরূপ ফুৎকার অঙ্গার রূপী সদসৎশক্তিকে চৈতন্যরূপী অগ্নিময় করিবার প্রথম অবস্থাকে প্রধান কহে। অগ্নিসহযোগে যেমন অঙ্গার স্বকীয় গুণক্রিয়ার সহিত অগ্নির গুণ ক্রিয়া ধারণ করিয়া অগ্নি প্রভাব প্রকাশ করতঃ অগ্নিতে লয় পায়। তেমনি কাল দ্বারা চৈতন্য লাভ করিয়া সদসৎশক্তি যখন চৈতন্যময় হয়, তখনি মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি বা অবিশুদ্ধা মায়া প্রকাশিত হন।

শিঃ। এই মহত্তত্ত্বের গুণ কি ?

গুঃ। ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে প্রথমাবস্থাকেই মহত্তত্ত্বাবস্থা কহে। যে কোন তত্ত্বকে বিচার করিয়া দেখা যায় যে :—তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ অনুভব হইলে, সেই লক্ষণগুলির এমন একটী সাম্যভাব সংগৃহীত হয় যে সেটীকে কোন রূপে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু সেই অবস্থাটী যে নিশ্চিত তাহা বোধ হয়। সেই সূক্ষ্ম অবস্থাকে মহত্তত্ত্ব কহে। তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির বিচার দ্বারা সক্ষম হইয়াও যে ভাগকে মহৎ অর্থাৎ অতীত বলিয়া বোধ হয়, সেই অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম বস্তুর সৎ মাত্রাকে মহত্তত্ত্ব কহে। এই মহত্তত্ত্ব অবস্থা কি রূপ ?—না— কাল দ্বারা ক্রিয়াপর অব্যক্ত মায়া হইতে পুরুষ সহযোগে যে অবস্থা প্রকাশ হইল, তাহাই মহত্তত্ত্ব।

এই মহত্তত্ত্বে প্রধান তিনটী বস্তু রহিল, একটী—কাল, অপরটী চৈতন্য, অপরটী সদসৎ। সদসৎ বলিতে সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবাপন্ন পদার্থ তাহা হইতে জড়ভাবের ও জড় জগতের উপাদান সকল প্রকাশ হয়। যখনি কাল ও চৈতন্য উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখনি উহা নিরোধ রূপে অর্থাৎ প্রলয় রূপে আপন সূক্ষ্মভাবে আপনিই লয় হয়। এইজন্য ইহাতে নিরোধাত্মক ও ভূতোপদানাত্মক গুণ আছে বলিয়া মহত্তত্ত্বে তমো অর্থাৎ নিরোধ বা অপ্রকাশ নামক গুণ প্রকাশিত হয়। মহত্তত্ত্বে কাল শক্তি থাকায় তাহার ক্ষমতায় সদসৎ সৃষ্টির

উপাদান প্রকাশ হয়। তজ্জন্য কাল হইতে মহত্ত্বে যে গুণ থাকে, তাঁহাকে রজোগুণ বা প্রকাশক গুণ কহে। মহত্ত্বে চৈতন্য থাকায়, উহার দ্বারা সদসৎ, সজীবত্ব ও বিলুপ্তভাব উদ্ভব করণক শক্তি প্রকাশ হয় বলিয়া, তাহাকে সত্ত্বগুণ কহে।

কোন একটী বস্তুর কার্য্য স্বভাবকে গুণ কহে। কাল, চৈতন্যাদি কেবল যে মায়াতে ব্যাপ্ত রহিলেন তাহা নয়, কেবল তাঁহাদের কার্য্য স্বভাব মায়াতে ব্যাপ্ত হইল। এই জন্য তাঁহাদের প্রকাশ্য স্বভাবকে মায়াম্বিত গুণ বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঐ তিন গুণযুক্ত প্রকৃতি হইতে জগতের দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই অনিত্য স্বভাব প্রকাশ হয়। যাহাদের কারণ নিত্য, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, সেই সকল প্রকাশ্য বস্তুকে অনিত্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছে। বিশ্ব প্রকাশক কাল তেজোদ্ভূত রজোগুণে ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, বিশ্বের পূর্ব্বতন স্বভাব জ্ঞাপক ও সজীবক উপায় স্বরূপ চৈতন্যোদ্ভূত সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান প্রকাশ হয়। বিশ্বপ্রকাশক উপাদানরূপ ভূতাদি উদ্ভাবক সদসৎ শক্তি হইতে উদ্ভূত রজোগুণে দ্রব্যের প্রকাশ হয়। ব্রহ্ম জগৎ লীলা করিবার জন্য কর্ম্ম ও স্বভাবের সহিত আপনি ঐ গুণত্রয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েন। ঈশ্বরের ইচ্ছার কর্ত্তব্য সাধনকে কার্য্য কহে এবং সেই প্রকাশক তেজকে স্বভাব কহে। এই কর্ম্ম ও স্বভাব সম্মিলনে মহত্ত্বের দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া সংযোজিত হয়। কালও আপন গুণে উহাদের ক্রিয়মাণ করেন। এমতে ঈশ্বর জাত নিত্যকাল, কর্ম্ম,স্বভাব এবং মহতত্ত্বরূপ মায়া হইতে জাত দ্রব্য,জ্ঞান, ক্রিয়া এই ষট্ সম্পত্তির মিলন হয়। দ্রব্যে জগতের উপাদান প্রকাশ হয়, ক্রিয়া তাহা রূপান্তরে প্রকাশ করে, জ্ঞান চৈতন্যময়ভাবে সূক্ষ্মভাব বিকশিত করিয়া নিয়মিত সংসার কার্য্য করেন। কাল ইহাঁদের পরিবর্ত্তন করেন, কর্ম্ম পূর্ব্বভাব রূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা নামক কর্ত্তব্য প্রকাশ করেন; স্বভাব সকলের প্রকাশক রূপে সকলি প্রত্যক্ষ করান। ইহাই জগতের উপাদান সূক্ষ্ম কারণ-রূপে সাংখ্যে বিচারীকৃত হইয়াছে।

শিঃ। চৈতন্যময় জগৎ কি রূপে প্রকাশ হইল?

গুঃ। ঈশ্বরের কর্ত্তব্য কার্য্যই জগৎ লীলা। ঈশ্বর লীলা করিতে ইচ্ছা

করিয়া আপন শক্তির সহিত যখন দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়াত্মক পদার্থরূপী মহত্তত্ত্বে মিলিত হইলেন অমনি সকলের সংজ্ঞা বোধ হইল। তাহাকে অহঙ্কার কহে। অহঙ্কার বলিতে সত্তা, অর্থাৎ সজীবভাবে ক্রিয়মান তেজ। মায়াতে যে তিন গুণের পরিচয় দিয়াছি,তাহারা পূর্ব্বোক্ত ছয়টী শক্তি বলে সেই অহঙ্কারে মিশ্রিত হইল। সত্তাতেজরূপী অহঙ্কারের যে অংশে তমোগুণ মিশ্রিত হইল, তাহা হইতে ভূতাদি উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। কারণ তমোগুণে জড়ভাবাপন্ন জগতের সূক্ষ্মকারণ ছিল, এক্ষণে সত্তা পাইয়া তাহার তেজে আপনার বিলুপ্ত ভাব রূপ দ্রব্যাদি অর্থাৎ ভূতাদি, কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব বশে প্রকাশ করিতে লাগিল। অহঙ্কারের যে অংশে রজোগুণ আসিয়া মিশিল, তাহা হইতে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব বশে ঐ ভূত সকলকে ক্রিয়াবান্ করিল,কারণ মায়ার ক্রিয়াশক্তি রজোগুণ হইতে প্রকাশ হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। অহঙ্কারের যে অংশে সত্ত্বগুণ মিশ্রিত হইল, তাহা হইতে ভূত জগতে জ্ঞান প্রকাশ হইল। উহাতে আপনিই চৈতন্যে আকর্ষিত কাল, কর্ম্ম, স্বভাব প্রতিফলিত হইয়া দ্রব্য ও ক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল। এমতে চৈতন্যময় জগৎ প্রস্তুত হইল।

শিঃ। ঈশ্বরের জগৎ লীলা কি রূপ?

গুঃ। জ্ঞানময় সত্ত্বা বা অহঙ্কার হইতে মানস প্রকাশ হইল। সেই মানস হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ এবং তিনিই সকলের কর্ত্তা হইয়া সংসারে অবস্থান করেন। সেই সাত্বিক অহঙ্কাররূপ মানষের কার্য্য, পঞ্চভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই দশের আকর্ষণ কালের ক্ষোভণে হইয়া থাকে। ঐ ভূতাণু ভাবক চৈতন্যময় তেজের নামকেই বিজ্ঞানবিদেরা ইন্দ্রিয় কহেন। তমো ও সত্বের মিলন হইতে রজোগুণের প্রকাশ হয়। ঐ রজোগুণ ও সত্বাংশ হইতে জ্ঞানের শক্তি স্বরূপ বুদ্ধি, আর ভূত সকলের শক্তি স্বরূপ প্রাণের প্রকাশ হয়। এই সকল বিভূতি লইয়া ঈশ্বর সমষ্টি ও ব্যষ্টি করিয়া রাখিলেন। উহাদের সমষ্টি হইতে জীব দেহ, আর ব্যষ্টি হইতে জগৎপূর্ণ ভূত প্রপঞ্চ প্রকাশ হইল। সেই জীবদেহে, ভগবানের শক্তি প্রবেশ করিল, তাহাই জীব ও সকল আনন্দোপভোগকর্ত্তা হইল। ঐশিক ইচ্ছা শক্তি প্রথমে যাহা ঈশ্বরের কার্য্যে ব্রতী হইয়া, কাল সহযোগে জগৎ ও জীব প্রকাশ করিল; তাহাই স্বাধীনভাবে জীবের সহকারিণী হইল। কাল,

কর্ম্ম ও স্বভাব মতে জীব ঐ স্বাধীন বৃত্তিরূপী বাসনার মন্ত্রণায় মায়াজাত ত্রিগুণের অধীন হইয়া পড়িল, আর আপনার পরম শক্তি দেখিতে পাইল না এবং কেহ গো, কেহ বৃক্ষ, কেহ মনুষ্য, বাসনার মতে স্বভাবের তারতম্যে প্রকাশ হইল। যত জীব জগতে প্রকাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুষ্যের জন্ম সত্বগুণ প্রধানে অর্থাৎ জ্ঞানাধিক্য। জন্মান্তে যে সকল মনুষ্য রজো ও তমোগুণে বশীভূত না হইয়া আপনাপনি সত্বময় থাকে, তাহারা চৈতন্যময় বলিয়া কূটস্থ জীবভাব হইতে ঐশিক ভাব অনুভব করিতে পারে। সেই আনন্দময় রূপই ব্রহ্ম বা নারায়ণ। নারায়ণের আনন্দময় প্রভাবই আপনি ঐশিক জ্ঞানকে রজো ও তমোগুণে প্রকাশ করেন, এবং সেই জ্ঞান স্বভাব নিত্য ও অভ্রান্ত; কারণ জগৎ নিয়মিত রহিয়াছে। গতি হইতেই পুণ্য ও পাপের তারতম্যে বাসনা জীবলীলা করিয়া থাকেন।

শিঃ। গতি কাহাকে বলে ?

গুঃ। জন্ম ও জন্মান্তরের কর্ম্মফলকে গতি কহে। স্বাধীন বৃত্তির অধীনে জীবাত্মা দ্রব্য কর্ম্ম, কালাদি ষট্ সম্পত্তি লইয়া যে ভাবে মায়াজাত ক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকিবেন সেই অবস্থার পরিমাণকে গতি কহে। কেহ বা ফল কহে। ঈশ্বর আপন চিন্ময় শক্তি জীবের হৃদয়ে দিয়া তাহার সদ্ব্যয় হইল কি অসদ্ব্যয় হইল, ইহা জানাইবার জন্য গতি রাখিয়াছেন। ঐ গতিই বাসনার পরিণাম ফল। এই গতিটী কেবল প্রাপ্ত হইয়াই বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরকে পরকালের বিচারকর্ত্তা বলিয়া অসংশয়ে শাস্ত্রে প্রয়োগ করেন। বস্তুত ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাপ পুণ্যের বিচার করেন না। মায়াতে তাঁহার এমন ভাবে শক্তি সমূহ আছে, তাহারাই একেবারে স্থির ফলাফল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দিতেছে। ইহা অপেক্ষা সদ্বিচার আর হইতে পারে না এবং বিজ্ঞানে এতদ্ব্যতীত অপর ফলাফলের নিতান্ত পাওয়া যায় না। সাংখ্য শাস্ত্রে এ বিচার একেবারে ভূরি ভূরি প্রমাণের সহিত মীমাংসা করিয়াছেন।

শিঃ। জীবের গতি কয় প্রকার ?

গুঃ। শাস্ত্রে আছে এই জীবের গতি ত্রিভাবাপন্ন, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। স্বঃ বলিতে সৎকর্ম্মগত গতি বা স্বর্গ, ভুবঃ বলিতে অসৎকর্ম্মগত গতি। আর ভূঃ বলিতে জন্মমরণাত্মক কর্ম্মভূমি। কর্ম্ম ভূমিই জীবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে,

সৎ বা অসৎ কর্ম্ম ফলে বা গতিবাচক স্থানের কিছুইতো প্রত্যক্ষ হয় না। যাহা প্রত্যক্ষ হয়, না তাহার উপরে সন্দেহ হইতে পারে। উপদেশ দ্বারা প্রতীত হইলে, সেই সন্দেহ নাশ হইয়া থাকে। জন্ম ও মৃত্যুকে জীবের স্বাভাবিক গতি কহে। ঐ স্বাভাবিক গতি ব্যতীত আর একটী বৈকারিক গতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গতিকে গুণ ও কর্ম্মজ গতি কহে। সাত্বিক, ও রাজসিক, ও তামসিক প্রবৃত্তিকে ও অদৃষ্টের শুভাশুভ ফলকে বৈকারিক বা গুণ কর্ম্মজ গতি কহে। অর্থাৎ জীব সমূহ সাত্বিকগুণ বলে কেহ নিবৃত্তিগতি ও মুক্ত অদৃষ্ট লাভ করিয়া ইহ লীলা করিতেছে। কেহ রাজসিক গুণ বলে শুভ কর্ম্মে মতিমান্ হইয়া শুভ অদৃষ্ট মতে শুভ গতি লাভ করিতেছে। কেহ তামসিক গুণ মতে পাপকর্ম্মে রত হইয়া দুরাদৃষ্ট লাভ করিয়া মন্দগতি লাভ করিতেছে।

শিঃ। কোন অবস্থাকে অহঙ্কার কহে ?

গুঃ। পূর্ব্বোক্ত আটটী অবস্থাময় মহত্তত্ত্ব কালাদি শক্তিত্রয় মতে ক্রিয়াপর হইলে অবস্থান্তর হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব অবস্থা পর্য্যন্ত মায়ার তিনটী গুণ একত্রিত থাকে,পরে আপনাপন অংশের প্রকাশ হইতে ও পরিবর্ত্তিত হইতে চেষ্টা করে। সেই নিয়মে রজঃ ও সত্ব প্রায় এক্‌ভাব,এইজন্য অল্পমাত্র বিচ্ছিন্ন হয়। তমোগুণের সহিত রজঃ ও সত্বের মিলন অভাব হেতু উহা বিভিন্ন হইয়া প্রকাশ হয়। এই জন্য তমোগুণটী মহত্তত্ত্ব অবস্থার পরে অপর গুণের অপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠে। এই স্থানে মায়া দুই অবস্থাপন্ন হয়েন। এক অবস্থায় রজঃ ও সত্বাধিক থাকে, তাহাকে বিদ্যাবস্থা কহে, আর এক অবস্থায় তমোগুণ অধিক হয় ; ইহাকে অবিদ্যা অবস্থা কহে।

সৎশক্তির মধ্যে সত্তা বস্তুর সূক্ষ্ম কারণ অবস্থান করে। কাল, কর্ম্ম ও স্বভাববশে তমঃ শ্রেষ্ঠ হইয়া, আপনার প্রধান সত্তা সেই সৎস্বভাবকে আকর্ষণ করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করে। পূর্ব্বে তমোগুণের সহিত রজঃ সত্বের সামান্যতঃ মিলন ছিল বলিয়া, তাহারাও ঐ তমের আকৃষ্ট দ্রব্য মধ্যে সত্বগুণে জ্ঞানভাবে এবং রজোগুণে ইন্দ্রিয় বা ক্রিয়াভাবে আবির্ভূত হয়। ঐ দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়ার একত্র সম্মিলনে একটী অবস্থা হয়। উহা হইতেই সচেতন জগতের প্রকাশ হয়। সেই তমোগুণ প্রধান অবস্থাকে অহঙ্কার কহে। সূক্ষ্মকারণ সমূহ ক্রমে

মিলিত হইয়া অনুভব করা যায়। এমন সচেতন স্থূল কারণ ভাবকে অহংকার কহে। এই অহংকারকে সকলের সত্তা কহে। কারণ, প্রকাশ্য জগৎ এই অহংকারের কয়টী অবস্থার রূপান্তর মাত্র।

শিঃ। আকাশ কাহাকে বলে?

গুঃ। অহঙ্কার আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। জ্ঞান-শক্তিমিশ্রণে অহঙ্কার যে ভাবে থাকে, তাহাকে বৈকারিক অহঙ্কার কহে। ক্রিয়াশক্তির মিলনে অহংকারের যে অবস্থা হয়, তাহাকে রাজসিক অহঙ্কার কহে এবং দ্রব্যশক্তির মিশ্রণে অহঙ্কারের যে অবস্থা হয়, তাহাকে তামসিক অহঙ্কার কহে। সেই ভূত সকলের আদি তামস অহঙ্কার রূপান্তরিত হইয়া প্রথমে আকাশের প্রকাশ করে। ঐ আকাশের মাত্রা এবং গুণই শব্দ বুঝিতে হইবে। ঐ শব্দই জগতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বোধক হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সদসৎ শক্তির সত্তা নামক দ্রব্যাদির সূক্ষ্ম কারণ তমোগুণে ছিল। দ্রব্য সম্মিলিত সত্তা অবস্থাকে তামস কহে। ঐ স্থূল দ্রব্য কারণরূপী তামস অহঙ্কার হইতে সেই জন্য জগতের উপাদানরূপী দ্রব্যের প্রকাশ প্রমাণ হইতেছে। এই যে স্থূল জগতের মধ্যে পাঁচটি স্থূল দ্রব্য কারণরূপী ভূত অনুভব করা যায়, তাহারা ঐ অহঙ্কার হইতেই প্রকাশ হইয়াছে।

বিজ্ঞানে দেখা যায় যে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বোধক একটী সূক্ষ্ম কারণ আছে। একটী বৃক্ষ দেখিতে হইলে আপন ইন্দ্রিয়কে কোন একটী পদার্থের সাহায্যে,সেই বৃক্ষ স্থলে লইলে তবে বৃক্ষ বোধ হইবে। পরে পূর্ব্বভাব ও শিক্ষামতে তাহার পরিচয় স্থির হইবে। বৃক্ষটীকে দেখিয়া প্রথমে একটী পদার্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল; সেই পদার্থবোধক কারণকে আকাশের কারণ কহে এবং তাহারি নাম শব্দ। অনেকেই অনুমান করেন আঘাতই শব্দ। সেটী তাহাদের ভ্রম। বস্তুর সূক্ষ্ম রূপকে মাত্রা কহে। আকাশ বুঝিতে তাহার সূক্ষ্মরূপরূপী শব্দকে বুঝিতে পারিলেই আকাশ বোধ হইবে। এই ভূত সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক ভাব সম্পন্ন। (আ + কাশ)=আকাশ। আ উপসর্গের অর্থ সর্ব্বতোভাবে। কাশ শব্দের অর্থ বর্ত্তমান বা প্রকাশ। যে ভূত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তাহাকে আকাশ কহে।

দ্রব্য মিশ্রিত অহঙ্কার সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূল হইয়াছে, এবং সূক্ষ্ম হইতেই

স্থূলের আবির্ভাব, ইহাও বিজ্ঞানবিদেরা কহিয়া থাকেন। বায়ু শূন্য অপেক্ষা স্থূল বলিয়া শূন্যই ঘনীভূত অবস্থায় বায়ুতে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাতে অহঙ্কারের পূর্ব্বশক্তি আছে।

শিঃ। বায়ুর উৎপত্তি কিরূপ ?

গুঃ। তামস অহঙ্কার একেবারে রূপান্তরিত হইয়া ভূতবশে প্রকাশ হয়। ঐভূত সকল একের আশ্রয়ে অহঙ্কার হইতে জগতে বিরাজ করিতেছে। যাহার যাহার আশ্রয়ে যে ভূতের স্থিতি ও প্রকাশ নির্দ্দেশ হইয়াছে, সেই ভূতে আশ্রয়দাতার গুণ ও ধর্ম্ম আকর্ষিত হইয়া থাকে। ইহাই বিজ্ঞান বিধান। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বুধগণ স্থির করিয়াছেন যে, শূন্য ও অহঙ্কার এই উভয়ের মিশ্রণে যে ভূতের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই বায়ু। কারণ বায়ুতে নিজের স্পর্শ গুণ রহিয়াছে এবং ঐ স্পর্শগুণ ইন্দ্রিয়ের বোধক হইতেছে। তাহাতে শূন্যের বোধক বা শব্দগুণ এবং নিজের স্পর্শ গুণ থাকা সত্ত্বে জগতে বায়ুর স্থিতি প্রকাশ হইয়াছে। তেজের তারতম্যে ও গুরুতার তারতম্যে যে কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাকে স্পর্শন কহে। বায়ু শূন্য অপেক্ষা গুরু এবং তাহার অন্তরে তেজোবীজ রক্ষিত আছে, সেই জন্য গুরুত্ব এবং তেজ হেতু বায়ু ভূতের স্বকীয় লক্ষণ স্পর্শ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ স্পর্শ সকলের অনুভবের বা বোধের বস্তু বলিয়া তাহাতে শূন্যের শব্দ মাত্রার সত্তা দেখা যাইতেছে। এইজন্য বিজ্ঞানবিদেরা বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ লক্ষণ স্থির করিয়াছেন।

বায়ুর আরো চারিটী স্বভাব আছে, তন্মধ্যে একটীর নাম প্রাণ ; দেহ ধারণ শক্তিকে প্রাণ কহে। বায়ুর যে অংশে তেজ আছে, সেই অংশ সকল জীবের অন্তরে যাইয়া তেজ প্রদান করে। সেই তেজই সকল ভূতের আকর্ষক। সেই তেজ কি ভূত, কি ইন্দ্রিয় সকলকেই আকর্ষন করিয়া প্রতি প্রাণীর দেহে পালন ও জগতের নিয়মিত পরিপালন কার্য্যে পরিণত হয়। জীবের দেহ বলিতে ভূতাংশ। বায়ু যে তেজাংশে ভূত সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাকে প্রাণ কহে ; এবং যে স্পর্শন মিশ্রিত তেজাংশে ইন্দ্রিয় সকলকে কার্য্যপর করে, তাহাদের ওজঃ, সহঃ, ও বল এই তিন স্বভাব কহে। ওজঃ স্বভাবে জীব ইন্দ্রিয়ের তেজ প্রাপ্ত হয়। সহঃ স্বভাবে জীব ইন্দ্রিয়ের সহগুণ প্রাপ্ত হয়। বল স্বভাবে ইন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন হয়। এই চারিটী লক্ষণাক্রান্ত এবং শব্দ

স্পর্শ গুণদ্বয় যুক্ত যে ভূত জগতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকেই বায়ু কহে। ঐ বায়ুর অন্তরে যে তেজের সত্তা কহিলাম, তাহা কাল, কর্ম্ম, স্বভাবের দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বায়ু তেজকে প্রকাশ করে।

শিঃ। তেজের উৎপত্তি কি রূপ ?

গুঃ। কাল, কর্ম্ম, স্বভাবের দ্বারা অহঙ্কার যত পীড়িত হইতেছে, ততই তাহার কার্য্য প্রকাশ হইতেছে বুঝিতে হইবে। শূন্য ও বায়ু প্রকাশ হইলে তদপেক্ষা গুরু যে এক ভূত হইল, তাহাকে তেজ কহে। যে সূক্ষ্ম ভূতাংশ হইতে উত্তাপ প্রকাশ হয় এবং যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন, তাহাকে তেজ কহে। যে সূক্ষ্ম ভূতাংশ হইতে তেজ প্রকাশ হয়, তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে বায়ুতেই বিরাজ করে এবং মিলিত থাকে। ঐ সূক্ষ্মাংশ জ্যোতিঃ-সম্পন্ন। সেই জ্যোতিই রূপ বলিয়া সর্ব্বত্র অবস্থিত। এই জন্য বিজ্ঞানবিদেরা বায়ু হইতে তেজের প্রকাশ এবং তেজের গুণ জ্যোতিঃ বা রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ তেজ নিজগুণ রূপ লইয়া অপরের বোধক হয় বলিয়া, উহাতে শূন্যের মাত্রা শব্দ সংমিশ্রিত আছে দেখা যায় এবং ঐ তেজ স্পর্শনে অনুভূত হয় বলিয়া, উহাতে বায়ুর স্পর্শগুণ আছে দেখা যায়, উহাতেই তেজ জ্যোতিঃ বা রূপ, শব্দ, ও স্পর্শ এইতিন স্বভাবাপন্ন হইয়া জগতে বিদিত হইয়াছে। বায়ুই তেজের আশ্রয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তত্ত্ব-বিচারকেরা দিয়াছেন। কোন স্থানে অগ্নি জ্বালাইয়া, সেই অগ্নিস্থ ইন্ধন সকল স্থানান্তরিত করিলে, উত্তাপের সহিত তেজ আপনিই বায়ুতে মিশিয়া যায়। যে ভূত যাহার আশ্রয়ে মিশ্রিত হয়, সেই আশ্রয়দাতা তাহার প্রকাশকর্ত্তা বুঝিতে হইবে। এই জন্য বিচারমতে ও বিজ্ঞানমতে বায়ুই তেজের প্রকাশক।

অগ্নি অঙ্গারে পতিত হইয়া বায়ু হইতে আপনার শুদ্ধ স্বভাব লইয়া অগ্রে আপনাকে তেজোময় করত পরে অঙ্গারস্থ তেজ স্বভাবকে হরণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় অঙ্গার অগ্নিময় হয়। ক্ষণপরে অগ্নির স্বভাব হৃত হইলে, অগ্নি বায়ুতে মিশিয়া যায়। অগ্নির সহিত রসও অগ্নিতে মিশিয়া নির্গত হয়, কেবল পৃথ্বীর অংশ পতিত ভস্ম রূপে থাকে। ইহাতেই বেশ জানা যায়, কেবল বায়ু হইতে তেজের প্রকাশ।

শিঃ। রস বা বারির উৎপত্তি কিরূপ ?

গুঃ। প্রত্যেক ভূতের মূল কারণ—সেই অহঙ্কার হইতে কাল, কর্ম্ম, স্বভাববশে প্রকাশ হইতেছে বুঝিতে হইবে। যে তন্মাত্রা রস রূপে জগতে বিদিত, তাহা যে সূক্ষ্ম ভূতাংশে লক্ষিত হয়, তাহাকেই বারি কহে। ঐ বারির সূক্ষ্মাংশ তেজেতে মিশ্রিত থাকে। তেজই বারির প্রকাশকর্ত্তা এবং আশ্রয়দাতা। তেজের সহিত মিশ্রণ ও আশ্রয় সম্বন্ধে বারিতেও পূর্ব্ববর্ত্তী ভূত সকলের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তৎসহযোগে তাহাদের স্বভাব বারিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতগণের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটী গুণ বারিতে মিশ্রিত হওয়ায়, বারির যে রস স্বভাব, তাহা জগতে অনুভূত, স্পৃষ্ট এবং রূপময় বলিয়া দেখা যায়। তেজোমধ্যস্থ রসরূপী অতি সূক্ষ্মাংশ পবন-বিহারী ভূতাংশকে বারি কহে। ঐ সূক্ষ্মাংশে তেজ প্রবেশ করিলে, উহা একত্রে মিশ্রিত হয়, এবং তাহাই বাষ্পভাব ধারণ করিয়া, অপর ভূতাদির স্বভাবে সকলের দ্বারা অনুভূত, স্পৃষ্ট, এবং লক্ষিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানবিদেরা যে লক্ষণে বিচার করিয়া বারিকে তেজোন্তর্গত ভূত কহিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি। যখন তেজোভাগ লইয়া সূর্য্য পৃথিবী হইতে দূরে অবস্থিতি করেন, তখন বারি সূক্ষ্মাংশে পরিণত হইবার জন্য বাষ্পভাবে বায়ুগত তেজে আকর্ষিত হইয়া থাকে। আবার ঐ সূক্ষ্ম বাষ্পভাবে যখন তেজাধিক প্রবেশ করে, তখন উহারা একত্রে ঘনীভূত হইয়া মেঘরূপে পবনের মধ্যে অবস্থিত করে। সেই বাষ্পভাগে যখন তেজোভাগ মিশ্রিত না নয়, তখনই উহারা আপন স্বভাব রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তেজে আকর্ষিত হইলে যখন সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয় এবং তেজোবিহীনে যখন তরলতা প্রাপ্ত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত তেজে সূক্ষ্মতা লাভ হয় বলিয়া তাহাই বারির প্রকাশক বুঝিতে হইবে।

শিঃ। পৃথ্বীর প্রকাশ কিরূপ ?

গুঃ। রস অপেক্ষা স্থূল ভূতাংশকে পৃথ্বী কহে। ইহাও কণারূপে গগণে, পবনে, তেজে, বারিতে মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে বারি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত স্বভাবে গুরু, এইজন্য পৃথ্বীর সূক্ষ্মাংশ বারিতে অন্তর্হিত থাকে। ঐ সূক্ষ্মাংশকে গন্ধলক্ষণ সম্পন্ন দেখা যায়। অধিকন্ত পূর্ব্বভূতাংশ উহাতে

মিশ্রিত থাকায়, উহা আপনার গন্ধ স্বভাব পাইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধযুক্ত হইয়া জগতে রহিয়াছে।

বারি যেমন তেজাধিক্যে তেজে মিলিত এবং তেজ হ্রাসে আপনার স্বরূপে থাকে, তদ্রূপ পৃথ্বীও রসাধিক্যে রসে মিশ্রিত থাকে এবং রস হ্রাসে স্বরূপে পরিণত হয়। দুগ্ধ মধ্যে যে অতি সূক্ষ্মাংশ পৃথ্বী থাকে, তাহাকে নবনীত কহে। দুগ্ধের রসভাগ উত্তাপ দ্বারা হ্রাস করিলে, আপনিই পৃথ্বীভাগ একত্রিত হইয়া দুগ্ধের উপরে ভাসিতে থাকে। রসহ্রাসে একত্রে ঘনীভূত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এই বিশাল মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি সেই রসান্তর্গত পৃথ্বী অংশ হইতে প্রকাশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

শিঃ। জগতে পর্ব্বত থাকিবার প্রয়োজন কি?

গুঃ। পর্ব্বতে জগতের অনেক প্রয়োজন সাধন হয়। ভূবিদ্যাবিতেরা কহেন, পর্ব্বতের দ্বারা পৃথিবীর ভার মধ্যস্থির থাকিয়া, বায়ু ও অপরাপর ভূতাংশ সমষ্টিতে আকৃষ্ট থাকা সত্ত্বে সূর্য্য ও চন্দ্রে পৃথিবী মিশ্রিত হয় না। এই জন্য পর্ব্বতাদির নাম গোত্র। গো—শব্দে পৃথিবী। ত্রি-শব্দের অর্থ ত্রাণ। পৃথিবীকে সূর্য্যাদির পথ হইতে যে বস্তু স্খলন নামক বিপদ হইতে ত্রাণ করে, সেই-ই গোত্র হইতেছে।

শিঃ। পৃথিবী বলিতে কি বুঝা যায়?

গুঃ। সর্ব্ব ভূতাংশের তেজ সংযুক্ত সমষ্টিমাত্র বুঝিতে হইবে। পঞ্চ ভূতাংশ তেজপ্রভাবে চালিত হইয়া, পৃথিবীতে পরিণত হওত জীবাদির সংগঠন করিতেছে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য বিধান করিতেছে। মহা চৈতন্যরূপী ভগবানাংশ হইতে ভূতাদি প্রকাশ হইয়া পৃথিবীতে সমষ্টিভূত হইয়া স্থির হইয়াছে, আর বৃদ্ধি পায় নাই এবং ভগবান্ (সর্ব্বপ্রবিষ্টরূপে) সকল ভূতে থাকিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। সেই পৃথিবীর উপরে কি চৈতন্যভাব কি জীবভাব সমস্তই অবস্থান করিতেছে এবং স্বভাবে পরিণত হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সমস্ত তেজ ভাগ পৃথিবীতে আছে। পৃথিবী হইতেই এই দেহ গঠন হইয়া ইহাতেও ঐ সমস্ত বর্ত্তমান। বাসনা তাহার অন্তর্গত।

শিঃ। প্রলয়ে প্রকৃতি কি অবস্থায় থাকেন?

গুঃ। কোন একটী অব্যক্ত বস্তু না থাকিলে কোন একটী বস্তুর অব্যক্ত-

হওয়া যায় না। যেমন আলোক আছে, সেই জন্য অন্ধকার আলোকে মিশিয়া যায়। অথচ আলোক ও অন্ধকার এক বস্তুরই পূর্ণ ও অপূর্ণ ভাব। তদ্রূপ প্রলয়ে প্রকৃতি অন্ধকার রূপে ঈশ্বর-রূপ আলোকে মিশিয়া যায়েন। পরে আপনিই কালবশে প্রকাশ হয়েন। ইহাকে প্রকৃতির রূপান্তর লীলা বলা হইল। অপর রূপ আছে, সেই জন্যই বস্তুর রূপান্তর হয়।

শিঃ। কাল চক্র কাহাকে কহে ?

গুঃ। জগতের গতিবিষয়ক ও সৃষ্টি পরিবর্ত্তনকারী ঐশিক শক্তিকে কাল কহে। সেই কাল যে ক্ষমতায় জগতে জীবে ব্যাপ্ত, তাহাকে কালচক্র কহে।

শিঃ। গ্রহ কাহাকে কহে ?

গুঃ। জীবাদি সমন্বিত বিমানবিহারী ও সূর্য্য দ্বারা আকর্ষিত জ্যোতিষ্মান্ ভূখণ্ডকে গ্রহ কহে।

শিঃ। নক্ষত্র কাহাকে কহে ?

গুঃ। জীবশূন্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ মিশ্রিত অবস্থা খণ্ডকে নক্ষত্র কহে।

শিঃ। তারকা কাহাকে কহে ?

গুঃ। পদার্থ মিশ্রিত অতিক্ষুদ্রতম পিণ্ডকে তারকা কহে। সকলেরই জ্যোতি আছে। তাহারা সকলেই কালের পরিবর্ত্তন ক্ষমতায় আপন আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখাইয়া নানা স্থলে ভ্রমণ করিতেছে; এই জন্য কাল চক্রস্থিত গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি ও স্থিতি, কালের পেষণে নভোমণ্ডলে আছেন।

শিঃ। সূর্য্যচন্দ্রাদির কি লয় আছে ?

গুঃ। জ্যোতিষীগণ কহেন সূর্য্যচন্দ্রাদি কালের অধীন। কালের শক্তির সহযোগে সূর্য্যচন্দ্রাদির আকর্ষণ মতে ও পৃথিবীর পরিবর্ত্তন মতে যেমন এক বৎসরে পৃথিবীর একবার পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তেমনি প্রতি গ্রহের ঐ রূপ পরিবর্ত্তন আছে; সেই কাল শক্তিটী জীবগণকে আয়ুক্ষীণ করত ভয় দেখাইয়া থাকেন।

শিঃ। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, গ্রহ, ঋক্ষ, ও তারকা সমূহের প্রকাশ কিরূপে হইল ?

গুঃ। সূর্য্য চন্দ্রাদি যেমন চৈতন্য দৃষ্ট পদার্থ। যে শরীরে বা যে বস্তুতে চৈতন্য সংজ্ঞা নাই, সে কখনই চন্দ্র সূর্য্যাদির অনুভব করিতে পারে না। আর

ঐ চন্দ্র সূর্য্যাদি চৈতন্যময় বলিয়া চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত হন,কিন্তু সহসা দেখিলে উহাদের স্বপ্রকাশ বলিয়া বোধ হয়। এ চৈতন্য জ্ঞানচৈতন্য নহে, ইহা ভূতগত চৈতন্য। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদির হিমত্ব ও অগ্নিত্ব হইতেই আকর্ষণ শক্তির প্রকাশ হয় এবং সেই আকর্ষণ শক্তি হইতেই ভূত সকল সজীব থাকিয়া পরস্পরে মিলিত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। যখন মহত্তত্ত্ব অবস্থা হইতে প্রকৃতি ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হন, কাল ও ঈশ্বর চৈতন্য উহাতে ক্ষোভ প্রদান করাতে, উহার তমসাংশ বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। তেজ ও হিমের হ্রাস বৃদ্ধিমতে ঘূর্ণন প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই ঘূর্ণনে প্রলয়ের পূর্ব্বজাত নিত্য অব্যক্ত ভূত তন্মাত্রা সমূহ বিচ্ছেদ হইতে থাকে। ইহাকেই পুরাণে অন্তভেদ কহে। হিম ও তেজের ক্ষমতায় ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রে শূন্য তন্মাত্রা প্রকাশ হয়, তাহাতে এরূপ ভাব হইল যে, কোটী কোটী পদার্থহীন বিমল শূন্য নামক ভূতাংশ বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল। সেই প্রত্যেক শূন্যাংশকে আধার করিয়া ঘূর্ণিত সৎ বা তমস্ ভাগ হইতে বায়ুর সূক্ষ্ম তন্মাত্রা প্রকাশ হইয়া শূন্যের মধ্যে রহিল। শূন্য ও বায়ু নামক সূক্ষ্মতম তন্মাত্রদ্বয় প্রকাশ হইলে, আপনি অগ্নি তন্মাত্রা তেজ ও হিম হইতে প্রকাশিত হইলেন। পরে অব্যক্ত ভাবে যে রস তন্মাত্রা অগ্নির মধ্যে ছিল, তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। পরে রসের প্রকাশে বীজময় পৃথ্বী প্রকাশ হইবার জন্য, তাহার তন্মাত্রা প্রকাশ হইল। যেমন হিমরূপ জলকে ও তেজ-রূপী অগ্নিতে পীড়ন করিলে উভয়ের তেজ মিশ্রিত হইলে, বুদ্বুদ সমূহ উঠিয়া ফুটীতে থাকে। প্রলয়ান্তে বিশ্বের প্রকাশও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। যখন কাল দ্বারা ক্ষুব্দ তমস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তেজে ও হিমে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, তখনি জল বুদ্বুদের ন্যায় কোটী জগৎবুদ্বুদ প্রকাশ হয়। পূর্ব্বোক্ত একটী একটী বুদ্বুদের গর্ভ যেমন বায়ুপূর্ণ, তেমনি ব্রহ্মাণ্ড বুদ্বুদের প্রথম আবরণ শূন্য, তাহা সকল ভূতাপেক্ষা লঘু, সূক্ষ্ম, ও সর্ব্বব্যাপ্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণ ক্ষমতাবান্। শূন্যাংশ শূন্যে মিলিত হইয়া মহাশূন্যময় একটী ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হইল। পরে বায়বাংশ বায়বাংশের আকর্ষণে মহা বায়বাংশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইল, কিন্তু শূন্যাপেক্ষা আকর্ষণ ক্ষমতাহীন বলিয়া তদুপরি গমন করিতে পারিল না। পরে তেজ হইতে অগ্নি আপনা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া উত্থিত হইলেন, তিনিও পবনের উপরে উঠিতে পারিলেন না। পরে

আপনাপন আকর্ষণে সমষ্টিভূত হইয়া হিমাংশ চন্দ্ররূপী হইলেন। তেজাংশ সূর্য্যরূপ হইলেন। সেই তেজ রস আপনিই প্রকাশ হইয়া পৃথ্বীকে প্রকাশ করিলেন। এই পৃথ্বীই বীজময় ও সকলের আধার। শূন্যাকর্ষণে শূন্য ও পবন রহিলেন। পবনের আকর্ষণে চন্দ্রসূর্য্যরূপী হিমও তেজ রহিলেন। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে বারি রহিলেন। বারির আকর্ষণে পৃথ্বী রহিলেন, পরস্পরে পরস্পরের আকর্ষণে পরস্পরে রহিল। এইরূপে তমসের যে ভাগে যত বুদ্বুদ উঠিয়া ছিল, তত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্যাদি যেমন পর প্রকাশে প্রকাশ্যঃ বিজ্ঞানের নিয়ম এই যে চৈতন্যময় না হইতে পারিলে চৈতন্যপ্রণীত বস্তুর অনুভব আকর্ষণ করিতে পারে না। অর্থাৎ মনুষ্যাদির ভূত চৈতন্য দ্বাররূপ ইন্দ্রিয়াদি রহিয়াছে, তজ্জন্যই সূর্য্যাদি দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; যাহাতে হিমত্ব ও উষ্ণত্ব উভয়ই আছে, সেইই হিম ও উষ্ণ অনুভব করিতে পারিবে, নচেৎ কেবল হিম হিমত্ব বা কেবল উষ্ণ উষ্ণত্ব অনুভব করিতে পারেনা। অতএব চৈতন্যাদি সূর্য্যাদির প্রকাশ কর্ত্তা।

শিঃ। তেজ কাহাকে বলে?

গুঃ। তেজ বলিতে বল নহে। তেজ তিন অংশে বিভক্তঃ—সহঃ, ওজঃ, বল। যে গুণে সহিষ্ণু ক্ষমতা আছে, তাহাকে সহতেজোংশ কহে। এই গুণের দ্বারা রিপুদমন করা যায়। যে গুণের দ্বারা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সহকারে অপরকে বশীভুত করা যায়, তাহাকে ওজঃ তেজোংশ কহা যায়। যে গুণের দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বলী করিয়া অপরকে যুদ্ধে পরাস্ত করা যায়, তাহাকে বল তেজোংশ কহা যায়। এই তিন রূপ তেজ হইতেই তিন প্রকার শরীরের প্রসাদ শান্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। এই তিনই তেজের প্রসাদ লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন বিকার লক্ষণাক্রান্ত আশা, চিন্তা ও রাগাদি রিপুবল তেজোংশ প্রভৃতি আছে, তাহা এস্থানে প্রকাশ করা বাহুল্য। জ্ঞানী আংশিক তেজে প্রকাশিত নহেন। তেজের সমস্ত অংশ প্রসাদ গুণে মণ্ডিত হইলে, অন্তরে যে তেজোভাবের আবিষ্কার হইয়া থাকে, জ্ঞানীর অঙ্গ হইতে সেই তেজ আভা প্রকাশ হইয়া থাকে।

শিঃ। তেজ কয় প্রকার?

গুঃ। প্রতি জীব অণু ও পরমাণুর তেজে জীবিত আছে। ঐ তেজ দুই

প্রকার। অণু পরমাণুগত তেজ ও সূর্য্যের তেজ অর্থাৎ মহাতেজ। যতক্ষণ অণু পরমাণুতে তেজ থাকে, ততক্ষণ ঐ তেজ ও সূর্য্যতেজ উভয়ে মিশ্রিত হইয়া বারি প্রকাশ করে। সেই আন্তরিক তেজ প্রকাশ হইয়া বারিরূপে বাহে প্রকাশিত হইলে মহাতেজের আকর্ষণে মেঘরূপে পরিণত হয়। যখন পৃথিবী প্রলয়াবস্থায় পতিতোন্মুখী হন, তখন ভূতগত, প্রাণীগত তেজের হ্রাস হওয়াতে বায়ুৎপাদন ক্রিয়া হয় না। অতএব মেঘ বর্ষিত হয় না। যখন ধর্ম্মের হ্রাস হয় ও প্রতি ভূতে স্বভাব বিহীন হয়, তখন সেই স্বভাব বিহীনতায় জাগতিক ক্রিয়াদি হয় না। তাহা না হওয়াতে মেঘ বর্ষিত হয় না। তাহাতে প্রজাগণের একেবারে নাশ হইবার সম্ভাবনা।

শিঃ। ভগবান প্রলয় সাগরের মধ্যে অনন্তকে সখা করিয়া শয়ন করেন, সে অনন্ত কে?

গুঃ। কালশক্তির নামান্তর অনন্ত। ঈশ্বর মহাপ্রলয়ের সময়ে অণু পরমাণুর সহিত কারণ বারিতে শয়ন করিলে কালশক্তি তাঁহার আধার স্বরূপ হইয়া থাকে। অনন্তকে সর্পরূপে কল্পনা করা হয় এবং তাহাকে পাতালে অবস্থিত বলা হয়। অনন্ত আপন মস্তকে মহাবিষ্ণুর সহিত এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। তাহার কারণ এই যেঃ—কালশক্তির ক্ষমতায় জগৎ উদ্ভাবন, পালন, বর্দ্ধন হইতেছে বলিয়া, তাহা জগতের বহনকারী বলিয়া রূপক করা হইয়াছে। মহাবিষ্ণু হইতে সকলের চৈতন্যের আবির্ভাব বলিয়া তিনি মধ্যস্থলে। সংসারের শেষকে পাতল কহে। সংসারের মধ্যে সর্ব্বত্রই দৃষ্টি-গোচর হয়, কিন্তু পাতাল অলক্ষ্য। কালকেও কেহ দেখিতে পায় না। সেই হেতু অলক্ষ্য বস্তু অলক্ষ্য স্থানে অবস্থিত, এই কল্পনা করা হইয়াছে। কালের অস্থির গতি বলিয়া তাহাকে সর্পরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পৌরাণিক রূপক ত্যাগ করিলে একমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

শিঃ। ঈশ্বরকে বিরাট পুরুষ কেন বলা হয়?

গুঃ। ঈশ্বর হইতে, এই সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে—অর্থাৎ প্রথমে ঈশ্বর আপনি ইচ্ছায় মহত্বাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে পরিণত হইলেন। পরে সেই তত্ত্ব সকলকে বস্তুপর করিবার জন্য আপন শক্তি সংযোগে ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইলেন। পরে নিত্যশক্তিকে শক্তিরূপে ইন্দ্রিয় ও তত্বাদির সংযোগ ইন্দ্রিয়রূপে

করিয়া আপনার জগৎ ও জীবলীলাত্মক আবরণরূপী বিরাটভাব প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে সজীব করিলেন, অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষ হইলেন।

শিঃ। ঈশ্বর কি ভাবে কোথায় অবস্থিত আছেন?

গুঃ। যেমন পঞ্চভূত সমষ্টি বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে, তাহা হইতে কাষ্ঠ উৎপন্ন হয় এবং সেই কাষ্ঠ লইয়া একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বহুলোক, বহুজীব, সচ্ছন্দে বসিয়া অর্ণবে ভাসিতে থাকে, তেমনি এ বিশ্বমধ্যে বিশ্বনিয়ন্তা চৈতন্যরূপে সকল বস্তুতে অবস্থিত থাকিয়া স্বকীয় তেজে মহত্তত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া স্বীয় মায়া শক্তি দ্বারা আপনাতেই জগৎ সৃজন করিতেছেন এবং হরণ করিতেছেন।

শিঃ। বিশ্ব কাহাকে বলে?

গুঃ। বিশ্ব যে মৃৎখণ্ড বা অপর ভূতখণ্ড নহে। যেমন নগর বলিতে নগরস্থ সমস্ত বস্তুকেই বুঝায়, তেমনি বিশ্ব বলিতে ত্রিভুবনকেই বুঝায়। ঐ ত্রিভুবন বিভাগ করিলে সর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন নাম পাওয়া যায়। নাম কয়েকটী সঙ্কেত মাত্র। এই ত্রিভুবনাত্মক বিশ্ব একটী যন্ত্রের ন্যায়। ইহা কার্য্য প্রকাশের স্থান। মায়া ও কালশক্তি অধ্যক্ষ এবং চৈতন্য ইহার কর্ত্তা।

শিঃ। স্বর্গ কাহাকে বলে?

গুঃ। স্বর্গ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়া ইহা দেখা যায় যে, যথা হইতে সমস্ত সৃষ্ট জীবের সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই স্বর্গ। চৈতন্যে পরিণত অণু প্রভৃতি যথায় অবস্থান করে, শূন্যের সেই অংশেরও নাম সর্গ। শূন্য ভিন্ন আর আধার স্থানের পরিচয় নাই। যদি কেহ শূন্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে শূন্যের নিম্ন নিয়মে পরীক্ষা করিতে পারেন।

একটী কাচের নল লইয়া তাহার গর্ভটীকে একেবারে পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া আবদ্ধ করিলে, গ্রীষ্ম ও শীতের আধিক্যে পারদের স্ফীততা ও হ্রাসতা বশতঃ নলের মধ্যে শূন্য দেখা যায়। পারদ অপেক্ষা অমিশ্র ও ভারি ধাতু জগতে দ্বিতীয় নাই। তাহাতে কোন ক্রমেই বায়ুাংশ থাকিতে পারে না। যখনই পারদ ছিদ্রমধ্যে পূর্ণ হইবে, তখনই ছিদ্রস্থ বায়ুাংশ বাহিরে আসিবে। পরে, সেই ছিদ্রের মুখ অতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিলে, বায়ু কখনই প্রবেশ করিতে

পারিবে না। কিন্তু হিমে ডুবাইলে পারদ আপনি কমিয়া ঐ ছিদ্রের মধ্যে শূন্যের প্রকাশ করিবে। আমাদের বেদোক্ত জগৎ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে স্থানে সৃষ্টি প্রকাশক অণ্বাদি থাকে, তাহাকে সর্গ কহে। উহার মধ্যগত সুফল ভোগ স্থানকে স্বর্গ কহে।

শিঃ। যে স্থানে সৃষ্টি প্রকাশক অণ্বাদি থাকে সে সর্গ কি?

গুঃ। সৃষ্টি প্রকাশ করণাত্মক উপায়কে সর্গ কহে। ঐ সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি গত উপায় দুই অবস্থাপন্ন। একটীকে প্রাকৃত সর্গ কহে। আর একটীকে বৈকৃত সর্গ কহে। যে কারণাবস্থা গুলি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম সৃষ্টি হয়, তাহাকে প্রাকৃত কহে। যে কার্য্যাবস্থার দ্বারা জীব সৃষ্টি হইতেছে, তাহাদের বৈকৃত সৃষ্টি কহে। প্রাকৃত সর্গ ছয় প্রকার অবস্থাপন্ন এবং বৈকৃত তিন প্রকার অবস্থাপন্ন। মহত্তত্ত্বই প্রথম সর্গ। অহঙ্কার দ্বিতীয় সর্গ। ভূত সৃষ্টি তৃতীয় সর্গ। স্বভাব ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি চতুর্থ সর্গ; ইন্দ্রিয় শক্তি ও মন সৃষ্টি পঞ্চম সর্গ। জীবগণের ভ্রমাদি জনক জন্ম ও মৃত্যু জনক পঞ্চপর্ব্বতাত্মক অবিদ্যা সৃষ্টিই ষষ্ঠ সর্গ। এই ছয়টী মূল অর্থাৎ প্রাকৃত সৃষ্টি। এই ছয় সূক্ষ্মাবস্থা লইয়া জগৎ ও জীবের সূক্ষ্মভাব বিরচিত। ঐ ছয় শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেকের বহুবিধ পর্য্যায় আছে।

ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন জীবসৃষ্টিকে বৈকৃত সর্গ কহে। বৃক্ষাদি সর্গ প্রথম; ইহাদের উর্দ্ধ শ্রোতী কহে। পশু সৃষ্টি দ্বিতীয়; ইহাদের তির্য্যকশ্রোতী কহে। মনুষ্যাদির সৃষ্টিই শেষ সৃষ্টি; ইহাদের অর্ব্বাক শ্রোতী কহে। প্রাকৃতে ছয় এবং বৈকৃতে তিন, এই নয়বিধ সর্গের উপায় বিজ্ঞানবলে প্রকাশ হইয়াছে। আর একটী সর্গ আছে, তাহার নাম অনুসর্গ।

শিঃ। অনুসর্গ কাহাকে বলে?

গুঃ। অনুসর্গ বলিতে পরিবর্ত্তনান্তর সৃষ্টি। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ ও মৃত্যুরূপে পরিবর্ত্তনান্তর প্রকাশকে অনুসর্গ কহে। বিজ্ঞানের ইহা স্থির মীমাংসা আছে, অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে কখনই নূতন ভাব প্রকাশ হইতে পারে না। যদি জন্ম না থাকিত, কখনই মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিত না। যদি মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলে কখনই নূতন জন্মের প্রয়োজন হইত না। এইরূপ পরিবর্ত্তনাত্মক জগৎ ও জীব সৃষ্টিকে অনুসর্গ কহে।

শিঃ। মর্ত্ত্য কাহাকে বলে ?

গুঃ। যে শূন্যাংশে মায়া-জাত কার্য্য প্রকাশ হয়, তাহাকে মর্ত্ত্যভূমি কহে। মর্ত্ত্য বলিতে পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহাদি এবং বিকারভূত ভূতাদি। কার্য্যাদি প্রকাশিত অগ্নি, ভূগর্ভস্থ জল, এ সমস্তই বিকারভূত ভূতাংশ মাত্র। কারণ মূল বস্তুর প্রকাশ নাই। তাহারা অণুরূপে চৈতন্যবশে মায়া মধ্যে অবস্থান করে। মায়ার তাড়নে প্রকাশিত হয় মাত্র। মুল ভূতাংশ জগদংশ মাত্রেই আছে, কিন্তু মায়াতে প্রকাশ্য নহে।

শিঃ। বিকার কাহাকে বলে ?

গুঃ। ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ সৃষ্টি বা লীলা করণাত্মক কার্য্য-শক্তি রূপে আবির্ভূত হওন।

শিঃ। পাতাল কাহাকে বলে ?

গুঃ। বিলয় হইয়া যথা হইতে পুনরায় স্বরূপে বস্তুর গতি হয়, তাহাকে পাতাল কহে। এই পাতাল তলেই অনন্তের অর্থাৎ কালের অবস্থান, পুরাণে কল্পিত হইয়াছে, এবং এই স্থানে প্রলয়ের সময়ে আদি পুরুষেরও অবস্থান, এই জন্যই পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। এই যে মায়ার প্রভুত্ব করিবার লীলাস্থল ত্রয়, ইহাকে ব্যষ্টিজ্ঞানে বিচার করিয়া বেদবিদ্‌গণ চৌদ্দভাগে বিভাজিত করিয়াছেন। পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত প্রকাশক শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, চৈতন্য এই চতুর্দ্দশ প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব প্রকাশ। এই চতুর্দ্দশ মূলপদার্থকেই চৌদ্দ ভুবন কহে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক।

শিঃ। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই যদি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক, তাহা হইলে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপে বলিব ?

গুঃ। যেমন বহুল নগর গ্রামাদি লইয়া একটী সাম্রাজ্য হয়, তেমনি চৌদ্দটী অংশে সেই পরমাত্মা বিভাজিত হইয়া এই লীলারাজ্যরূপী ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া আপনার স্বরূপ দ্বারা নানা জাতি জীব প্রকাশ করিয়া প্রকৃতপক্ষে আপনিই মায়ার মধ্যে রমণ করিতেছেন। মনে কর, সেই পরম-পুরুষ একটী চৈতন্যময় দেহী। তিনি এমন বৃহৎ যে তাঁহার বৃহত্ব কেহ বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিতে পারে না, কিন্তু অনুভব করিয়া এই বলে যে,

তিনি এই চতুর্দ্দশ ভুবনেই আপনার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত আছেন। বাহ্য জগৎ বা অন্তর্জগৎ ঈশ্বর বিহনে কিছুই নহে। যেমন আলোক পাইলে হীরকমণ্ডিত গৃহ আলোকময় হয়, তেমনি ঈশ্বরের চৈতন্য পাইয়া এই স্থূল জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে। এই স্থূলরূপ ধারণা করিতে পারিলে তবে সূক্ষ্মরূপের ধারণ হইবে; তবে জগৎ কি বুঝিতে পারিবে। তবে আপনি কে—ইহা জানিবার জন্য আত্মজ্ঞান প্রকাশ হইবে। আত্মজ্ঞানে "আপনি কে" ইহা স্থির হইলে, আপনিই বিজ্ঞান-কোষ প্রস্ফুটিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।

শিঃ। ঈশ্বর যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক, তাহা হইলে ব্রহ্মা কে?

গুঃ। যখন প্রলয়কালে এই জগৎ বিনষ্ট হইয়া, পুনরায় সৃষ্ট হইল, তখন সৃষ্টির স্মৃতি কাহারো ছিল না। সেই প্রলয়ের অন্তে পুনরায় এই জগৎ ভূতাদির প্রকাশ হইল। প্রতি জীবে প্রকৃতি হইতে স্বভাব, কাল ধর্ম্ম হইতে আয়ু, এবং চৈতন্য হইতে সজীবত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহাতেই প্রলয়ান্তে জগৎ সজীবত্ব বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু সে সময়ে শিক্ষিত স্বভাবের ফলরূপী নারীসঙ্গম দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হইবার উপায় কে শিক্ষা দিবে? কে বীজসমূহকে নিয়মিতরূপে রোপণ করিয়া তাহা হইতে ফল ফুল প্রকাশ করিবে? কে এক প্রকার বীর্য্য হইতে কৌশলে নানা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া নানা পশুর আবির্ভাব করিবে। সে স্মৃতি তখন কোথায়? যখন পৃথিবীর নূতন সংস্করণ, চৈতন্যের নূতন সংস্করণ, মহত্ত্বের নূতন সংস্করণ, ভূতাদির নূতন সংস্করণ, জীবাত্মার নূতন সংস্করণ, তখন সকলি নূতন, বিকার তো কিছুই নয়। বিকার না হইলে গঠনের উপায় নাই। এমন সর্ব্বের নূতন সংস্করণের সময়ে একের হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ স্মৃতির উদয় হইয়া ছিল; তাঁহারই নাম ব্রহ্মা। জ্ঞানীতে তাঁহাকে ব্রহ্মা কহে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ঈশ্বর। ঈশ্বর হইতে উৎপাদিত বলিয়া বিধাতাকে ব্রহ্মা কহা যায়। প্রলয়ের পরে ব্রহ্মা স্মৃতি লাভ করিয়া সৃষ্টি করেন।

শিঃ। ব্রহ্মা কি ভাবে সৃজন করিয়াছেন?

গুঃ। অধুনা যে বিশ্বভাণ্ডার দেখিতেছ, এই ভাণ্ডারে নানাবিধ পশু,

নানাবিধ পক্ষী, নানাবিধ কীট, নানাবিধ লতাদি দেখিতে পাইতেছ। এ সমস্ত বিকার ভেদে নির্ম্মিত। স্বভাবের নিয়মে জরায়ুজ ও অণ্ডজ সঙ্গম দ্বারা প্রজা প্রকাশ করিতে পারে। উদ্ভিজ্জ বপনে প্রজা প্রকাশ করিতে পারে। স্বেদজ স্বেদ সাহায্যে প্রজা প্রকাশ করিতে পারে। ইহাই স্বভাব। কিন্তু একের বীর্য্য অপরের যোনিতে স্বভাবের নিয়মে প্রদান করিলে বিভিন্ন বিকারী জীব স্বভাব দ্বারা জন্মাইতে পারে। ইহা বিজ্ঞান-সিদ্ধ। তাহাতে ইহা বুঝিবে যে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সঙ্গম হইলে স্বভাব সেই শ্রেণীতে নূতন রূপের প্রকাশ করিবে। যেমন ঘোটক ও গর্দ্দভ এক শ্রেণীর, ঘোটকের বীর্য্যে ও গর্দ্দভের জরায়ু-সংযোগে নূতন শ্রেণীর ঘোটক মিশ্রিত স্বভাবে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তেমনি গর্দ্দভের বীর্য্যে ঘোটকের জরায়ুতে যে জীব জন্মাইবে, তাহা গর্দ্দভ হইবে এবং মিশ্রিত স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। যেমন এক শ্রেণীর দুইটী বৃক্ষ লইয়া একের মূলের সহিত অপরের শিরোদেশ সংযোজনা করিয়া তাহাতে স্বাভাবিক শোষণ ক্ষমতায় মূলটী শিরস্থিত বৃক্ষের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী ফলের বিভিন্ন আস্বাদন ও রূপান্তর প্রকাশ করে। ইহা বিজ্ঞান-সিদ্ধ। এই স্বভাব-সাহায্যে সেই ভগবান ব্রহ্মা নানা উপায়ে নানাবিধ রূপের শিক্ষিত স্বভাব দ্বারা জগতের নানাবিধ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে সজীবিত ও সুশোভিত করিয়াছেন। যদি বল যে জীব পাইয়া ব্রহ্মা তাহা হইতে নানা জীব সৃজন করিয়াছেন। তাহা সত্য ; স্বর্ণ যেমন খনিতে থাকিলে একরূপে বিশুদ্ধ ভাবে থাকে, তাহাতে কোনপ্রকার শোভার কার্য্য হয় না। স্বর্ণকার সেই স্বর্ণকে লইয়া বিকারভাবে কত প্রকার শোভার উপকরণ প্রস্তুত করে। প্রকৃতভাব সেই স্বর্ণ বটে। কিন্তু স্বর্ণকারের বুদ্ধিতে যদি স্বর্ণ পরিবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে কখনই বিভিন্ন অলঙ্কারে পরিবর্ত্তিত হইত না। অবিশুদ্ধ চারিজাতি জীব ও তাহাদের স্বভাব প্রকৃতি সাধ্য বটে। কিন্তু ঐ চারি জাতির মধ্যে প্রত্যেকেরই সহস্র সহস্র শ্রেণী সমুদ্ভব করণই ব্রহ্মার কৌশল। তিনিই একজাতি পক্ষী হইতে স্বভাবের কৌশলে কোটী কোটী জাতি পক্ষীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এক জাতি উদ্ভিজ্জ হইতে স্বভাবের কৌশলে কোটী কোটী শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ প্রস্তুত করিয়াছেন। এক জাতি স্বেদজ হইতে কোটী কোটী উপায়ে কোটীবিধ স্বেদজ সৃজন করিয়াছেন। এক জাতীয় জরায়ুজ শ্রেণী হইতে সেই শ্রেণীর কোটী সম্প্রদায় প্রকাশ

করিয়াছেন। ইহাই সেই ব্রহ্মার জগৎ বিজ্ঞানের কৌশল। প্রলয়ের পরে তিনি প্রথমে স্মৃতিলাভ করিয়া এইরূপ সৃষ্টি করেন।

শিঃ। লোকপালগণের সৃজন কিরূপে হইল ?

গুঃ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যশক্তি প্রভৃতি কারণসমূহ তাঁহার বিরাট দেহে নিশ্চেষ্ট ভাবে ছিল, সেই সকল প্রকাশ করিবার জন্য সেই বিরাট দেহে নানাবিধ ছিদ্র নির্ম্মাণ করিলেন। পুরাণের মতে প্রথম নির্ম্মিত মুখ ছিদ্র হইতে শব্দের ব্যবহারযোগ্য বাক্য প্রাদুর্ভূত হইল। এবং তাহাতেই বাগেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নিও বাক্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। এই নাসিকা ছিদ্র হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রাদুর্ভূত হইল এবং প্রাণ হইতে তদধিষ্ঠাতা বায়ুও প্রাদুর্ভূত হইলেন। চক্ষুর ছিদ্র হইতে চক্ষুও জন্মিল, আর চক্ষু হইতে তদধিষ্ঠাতা ভগবান রবিও জন্মিলেন। কর্ণের ছিদ্র হইতে এই শ্রোত্র জন্মিল। এবং শ্রোত্র হইতে তদধিষ্ঠাতা এই দিক্ সমস্ত জন্মিল। সমস্ত দেহে অতি সূক্ষ্ম ও অপরিমিত যে ছিদ্র সকল জন্মিল, তাহা হইতেই সমস্ত দেহ ব্যাপক স্পর্শনেন্দ্রিয়, ত্বক্ লোম ও কেশ সমূহ জন্মিল। পদ্মাকৃতি, মাংসনির্ম্মিত, মধ্যে শূন্য এবং পাঁচটী ছিদ্রযুক্ত হৃদয় জন্মিল। সেই হৃদয় হইতে মনও জন্মিল। মন হইতে জগতের আনন্দজনক চন্দ্রও জন্মিলেন। আর নাভি ছিদ্র হইতে অতি দুঃসহ প্রাণভেদ অর্থাৎ বাহ্যবায়ুর আচমনহেতু অপান জন্মিল।

মুখাগত সমস্ত অন্ন ও পানীয় দেহের অধোদেশে অপনয়ন করেন, এই জন্যই ইহার নাম অপান ; এই অপান হইতেই লোক সকলের ভয়জনক মৃত্যু ও জন্মগ্রহণ করিলেন। কারণ অন্নের দোষ বিনির্ম্মুখে প্রাণিগণ কদাচই মৃত হয় না, কিন্তু সেই অন্নই অপান দ্বারা গ্রসিত হয়। অতএব অপান হইতে নিশ্চয় যে মৃত্যু হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এই অপান গুহ্যের ছিদ্র হইতে স্পষ্ট হইল, এজন্য অপান পায়ু-ইন্দ্রিয় বলিয়া উপলক্ষিত হয় এবং মিত্রই তাহার অধিদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপস্থ ছিদ্র হইতে স্বর্গ, পর্জ্জন্য, ভূমি, পুরুষ, এবং যোষিৎ শ্রুতিসিদ্ধ এই পঞ্চম আহুতির ঘটক এবং জরায়ুজ ও অণ্ডজাদিদেহ সকলের বিস্তারক। রেত সহচরিত উপস্থেন্দ্রিয়ও জন্মিল। সেই রেত হইতে জল প্রধান পঞ্চমহাভূতাত্মক প্রজাপতি দেবও উৎপন্ন হইলেন। মনের প্রাদুর্ভাব সময়ে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও

চিত্তও উৎপন্ন হইয়াছিল। এবং মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রের জন্মকালীন বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্র এবং চিত্তের অধিষ্ঠাতা মহেশ্বরও প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপে ছিদ্র সকল নির্ম্মাণ করিয়া হস্ত এবং পাদেরও সৃষ্টি করিলেন। হস্ত হইতে তদধিষ্ঠাতা ইন্দ্র এবং পদ হইতে তদধিষ্ঠাতা উপেন্দ্রও জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে মুখাদিক্রমে যথোচিত ছিদ্র সকল হইতে বাগাদি ইন্দ্রিয় এবং তত্তৎ অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের যথাক্রমে সৃজন সম্পন্ন করিলেন।

শিঃ। লোকপালগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া কি করিলেন?

গুঃ। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! আমাদের হিতের নিমিত্ত অন্যদেহের সৃষ্টি করুন; আমরা যাহাতে স্থিত হইয়া ভোক্ষণীয় ও পানীয় বস্তুর আস্বাদন করিতে সমর্থ হই।

শিঃ। লোকপালগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ঈশ্বর কি করিলেন?

গুঃ। প্রথমে গো দেহের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু সেই গো শরীরে বুদ্ধি ও কর্ম্মের অদর্শন হেতুক তাহাতে তাহাদের প্রীতি জন্মিল না। তাহাদের প্রীতির নিমিত্ত পুনরায় অশ্বের সৃষ্টি করিলেন, হস্তাদির অভাব হেতুক সেই অশ্বেতেও তাহাদের সন্তোষ জন্মিল না। দেবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত নানাবিধ দেহের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু কোন দেহেই তাহাদের প্রীতি জন্মিল না।

শিঃ। ঈশ্বর কোন দেহ সৃষ্টি করিলেন, যাহাতে দেবগণের প্রীতি জন্মিল?

গুঃ। মানুষ দেহের সৃষ্টি করিলেন, দেবগণ সেই মানুষ দর্শন করত সাতিশয় প্রীত হইয়া জগৎ জনক ঈশ্বরকে বলিলেন, হে তাত! আমাদের প্রীতির নিমিত্ত এই সুন্দর পুরুষটী বিশেষ যত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করিলেন। এই পুরুষ বিশেষরূপে অবগত বক্তব্য বিষয় বলিতে সক্ষম এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জন্য দর্শনাদি ব্যাপার বিষয়েও প্রায় ইনি অজ্ঞানরহিত, এতদ্ভিন্ন আপনার সৃষ্ট প্রাণিগণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল সত্ত্বেও অজ্ঞানবিশিষ্ট। এই পুরুষ ইহকালের ও পরকালের যাহা সুখ এবং তৎসাধন ও গতদিনে যাহা হইয়াছে এবং আগত দিনে যাহা হইবে, তৎসমুদয় আর জ্ঞান লাভের নিমিত্ত জ্ঞানিদিগের সঙ্গ এবং কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সমস্ত প্রমাণ বশতঃ জানিবেন। এই পুরুষে বেদবাক্য-বশতঃ পরমাত্মা সবিস্তারে প্রকাশমান হন।

শিঃ। মানুষ দেহ কি বস্তু?

গুঃ। যাহাতে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বারূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চতা বর্ত্তমান আছে। বাক্য, হস্ত, পদ, গুহ্য, ও উপস্থরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পঞ্চতা এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণ বিদ্যমান আছে, আর ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও রেত প্রভৃতি সপ্ত ধাতু ও বাত পিত্ত ও কফ-রূপ ত্রিদোষ, বিষ্ঠা, মূত্র, স্বেদ, ও পূয় এবং অপরিমিত কেশ লোম প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, এই বস্তু সকলের সংঘাতের নাম দেহ।

শিঃ। এই সংঘাত সকলের মধ্যে কোন সংঘাতের নাম দেহ? সমুদয় সংঘাতের নাম কি দেহ? না—সমুদায় কি সমুদায়ী হইতে ভিন্ন অথবা সমুদায়ী হইতে অভিন্ন?

গুঃ। সমুদয় সংঘাতের নাম দেহ, ইহা বাস্তবিক নহে। সমুদায় যে সমুদায়ী হইতে ভিন্ন, তাহাও হইতে পারে না, কিম্বা অভিন্ন তাহাও সম্ভব হইতেছে না। যদ্যপি ভিন্ন স্বীকার কর, তাহা হইলে সমুদায়ী ও সমুদায়ে পরস্পর ভেদ হয়, সে জন্য তাহাদের অসমতা প্রযুক্ত পরস্পর সম্বন্ধরূপ সংঘাতই হইতে পারে না; যে হেতুক যোগ্যবস্তুর অযোগ্যের সহিত সম্বন্ধ ন্যায়বিরুদ্ধ। যদ্যপি অভিন্ন স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপে সমুদায় ব্যবহারকার্য্য দেহব্যবহারকার্য্যে আবশ্যক হয় কেন? এ কারণ সমুদায়ী হইতে সমুদায় অভিন্ন এইরূপও সম্ভব হইতেছে না।

শিঃ। যদি যোগ্য বস্তুর অযোগ্যের সহিত সম্বন্ধ ন্যায় বিরুদ্ধ। কিন্তু এ স্থলে সমুদায়ীতে সমুদায়ের সংযোগরূপ সম্বন্ধ কেন দেখা যাইতেছে?

গুঃ। সং শব্দের অর্থ সম্যক, বন্ধ শব্দের অর্থ বন্ধন। বধ্যমান বস্তু দ্বয়ের বন্ধন বস্তু তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া দৃষ্ট হইবে, তাহার সংশয় নাই। যেমন বধ্যমান গো দ্বয়ের বন্ধন রজ্জু গো দ্বয় হইতে পৃথক্ রূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ রজ্জুর ন্যায় মূর্ত্তিমান্ কোন তন্ত্বাদির বন্ধনও দেহে দৃশ্য হইতেছে না। এজন্য দেহে অন্য অন্য সংযোগরূপ সম্বন্ধও স্বীকার করিতে পার না।

শিঃ। যদি কোন সংঘাতকেই ভিন্ন কিম্বা অভিন্ন বলা যায় না। তাহা

হইলে সমুদায় সংঘাতের নাম দেহ বলিবার ক্ষতি কি? কারণ ইন্দ্রিয়গণই তো দেহের সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে?

গুঃ। হাঁ, যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব নিৰ্দ্ধারিত কার্য্য করিতে সক্ষম, অন্য ব্যাপারে অক্ষম।

শিঃ। ইন্দ্রিয়গণের নিৰ্দ্ধারিত কার্য্য কি?

গুঃ। যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক্ ইহাদের দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, ও স্পর্শন এই সকল ব্যাপারে সক্ষম, এতদ্দিরিক্ত ব্যাপারে অক্ষম। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই মহাভূতগণেরও ধারণ, ক্লেদন, পচন, ব্যূহন অর্থাৎ সঙ্কোচ ও প্রকাশাদি ভেদে বিবিধ উহন ক্রিয়া অবকাশতা অর্থাৎ স্থিতি ও প্রসরণে অনুকুলতা এই সকল ব্যাপারে সক্ষম, এতদরিরিক্ত কার্য্যে অক্ষম।

শিঃ। ইন্দ্রিয়গণেরা অন্য কার্য্যে অক্ষম কেন?

গুঃ। ইন্দ্রিয়গণের একৈকের কোথাও আত্মতা নাই। যে হেতুক জগতের আত্মারূপ ঈশ্বরের তাদাত্ম্যের অধ্যাস বিনির্ম্মুখে ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত বস্তুই অচৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অচেতন বস্তু সকলের সঞ্চালনাদি ব্যাপারে স্বাধীনতা নাই।

শিঃ। আত্মার বিনির্ম্মুখে যদি সমস্ত বস্তুই অচৈতন্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রাণ স্বয়ং জীবনের হেতুভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ কেন?

গুঃ। আত্মার কর্ত্তৃত্ব বলেই প্রাণের জীবন হেতুতা। প্রাণ দ্বারা কিম্বা অপান দ্বারা কোন মনুষ্য জীবিত হইতে পারে না; কিন্তু যাহার সন্নিধি মাত্রে ইহারা কার্য্য করে, সেই আত্মা দ্বারাই জনগণ জীবিত হইয়া থাকে।

শিঃ। সেই বিশ্বাত্মা মানুষ শরীরে কি রূপে প্রবেশ করিলেন?

গুঃ। কপালত্রয়ের মধ্যবর্ত্তিস্থান, যাহাকে মনুষ্যগণ নারীগণের সীমন্ত বলিয়া জানে, সেই মূর্দ্ধসীমা নিজ সন্নিধি মাত্রেই বিদারণ করত তন্মধ্য দিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই হেতু মনুষ্যমাত্রেরই শরীর প্রশস্ত, দ্বারবতী বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ।

শিঃ। পরমেশ্বর মস্তক বিদারণ করত এই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহার কি অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায়?

গুঃ। বিদ্বান উপাসকেরা মস্তকের ঊর্দ্ধভাগেই দ্বার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর যোগীগণ এই দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া ক্রমমুক্তিদ অর্চ্চিঃ স্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, এজন্য ইহার পরমানন্দপ্রাপক রূপ নামান্তরও আছে। স্বর্গীয় পুরুষদের স্বর্গ গমন কালে নন্দনবন যেমন, আনন্দ জনক, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষদের মুক্তি প্রাপ্তি সময়ে এই দ্বারও সুখজনক।

শিঃ। সেই পরমাত্মা মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া কি অবস্থায় অবস্থান করিলেন ?

গুঃ। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের প্রভু দেহরূপ নগরী প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে নিজ বসতি জন্য চক্ষু, চিত্ত, ও হৃদয়পদ্ম তিনটী প্রাসাদ করিয়াছিলেন। এই তিনটী প্রাসাদ মধ্যে বিজ্ঞানশক্তিরূপ ভোগ্যার সহিত সেই দেব অহঙ্কার লক্ষণা শয্যায় শয়ন করত সত্যস্বরূপ জ্ঞানে বিরহিত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে ত্রিবিধ স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

শিঃ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ স্বপ্ন কিরূপ ?

গুঃ। যখন, স্থূল ভোগ্যের ভোগের নিমিত্ত সেই দেব, ভোগের নিমিত্তীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, অনাদি মায়া দ্বারা গ্রহণ করেন অর্থাৎ আমি জন্মিয়াছি, অতএব ইনি আমার পিতা, ইনি মাতা, ইহারা ভ্রাতা, ইহারা ভগিনী, ইহারা বান্ধব, ইহারা ভৃত্য, ইনি ভার্য্যা, ইহারা কন্যা, এইরূপ বাহ্য-বস্তুর ভোগ। গৃহ, ভূমি, ধান্য, স্বর্ণ, পশু, বস্ত্র, আভরণ, শয্যা, আর এই বস্তু রমণীয়, এই বস্তু অপকৃষ্ট, ইহা অল্প, ইহা অধিক, ইহা সমীপবর্ত্তী, ইহা দূরবর্ত্তী এইরূপ জড়বস্তুর ভোগ। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রস, রূপ এই সকল বক্তব্য, ইহা হস্তগ্রাহ্য, ইহা গম্য, ইহা আনন্দজনক, এইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্য বিষয়-ভোগ। এই সকল বস্তু সুখ সাধন, ইহারা দুঃখ সাধন, ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, ইহা ছিল, ইহা আছে, ইহা হবে, এইরূপ সেই পরমাত্মা স্বাধীন-মায়া শয্যায় শয়ান হইয়া অন্নজাত শরীরগ মস্তকে আত্মতা রূপে জানিয়া তৎকৃত ক্লেশাদিভাগী হইয়া থাকেন। এইরূপে অন্য বহু প্রকার দেহ ধর্ম্মও আত্মাতে অধ্যাস করেন। আত্মার স্বরূপ জ্ঞানে বিরহিত হইয়া দেহাদিরূপকে অহং বলিয়া স্বীকার করিয়াও থাকেন। কোন সময়ে অকারণ শোক, কোন সময়ে অকারণ হর্ষ, ও প্রতিপন্ন হন এবং ক্ষুধা ও

পিপাসাদি প্রাণের ধর্ম্মকেও আত্মার বলিয়া অভিমান করেন। এই সমস্ত কারণ বশতঃ সচ্চিদানন্দরূপী অনন্ত আত্মার যে জাগরণ অবস্থা, তাহাও প্রবোধের অভাবে মিথ্যা বস্তুর দর্শনরূপ স্বপ্নের লক্ষণ যোগ বশতঃ নিশ্চয়ই স্বপ্নাবস্থা বলিয়া গণ্য। এইরূপে জাগরণ অবস্থাতেই বহুবিধ স্বপ্ন দর্শন করত সেই বিভু ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনোরূপ প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মন ও অনন্ত জন্ম সংভূত জ্ঞান কর্ম্ম ও বাসনারূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তত্তৎ জন্মকৃত কর্ম্মের অনুসারে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতেই স্বকীয় নানাবিধ রূপ দেখাইয়া থাকেন।

স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় রহিত, কেবল জাগ্রৎ অবস্থাকৃত বাসনাপরবশ হইয়া স্বপ্নভোগপ্রদ কর্ম্মের অধীনে মনঃপ্রযুক্ত বাসনা কার্য্যেই অবলোকন করে। স্বপ্নবহ সূক্ষ্মনাড়ী সকলের বিবর মধ্যে স্থিত হইয়া তন্মধ্যে মহা-সমুদ্র মেরুপর্ব্বত অথবা এই সপ্তদ্বীপ পৃথিবীকে দর্শন করেন। স্বপ্নদৃশ্য বৃক্ষও কোথাও পর্ব্বত হয়, ও পর্ব্বত কোথাও তৃণ হয়। কখন পশু, কোন সময়ে দেবতা, ক্ষণমাত্রেই মহারাজ, এইরূপ নানা প্রকার দৃশ্য হয়, স্বপ্নাবস্থায় দেশকালাদির নিয়ম কিছুই বিদ্যমান নাই। রাত্রিতেই শয্যা মধ্যে স্থিত হইয়া সূর্য্যযুক্ত দিবসকে দর্শন করে, কখন ভারতবর্ষের মধ্যেস্থিত হইয়া এই মনুষ্য শরীরেই চন্দ্র ও সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব পরমাত্মার সংসারাদির কারণ মায়া, তদ্ভিন্ন অন্য আর কিছুই লক্ষিত হয় না, এজন্য স্বপ্নাবস্থা প্রতিপাদক বেদের তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নকে মায়াময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা মন এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া কখন স্বপ্নদর্শন না করিয়াই ভোগ্যরূপা ইন্দ্রাণীর সহিত শীঘ্রই হৃদয় আকাশরূপ অট্টালিকা অর্থাৎ সুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন। সুষুপ্ত পুরুষের ইন্দ্রিয় সকল সুষুম্না নাড়ীতে লীন, অতএব তৎসময়ে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান থাকে না।

শিঃ। পণ্ডিতগণ স্বপ্নকে মায়াময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই মায়া কে?

গুঃ। মায়াবী, আনন্দাত্মা, সেই ভগবানও বিশ্বপ্রসবকর্ত্রী মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন না। অতএব ঈশ্বর হইতে মায়ার

বিভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। মায়ার স্ফূর্ত্তি তাহাও মায়াবশত হইয়া থাকে, যে হেতুক মায়ার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। মায়া কোন রূপেই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নয় ও অনুমাণ-সিদ্ধও নয়। যেমন সুষুপ্ত পুরুষের সুষুপ্তি অবস্থা সুষুপ্তিতেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু সুষুপ্তি বিশিষ্ট পুরুষ ইন্দ্রিয়-চেষ্টা হীন, সুতরাং অনুমানও অসিদ্ধ হইল।

শিঃ। যদ্যপি ঈশ্বর লৌকিক প্রমাণগোচর নন, তাহা হইলে ব্রহ্ম কাহাকে বলিব ?

গুঃ। আমরা বুদ্ধিমান হইয়াও বুদ্ধি দ্বারা যাহাকে স্বয়ং অবধারণ করিতে পারিতেছি না, এবং মানসিক প্রবৃত্তিদক্ষ পুরুষগণ মনোদ্বারা যাহাকে কল্পনা করিতেও পারেন না ; কোন দেহমন্দিরেও ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যিনি আঘ্রাণের বিষয়ীভূতও নহেন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বপ্নেও কোন পুরুষের যিনি দর্শনেন্দ্রিয় গোচর হয়েন না, আমাদের তৎস্বরূপ জ্ঞানের চেষ্টা বৃথা, কিন্তু প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, এই বেদবাক্য।

শিঃ। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম এই যে বেদবাক্য, সগুণ ব্রহ্মপর, কি নির্গুণ ব্রহ্মপর ?

গুঃ। সগুণ কি নির্গুণ তদ্বিষয়ের বিশেষ নিশ্চয় নাই, এজন্য আমরা এই শ্রুতি সগুণ ব্রহ্ম বিষয়েই লৌকিক প্রমাণাধীন স্বীকার করি।

শিঃ। মানব-দেহে কি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন সম্পন্ন ক্ষমতা আছে ?

গুঃ। উরু, উদর, বক্ষ, এই সকল স্থানে সর্ব্বগত পরমাত্মা প্রাণোপাধি আশ্রয় করিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। সেই প্রাণীগণের মধ্যে মানব দেহই ব্রহ্মজ্ঞানের সমস্ত সাধন সম্পন্ন। মানব দেহেই নির্ম্মল পরমাত্মার আবির্ভাব হয়, ইহাও স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন।

শিঃ। এই স্থূল দেহতেই কি পরমাত্মা আছেন ?

গুঃ। হাঁ, কিন্তু স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন, পুণ্য ও পাপ ফলের ভোক্তা আত্মা আছেন, এই মাত্র আমরা জানি এবং শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা, দ্রষ্টা, সমস্ত প্রাণীর অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ আছেন। এইরূপ শ্রুতিতে বলিয়াছেন।

শিঃ। এই স্থূল দেহকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিবার উপায় কি ?

গুঃ। সপ্তম ধাতুরূপ রেতো নিরুদ্ধ হইলে পর, ইহার ওজ নামে একটী

অষ্টমী দশা হয়, ইহা পীত বর্ণ, হৃদয় মধ্যস্থিত জীবের আবাসভুত, ইহার দ্বারাই জীবগণ তেজস্বী হইয়া সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে। এই রেতের সম্যক্‌রূপে সংস্থাপন করিলে, শরীরের বিরূপকারিণী জরাবস্থা ও মৃত্যুও শীঘ্র হয় না এবং শরীরের বল নাশও হয় না। কিন্তু অনেকেই ইহা নিরোধ করিতে সক্ষম হয় না।

শিঃ। এরূপ শরীরের সারভূত রেতকে প্রাণীগণ ধারণ করিতে সক্ষম হয় না কেন?

গুঃ। সর্ব্বাঙ্গ হইতে পৃথক্‌কৃত আত্মস্বরূপ রেতকে কামী পুরুষ কামরূপ গ্রহের সমাবেশ এবং উপস্থরূপ সর্পের দংশন হেতুক রেতরূপী গর্ভ কর্ত্তৃক খিন্ন হইয়া তাহাকে মোচন করিতে ইচ্ছুক হয়। যখন বহন করিতে সক্ষম না হয়, তখন নারীর যোনিদেশে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তৎ-কালীন রেত উপস্থ দ্বার দিয়া বিনির্গত হইয়া স্ত্রীপুরুষসঙ্গরূপ গ্রাম্য ধর্ম্মবলে বধূর যোনিদেশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। ঐ রেত বধূর যোনিদেশে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য কি?

গুঃ। যেমন একটী বৃক্ষ শত শত ফল উৎপাদন করিয়া আপনার স্বরূপ ঐ শত শত বীজে প্রদান করে; তদ্রূপ পুরুষে পুত্র কন্যাদিতে আপনার স্বরূপাত্মা প্রদান করেন।

শিঃ। এরূপ শরীরের সারভূত রেতকে পরিত্যাগ করিবার সময় বোধ হয় কামী পুরুষ কষ্ট বোধ করিয়া থাকে।

গুঃ। ভারাতুর ব্যক্তি ভার পরিত্যাগ করিয়া যাদৃশ সুখ অনুভব করেন, গর্ভীব্যক্তি রেতোরূপ গর্ভের সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ সুখ অনুভব করে। গ্রহাবিষ্ট পুরুষ গ্রহের নির্গমে যেরূপ সুখলাভ করে, রেতোরূপ গর্ভধারী পুরুষও রেতো বিনির্গমে তাদৃশ সুখ সম্পৎ লাভ করে।

শিঃ। এই সুখ কি প্রকৃত সুখ?

গুঃ। না, কখনই নয়। অজীর্ণে ভোজন যেমন নর সকলের প্রাণান্তরূপ আপৎ জন্মাইয়া নির্গত হয়, তদ্রূপ রেতও নর সকলের বলক্ষয় করিয়া নির্গত হইয়া থাকে। অতীসার যেমন লোকের তেজের অপহরণ করে; তদ্রূপ রেতোনির্গমও বলবীর্য্যের অপহরণ করে। পীড়িত ইক্ষুদণ্ড যেমন অসার

হয়, তদ্রূপ বধূ হস্ত দ্বারা নিপীড়িত পুরুষ ও রেতোরূপ সার নির্গম জন্য অসার হইয়া পড়ে। মূর্খ ব্যক্তি স্বাশ্রিত মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া আয়ু ও বলকর প্রগলভ আত্মীয় তেজোরূপ রেতকে বধূযোনিতে অর্পণ করিয়া থাকে।

শিঃ। যাহারা রেত ধারণ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদের অবস্থা কিরূপ?

গুঃ। রেতোনিরোধপূর্ব্বক যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করে, তাহার পরলোক ব্রহ্মলোক, এবং মানুষ লোকে বিপুলা কীর্ত্তি জন্মিয়া থাকে, অতএব এই ব্যক্তির লোকদ্বয়ই যে সিদ্ধ হয় তাহা নিঃসংশয়। এই রেতের নিরোধ বিশেষ হেতুক, মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা যোগবিৎ, ইহাদের আকাশ গমনেও ক্ষমতা জন্মে, আর ইহারা অণিমা প্রভৃতি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। বধূর যোনি মণ্ডলে অর্পিত যে রেত, তাহা কি অবস্থায় পরিণত হয়?

গুঃ। যোনিস্থানে গত হইয়া দুঃখ ও শোকজনক যে শত সহস্র নানাবিধ অবস্থা, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। রেতের আবার দুঃখ ও শোক কি?

গুঃ। রেতোরূপ গর্ভধারী পুরুষ রেতোরূপে স্ত্রীতে প্রবেশ করে, ইহাতে এই পুরুষ নূতন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। নিষেক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বকীয় শোণিতের সহিত একতা প্রাপ্ত যে রেতোরূপ পুরুষাংশ, তাহা যোনি হইতে স্বয়ং যতদিন বিনির্গত না হয়, ততদিন স্ত্রী তাহাকে স্বীয় শরীরের ন্যায় রক্ষণ ও পোষণ করিয়া থাকে। যোনিই যাহার প্রবেশ দ্বার ও যাহা বিষ্ঠা মূত্রাদি দ্বারা নিয়তই দোষিত, সেই উদর মধ্যস্থিত হইয়া জীবগণ অতিশয় দুঃখ অনুভব করতঃ যোনিদ্বার দিয়া পুনর্ব্বার বহির্দ্দেশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। যোনিযন্ত্রে প্রবেশ ও নির্গম সময়ে জীবগণের কিরূপ দুঃখ হইয়া থাকে?

গুঃ। মনুষ্যগণের মরণ সময়ে ও নরকের অনুভবকালে দুঃখ প্রসিদ্ধই আছে, কিন্তু তদপেক্ষায় কোটী কোটী গুণ দুঃখ হইয়া থাকে। যোনিযন্ত্রে প্রবেশ ও তাহা হইতে নির্গমে যে দুঃখ, ইহা মরণকালীন পীড়ায় শতগুণ অধিক, আর

যোনিযন্ত্রে ও মাতার উদরে বাস, নরক বাস হইতেও অধিক ক্লেশকর। মাতার উদরে দেহধারী পুরুষ যে দুঃখ অনুভব করে, তাহা বলিলেও আমাদের সম্মোহ জন্মে।

শিঃ। শিশু যখন মাতার ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া সুখ অনুভব করে, তখন মাতার উদরে বাস করিয়া এরূপ দুঃখ অনুভব করে কেন?

গুঃ। জননীর উদর বিষ্ঠা ও মূত্রের আবাসস্থান, পূয় ও রক্তদ্বারা ইহার অন্তর লিপ্ত, নানাবর্ণ কফাদি ধাতুদ্বারা ব্যাপ্ত, ইহার দুঃসহ মাংসময়ী ভিত্তি, কৃমিরূপ নাগপাশ দ্বারা দুঃসহ বন্ধন, মাতার প্রাণবায়ু দ্বারা নাড়ীরূপ রজ্জু সমস্ত হইতে চালিত, বায়ু ও অগ্নিজনিত তাপ জন্য কষ্টানুভব। অপরিমিত গর্ভ দুঃখ, যাহা কোনরূপেই সহ্য করা যায় না এবং যাহা শত জন্মেও বলিতে পারা যায় না, কেবল জাতিস্মরগণ এই দুঃখ স্মরণ করিতে সমর্থ হয়, সাধারণ লোক ইহার কিছুই জানিতে পারে না। সাকল্যরূপে সেই দুঃখ কোন প্রকারেই কেহ বলিতে সক্ষম হইবে না।

শিঃ। গর্ভস্থিত রেত কি রূপে জীবে পরিণত হয়?

গুঃ। এক রাত্রে কলিলাকার (অর্থাৎ শুক্র শোণিত মিশ্রিত), সপ্তরাত্রে বুদ্বুদাকার, অর্দ্ধমাসে পিণ্ডাকার, একমাসে কাঠিন্য, মাসদ্বয়ে মস্তক, তৃতীয় মাসে পাদ প্রদেশ, চতুর্থ মাসে অঙ্গুলি, উদর ও কটিদেশ, পঞ্চমমাসে মেরুদণ্ড, ষষ্ঠ মাসে মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ, সপ্তম মাসে জীব সংযোগ, অষ্টম মাসে সর্ব্বাঙ্গ পূরণ, নবম মাসে সম্পূর্ণ জ্ঞান হেতুক পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ, জরায়ুরূপ পট রহিত হইয়া ভেকের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রদেশ কুণ্ডলাকার করিয়া হস্ত ও পদের সঙ্কোচপূর্ব্বক কুক্ষিস্থানে মস্তক অর্পণরূপ যে গর্ভাসন, তাহাকে পরিত্যাগ করত হস্ত পদ ও গাত্রাদির চালনায় যেমন জননী জঠর ভেদ করিতেই উদ্যুক্ত শিশু, কখন মাতার কুক্ষিদেশে ধাবমান, কদাচ বানরের ন্যায় হৃদয় দেশে, কদাচ যোনিযন্ত্র মধ্যে ধাবমান হয়, এবং স্বীয় শরীর হইতে নিক্ষেপ করিয়া অধোদেশে মস্তক লম্বোমান পূর্ব্বক বহুপ্রকার ক্লেশ দ্বারা জননীর ক্লেশ-জনক এবং সর্পগ্রস্ত ভেকের ন্যায় অতিশয় বিক্রোশমান জুগুপ্সিত সেই বালক তখন সর্পের মুখ রূপ যন্ত্র হইতে ইন্দুর যেরূপ বহির্নীত হয়, তদ্রূপ বায়ু দ্বারা বহির্দ্দেশে নিঃসারিত হইয়া থাকে।

শিঃ। গর্ভমধ্যে জীব কোন মাসে দুঃখ অনুভব করে?

গুঃ। প্রথম অষ্টমাস গর্ভস্থ জীব সর্ব্বদুঃখকর অজ্ঞানরূপ মূর্চ্ছা স্বীয় ও মাতৃ-সম্বর্দ্ধি ক্ষুধা ও পিপাসা জন্য সন্তাপ এবং স্বীয় শরীরে অসামর্থ্য জন্য নানা ক্লেশ অনুভব করে। অতি দুঃসহ বহু জন্মানুভূত দুঃখ স্মরণ করত নবম মাসে জীব এইরূপ বলিতে থাকে যে, আমি জন্মে জন্মে বহুবিধ আহারীয় বস্তু ভোজন করিয়াছি, নানাবিধ স্তনপান করিয়াছি, নানাবিধ মাতা পিতা ও বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিও দেখিয়াছি, এক্ষণে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের ইচ্ছা নাই, যদি এই স্থান হইতে মুক্ত হই, তাহা হইলে পরমেশ্বরের প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করিব, নচেৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বপাপজনক জননীর পীড়া আর প্রদান করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। এইরূপ অনেক জন্ম স্মরণ বশতঃ তত্তৎ জন্ম দুঃখ স্মরণ, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছা হওয়ায় তত্তৎ জন্ম বিস্মরণ, বিষ্ঠা ও মূত্রাদি ভক্ষণ, ইত্যাদি প্রকার বহুবিধ গর্ভ দুঃখ অনুভব করিয়া করাতের অগ্রাপেক্ষায় সহস্রগুণে কঠিন এবং স্বল্পছিদ্র বিশিষ্ট যোনিযন্ত্র হইতে বিনির্গত হইয়া, জীব কীটের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হয়।

শিঃ। স্ত্রীগণ গর্ভধারণ করিলে, তাহাতে তাহাদের কি আহ্লাদ জন্মায়?

গুঃ। সে কথা সত্য, কিন্তু অতিশয় পরিপক্ব ব্রণ কীটযুক্ত হইলে যাদৃশী ব্যথা জন্মে, বালক যোনিযন্ত্রগত হইলে পরও স্ত্রীগণের তদপেক্ষায় অধিক-তর ক্লেশ হইয়া থাকে। মল ও মূত্রের নিরোধে মনুষ্যগণের যাদৃশ দুঃখ জন্মে, গর্ভধারণে স্ত্রীগণেরও তদপেক্ষায় অধিকতর দুঃখ হইয়া থাকে। দুর্গন্ধি ব্রণ বিদারণের পর তাহা হইতে কীটাদি বহির্গত হইলে, মনুষ্যগণের যাদৃশ সুখ হয়, নারীগণের গর্ভমোচনেও তাদৃশ সুখ অনুভব হয়। বহু সময় নিরুদ্ধ মল ও মূত্র পরিত্যাগে যাদৃশ সুখ জন্মে, গর্ভিণীগণের গর্ভমুক্ত হইলে পর তাদৃশ সুখ অনুভব হয়। এইরূপ গর্ভমধ্যে অবস্থানে ও বিনি-র্গমে জীবগণের অনুপম দুঃখ জন্মে এবং গর্ভধারিণীরও গর্ভধারণে ও গর্ভস্থ বালকের বিনির্গমে অসীম দুঃখ জন্মিয়া থাকে।

শিঃ। মানুষ-জন্ম কি অতিশয় নিকৃষ্ট জন্ম?

গুঃ। মনুষ্য-জন্ম, অতি দুর্লভ জন্ম, এই দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া অসৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সেই পুরুষ যে

ক্রমে তাহার সন্দেহ নাই, দেবগণও এই মানুষ-জন্ম সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন; কারণ, মানুষ-দেহেই নির্ম্মল পরমাত্মা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

শিঃ। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতার মন কিরূপ হয়?

গুঃ। বংশহানির সম্ভাবনা থাকে না, এই জন্য বহু কষ্টে জননীর গর্ভ হইতে বালক ভূমিষ্ট হইলে তদ্দর্শনে তাহার পিতা অতিশয় আনন্দিত হয়।

শিঃ। আত্মা কিরূপে পিতা মাতা পুত্রাদিরূপে দর্শিত হয়?

গুঃ। যেমন এক সূর্য্য যতক্ষণ কূপে, সরোবরে, ঘটে, কলসীতে, প্রতিবিম্বিত হয়, ততক্ষণ আধার ভেদে কূপসূর্য্য, ঘটসূর্য্য, নাম ধারণ করেন; তেমনি এক আত্মা মায়াতে বিম্বিত হইয়া সংসার সম্বন্ধে মাতা, পিতা পুত্রাদিরূপে দর্শিত হয়।

মায়ার আবরণের নাম লজ্জা। স্ত্রীগণে অধিক মুগ্ধ বলিয়া অধিক লজ্জাশালিনী হয়। মায়াকে আত্মজ্ঞানীতেই ত্যাগ করিয়া থাকে। মায়াবশেই সংসার। মায়া দৃষ্টিতে সংসারে আবদ্ধ হইলেই আত্মীয়গণের উপাধিতে পুত্র, পিতা, পতি স্থির হইয়া থাকে। যাহারা মায়া ত্যাগ করিল, তাহাদের পক্ষে পতি-পুত্র ভাব সমান হইয়া যায়।

শিঃ। স্ত্রীগণের পতি-পুত্র ভাব সমান কিরূপে হইবে?

গুঃ। ঈশ্বর-প্রেমে যাহারা মগ্ন হয়, তাহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সেই বাহ্যজ্ঞান নাশ করিবার কারণ তান্ত্রিকেরা স্ত্রীকে জননী বলিয়া পূজা করেন, তাহার ভাব বিভিন্ন!! জননী বলিতে যাহা হইতে প্রসূত হওয়া যায়, এমন মানবী!! সেই প্রমাণে স্ত্রীলোক মাত্রেই জননী। আত্মামাত্রকেই ঐ প্রমাণে পুত্র ও পিতা বলা যায়। কারণ, পিতাই পুত্ররূপে পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রসূত হয়েন। ইহা বেদ-বাক্য। কারণ ঈশ্বর পিতা হইয়া, পতি হইয়া, আবার পুত্ররূপেও প্রকাশ হয়েন।

শিঃ। মনুষ্য জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া কি অবস্থায় থাকে?

গুঃ। মানবগণ প্রথমে জাত মাত্রেই নানারূপ শব্দ করত ধরণীতলে শয়ান হইয়া, স্তন্য-দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা করে, ও ইচ্ছামত অন্ন পানীয়াদি প্রাপ্ত না হইয়া অতিশয় দুঃখিত হয়। বাগ্বাদিনী নাড়ির কফ ব্যাপ্ততা প্রযুক্ত বাক্য বলিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কেবল স্বীয় জননীকে আহ্বান

করে। বালক কোন সময়ে বৃথা হাস্য করে, কদাচ বৃথা ভয় প্রাপ্ত হয়, কদাচ বৃথা রোদন করে, কখন মোহিত হইয়া বিষ্ঠাদিও ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বালক কথা কহিতে, গমন করিতে, এবং গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা করিয়া যখন তত্তৎকার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তখন অতিশয় দুঃখ ও ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাল্যকালে এইরূপ কোটী কোটী দুঃখ অনুভব করিয়া বাল্যের অবস্থান্তর কৌমারি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। কৌমারি অবস্থা কিরূপ?

গুঃ। বালক জানু ও হস্ত দ্বারা মন্দ মন্দ গমন করিতে প্রবৃত্ত হয় কখন শঙ্কাযুক্ত হইয়া কুকুরের ন্যায় স্বকীয় গৃহে প্রবেশ করে এবং অভি-প্রায় সূচক অঙ্গ চেষ্টাদিও জানে না; এইরূপ অবস্থায় কিয়ৎকাল অতি-বাহিত করত অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তখন পদদ্বারা গমন করিতে আরম্ভ করে। এবং স্পষ্টরূপে বাক্য বলিতে সক্ষম হয়; কিন্তু নিজ হিতাহিত কিছুই জানে না। অপর স্থান হইতে বৃথাই অপর স্থানে গমন করে, উন্মত্তের ন্যায় কোন বস্তু গ্রহণ করে এবং বৃথাই নানারূপ বাক্য বলিয়া থাকে। ধূলির দ্বারা ধূসর সর্ব্বাঙ্গ সেই বালক মহৎশ্রমে ব্যাপৃত হইয়া বৃথাই অন্য বালকের প্রতি স্নেহ ও দ্বেষ করিয়া থাকে। কৌমারকালে এইরূপ নানা বিধ দুঃখের অনুভব করিয়া কোটী কোটী দুঃখের আকর যৌবনাবস্থাও ক্রমে প্রতিপন্ন হয়।

শিঃ। যৌবনাবস্থা কিরূপ?

গুঃ। যুবক পুরুষ কোন সময়ে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়, কদাচ যুধ্যমান ব্যক্তিকে পরাভূত করিয়া থাকে, কখন অত্যন্ত নৃত্য করে, কদাচ ধাবমান হয়, কোন সময়ে অহঙ্কার প্রকাশ এবং বারম্বার শ্বাস পরিত্যাগও করে, যৌবনকালে যৌবনমত্ত পুরুষ এইরূপ বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই পুরুষ যৌবনসুখে তৃপ্তিহীন হইয়া কেবল স্ত্রীজনেই মানস অর্পণ করত তৎসুখসম্পাদনার্থ দুষ্ট স্বভাবের বশবর্ত্তী হয়। কেবল গৃহক্ষেত্রে ও কলত্রাদিতে আসক্ত হইয়া কালাতিবাহিত করিয়া থাকে, তখন এইরূপ দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন যুবা পুরুষকে জরারূপ মহাকাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়।

শিঃ। বৃদ্ধাবস্থা কিরূপ ?

গুঃ। সেই যুবক জরার সঙ্গমে কুরূপ ও শক্তিহীন হইয়া দুঃখ ও শোকে সমাবৃত হইয়া থাকে। তৎকালে যৌবনকৃত অনেকবিধ অকার্য্যের স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ আপনাকে এইরূপ নিন্দাও করিয়া থাকে, "হায়, আমি যৌবনমদে মত্ত হইয়া কি অকার্য্যেরই বা অনুষ্ঠান না করিয়াছি; তৎফল আমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; এইরূপ অধিকতর পরিতাপ করিয়া থাকে। বৃদ্ধকালে মনুষ্যের বিষয়লাভে মহতী ইচ্ছা দেখা যায়, কিন্তু শক্তি রাহিত্য প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সংক্ষয় হেতুক বৃদ্ধ কোন বিষয় ভোগই করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপে বৃদ্ধের দেহরথকে কাল সুসজ্জিত করিলে পর সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধাবস্থায় নানাবিধ দুঃখ অনুভব করিয়াও মোহ বশতঃ সমস্ত দুঃখের আকর এই শরীরকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। মরণকাল সন্নিধান হইলে পর তখন জীব অতিশয় দুঃখিত হইয়া স্বীয় পুত্র ও কন্যাদিগকে স্মরণ করিতে থাকে এবং মরণজন্য ক্ষোভ বশত ইহার ত্রাস ও দেহ কম্পও উদ্ভব হইয়া থাকে। তৎকালে বান্ধব সকলে তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, কিন্তু কোনরূপেই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না।

শিঃ। মরণকালে জীব কিরূপ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ?

গুঃ। দ্বিসপ্ততিসহস্রপরিমিত বৃশ্চিকসমস্ত যদি এককালীন পুচ্ছের দ্বারা সমস্ত গাত্র দংশন করে, তাহাতে যাদৃশ দুঃখ অনুভব হইতে পারে, মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহত্যাগে তাদৃশ দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে। মরণকালে জীবগণ চেতন রহিত হইয়া হস্ত ও পদের সঞ্চালন করিতে থাকে; তখন তাহার আত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া শোক করিতে থাকে। জালবদ্ধ কপোত যেমন দীনচিত্ত হইয়া যথেচ্ছ গমনে অক্ষম হয়, তদ্রূপ জীবগণ কালরূপ পাশের বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছ গমনে অক্ষম হইয়া থাকে। মুমূর্ষু ব্যক্তির অসংখ্যাত হিক্কা এবং গ্লানিযুক্ত মুখ দেখিয়াও নিষ্ঠুরাশয় মৃত্যুর করুণা হয় না। হা পুত্র, হা কলত্র, এইরূপ শব্দকারী মুমূর্ষুরূপ জীবকে কাল-চোরের ন্যায় বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। জনঘাতী নির্দ্দয় মৃত্যু তখন মৃতব্যক্তির শরীর মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীর বন্ধন, কালরূপ কুঠার দ্বারা অনায়াসে ছেদন করিয়া থাকে। মুমূর্ষু ব্যক্তি কখন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, কদাচ প্রবোধিত

হয়, কোন সময়ে ভয়জনক যমদূতগণের সন্দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া, ভয়-জনক মহৎ শব্দ করে, কখন বিষ্ঠা মুত্র ত্যাগ করে, কদাচ অশ্রুমোচন করে। জীবিত ব্যক্তির তপ্ত তৈল মধ্যে প্রবেশে যেরূপ দুঃখ অনুভব হয়, মরণসময়েও মনুষ্যগণের তাদৃশ দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির শরীর করাত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার যাদৃশ দুঃখ হয়, মরণকালে সমস্ত প্রাণীগণেরও তাদৃশ দুঃখ হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির পদাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্তের ত্বক্ উৎপাটন করিলে তাহার যাদৃশ দুঃখ অনুভব হয়, মরণ সময়েও মনুষ্যের তাদৃশ দুঃখ হইয়া থাকে।

শিঃ। মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে যমদূত সকল আগমন করিয়া সেই পাপীকে কিরূপ দুর্ব্বাক্য দ্বারা ভৎর্সনা করে?

গুঃ। রে আত্মঘাতী মনুষ্যদেহধারি পাপী তোমায় ধিক্, যে হেতুক তুমি এই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া অবধি স্বীয় হিত সম্পাদক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল সেই আত্মীয় পুত্র কলত্রাদির রক্ষণার্থ নিয়ত ভ্রমণ করিয়াছ। দেহের উপভোগ সিদ্ধির নিমিত্ত পুত্র কলত্র ও ধনাদিকে আশ্রয় করিয়া, পুণ্যলেশ মাত্রও না করিয়া রাশি রাশি পাপ সঞ্চার করিয়াছ এবং সেই সকল পাপের জন্য দিবারাত্র বহুবিধ দুঃখ ভোগও করিয়াছ। যাহাদিগকে শত্রু বলিয়া নিয়ত দ্বেষ করিয়াছ, তাহারা কেহই তোমার প্রকৃত শত্রু নহে, কিন্তু তুমি আপনার শত্রু আপনি, যে হেতুক মোক্ষসাধনের প্রধান উপায় মনুষ্যদেহ, তাঁহা লাভ করিয়া তুমি আপনার বন্ধন মোচনের উপায় কিছুই কর নাই, অতএব তুমি আপনার আপনিই যে শত্রু তাহা নিঃসংশয়। সুকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠানে স্বল্পমাত্র শরীরের আয়াস আছে, কিন্তু পরমাত্মায় তাহাও নাই, অতএব কেনই বা পরমাত্মার চিন্তা না করিয়াছ? যদিচ নির্গুণ ব্রহ্মের পরিজ্ঞান বিষয়ে সক্ষম না হইয়া ছিলে, তবে কেনই বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর নাই, যাহা অপেক্ষা পরম সুখাস্পদ আর কিছুই লক্ষিত হয় না। যদি চ উপাসনাদি কার্য্যে অক্ষম হইয়া থাক, তবে ভগবানের নাম কীর্ত্তনই বা কেন না করিয়াছ। শত্রু বিনাসের নিমিত্ত তুমি যেমন উদ্যোগ করিয়া ছিলে, তদ্রূপ স্বর্গ ও মোক্ষের নিমিত্ত স্বল্পমাত্র উদ্যোগও কেনই বা কর নাই? তুমি নির্জনে এবং প্রকাশে যে সমস্ত পাপ করিয়াছ, সেই পাপ, সাক্ষিস্বরূপ আদিত্যাদি

দৈবগণ বলিতেছেন। লোক সকল পাপানুষ্ঠান যদি প্রচ্ছন্নেও করে, তাহাও আমাদের অবিদিত থাকে না, কারণ দিবসে অনুষ্ঠিত পাপের সাক্ষী সূর্য্য ও দিবস, রাত্রে অনুষ্ঠিত পাপের সাক্ষী রাত্রি ও চন্দ্র প্রভৃতি, সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত পাপের সাক্ষী উভয় সন্ধ্যা এবং দিবা রাত্রি, ও সন্ধ্যা ভিন্ন সর্ব্বকালিক অনুষ্ঠিত পাপের সাক্ষী পঞ্চভূতগণ, ইহারা যমসভায় নিয়ত পাপিগণের গোপনে অনুষ্ঠিত পাপও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই জন্য পুণ্য ও পাপসকল আমাদের অবিদিত নাই, যে হেতুক আমরা যমের কিঙ্কর। যমদূতগণ এইরূপ নানাবিধ বাক্যদ্বারা সেই পাপাত্মাকে ভৎর্সনা করতঃ সুদারুণ পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক, কশা (অর্থাৎ চাবুক) দ্বারা আঘাত করিতে করিতে যমসদনে লইয়া যায়।

শিঃ। সেই ব্যক্তি মৃত হইলে পর তাহার পত্নী প্রভৃতি ও বান্ধবগণ তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে ?

গুঃ। জীবিত সময়ে আত্মীয়গণ যাহাকে কোমল ও অতি শুভ্রবর্ণ শয্যাতে শয়ন করাইত, সেই ব্যক্তি মৃত হইলে পর বান্ধবগণ প্রজ্জলিত বহ্নি মধ্যে উহাকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। জীবিত অবস্থায় যাহাকে বান্ধবগণ গন্ধ ও পুষ্প সংযোগপূর্ব্বক স্পর্শ করিতে সভয় হইত, তাহারাই চিতাগত ঐ পুরুষকে তীক্ষাগ্র কাষ্ঠ দ্বারা অকাতরে স্পর্শ করিয়া থাকে। যাহাকে পূর্ব্বে বান্ধবগণ ঘোটক, গজ ও রথ দ্বারা লইয়া যাইত, মরণান্তে তাহাকে কাষ্ঠের ন্যায় কাষ্ঠ দ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে স্বীকৃত হয়। যিনি পূর্ব্বে মঙ্গলজনক বাদ্যোদ্যমের সহিত প্রয়াণ করিতেন, তিনি অধুনা স্ত্রীগণের সশোক রোদনের সহিত গমন করিতেছেন। বান্ধবগণ পূর্ব্বে যাহার অগ্রে দধি ও খই প্রভৃতি মঙ্গলজনক বস্তু লইত, তাহার অগ্রে আজ্ ধূমযুক্ত অগ্নি লইয়া যায়। যাহার পদাগ্র হইতে নির্গত জল লোক সকল মস্তকে ধারণ করিত, মরণান্তে তাহার সংস্পর্শে লোক সকল স্নান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

শিঃ। মরণকালে জীবাত্মা দেহের কোন দ্বার দিয়া নির্গত হয় ?

গুঃ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবাত্মা যে দ্বার দিয়া (মস্তকের ঊর্দ্ধ ভাগ দিয়া) এই দ্বারবতী পুরীতে (অর্থাৎ দেহমধ্যে) প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গম হইলেই যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন, ইহা নিঃসংশয়। পুণ্যশালী পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্গত হইলে পর স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, তদ্ভিন্ন

দুষ্কৃতশালী পুরুষ ঐ দ্বার দিয়া নির্গত হইলে দুষ্কৃতকে অগ্রবর্ত্তী করত যমালয়ে গমন করিয়া থাকে।

শিঃ। ঐ পাপী পুরুষ শরীর ত্যাগ করিয়া কি অবস্থায় যমদূতগণের সহিত গমন করে?

গুঃ। যে পুরুষ জীবিতকালে পুত্র ও ভার্য্যা প্রভৃতিকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারিত না, সেই পুরুষ সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া অক্লেশেই পুনঃ পুনঃ গমন করিতেছে। এইরূপ অতিশয় দুঃখিত পুরুষ শরীর ত্যাগ করত অতিশয় ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর এবং যমদূতগণ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া যমদ্বারে নীত হইয়া থাকে। যমালয়ে যমশাসন বশত অনেকবিধ দুঃখানুভব করিতে হয়, সেই দুঃখ বলিতেই বা কে সক্ষম এবং তাহা শ্রবণ করিতেই বা কে সক্ষম হইবে। অসিপত্র, বন প্রভৃতি ভয়জনক নরকমধ্যে দুষ্কৃতশালী পুরুষ অনেক কল্প পর্য্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। যমালয় গমনের পথিমধ্যে কিরূপ কষ্ট?

গুঃ। পথিমধ্যে শূকর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশুগণের এবং কাক শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণেরও উপদ্রব আছে। রাক্ষস তুল্য শত শত চৌরগণ নানাবিধ অস্ত্রাদি দ্বারা জীবকে প্রহার করিয়া থাকে, কিন্তু স্বীয় দুষ্কৃত ভোগের পর্য্যবসান না হওয়াতেই সেই জীবের তাহাতে মৃত্যু হয় না। পথিমধ্যে পূয় ও বিষ্ঠাদি পূর্ণ নদী সকলকে জীব লঙ্ঘন করিয়া থাকে, কোথাও তন্মধ্যে নিমগ্নও হন, কোন স্থানে কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জলজন্তু হইতে ভয়ও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। দুষ্কৃতশালী পুরুষ এইরূপ দুঃখ অনুভব করিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

গুঃ। কালের অনুসারে ভোজনীয় বস্তু অন্নাদিরূপ প্রাপ্ত হইয়া এই মনুষ্য লোকে পুনরায় গমন করিয়া থাকে।

শিঃ। সুকৃতশালী পুরুষ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

গুঃ। স্বর্গলোকে স্বর্গীয় মহৎ সুখ অনুভব করিয়া কালানুসারে সুকৃতের অবসান হইলে পর, পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে জলধারার সহিত এই মনুষ্য লোক পুনরায় প্রাপ্ত হয়। এবং পুণ্য ও পাপের অনুসারে পিতা ও মাতা দ্বারা নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

শিঃ। এইরূপে জীবগণ কতবার সংসার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে?

গুঃ। রবি ও সোম প্রভৃতি বার সকল যেমন অবিচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ প্রাণিগণের জন্ম ও মরণাদিভাবও অবিচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন দেহিগণ পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ জীবও নূতন দেহ প্রাপ্ত হইয়া জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সংসার মধ্যে অবস্থিত জীবগণের যতদিবস পর্য্যন্ত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান না হয়, তত দিবস এইরূপে জন্ম ও মরণাদির বশবর্ত্তী হইয়া জীবগণ সংসার মধ্যে নিয়তই ভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব অজ্ঞানের বিনাশ এবং স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান না হইলে মনুষ্যগণের দেহাদিরূপ এই সমস্ত দুঃখের বিনাশ কোনরূপেই হইবার সম্ভাবনা নাই।

শিঃ। ব্রহ্ম যিনি তিনিই আত্মা, সকল প্রাণীগণেতে কি আত্মা আছেন?

গুঃ। স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ প্রভৃতি এবং অপরাপর প্রাণীগণ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। নানাবিধ কর্ম্মশান্তি "ব্রহ্মা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত" যে সকল জন্তুগণ ইহারাও আনন্দাত্মারূপী ব্রহ্মের দেহ।

শিঃ। যদ্যপি সকল দেহেতেই আত্মা অবস্থান করেন, তাহা হইলে দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ থাকেন কেন?

গুঃ। যে জন্ম গ্রহণ করে, যাহা প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়, যাহা অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয়, যাহার অবশ্যই বিনাশ আছে, এবং যাহা বিনষ্ট হয়, এতাদৃশ ইন্দ্রিয় যুক্ত দেহভাবপ্রাপ্ত আত্মা নহেন, যে হেতুক এই সমস্ত দেহ সাক্ষাৎ পরোক্ষরূপ আত্মাতে কল্পিত, কিন্তু কল্পিত-ধর্ম্ম কখন আধারকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শিঃ। আত্মা যিনি, তিনিওতো দেহমধ্যে বন্ধন অবস্থায় আছেন?

গুঃ। আত্মার বন্ধন নিমিত্তক অজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মিত চরোশী লক্ষ ক্লেশ-জনক কারাগার স্বরূপ দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৃহদাকার পক্ষী যেমন লৌহনির্ম্মিত পঞ্জর মধ্যে শৃঙ্খলা দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক রক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মাও সেই দেহ মধ্যে অজ্ঞানরূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে।

শিঃ। যখন আত্মা দেহমধ্যে বদ্ধ আছেন, তখন তাঁহাকে দেহ ধর্ম্মের (অর্থাৎ মৃত্যু, ভয়, সুখ দুঃখ ইত্যাদির) অধীন বলিতে হইবে?

গুঃ। পরমাত্মা মৃত্যুরও আত্মা স্বরূপ, মৃত্যু কখন কি আপনার দ্বারা আপনাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারে, এজন্য আত্মার মৃত্যুভীতি কোন প্রকারেই নাই। ভয় দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেই হইয়া থাকে, বাস্তবিক আত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই, সেই জন্য সংসারাদি হইতে আত্মার ভয় কোন রূপেই সম্ভব হইতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এই সমস্ত দেহের ধর্ম্ম, এই সকলের কোন অংশই আত্মাতে নাই, অতএব দেহ হইতে ভিন্ন যে আত্মা, তাহার কিরূপে সুখ বা দুঃখের অনুভব হইবে? ভয়, ও মোহ মনের ধর্ম্ম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণের ধর্ম্ম, নিদ্রা ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম, বিষ্ঠা ও মূত্র নিবন্ধন যে পীড়া তাহা দেহ ধর্ম্ম; আত্মার ধর্ম্ম কদাচই নহে, কারণ আত্মা অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ, তাহার ভয় স্বীকার করিলে তিনি দ্বিতীয় হইয়া পড়েন এবং মোহ স্বীকার করিলে তাহার জ্ঞানস্বরূপে ব্যাঘাত হইয়া উঠে।

শিঃ। আত্মা সত্ত্ব, রজো, তমোগুণ বিশিষ্ট কি না?

গুঃ। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন মন মোক্ষ ইচ্ছা করে, রজোগুণ সম্পন্ন মন স্বর্গ ইচ্ছা করে, তমোগুণ সম্পন্ন মন বৈষয়িক সুখ সমস্ত বাঞ্ছা করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মা ত্রৈগুণ্যাভিমান রহিত (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণ শূন্য) এবং আনন্দরূপী।

শিঃ। নিদ্রাবস্থায় দেহমধ্যস্থিত আত্মা কি নিদ্রিত থাকেন?

গুঃ। কারণ শরীরে (অর্থাৎ এই স্থূল দেহের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম দেহ, তাহাতে) মনের লয়রূপা নিদ্রাবস্থা বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের হইয়া থাকে, কিন্তু যখন স্বপ্ন সন্দর্শন না হয়, তখন সেই নিদ্রা মনের বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ, অতএব মন ও ইন্দ্রিয়াদি বিহীন যে আত্মা তাহার নিদ্রাবস্থা কোন প্রকারেই সম্ভব নাই।

শিঃ। আত্মাই যদি ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম কি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বোধ্য নয়?

গুঃ। চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় কিম্বা মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই অন্তরিন্দ্রিয় সমস্ত দ্বারা বোধ্য নয় ও বুদ্ধি বৃত্তির বিষয়ভূত নহেন। পর-

মাত্মা আনন্দ স্বরূপ, সংশব্দ প্রতিপাদ্য (অর্থাৎ নিত্য) স্বপ্রকাশ এবং দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা অবধারণের অযোগ্য।

শিঃ। তাহা হইলে ব্রহ্মকে কিরূপে জানিতে পারিব ?

গুঃ। পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ না করিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না।

শিঃ। পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানলাভ কিরূপ ?

গুঃ। মনুষ্য লোকে ও স্বর্গলোকে লব্ধ যে কর্ম্মফল সমস্ত, তাহা পরিত্যাগ করত উপভোগে পুণ্যের ক্ষয় হেতুক নির্ম্মল আশয় হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ বিনাশ পূর্ব্বক পরমাত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিঃ। স্বর্গভোগে সুখ লাভ কি হয় না ?

গুঃ। স্বর্গলোকে পুণ্যের অল্প বা আধিক্য বশত ঐশ্বর্য্য-ভোগেরও অল্পাধিক্যদর্শনে স্বর্গীয় পুরুষেরও ঈর্ষা জন্মে; দেবগণের অধীনতা প্রযুক্ত ভয়, এবং পুণ্যভোগান্তে পুনর্ব্বার মনুষ্য লোকে পতন জন্য শোক, এই ত্রিবিধ দোষ স্বর্গলোকে অপ্রতিকার্য্য। আমরা কর্ম্ম জন্য ফলের বশবর্ত্তী হইয়া ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া কখন স্বর্গলোকে গমন করি, এবং স্বর্গ হইতে পুনরায় ভূলোকে আগত হইয়া থাকি, কখন কোনরূপে পাপজনক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে পর পুনরায় নরকেও গমন করিয়া থাকি, এইরূপে উপরিদেশে ও অধোদেশে কপোতের ন্যায় আমরা ভ্রমণ করি, এবং বিষয় তৃষ্ণায় পরিপীড়িত হইয়া দুঃখ ও শোকের হেতুভূত উত্তম অধম নানাবিধ শরীরও প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

শিঃ। যখন নির্ম্মল পরমাত্মা দেহমধ্যে অবস্থান করেন, তখন দেহী কেন অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া অনিত্য বিষয়-ভোগ বাসনা অভিলাষ করে ?

গুঃ। যেমন কোন পুরুষ নিজ চিত্তের দোষ বশত নির্দ্দোষ পিতা প্রভৃতি আত্মীয়-জনের দোষ দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা ও আত্মাতে সত্ত্ব রজঃ ও তমোরূপ ত্রিদোষ দর্শন করত জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। মদ্যপানে মত্ত কোন পুরুষ চক্ষু দ্বারা সম্যক্‌রূপ দর্শনে অসমর্থ প্রযুক্ত সম্মুখে মিথ্যা রূপাভিত্তিতুল্য আবরণ যেমন দর্শন্ করিয়া থাকে; তদ্রূপ আনন্দাত্মাও মিথ্যারূপ এই জগৎকে

সন্দর্শন করিয়া থাকেন; প্রত্যুত আত্মা কোনরূপেই জগতে লিপ্ত নহেন। যেমন কোন পুরুষ নিদ্রিত হইয়া আপনার স্বরূপ অবলোকন করে না, তদ্রূপ আনন্দাত্মাও জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ স্বপ্নত্রয় সন্দর্শন করতঃ আপনার স্বরূপ আপনি অনুভব করিতে পারে না। অনন্ত পরমাত্মা আনন্দ-স্বরূপ আপনার অজ্ঞান বশত সংসাররূপ শূন্যমধ্যে নিয়ত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। যেমন সর্ব্বগুণযুক্ত পুরুষ, কোন বেশ্যা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া দীনতা অনুভব করিয়া থাকে; তদ্রূপ মায়ার দ্বারা আত্মাও মোহিত হইয়া সংসার বাসনা-রূপ দীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শিঃ। পরমাত্মা কি মায়া কর্ত্তৃক মোহিত হন?

গুঃ। ত্রিলোক নাথ ইন্দ্র দেবাধিপত্য প্রযুক্ত কামদেবকে বাধ্য করিতে সমর্থ হইয়াও তাহাকে বাধ্য না করিয়া, তদধীনতা বশত যেমন, কামিনীতে আশক্ত হইয়া থাকেন; তদ্রূপ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মাও স্বাধীন মায়াকে বাধ্য না করিয়া তদধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া সংসার-বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হইয়া থাকেন ও মায়ার সংসর্গে নির্ব্বিকার পরমাত্মাও দূষিত হইয়া থাকেন।

শিঃ। পরমাত্মা কি মায়ার দোষ দর্শন করিতে অক্ষম?

গুঃ। পুত্রাদিতে প্রিয়দর্শী ব্যক্তির পুত্রাদিকৃত অনাদরাদি দোষে দোষ বুদ্ধি যেমন জন্মে না; তদ্রূপ পরমাত্মাও স্বকীয় মায়ার দোষকে দোষ বলিয়া অবলোকন করেন না। ভারশৃঙ্গ নামক মৃগ যেমন হৃষ্ট হইয়া শৃঙ্গভার বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মাও মায়ার ভার অনায়াসেই বহন করিয়া থাকেন। রাজা যেমন প্রজাগণের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন; তদ্রূপ আত্মীয়াভিমান বশত পরমাত্মাও জড়স্থিত দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া অভিমান করেন। পুরুষ যেমন, স্বপ্নাবস্থায় বৃথা আপনার দুঃখ আপনি প্রদান করিয়া থাকে, এইরূপ জাগরণাবস্থাতে আত্মা আপনার দুঃখ আপনি প্রদান করিয়া থাকেন।

শিঃ। যদ্যপি স্বয়ং আত্মাই দুঃখ অনুভব করেন, তাহা হইলে এই দুঃখের বিনাশ কিরূপে হয়?

গুঃ। স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট দুঃখের বিনাশ হয় এবং

স্বপ্নাবস্থায় আমি যাদৃশ দুঃখানুভব করিয়াছি, এরূপ দুঃখ আমার কদাচ হয় না, এক্ষণে হইতেছে না, ও হইবে না, এইরূপ জানিতে পারে, তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ত্রিস্বপ্নরূপ সংসার হইতে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ জাগরণ হইলে পর সমস্ত অসুখ বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং আমি পরমাত্মা স্বরূপ, আমার কোনরূপ দুঃখ কখন হয় না, হইতেছে না, ও কদাচ হইবে না, এইরূপ জানিতে পারে।

শিঃ। মনুষ্যগণের ন্যায় স্থাবরগণেরও কি সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে?

গুঃ। যে ক্ষমতা দ্বারা স্থাবরগণ সুখ দুঃখ অনুভব করে, তাহাকে প্রজ্ঞা কহে।

শিঃ। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ কি?

গুঃ। আমরা ব্রহ্মে যে বিবিধ প্রকার মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি নাম অর্পণ করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রজ্ঞা একটী নাম, যদিচ হৃদয়াদি নামের মধ্যে প্রজ্ঞান নাম উল্লেখ না করা হইয়াছে, তথাপি প্রজ্ঞান নামেও যে একটী বুদ্ধিবৃত্তি, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞা ধাতুর অর্থ প্রকাশ, প্র শব্দের অর্থ ত্রিবিধ ভেদ শূন্যতারূপ প্রকর্ষ, অতএব যেরূপ ব্রহ্মশব্দ নিরতিশয় আনন্দপর, প্রজ্ঞা শব্দ তদ্রূপ, এজন্য ব্রহ্মের সেই প্রজ্ঞা নাম অতি শোভনতর।

শিঃ। প্রজ্ঞা কি কেবল স্থাবর দেহেই আছে?

গুঃ। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নির ন্যায়, ব্রহ্মা অবধি করিয়া স্থাবর প্রভৃতির দেহ মধ্যে প্রজ্ঞা অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব প্রজ্ঞান শব্দ প্রকাশরূপ আত্মা।

শিঃ। প্রজ্ঞাকে প্রকাশরূপ আত্মা বলিলেন কেন?

গুঃ। জীবগণ যেরূপ মাংসময় চক্ষুদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্থাবর ও জঙ্গম প্রভৃতি সকল ভূত ভৌতিক পদার্থই প্রজ্ঞারূপ চক্ষু দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নি, প্রভৃতি যে কোন প্রকাশ পদার্থ সকল ইহারাও প্রজ্ঞারূপ দৃষ্টি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে, নতুবা ইহাদের প্রকাশ হইতে পারে না, কারণ সর্ব্ব সাক্ষী পরমাত্মা ভিন্ন কোন বস্তুরই প্রকাশের অসম্ভব, যে হেতুক তদতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই জড়, জড়ের স্বত প্রকাশ কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি প্রকাশ পদার্থেরও প্রকাশক, তখন সমস্ত জগৎ প্রজ্ঞা দ্বারাই যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা

নিঃসন্দেহ, এজন্য জগৎ প্রজ্ঞা-নেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি ত্রিলোক এবং ইহাদের বাহ্যদেশেও যেমন একমাত্র আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং বিনাশের পরে নাম ও রূপে অস্পষ্ট সমস্ত জগৎ প্রজ্ঞাতেই অবস্থিত হইয়া থাকে এবং সৃষ্টির সময়েও নাম ও রূপে স্পষ্ট এই জগৎ প্রজ্ঞাতেই থাকে, এজন্য প্রজ্ঞাই যে জগৎ নির্ব্বাহক, ইহা নিঃসন্দেহ। বেদবাক্য দ্বারা প্রজ্ঞাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সৎ কিম্বা অসৎ যে কোন বস্তু ইহা প্রজ্ঞা হইতে কোন রূপেই পৃথক্ নহে, অতএব প্রজ্ঞা ব্রহ্মপদ প্রয়োগের যোগ্য, যে হেতুক মায়া সহিত স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ সমস্ত জগৎ স্বত প্রকাশ প্রজ্ঞারূপ পরমাত্মার প্রকাশেই প্রকাশিত হইয়া থাকে, অতএব প্রজ্ঞাই যে চক্ষুরূপে জগৎ প্রকাশক তাহা নিঃসন্দেহ।

শিঃ। বৃক্ষাদির জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই কেন?

গুঃ। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুই শ্রেণীর জীব;—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়া জগতে প্রকাশিত আছে। তন্মধ্যে যাহারা উর্দ্ধস্রোতী অর্থাৎ যাহাদের ঘ্রাণক্রিয়া উর্দ্ধভাগে হয়, তাহাদের অধোভাগ হইতে প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের জ্ঞানক্রিয়া বিলুপ্ত থাকে। সেই জন্য বৃক্ষাদিতে ইন্দ্রিয়-চিহ্ন উর্দ্ধে প্রকাশ থাকে না। শিকড়াদিরূপে নিম্নে থাকে। এইরূপ যোনিজাত মায়ার নিয়মে প্রয়োজনমতে আপনিই ইন্দ্রিয় দেহে প্রকাশ হইয়া থাকে। বৃক্ষের অন্তরে প্রাণক্রিয়া হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গে প্রয়োজনমতে ইন্দ্রিয়রূপী ইন্দ্রিয়-দ্বার সকল শাখাপত্রাদিরূপে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

শিঃ স্থাবরগণের কি সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে?

গুঃ। প্রজ্ঞা দ্বারা স্থাবরগণ সুখ দুঃখ অনুভব করে। কারণ ইহাদের বৃদ্ধি ও হানি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে, অতএব স্থাবরগণেরও সুখ ও দুঃখাদির বিজ্ঞান অবশ্যই রহিয়াছে। ইহারা যথাকালে জলপ্রাপ্ত হইয়া সুশোভন স্বীয় দেহ ধারণ করিয়া থাকে। ইহা যখন প্রত্যক্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহাদের সুখানুভব রহিয়াছে ইহা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইতেছে। তদ্রূপ মূলচ্ছেদনাদি দ্বারা শুষ্ক ও শোভা রহিত হইয়া যখন

পতনাদি বিশিষ্ট ও দৃষ্ট হইতেছে তখন বৃক্ষাদিরও যে দুঃখানুভব রহিয়াছে ইহা নিঃসংশয়। এইরূপে স্থাবরগণেরও যখন ক্ষয় ও বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন সুখানুভব ও দুঃখানুভব স্থাবরগণের ও জঙ্গমগণের যে সমান, তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ নাই।

শিঃ। জঙ্গমগণেরা কিরূপে সুখ দুঃখ অনুভব করে?

গুঃ। হস্তে উত্তম তৃণধারণ পূর্ব্বক আহ্বান করিলে গ্রাম্য ও অরণ্য পশুমাত্রেরই সম্মুখে আগমন, ও হস্তে দণ্ডধারণ পূর্ব্বক আক্রোশ করিলে পলায়ন যখন প্রত্যক্ষই পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন উভয়বিধ পশুগণের যে সুখ দুঃখের অনুভব সমান, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। যে হেতুক সকল জঙ্গমগণেরই ব্যবহার সমান. অতএব পিপীলিকাদি প্রাণীরও সুখ ও দুঃখভোগ অবশ্যই রহিয়াছে।

শিঃ। সুখ ও দুঃখভোগ কি প্রজ্ঞা দ্বারাই হইয়া থাকে?

গুঃ। যখন প্রজ্ঞা না থাকিলে আমাদের সুখ ও দুঃখ জন্মিতে পারে না, তখন সুখ ও দুঃখ প্রজ্ঞা হইতে পৃথক নহে; কারণ প্রজ্ঞা প্রকাশরূপ। প্রজ্ঞার স্বত্বেই সমস্ত জগৎ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে?

শিঃ। মনুষ্য কি জন্য অপর জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

গুঃ। ব্রহ্ম প্রকৃতি স্বভাব বা চৈতন্য। তাঁহার তপস্যা অর্থাৎ চৈতন্যাকর্ষণ ক্ষমতা। প্রকৃতি চৈতন্যাকর্ষণ-ক্ষমতায় কি লাভ করিলেন, না চারিভাবে চৈতন্যলাভ করিলেন? একের দ্বারা জ্ঞান। এই শক্তির দ্বারা পূর্ব্ববিনষ্ট স্বভাবের প্রকাশ হয়। যেমন একটী শিশু নিজ অবস্থা হইতে যত উন্নত হয়, ততই জ্ঞানশক্তির বৃদ্ধিতে আত্মক্রিয়া স্বভাবমতে প্রকাশ করে। তদ্রূপ প্রকৃতিতে ঐরূপ চারিশক্তি বর্ত্তমান আছে। জ্ঞানের দ্বারা পূর্ব্বপ্রলয় বিনষ্ট বস্তুর তত্ত্ববোধ হয়। বৈরাগ্যের দ্বারা প্রকৃতি সেই তত্ত্ব প্রকাশে আসক্ত হইয়া থাকে। বিবেকের দ্বারা তত্ত্বময় হইয়া প্রকৃতি নিজ ক্রিয়া করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বাতীত ঈশ্বরের বাসনানুসারে তত্ত্ব সমূহের রূপান্তর করিয়া থাকে।

ঐ চারি শক্তি মনুষ্যের হৃদয়েও বিরাজিত। এই জন্য মনুষ্য অপর জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মের স্বরূপে গঠিত। মনুষ্য স্বভাবমতে আপনার কি

উচিত, এই ভাব জ্ঞান দ্বারা সংগ্রহ করিয়া থাকে। বৈরাগ্যের সহযোগে ঐ সংগৃহীত তত্ত্বে লীন না হইয়া পৃথক্ হইয়া থাকে। বিবেক সহযোগে ঐ স্বভাবটী কি, ইহা জ্ঞাত হইয়া স্বভাবের প্রকাশককে জানিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের সহযোগে স্বভাব ও স্বভাবের প্রকাশককে জানিয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিন্ত হয়।

শিঃ। কোন্ জ্ঞান উৎকৃষ্ট পথ ?

গুঃ। ব্রহ্মজ্ঞানই উৎকৃষ্ট পথ, ইহাই সত্য, এবং ইহাই জীবগণের অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ব্রহ্মজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া সাধনান্তর অনুষ্ঠান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এই পরমাত্মজ্ঞান অপেক্ষা মনুষ্যদিগের হিতকর অধিক আর কিছুই নাই, যে হেতুক এই জ্ঞানই পরম সুখপ্রাপ্তির এবং সমূল দুঃখ-বিনাশের কারণ।

শিঃ। কিরূপ ব্রতে ব্রতী হইলে পরমাত্মজ্ঞান পথে পথিক হওয়া যায় ?

গুঃ। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, অবধূত, সন্ন্যাস, ব্রহ্মদণ্ড, পরমহংস, অঘোর-পন্থ প্রভৃতি আত্মজ্ঞানীর ব্রতশ্রেণী আছে। তন্মধ্যে পরমহংসকে তুরীয় অবস্থা কহে। অর্থাৎ যাঁহারা ইন্দ্রিয়চেষ্টা, রিপুচেষ্টা সমস্তই জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া এই বিশ্বকে এবং আপনাকে ঈশ্বরময় বোধ করেন। ইহার উপরে অঘোরপন্থ বই আর কিছুই শ্রেষ্ঠ উপাসনা নাই। আনন্দে ও প্রেমে পরমহংসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শিঃ। ঋষি কাহাকে কহে ?

গুঃ। ঋষি বলিতে যাঁহাদের অন্তর মায়া হইতে অতীত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে বা যাঁহাদের মন মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অসরল না হইয়া ঋজুত্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিঃ। ঋষি-ধর্ম্ম কি ?

গুঃ। যে উপায়ে কর্ম্ম সকলকে নিষ্কাম ভাবে আচরণ করিয়া রিপুগণকে ইন্দ্রিয়গণের সহিত হৃদয়ে লোপ করা যায় তাহাকে ঋষিধর্ম্ম কহে। সংসারী, জ্ঞানবলে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান হওত পরমানন্দময় প্রেমিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যোগাদি না করিয়া কেবল শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা নিদি-ধ্যাসন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করত পরমাত্মময় হওয়া। এ

প্রথা নারদের-পূর্ব্বে ছিল না, তিনিই এই ঋষিধর্ম্ম প্রচার করেন এবং সকলের সুগমের কারণ স্বপ্রণীত নারদপঞ্চরাত্র-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সেই শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তল্লিখিত উপায়াদি আচরণ করিলে লোকে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। মুক্তির ফলকে স্বর্গ কহে। ঋষিরূপে পরমাত্মময় হইলে তাহাকে ঋষিস্বর্গ কহে।

শিঃ। যোগী কাহাকে কহে ?

গুঃ। যাঁহারা বাহ্য স্বভাব ত্যাগ করিয়া একেবারে অন্তরে বর্ত্তমান আছেন, অনুভব শক্তিকে বিজ্ঞান দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিয়া সর্ব্বসাক্ষিরূপী আত্মাকে অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই যোগী কহে।

শিঃ। অবধূত-বেশ কিরূপ ?

গুঃ। যে বেশ দ্বারা সংসারকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করা হয় তাহাকে অবধূত-বেশ কহে। সংসারকে মান্য করিতে হইলে অভিমানের দাসত্ব করিতে হয়। সেই অভিমান-বলেই যে যেমন পদবীর লোক তাহাকে তদুপযুক্ত বেশভূষাদি ধারণ এবং প্রসাদ লক্ষণাদি প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞানীর তাহা নাই। আত্মজ্ঞানীর বাহ্যিক অবস্থা প্রায় উন্মাদের সহিত সমান। কখন তাঁহারা বস্ত্র পরিধান করেন, কখন তাহাও খসিয়া যায়। আত্মজ্ঞানী এই কলেবরকে পরিচ্ছদভাবে আত্মাকে স্বরূপ বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে দাস, জ্ঞানকে মন্ত্রী, অস্থিমাংসাদিকে গৃহ এবং চর্ম্মকে পরিচ্ছদ ভাবেন। এই বেশই অবধূত-বেশ। ইহাঁদের পরিচয় পাওয়া অতি দুর্লভ হইয়া উঠে। ইহাঁরা সর্ব্বদাই জগতের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাকেন।

শিঃ। বানপ্রস্থের চিহ্ন কি ?

গুঃ। গৃহস্থের চিহ্ন সকলেই জানেন। বানপ্রস্থের চিহ্ন এই যে ;— শিষ্যোপযুক্ত বেশ, মুণ্ডিত শির, হস্তে পুস্তক প্রভৃতি, এই সমস্ত চিহ্নধারীকেই বানপ্রস্থাশ্রমী কহা যায়। বানপ্রস্থগণ ভিক্ষা করিয়া গুরুর ভরণ পোষণ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থের চিহ্ন দেখিলেই লোকে বুঝিবে যে এই ব্যক্তি বিদ্যার্থী, অতএব ইহাকে ভিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিঃ। সন্ন্যাসীর চিহ্ন কিরূপ ?

গুঃ। সন্ন্যাসী হইলে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে হয়, ডোর কৌপীন ধারণ করিতে হয়; ত্রিশূল, কমণ্ডলু হস্তে রাখিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে হয়, দেহের কোন অংশ ছেদন করিতে নাই। ত্রিশূলের ভাব "জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক" সন্ন্যাসী এই চিহ্ন রাখিয়া কোথাও যাইলে লোকে বুঝিবে যে এই ব্যক্তি জ্ঞানের চেষ্টায় বেড়াইতেছে, ইহার জীবনধারণোপায় রূপ কিঞ্চিৎ আহারীয় কমণ্ডলুতে দেওয়া উচিত। অধুনা কলি-প্রভাবে সন্ন্যাসীর প্রধান ভাব দূরীভূত হইয়া ভীষণ কপটতা উপস্থিত হইয়াছে।

শিঃ। পরমহংস কাহাকে কহে ?

গুঃ। পরমহংস পদকে আবৃত্তি করিতে হইলে ;—(পরম+হংস) এই দুই পদ লাভ হয়। পরম বলিতে পর অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বরকে পরিমাণ করিতে পারে, তাহাই পরমহংস শব্দের প্রকৃত বুৎপত্তি। বেদান্তে অনেক স্থলে প্রকাশিত আছে (অহং+স) এই পদদ্বয়ের সংযোগে ও বিয়োগে হংস এই শব্দ প্রকাশ হইয়াছে। হংস বলিতে অহং ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন, তাঁহাদেরই পরমহংস কহে।

শিঃ। সংসারী কাহাকে বলে ?

গুঃ। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত রহিত ও মায়া বিভূতিতে মগ্ন হইয়া থাকে, তাঁহাদের গৃহস্থ বা সংসারী কহে। সংসারী কার্য্যপর। বাসনা কার্য্যপর হইয়া কর্ম্মভূমিতে পরিশুদ্ধি বা অপরিশুদ্ধিমতে গতি লাভ করিয়া এই ত্রিলোকের মধ্যেই থাকে। ইহাই নির্ম্মুক্ত জীবাবস্থা।

শিঃ। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কিরূপ ?

গুঃ। যাঁহারা পুত্রাদি উৎপাদন না করিয়া সংসারের সমস্ত আসক্তি ছেদ করিয়া কেবল পরমেশ্বরে মিলিত হইবার জন্য যোগাচারাদি ব্রত ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী কহে।

সেই যে আদিদেব স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিবার কারণ কৌমার স্বর্গে থাকিয়া ব্রহ্মারূপে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া ছিলেন। যাহাতে ঈশ্বরানুভব সাধন দ্বারা সমদৃষ্টি নামে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য কহে।

শিঃ। কৌমার স্বর্গ কাহাকে বলে?

গুঃ। কুমার স্বর্গ, মানব স্বর্গ প্রভৃতি অনেক স্বর্গ আছে। যথায় ... কুমারাদি তপস্যা করিয়া সমদৃষ্টি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মে মিলিত হইয়া ছিলেন, তাহাকে কৌমার স্বর্গ কহে।

শিঃ। তপ কাহাকে বলে?

গুঃ। ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া রিপুর অধীনত্ব হইতে বাসনাকে উদ্ধার করণের নাম তপ। উহাতে কায়িক পরিশ্রমের ক্রিয়া হইল। কৃষক যেমন ধান্য লাভের উদ্দেশে অতি কষ্টে ভূমি কর্ষণ করিয়া যদি তাহাতে বীজ বপন না করে, তাহা হইলে কোন ক্রমেই ধান্যলাভ হয় না, কেবল বৃথা শ্রম হয়। তেমনি বাসনাকে ইন্দ্রিয়াতীত করিতে সাধক, বহুকষ্ট স্বীকার করিয়াও যদ্যপি ঈশ্বর বীজ তাহাতে রোপণ না করিল, তত্ত্বজ্ঞানের সাধনা যদি সেই তপস্যায় না করিল, তবে বৃথাই তাহার শ্রম হইল বুঝিতে হইবে। অতএব কি বাহ্যিক, কি মানসিক এই উভয় কর্ম্মেই যেন সেই ঈশ্বর বীজ রোপিত হয়, তাহা হইলে অন্তে ও বর্ত্তমানে শুভফল হইবার সম্ভাবনা।

শিঃ। তপস্যা কাহাকে বলে?

গুঃ। তপস্যা দুই প্রকার আন্তরিক ও বাহ্যিক। কোন একটী বাসনা করিয়া সেই বাসনাতে লিপ্ত হইয়া তাহার উদ্দেশ্য আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য চিত্ত ও বুদ্ধির সন্মিলনকে আন্তরিক তপস্যা কহে। এই আন্তরিক তপস্যা হইতে উপায় প্রকাশ হয়। সেই উপায়ই আনন্দ বলিয়া শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। উহা কেবল শুদ্ধাত্মায় হইয়া থাকে। কলুষিতাত্মাতে আনন্দময় হইবার জন্য প্রথমে বাহ্যিক তপস্যা করিতে হয়। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করণান্তর বুদ্ধি ও চিত্ত সন্মিলনকে বাহ্যিক তপস্যা কহে। সাধক এই তপস্যায় শুদ্ধ হইয়া পরে আন্তরিক তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন।

শিঃ। তপস্যা কোন ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন?

গুঃ। আত্মা নারায়ণ নামে নরশরীর ধারণ করিয়া তপস্যার প্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে উপায়ে প্রবৃত্তি ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া নিবৃত্তি ধর্ম্মকে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপঃ করত বিশ্বাস আহরণ করিয়া বীজমন্ত্র ধারণা করা যায়, তাহাকে তপস্যা কহে। এই নিয়ম নরনারায়ণের পূর্ব্বে জগতে

প্রকাশ ছিল না। নরনারায়ণই ঐ আত্মজ্ঞানের উপায় প্রকাশ করেন।

শিঃ। ধর্ম্মকে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ বলিলেন কেন?

গুঃ। ভার্য্যা যেমন সংসারীর পক্ষে আত্মার অর্দ্ধাংশ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে, তদ্রূপ তপস্যার কারণ ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপে লইতে হয়। আনন্দ, সুভাষ, মৈথুন সমস্তই তপস্বীরা ধর্ম্মের সহিত করেন। জ্ঞান-সন্দর্শনই তাঁহাদের আনন্দ। ঈশ্বর-সম্মিলনোপায় করাই তাঁহাদের সুভাষ। আর কর্ম্ম ও প্রেম সংযোগে যে আত্মা-সন্দর্শন সুখ হয়, তাহাই তাঁহাদের মৈথুন। এই কারণে তপস্বিগণের ধর্ম্মই স্ত্রী।

শিঃ। সাধনা কাহাকে বলে?

গুঃ। সাধনার দ্বারাই সৎবুদ্ধি লাভ হয়। ঐ বুদ্ধিও সেই সাধনপথ দ্বারাই কর্ম্মজগতে পতিত হয়েন। সাধনার সহযোগেহ মনোরাজ্যগত বুদ্ধি জীবের আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কোন কোন তত্ত্বের ভাব জীবের উদয় হয়।

সাধনা তিন প্রকার। নির্ব্বিকল্পক, সবিকল্পক ও নিত্য। মানব জীবনের পরিণত অবস্থাকে উন্নত করিতে পূর্ব্বোক্ত সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। মনোরাজ্য যে প্রাকৃতিক নিয়মে জীবে ক্রিয়মাণ হইয়া আপনাপন অদৃষ্ট অর্থাৎ যোনিজাত জীব স্বভাব প্রদান করে, তাহাকেই নিত্য সাধনা কহে। ঐ সাধনা হইতে জীবেতে কি মানসিক কি ভৌতিক উভয়বিধ ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ সাধনা হইতে জীবে আপনিই বাসনামতে কর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবে জীবনকে পরিণত করিয়া থাকে।

মানবে আপন আপন জীবনের দুঃখ দূর করিবার জন্য দুঃখ সুখ বিধানকর্ত্তা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। সেই প্রার্থনার যে অনুশোচনা উদয় হয়, তাহাতেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই সত্ত্বগুণের আকর্ষণে ঈশ্বরজ্ঞান ঐ সাত্ত্বিক সাধকগণে প্রাপ্ত হয়। এবং ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিয়া ইন্দ্রিয় ও রিপুবশে যত কষ্ট হইতেছিল, তাহাদের বিনাশ করত ঈশ্বরময় হইয়া থাকে।

শিঃ। সমাধি কিরূপ?

গুঃ। ইন্দ্রিয়গণকে নিশ্চেষ্ট করিয়া বাসনাকে উদ্দেশ পূর্ণ করিয়া অন্তর-

মানসে অবস্থানের নাম সমাধি। নিদ্রাবস্থায় নিশ্চেষ্ট ইন্দ্রিয় হইলে কেবল মনোময় শরীর স্বপ্নে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রিয়াপর থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির সহিত কোন সংযোগ থাকে না। এমন কি চক্ষু বাহ্যদৃষ্টি দেখিতে পায় না। কর্ণ সেই অবস্থায় বাহ্য শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না। হস্ত কোন বস্তু গ্রহণ করিতে প্রসারিত হয় না। পদ কোথাও গমন করিতে পারে না। অথচ স্বপ্নদৃষ্ট ক্ষমতার ভাবে বাসনা আপনিই যেন কি গ্রহণ করিতেছেন, কি দেখিতেছেন, কোথাও গমন করিতেছেন, কাহারো সহিত কথা কহিতেছেন। সেই যে অন্তর চৈতন্যময় অবস্থা, তাহা যখন জাগ্রত অবস্থায় সাধকের উপস্থিত হইবে, তখনি সাধক সমাধি লাভ করিয়া অঙ্গযোগের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। এই সমাধি অবস্থা ভক্তির সাধনাতেও উপস্থিত হইতে পারে এবং ভক্তি সংযুক্ত যোগ সাধনাতেও উপস্থিত হইতে পারে। কোন একটী উদ্দেশ্য না থাকিলে কোন ক্রমেই ইন্দ্রিয়কে নিশ্চেষ্ট করা যায় না। সেই জন্য ধ্যানের প্রয়োজন। নিগূঢ় চিন্তায় বাসনাকে মনের সহিত একত্রিত করণের নাম ধ্যান। ধ্যানে যে চিন্তার আবশ্যক, তাহার উদ্দেশ্য স্বরূপ সাধক কেবল মাত্র ব্রহ্মবিচার বা ব্রহ্ম ভাবনা করিলে সমাধি বলে সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন এবং তাহাতে আপনি সেই ঈশ্বরের বস্তু, ইহা বুঝিয়া ঈশ্বরে মিলিতও হইতে পারেন; অধিকন্তু তাহা হইতে ব্রহ্মতত্ত্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ সহজেই করিতে পারেন। শ্রেষ্ঠ সাধকেরা ঈশ্বরকে আপনাপন সমাধি বলে জানিয়াছেন যে, তিনি "সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বাধার ও সর্ব্বব্যাপ্ত"। সেইরূপ মুখে প্রকাশ হয় না, অর্থে প্রকাশ হয় না, ভাবে বা ইঙ্গিতে প্রকাশ হয় না, কেবল মনোভাবে প্রকাশ হয়। সমপাঠী বা সমসাধক না হইলে মনোভাব অবগত হইতে পারা দুর্লভ। ব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্ত্তির ধ্যানে, মূর্ত্তির গূঢ়ভাব সকল যখন জ্ঞানে তন্ময় হইয়া উঠে, তখনি সাধক ঈশ্বর সন্দর্শন করিতে পারেন। শ্রেষ্ঠ সাধকগণের রুচির অনুযায়িক ঈশ্বরের কল্পনা প্রকাশ হওয়াতে তিনি নানারূপে কল্পিত হইয়াছেন। ঐ ভাবে যাঁহারা সমাধিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বর দর্শন করতঃ তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইয়া অপর সকলকে সেই বস্তু দর্শাওন জন্য এবং তাহাদের প্রবৃত্তির আকর্ষণের জন্য ঈশ্বরের স্বরূপ রূপের কল্পনা মাত্র আপনাপন রুচি অনুসারে করেন, বুঝিতে হইবে।

শিঃ। সচ্চিদানন্দ কাহাকে বলে ?

গুঃ। চৈতন্য-শক্তির তিনটী উপশক্তি আছে। একটীকে সং কহে। এই সংশব্দে জীবিতভাব। ইহাই জীবাত্মা নামে পরে অবিহিত হয়েন। চৈতন্যের দ্বিতীয় উপশক্তির নাম চিৎ; এই চিদ্দ্বারা একটী এমন চৈতন্যের প্রকাশ হয়, যাহার স্থূলাংশকে জ্ঞান কহে, সূক্ষ্মাংশকে বিজ্ঞান কহে। ঐ জ্ঞান হইতেই ঈশ্বরের তত্ব সমস্ত আপনি সং অর্থাৎ জীব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্থানে জীব বলিতে সজীব প্রকৃতি। চৈতন্যের তৃতীয় উপশক্তির নাম আনন্দ। এই আনন্দই ঈশ্বরের স্বরূপভাব অর্থাৎ পরমাত্মা।

শিঃ। কোন ব্যক্তি যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন ?

গুঃ। মহাত্মা পতঞ্জলি বেদাদি হইতে উদ্ধার করিয়া ও আত্মানুভবে উন্মত্ত হইয়া জগতে প্রথমে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। চিত্তের বাহ্যবিষয় পর বৃত্তিকে নিরোধ করা অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গানুসারী হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য।

শিঃ। কি রূপ উপাসনার নিয়মে যোগসিদ্ধি সহজেই হয় ?

গুঃ। ঈশ্বরকে সাকার ভাবে ধারণা করিয়া তাঁহাকে নিদিধ্যাসন দ্বারা নিরাকার ধারণা করিতে পারিলে সহজেই যোগসিদ্ধি হয়।

শিঃ। ভক্তিযোগ কাহাকে বলে ?

গুঃ। এ স্থলে ভক্তি ও যোগ = ভক্তিযোগ। যোগ বলিতে জ্ঞানযোগ অর্থাৎ তত্ত্ববিচার সিদ্ধান্ত। আর ভক্তি বলিতে তত্বাতীত বস্তুর সত্বার প্রতি বাসনার আকর্ষণ শক্তি।

শিঃ। ভক্তি কয় প্রকার ?

গুঃ। অহঙ্কার সত্বাভেদে ভক্তি ত্রিবিধ গুণপন্না। অহঙ্কার জাত সাত্বিকী অংশ হইতে যে ভক্তি প্রকাশ হয়, তাহাকে সাত্বিকী ভক্তি কহে। ঐরূপে রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির উৎপত্তি। সাত্বিকী ভক্তির দ্বারা জীবের ভোগেচ্ছা থাকে না। রাজসিকী ভক্তির দ্বারা জীবের ভোগেচ্ছা হয়। এই ভক্তির দ্বারা জীবে ঐশিক প্রভাবকে হৃদয়ে সাক্ষী করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া দেয়। আর তামসিকী ভক্তির দ্বারা মায়াবন্ধের সহিত মুগ্ধ ভোগেচ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে। ভক্তিই সংসার পক্ষে মহিলা স্বরূপ হইতেছে। পুরুষের অনুরাগ যেমন স্ত্রীর দ্বারা আকর্ষিত হয়

এবং স্ত্রীর অনুরাগও যেমন পুরুষের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া মায়ার কার্য্যরূপী সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ ত্রিবিধ ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের ভাব জীবপক্ষে আকর্ষিত হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও ঐ ভক্তির সত্ত্বার সহ-যোগে ও নিজ অনুরাগ সংযোগে এই সংসার কার্য্য করিয়া থাকেন।

শিঃ। ভক্তিতে কি সত্যভাব উদয় হয়?

গুঃ। ব্রহ্মা তপস্যায় ভক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবানের সত্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার আর একটী বিশেষ ভাব এই যে:—ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের বিকারভাব। জীবও ব্রহ্মের বিকার ভাব। ব্রহ্ম নিত্য ও সত্য-স্বরূপ নির্গুণ ভাব। ব্রহ্মারূপী সগুণ ভাব নিজ স্বরূপরূপী নির্গুণ ভাব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। সগুণ হইতে নির্গুণভাবে যাইতে হইলে যে সাধনের প্রয়ো-জন, তাহাই ভক্তি। ব্রহ্মা জগতের সকল জীবের কারণভাব। তাঁহার স্বভাবই নিগুণভাবে লীন থাকে। কারণ নির্গুণ হইতে সগুণের প্রকাশ। অতএব ভক্তিতেই সত্যভাব হৃদয়ে উদয় যথার্থ।

শিঃ। ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ?

গুঃ। ইন্দ্রিয় দমন ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়াই পূর্ণ জ্ঞানানন্দের লক্ষণ। তুমি যে উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা কে দিতে পারে? কাহারো অন্তর হইতে তাহা প্রকাশ হইবার নয়। তাহা প্রতি মানবের হৃদয়ে আপনিই দীপ্ত আছে; উপযুক্ত উপকরণ পাইলেহ প্রকাশ হইবে। অগ্রে বাহ্যিক মায়া ত্যাগ কর; কামনাকে জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর; তাহা হইলে তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমারি অন্তঃকরণ তোমাকে তাহাই দেখাইয়া দিবে।

শিঃ। কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী?

গুঃ। মুনিগণই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। যাঁহাদের আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বাসনা প্রশান্ত হইয়াছে, তাঁহারাই মুনিপদে বাচ্য।

শিঃ। প্রশান্ত অবস্থা কিরূপ?

গুঃ। আত্মা বলিতে চৈতন্যপর দেহ। চৈতন্যপর দেহ বলিতে মনাদি। মনাদি বিষয় পর স্বভাব হইতে নিরস্ত হইলে জ্ঞানপথের পথিক হইয়া থাকে। ঐ বিষয়পর ভেতই রিপু। চৈতন্যময় দেহ যখন রিপুর অধিকার হইতে স্বাধীন

হয়, তখনই আত্মার প্রসন্নতা কহা যায়। এই প্রশান্ত অবস্থায় জীবে পরমা-নন্দ উপভোগ করে। ঐ আত্মা প্রশান্ত করিবার উপায় কি? ইন্দ্রিয়ের শান্তি। জ্ঞানপথের প্রবাহিকা শক্তিরূপী জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি, এবং বিষয় পথের প্রবাহিকা শক্তিরূপী কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি যখন বিষয়পর স্বভাব অর্থাৎ রিপু হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে চৈতন্যময় দেহ প্রাপ্ত হয়।

শিঃ। ইন্দ্রিয়াদি শান্ত কি উপায়ে হয়?

গুঃ। বিষয় বাসনা বিনাশ। বাসনা জীবের স্বভাব, সেই স্বভাব যখন বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হয়, তখন যে ভাবে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহাকে বাসনার বিষয়াকর্ষণ কহে। যখন সেই বাসনা মুগ্ধ না হইয়া বিষয়কে তত্ত্ব দ্বারা বোধ করিতে থাকে, তখনই তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে।

স্বভাবকে বিষয়পর হইতে আকর্ষণ করিতে হইলে জ্ঞান বারি সিঞ্চন করিতে হয়। যখন কিঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তখন আপনিই স্বভাব বিষয়াকর্ষণ হইতে জ্ঞানে মিলিত হইয়া থাকে। ইহাকেই রিপুর বিনাশ কহে।

শিঃ। বাসনার পবিত্রতা কিরূপ?

গুঃ। কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত। মানসিক ও বাহিক। তপ, যোগ, মন্ত্রাদি সাধনকে মানসিক কর্ম্ম কহে। দান, আচার, প্রভৃতিকে বাহিক কর্ম্ম কহে। এই উভয় কর্ম্মেই বাসনার পবিত্রতা হইয়া থাকে। বাসনার পবিত্রতা হইলে কি ইহলোকে কি পরলোকে, উভয় লোকে শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। কি ঐ যে সকল কর্ম্মের কথা বলা হইল, উহারা যদি ঈশ্বর-ভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে বিফল হয়। কারণ ঈশ্বর ভাবই তত্ত্ব-জ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানই চৈতন্যের সখা। চৈতন্য যদি কোন কর্ম্মে লাভ না হইল, তাহাতে তবে আর বাসনার পবিত্রতা হইল না। বাসনাই যখন জন্ম জন্মা-ন্তরের শুভাশুভ দাত্রী, তখন তাহার পবিত্রতা না হইলে কখনই শুভ ফল লাভ হইতে পারে না। অতএব কায়মনে সেই বাসনাকে ঈশ্বরে সংযোজন করিতে হইলে কি কর্ম্ম, কি উপাসনা, কি জ্ঞান, সকল ভাবেই ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। নতুবা সকল বিফল হইয়া যায়।

– শিঃ। জ্ঞানশিক্ষা কিরূপে হইবে, যাহাতে অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় ?

গুঃ। বিজ্ঞানমতে জ্ঞান পরের দ্বারা শিক্ষা হয় না। পরে উপায় শিক্ষাইতে পারে ; কিন্তু সেই উপায়ের অনুসরণ করিয়া আপনাকে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়।

শিঃ। জ্ঞানশিক্ষার উপায় অনুসরণ করিয়া কিরূপে জ্ঞান আহরণ করিতে হয় ?

গুঃ। জ্ঞান শব্দের অর্থ—জানিবার ক্ষমতা। ঈশ্বর বাসনার নিয়মানুসারে এই জীবদেহ প্রদান করিবার কালে ইহাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করেন। অনুভব শক্তিই জ্ঞানের ক্রিয়া-প্রকাশক। চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ তাহার ক্রিয়া করিয়া থাকে। যেমন একটী বীজের মধ্যে বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ ও সর্ব্ব ক্রিয়া অস্ফুট ভাবে অবস্থান করে, পরে অঙ্কুরে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শিশুর দেহে জ্ঞানাদিও অস্ফুট ভাবে থাকে। সে জ্ঞান পরিচালনা না করিলে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় না। আত্মজ্ঞান উপস্থিত না হইলে জ্ঞানের ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। যেমন মেঘ দূরীভূত হইলে আকাশে সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে বশীভূত করিতে সমাধি বা যোগের প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং সমাধি বা যোগ করণের পূর্ব্বে হৃদয়ে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম স্থাপন করিবার কারণ সাধককে সূক্ষ্মদর্শী, নিষ্কলুষিতমনা, সত্যধর্ম্মরত সর্ব্বদাই ধৃতব্রত হইতে হয়।

শিঃ। আত্মজ্ঞানী ভিন্ন ঈশ্বরের স্বরূপ কি কেহ বুঝিতে পারে না ?

গুঃ। যেমন জ্যোতির্ব্বিৎ ভিন্ন সৌরচক্রের ভাব প্রকাশ করণ দুরূহ হয়, তেমনি আত্মজ্ঞানী ভিন্ন ঈশ্বরানুভব করিতে পারে না। আত্মজ্ঞানী না হইলে হৃদয় স্থির হয় না। হৃদয় স্থির না হইলে ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না। ধারণায় অক্ষম হইলে ভিন্ন দৃষ্টি অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপানুভব করিতে পারা যায় না। স্বরূপ প্রাপ্ত না হইলে মতি ক্ষুব্ধ হইয়া বাতাহত নৌকার ন্যায় চঞ্চল ভাব ধারণ করে। অতএব আত্মজ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, নিবৃত্তি ইচ্ছা ভিন্নও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।

শিঃ। তাহা হইলে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম অর্থাৎ সংসার ধর্ম্ম তো অতিশয় নিন্দনীয় ?

গুঃ। প্রবৃত্তি ধর্ম্ম একেবারেই নিন্দনীয় নহে, ইহাতে সংসারিগণ, যে

ভাবে পুণ্য সঞ্চয়ে জীবাত্মার উন্নতি ও পাপে তাহার অধোগতি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিবে। অর্থাৎ পাপে জীবাত্মা কুকামনায় মণ্ডিত হইয়া অধোগতি লাভ করে, কারণ কামনাতেই জীবের দেহ ধারণ হইয়া থাকে। পুণ্যে জীবাত্মা সত্বগুণে থাকিয়া উত্তম ফললাভ করে। প্রবৃত্তি অর্থাৎ সংসার ধর্মের উন্নতিযুক্ত যে উপদেশ আছে, তাহাতে ভক্তি স্থির হয় মাত্র, মুক্তিলাভ হয় না।

শিঃ। সংসারী জীবকে সুখভোগ করিতেও দেখিতে পাওয়া যায়?

গুঃ। সংসারী জীবকে যে সুখভোগ করিতে দেখিতে পাও, তাহা অকিঞ্চিৎকর। লোক স্বধর্ম্মে থাকিলে পুণ্য দ্বারা বিষয়সুখ লাভ করিতে পারে এবং কর্ম্মফলে ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবরলোক অবধিও লাভ করিতে পারে; কিন্তু স্বধর্ম্মী তো মুক্ত হয় না। জন্ম হয়ই। জন্ম হইলেই পুনরায় পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে কালের পীড়নে দুঃখভোগ করিতে হয়। তবে যে কিছু পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্মানুসারে সুখভোগ হয়, তাহাকে বিষয়সুখ কহে, তাহা ক্ষণিকের কারণ। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমে যে সুখ, তাহা কল্পান্তস্থায়ী; ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া ঈশ্বরময় হইলে মায়ার দ্বারা আর তাহার পীড়ন হয় না। অগ্নিতপ্ত বীজের ন্যায় জ্ঞান দগ্ধ হইয়া তাহার আর মায়া দর্শন হয় না। ইহাপেক্ষা সুখ আর কোথায় আছে?

শিঃ। কিন্তু জ্ঞানী বা পাপাত্মা হইবার উপায় তো সমাজের অনুকরণীয়?

গুঃ। সে কথা সত্য, কিন্তু রতি তাহাদের নিজের। ঐ রতি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রবৃত্তি হইতে জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বজন্মে যে প্রকার প্রবৃত্তি লইয়া বাসনা ছিল, এ জন্মেও তদ্রূপ প্রবৃত্তি প্রকাশ হইবে। সেই কারণ একের রুচির সহিত অপরের মিল হয় না, কারণ রুচিও প্রবৃত্তিজাত রতি হইতে জন্মিয়া থাকে। যাহার রতি পূর্ব্বে হরিপদালিঙ্গনে আসক্ত ছিল, পরজন্মে সে কখনই সেই পাদপদ্মের মধু ভুলিতে পারে না। কারণ অমৃত তেজ মনে থাকিলে কেহ বিষ ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হয় না।

শিঃ। অমৃত কি?

গুঃ। আত্মজ্ঞানকে অমৃত কহে। মায়া ঐ অমৃত যোগিগণকে প্রদান করেন। অর্থাৎ যোগীর বুদ্ধি যখন জ্ঞানপথ দ্বারা সহস্রদল কমলে অর্থাৎ ব্রহ্মতালুতে গমন করিবে, তখন যোগী সিদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করত সেই কমলগলিত

অমৃত পান করিতে পারিবে। সেই সুধা অর্থাৎ অমৃত পান করিলে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া মুক্ত হইতে পারা যায়। সেই অমৃত পানে উন্মত্ত হইলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভ হইবে। ইহার মর্ম্মার্থটী এই যে, যখন যোগী আত্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত যোগসাধনা আরম্ভ করেন, তখন ইন্দ্রিয় ও রিপুবর্গ উভয়ে একত্র হইয়া, যথায় মনকে নিরোধ করিবার কারণ হৃদয়ে সাধনা হইতেছে, তথায় গমন করে। ইন্দ্রিয় ও রিপুবর্গ একত্র মিলিলে ভক্তি স্থির হইয়া বিশ্বাসে আবদ্ধ করত হৃদয়স্থ সাধনা আরম্ভ করে। মন হৃদয়ে আবদ্ধ হইলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞানই অমৃত। সেই অমৃতবলে বিশ্বাসের নিম্নে কি দেখা যায়ঃ—না—ঈশ্বরানুভবকারী বিজ্ঞান অর্থাৎ যে মায়াতে ঈশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া আবার জগৎকে আপনাতে লয় করিতেছেন।

শিঃ। এরূপ অমৃতপান পরিত্যাগ করিয়া কেন জীবে ঈশ্বরদ্রোহী হয়?

গুঃ। রিপুপরবশে বশীভূত মনকে অজ্ঞান বা অবোধ কহে। অজ্ঞানেতেই ধনগর্ব্বে লোকে গর্ব্বিত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া, আমি, তুমি, এই অহঙ্কার করিয়া ঈশ্বরদ্রোহী হইয়া থাকে।

শিঃ। কিরূপ জ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞানকে বিনাশ করা যায়?

গুঃ। এক বিংশতি তত্ত্ব বুঝিলে অজ্ঞান বিনাশে জ্ঞানের উদয় হয়। সাংখ্য মতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কিন্তু প্রধান এক বিংশতি হয়—(মহত্তত্ত্ব, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, আর পঞ্চ শব্দাদি তন্মাত্রা)।

শিঃ। ক্ষীরোদ মন্থনকালে যে অমৃত লাভ হয়, সে অমৃত কি?

গুঃ। ক্ষীরোদ শব্দ সংসারের রূপক; মন্দর পর্ব্বত বিশ্বাসের রূপক। অনন্ত সাধনার রূপক; সুরাসুর ইন্দ্রিয় ও রিপুবর্গের রূপক; মহাদেব কাল-শক্তির রূপক। কমঠ রূপ ঈশ্বরের স্বরূপ ও ক্রিয়াযুক্ত রূপক। বিষ্ণু ইন্দ্রিয়ও রিপুবর্গ দ্বারা প্রাণীর দেহ পালন করেন। প্রাণীগণ রিপু ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া এই দেহ রক্ষা করে। রিপুগণ দ্বারা দুঃখানুভব ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সুখানুভব হইয়া থাকে। সেই রিপুগণকে বিনাশ করিবার কারণ ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করে। ঐ মায়ারূপী ক্ষীরোদের তীরে যাইয়া সাধনাবলে বিশ্বাস দণ্ড দ্বারা মায়াকে মন্থন করিলে অবিদ্যা নষ্ট হইয়া বিদ্যার প্রকাশ হয়। সেই বিদ্যাশক্তিই ক্ষীরোদমন্থনের অমৃত।

শিঃ। তাহা হইলে মোহিনী মূর্ত্তি কি?

গুঃ। সেই অমৃত বা বিদ্যাশক্তি বলে ইন্দ্রিয়গণ কি দেখিলেন—না,—রিপুগণ ঐ জ্ঞানামৃত লাভ করিলে তাহারা ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিবে। কারণ রিপুবান্ যদি আত্মজ্ঞান শিক্ষা করে, তাহা হইলে মানবের বিশ্বাস নাশ হয়, আর সে নাস্তিক হয়; এই কারণে বিষ্ণু অর্থাৎ পালনশক্তি, মোহিনী মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইলেন। অর্থাৎ বিদ্যাশক্তি লাভে রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ প্রথমে ঈশ্বর কি ভাবে এই জগৎ পালন করিতেছেন, তাহা অনুভব করিল। তাহাতে রিপুগণ মোহিত হইয়া পড়িল, আর ধারণা করিতে পারিল না। সেই পালন শক্তি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাদের আত্মজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক ঈশ্বরানুভব করাইয়া মুক্তিপথে প্রকাশ করিলেন। তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ অমরভাব ধারণ করিল অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ অবস্থিত বলিয়া বোধ করিল।

শিঃ। মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহাদেব মোহিত হইয়াছিলেন কেন?

গুঃ। মহাদেব যিনি তিনিই কাল। কালশক্তি ঈশ্বরের পালনশক্তির মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়া ছিলেন; অর্থাৎ কালশক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ পালনের ক্ষমতাদর্শনে মুগ্ধ হয়েন; অর্থাৎ তিনিও সত্ত্বগুণময় হইতে চেষ্টা করেন; ইহা স্বভাবের নিয়ম। মহাদেব যে বিম্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে অজ্ঞান কহে। কালই অজ্ঞানদাতা। কাল হইতেই অজ্ঞানের প্রকাশ। মায়ারূপের বাহ্যজ্ঞানকে অজ্ঞান কহে; কালই তাহার প্রকাশক।

শিঃ। মায়াতত্ত্ব প্রকাশ করেন কে?

গুঃ। যে শাস্ত্রে কালশক্তির ক্ষমতা না মানিয়া সমস্তই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই তত্ত্ব প্রকাশিত আছে, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্র কহে। বৈদিকেরা কালশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি উভয় সম্মিলনে ব্রহ্ম মায়া দ্বারা জগৎ প্রস্তুত হইতেছে বলেন। কিন্তু কপিলদেব অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া বিজ্ঞানদৃষ্টি লাভপূর্ব্বক বৈদিকগণের নির্ব্বাচিত কালশক্তি ত্যাগ করিয়া সহজে স্বভাব হইতেই সৃষ্টি প্রকাশ প্রমাণ করিয়াছেন। এ প্রকার মায়াতত্ত্ব ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ হয় নাই। আত্মা কপিল নামে আখ্যাত হইয়া ঐ শাস্ত্রে প্রকাশ করেন বলিয়া, উঁহাকে কপিলাবতার কহে।

শিঃ। অবতার কাহাকে বলে?

গুঃ। অবতার বলিতে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ভাব হইতে লৌকিকে পরিবর্ত্তিত হওন। এই পরিবর্ত্তন বহুবিধ; তন্মধ্যে প্রাকৃতিক অবতারণ ও জীব মধ্যগত অবতারণই শ্রেষ্ঠ। সত্ত্বাদি গুণভেদে জ্ঞানাধিক্য ও জীবন্মুক্ত জন্মাদিই জীবমধ্যগত অবতারণ, আর ঈশ্বর স্বয়ং যে রূপে ক্রমে আপনিই সগুণ হইয়া আপনা হইতে বিশ্বপ্রকাশক আত্মাময় কারণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাকে তাঁহার প্রাকৃতিক অবতারণ কহে।

শিঃ। ঈশ্বর কয় ভাবে অবতার?

গুঃ। ঈশ্বর দুই ভাবে অবতার। গুণাবতার ও অবতার। গুণাবতার বলিতে জীব ও ঈশ্বররূপী হওন। গুণগত অবস্থা ও অবতারগত অবস্থা এই উভয়াত্মক অবস্থার মধ্যে গুণগত হইলেই কর্ত্তৃত্বাদি মায়াগুণ মধ্যগত ঈশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মা এবং অবতারগত বলিতে মায়ার আকর্ষণে আবির্ভাব ও তিরোভাব লীলাময় পরমাত্মা।

শিঃ। অবতার হইবার প্রয়োজন কি?

গুঃ। এই ভুবন যখন মহা ভারাক্রান্ত হয়, তখন তিনি সেই ক্ষণিক ভার নাশ করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ মহাপ্রলয় সকলের নাশকারী হয়। ভুবন শব্দে সংসার। ঈশ্বর ক্রীড়ার্থ এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সংসার যখন ক্রীড়া বস্তুতে ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আর ধরে না, তখন তিনি দেহিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কেন করেন, তাহার বিশেষ কারণ ইহা অপেক্ষা অধিক পাওয়া যায় না। সংসারে যে অংশে অধিক জন সমাগম, সেই স্থানেই পাপের ও অধর্ম্মের আধিক্য হয়। তাহা নাশ করিতে ঈশ্বর সেই সেই স্থানে প্রকাশিত হন। কারণ আত্মাই ঈশ্বর স্বরূপ। অভাব মাত্রেই চেষ্টার আবিষ্কার হয়। যখন অধর্ম্মে ও পাপে সংসার পরিপূর্ণ হয়, তখন পুণ্যের প্রয়োজন হয়। সেই অধর্ম্মীগণের কুলে যে আত্মা শরীর গ্রহণ করিয়া মায়াজাত অধর্ম্মে মণ্ডিত না হইয়া পবিত্রাবস্থায় থাকিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেন, তিনি কলুষিত না হইয়া ঈশ্বর রূপে প্রতীত হন। আত্মাই দেহ ধারণ করেন, আবার তাহা জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ যদি আত্মা হইল, তখন ঈশ্বরই মায়ারূপী দেহ ধারণ ও ত্যাগ করিতেছেন বুঝিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের শরীর গ্রহণ মিথ্যা বা কল্পনা নহে।

শিঃ। পৃথিবীতে যে সকল অসংখ্য অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা কে?

গুঃ। মনু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবগণ, মহাবলী মানবগণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই শ্রীহরির কলারূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রামাবতার প্রভৃতি যে সকল অবতার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ শ্রীহরির অংশ, অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ স্বরূপ, কেহ তাঁহার কলা অর্থাৎ ষোড়শাংশ স্বরূপ। ঈশ্বর স্বয়ং রূপকে যে সমস্ত অবতারে আরোপিত হইয়াছেন, তাহাকে অংশ কহা হইল। আর তাঁহার সূক্ষ্মাংশ আত্মাতে পরিণত হইয়া যে সমস্ত আবতারিক ক্রিয়া করেন, তাহাকে কলাবতার কহে।

শিঃ। মনু কাহাকে কহে?

গুঃ। ঈশ্বর যে স্বভাব দ্বারা মনুষ্যের স্বভাব অর্থাৎ জ্ঞানাদি, মনাদি উপযুক্ত যোনিগত করেন, সেই স্বভাবচৈতন্যকে মনু কহে। ঐ চৈতন্য প্রতি প্রলয়ের অর্থাৎ জীব ও জগতের প্রতি পরিবর্ত্তনের পরে প্রকাশ হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক স্বভাব জ্ঞানাদির উন্নতিবিধায়িনী উপদেশ আত্মাতে প্রদান করেন। প্রতি সত্যযুগ হইতে মহাপ্রলয়াবধি ঐ মনু নামক তেজ মানবশরীরের অন্তরে বিরাজ করেন। মন্বন্তর বলিতে যে স্বভাব লইয়া মানবাদি বা জীবাদি একবার লীলা করিতে করিতে প্রলয় পর্য্যন্ত সক্রিয় হয়, তাহাকে এক মনুর অন্তর অর্থাৎ স্বভাবের পরিণাম কহে।

শিঃ। রাম অবতার কি?

গুঃ। রাম জীবাত্মার রূপক। সৃষ্টির মঙ্গল কামনায় ঈশ্বর আপনি চারি অংশে জগতে অর্থাৎ ব্রহ্ম চৈতন্যময় কারণে প্রকাশ হয়েন। সীতা বিদ্যাশক্তি বা বিশুদ্ধা মায়া। এই জন্য রামকে মায়ার অধীশ্বর বলিয়া কল্পনা করা হইল। দশরথ ঐ ব্রহ্মচৈতন্যের রূপক। লক্ষ্মণাদি বর, অভয়, ক্ষেম বা জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক বুঝিতে হইবে। বনই সংসার। রাবণাদি রিপু। ঐরাবৎ অহঙ্কার। সমুদ্র সংসার। নক্র চক্রাদি শোক মোহাদি। ইহার সামান্যত গূঢ়ভাব এই যথা:— ঈশ্বর ব্রহ্মাবস্থা হইয়া সগুণ সত্ত্ব, রজো ও তমো প্রকৃতি মধ্যগত হইয়া আপন বাসনাক্রমে মায়ার সহযোগে অবিদ্যা সংসারে গমন করিয়া অদৃষ্ট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণই বিবেক এবং সীতাই বিদ্যাশক্তি বা জীবের উদ্দেশ্য

স্বভাব। রাবণাদি সংসাররূপী সাগরমধ্যে রিপুরূপে বাস করে। তাহারাই বিদ্যাকে গ্রহণ করিয়া জীবকে সুখ দুঃখের ভাগী করিয়া থাকে। বিবেক লক্ষ্মণ জীবকে সুখদুঃখাক্রান্ত দেখিয়া কামাদিরিপুরূপী রাবণের প্রাবল্য হইতে নিস্তার করিবার জন্য সংসারসাগরে ধৈর্য্যসেতু বান্ধিয়া যুদ্ধরূপী সাধনার সংযোগে হৃতা সীতা পুনরুদ্ধার করত সেই রাবণাদিকে পবিত্র করিয়া জীবন্মুক্ত ভাবে অবস্থান করেন। ভগবান্ বাল্মিকী অতি মাধুরীর সহিত এই ঈশ্বরকে সগুণে কল্পনা করত রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শিঃ। কল্কী অবতার কি?

গুঃ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে এক মহাযুগ হয়। প্রতি মহাযুগান্তে ধর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মই হরিনামোদ্দীপন করিয়া দেন এবং সকল প্রাণীকে শান্তিময় করিয়া রাখেন। সেই ধর্ম্ম প্রতি মহাযুগান্তে প্রাণীগণের হৃদয় হইতে নষ্ট হয়। ইহার কারণ এই :—জ্ঞানই ধর্ম্মের আধার। চৈতন্যই জ্ঞানের আধার। কালবশে যেমন প্রতি জীব সতেজ দেহকে ক্ষীণ হইতে দেখে, তেমনি কালবশে চৈতন্য ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহাতে চৈতন্যের শক্তি নাশ হইয়া যাওয়াতে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়। ঈশ্বর জীবাত্মার এবম্বিধ অবস্থা দেখিলে পুনরায় জীবজগতে চৈতন্য সংস্কার করেন। যদি তিনি না করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত জগতই এত দিনে জড়ময় হইয়া যাইত। ঐ চৈতন্য সংসারের সহিত পুনরায় চৈতন্য জীবে জ্ঞানধর্ম্ম বীজরূপে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাকেই কল্কীর আবির্ভাব বা ঈশ্বরের বিচার কহে।

শিঃ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী শব্দের অর্থ কি?

গুঃ। যে উপায়ে জীবনকে ভগবৎ ভক্তি প্রভৃতি শুভপথে লওয়া যায়, তাহাকে ধর্ম্ম কহে। যে উপায়ে জীবের জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে অর্থ কহে। যে উপায় দ্বারা কাম্য ও নিষ্কাম উভয়াত্মক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিগত কামনা সাধিত হয়, তাহাকে কাম কহে। যে উপায় দ্বারা জীবকে জন্ম মৃত্যু অবস্থা হইতে অতীত হইতে হয়, তাহাকে মুক্ত বা মোক্ষ কহে।

শিঃ। জগতে কয় প্রকার মুক্তি প্রচারিত আছে?

গুঃ। সদ্যমুক্তি ও ক্রমমুক্তি এই দুই প্রকার মুক্তি জগতে প্রচারিত আছে। বিষয়বাসনা হইতে বাসনাকে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় মনের সংযোগে

বিনা ভূতসঙ্গমে চৈতন্যে অবস্থানের নাম মুক্তি। যে মুক্তির উপায়ে একেবারে ঈশ্বরে লীন হওয়া যায়, তাহাকে সদ্যমুক্তি কহে। কি উপায়ে ইন্দ্রিয়, মন ও বাসনা জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া চৈতন্যের সহিত ভূতগৃহরূপ দেহত্যাগ করত ব্রহ্মচৈতন্যে মিলিত হইবে, তাহাই সদ্যমুক্তির উদ্দেশ্য। আর যাহাতে অভিষ্ট বাসনা পর্য্যন্ত লাভ হয়, তাহাকে ক্রম মুক্তি কহে। কারণ ঐ প্রকার মুক্ত অবস্থায় চৈতন্য উদ্দেশ্যমতে অবস্থান করেন। সদ্যমুক্তির উদ্দেশ্য নাই। উহাই নিরুপাধিপর ব্রহ্মেতে মিলন করাইবার উপায় স্বরূপ হইতেছে। মুক্তির আর একটী অবস্থা আছে, তাহাই ঐহিক প্রিয়ঙ্কর। তাহার নাম জীবন্মুক্তি; যোগবলে দেহ সংরক্ষণ করিয়া এই দেহতেই পরমাত্মাময় হইয়া থাকিবার নাম জীবন্মুক্তি। যতদিন কাল আপনার ক্ষমতায় ঐ প্রকার যোগীর দেহ না ক্ষয় করিতে পারেন, ততদিন উহারা আপন দেহের সহিত ইহ জগতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য এই কয়টী উপায় ক্রম মুক্তির অন্তর্গত।

মৃত্যুকালে কর্ম্মবিশেষে যোগশাস্ত্রমতে চারিপ্রকার মুক্তি নির্দ্ধারিত আছে:— সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য ও সাষ্টি।

শিঃ। সারূপ্য মুক্তি কি রূপ?

গুঃ। মৃত্যুকালে যাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞান-দৃষ্টিতে স্বরূপ দেখিয়া ব্রহ্ম পদ্ম দ্বারা জীবনকে নির্গমন করিতে দেয়; অর্থাৎ তাঁহাকে পরমাত্মারূপে অনুভব করিতে করিতে আপনার আত্মায় মিশাইয়া তাঁহার রূপে আত্মা মগ্ন হইলে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; তাহাকেই সারূপ্য মুক্তি কহে।

শিঃ। সারূপ্য মুক্তি লাভ হইলে কিরূপ দেখা যায়?

গুঃ। কারণ কারণে মিশ্রিত হইয়াছে।

শিঃ। মুক্তির সহজ উপায় আর কিছু আছে?

গুঃ। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চ মকার সাধন করিতে পারিলে পাপ কলুষিত মানব সহজেই উদ্ধার পাইবে।

শিঃ। মদ্য, মাংস, মৎস্য প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের যাহা অর্থ, তাহাতো নিতান্ত পাপকারী?

গুঃ। দ্রব্যই যে শব্দের অর্থ তাহা নহে। যে তেজঃ দ্বারা সমতন্মিত

হইয়া মানব বাহ্যবিকার শূন্য হয়, তাহাকে মৎস্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কহে। যে জ্ঞান কর্ম্মফল আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেওয়া হয়, তাহাকে মাংস জ্ঞান কহে। যে ক্ষমতা দ্বারা আপনার সমান সর্ব্বজীবে সমদর্শন লাভ হয়, তাহাকে মৎস্যজ্ঞান কহে।

শিঃ। মদ শব্দের অর্থ কি?

গুঃ। কর্ম্মজ্ঞান রহিত বুদ্ধির তন্ময় অবস্থা। এই মদ ভাবই মুক্তজনের প্রধান আরাধ্য বস্তু। এই মদ দ্বারা ঈশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়।

শিঃ। জীব কাহাকে কহে?

গুঃ। আত্মা দুইটীরূপে কল্পিত আছেন। একটী স্থূল দেহ, অপরটী সূক্ষ্ম দেহ। ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট দেহকে স্থূল দেহ কহে। ইহা মায়া দ্বারা সৃষ্ট, এই কারণে কালশক্তির পূর্ণতা হইলে বিনষ্ট হয়। আর একটী সূক্ষ্ম দেহ, তাহা অব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়াদি মায়া-গুণাধার নহে। তাহা চক্ষে কেহ দেখিতে পায় না। তাহার ক্রিয়া কেহ শুনিতে পায় না। এবং তাহা অবস্তুর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। তাহাকেই জীব কহে। তাহা অনুভবে জানা যায়, কারণ জীব না থাকিলে এই দেহের পুনর্জ্জন্মাদি হয় না। এই দেহধারী জীব যখন পূর্ব্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে যে ভাবে প্রতিসিদ্ধ হইল অর্থাৎ আত্মাতে কল্পিত হইল, ইহা জানিতে পারিবে, তখন জীবের ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ মোক্ষ সাধন হইবে। জীবের কি সাধ্য যে, এই মায়া ত্যাগ করিয়া সেই ক্রিয়া করিতে পারে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই গুণত্রয় কে ত্রিগুণ কহে। ঐশিক চৈতন্যশক্তি ত্রিগুণ দ্বারা ঈশ্বরকে সক্রিয় করেন বলিয়া তাহাকে মায়া কহে। ঐ ত্রিগুণ সম্ভোগ দ্বারাই জীবে জীবিত থাকে। সাত্ত্বিক গুণ দ্বারা জীবদেহে কর্তৃত্ব উৎপাদিত হইয়া থাকে। মনো, বুদ্ধি, চিত্তাহঙ্কার; এই চারিটীই সাত্ত্বিক গুণের কার্য্য। ঐ চারিটী সত্বে জীব কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। রাজস গুণের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ হয়, তদ্দ্বারা জীবে উপভোগ করে। ঐ উপভোগ ও কর্ত্তৃত্বাদি হইতে এক প্রকার জ্ঞানাদির নিরোধক অবস্থার প্রকাশ হয়; তাহাকে মায়া মমতাদি মোহ কহে। ঐ মোহই তমোগুণ। ঐ মোহ দ্বারা জীবে আসক্ত থাকে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করে। মননাদির দ্বারা কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে।

ঐ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব মোহাদি জনক ত্রিগুণযুক্ত মায়ার দ্বারা যে ঈশ্বরের স্বীয়াংশ আবদ্ধ থাকে, তাহাকে জীব কহে।

শিঃ। যাহা ঈশ্বরের অংশ, তাহা ঈশ্বর সমান বস্তু। কারণ হীরকের কণা হীরকের পূর্ণাংশের সহিত সমান হইতেছে। ঈশ্বরের অংশ রূপী জীবে অবিদ্যাযুক্ত মায়া সংমিলন, কিরূপে সম্ভব?

গুঃ। ঈশ্বরশক্তি মায়া রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্রহ্মপক্ষ ও জীবপক্ষ দ্বিপক্ষে আবির্ভূত থাকেন। ব্রহ্মপক্ষে তিনি ঈশ্বরকে স্বশক্তি দ্বারা সক্রিয় করেন, সেই সক্রিয় ভাব দ্বারা ব্রহ্ম সগুণ হইয়া বিরাটাদিরূপে পরিণত হয়েন। বিরাট হইতে জীবাবির্ভূত হইলে তাহাকে ঘট মধ্যগত পাইয়া মায়া আপনার অপরা অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজয়া মূর্ত্তিতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃতাদি গুণ দ্বারা আবদ্ধ করেন। এক মায়াই, ঈশ্বরকে সক্রিয় করিয়া তাঁহাকে যে অংশ মুগ্ধ করিতে না পারেন, সেই চৈতন্যমিশ্রিত অংশকে বিদ্যা শক্তি কহে। তাহার আশ্রয়ে কেবল ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মাংশে বর্ত্তমান আছেন। জীব অবিদ্যাশ্রয়ে থাকিয়া মোহাক্রান্ত হইয়া নিত্যই এই সংসার লীলায় ব্রতী হইয়া থাকে।

শিঃ। মোহ কাহাকে বলে?

গুঃ। বাসনা নিজ স্বভাবের দ্বারা পঞ্চ ভূতাত্মার সহযোগে মায়ার কার্য্য করিয়া থাকে। ঐ পঞ্চভূতাত্মার স্বভাবেই বাসনা কলুষিত হইয়া থাকে। শরীরগত ঐ পঞ্চাত্মাই ভ্রমে লইয়া যায়। পরস্পরে পরস্পরের আকর্ষণ সহ্য করিতে উহারা সক্ষম হয় না। তেজাত্মার আধিক্যে অপর কয় আত্মা উৎপীড়িত হইয়া স্নিগ্ধতার আশ্রয় লইতে যায়। শীতলতার আধিক্যে অপর সকলে তেজের আশ্রয় লইতে যায়। এইরূপ পরস্পর বিরোধে শরীরের বিলাস ও স্নেহ হইয়া উঠে। ঐ বিলাস ও স্নেহের সংযোগই মোহ। দেহের মোহ প্রতি জীবের স্বভাব। উহাতেই লোকে বদ্ধ হয়। ঐ মোহে কেবল ভূতাত্মার সেবাই হইয়া থাকে। মোহেই মায়া বা প্রবৃত্তি আকর্ষিত হয়। মোহে লোকে আপনার দেহ অগ্রে, পরে আপনার পুত্রাদিকে রক্ষা করে। কিন্তু নির্ম্মম ব্যক্তি জ্ঞানাধিক্যে এতদূর ভূতাত্মা হইতে স্বাধীন হয় যে, আত্মজীবনের সহিত আপামরসাধারণকে রক্ষা করে। পঞ্চ ভূতাত্মা একা চিত্তের অধীন হইলেই এক হইয়া সত্ত্বগুণী হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় মোহের নাশ হয়। ঐ

মোহ নাশই অকপটতার প্রধান সাধন। ঐ মোহই দেবমায়া। আপনার দেহ হইতে ঐ মমতা নাশ করিতে পারিলে সকল বস্তুতে নির্ম্মম হওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও মানব জীবনের কর্ত্তব্য সাধন অবস্থা বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ যখন ঈশ্বরে স্থির বিশ্বাস ও মোহের বশ্যতা নাশ হইবে তখন জীবে পরিত্রাণের উপযুক্ত হইবে।

শিঃ। জীব কেনই বা মায়া ত্যাগ করিতে পারে না?

গুঃ। এই শরীর মায়াতে নির্ম্মিত ও মায়া দ্বারা পুষ্ট। যেমন কোন একটী জীব, উচ্চ বা নিম্ন জীবের সহবাসে থাকিলে, তাহার স্বভাবাপন্ন হয়; তদ্রূপ এই মায়ার সহবাসে স্থিত জীব কি প্রকারে মায়া ত্যাগ করিবে?

শিঃ। জীব যদি মায়া ত্যাগ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের মোক্ষ সাধন কি প্রকারে হইবে?

গুঃ। এই মায়ার দুই নাম, বিদ্যা আর অবিদ্যা। এই মায়াদেবী যে ক্ষমতা বলে সংসার সৃজন করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করেন, তাহাকে অবিদ্যা কহে এবং যে ক্ষমতায় ব্রহ্মের সহিত মিলন করান, তাহাকে বিদ্যা কহে। যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হইয়া রত্নান্বেষণ পূর্ব্বক রত্ন আহরণ করে, আর কোন ব্যক্তি তাহার লবণাক্ত বারি আস্বাদন করিয়া তরঙ্গে জীবন প্রদান করে; তদ্রূপ জীবে ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যা স্বভাবাপন্ন মায়াতে পুষ্ট হইয়া যদি মায়াস্থিত বিদ্যা স্বভাবের অনুকরণ করে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা মহা জ্ঞানোদয় হয়। যেমন কাচে যদ্যপি পারদ না লগ্ন করা যায়, তাহাতে তাহার স্বচ্ছ গুণে কেবল মূর্ত্তির অনুভব হয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে পারদ প্রদান করিলে স্পষ্টভাবে মূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে; তদ্রূপ এই জীবদেহ হইতেই পরমানন্দময় তুরীয় অবস্থায় পৌঁছাইবার সমস্ত বস্তুই আছে; কেবল অবিদ্যা স্বভাবে চিত্তের ভ্রম হয়, ভ্রমে মিথ্যাকে সত্যজ্ঞান করিয়া প্রবঞ্চনা শিক্ষা করা যায়। সেই অবিদ্যাতেই এই জগতের সুখ ও দুঃখ ভোগ করা যায়। এমন বেশধারিণী অবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়া বিদ্যার আশ্রয় লইলেই, সেই জ্ঞান ক্ষমতা বলে সর্ব্বজ্ঞতা ও পরমানন্দত্ব জীবে ভোগ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মময় বোধ করে।

শিঃ। জীব যখন ঈশ্বরের চৈতন্য, তখন জীবে ও ঈশ্বরে প্রভেদ কি?

গুঃ। সূক্ষ্ম শরীরকে যে জীব কহে, তাহার বিশেষ বিবরণ এই যথা:—

সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর কহে; তাহাই জীব। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি ও মন ইহারাই সপ্তদশ অবয়ব। ইন্দ্রিয় বলিতে প্রকাশ্য হস্ত পদ বা নয়নাদি নহে। মায়ার স্বভাবাপন্ন হইয়া জীবকে জন্মাদি কার্য্য করিতে হয়; ঈশ্বরকে তাহা করিতে হয় না। জীব ইন্দ্রিয়াদিতে লিপ্ত হইয়া তাহাদের বশীভূত হয়েন; ঈশ্বর তাহাতে লিপ্ত হয়েন না। জীব যেমন ভূতে অবস্থান করে, ঈশ্বরও ভূত মধ্যে অবস্থান করেন, কিন্তু মায়াতে আবদ্ধ নহেন; কারণ মায়া তাহারই সাহায্যে ক্রিয়া করিতেছে। যেমন সূর্য্য না প্রকাশ থাকিলে কিরণের কার্য্য হয় না; তদ্রূপ ঈশ্বর অবস্থিত না হইলে, মায়া কার্য্য করিতে পারে না। যেমন নাসিকা নানা গন্ধ আঘ্রাণ লইতেছে, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত নহে, তদ্রূপ ঈশ্বর সমস্তই উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত নহেন; কিন্তু জীব সর্ব্বতোভাবে আসক্ত।

শিঃ। আত্মাকে দেহধারী বলিয়া বোধ হয় কেন?

গুঃ। যেমন পার্থিব পরমাণু বায়ুতে মিলিত হইলে বায়ুতে স্থিত মেঘকে ধূসরবর্ণ দেখা যায়; তদ্রূপ মায়াতে নির্ম্মিত এই মহদাদি ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্ব নির্ম্মিত দেহকে অজ্ঞানীরা আত্মার রূপ কহে।

শিঃ। ভগবানের স্বরূপ আর কেহ আছে?

গুঃ। এই যে বিশ্বসংসার ইহাই ভগবানের স্বরূপ জানিবে, অর্থাৎ যে কারণ সমূহে এই জগৎ বিসৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বর-চৈতন্যলাভে ঈশ্বরময় হইয়াছে; সেই প্রমাণে ঈশ্বর জগতের কারণ স্বরূপ হইলেন এবং জগৎ তাঁহার কার্যস্বরূপ হইল। কার্য্য ও কারণে যেরূপ অভেদ ভাব বর্ত্তমান হয়; ঈশ্বরে ও জগতে ঠিক সেই রূপ অভেদভাব প্রতীয়মান হইবে। তাঁহাতে জগৎ সংলিপ্ত আছে, তাহা বলিয়া তিনি জাগতীক বস্তু নহেন, জগতের সত্তারূপে অবস্থান করিতেছেন মাত্র। জগতের সত্তা নাশ হইলে, পঞ্চভূত মহত্তত্ত্বে মিলিবে, মহত্তত্ত্ব কারণে লয় পাইবে; মায়াশক্তি ও কালশক্তি ভিন্ন হইবে। ঈশ্বর চৈতন্যে মায়া ও কাল কারণ সমূহের সহিত প্রবেশ করিবে।

শিঃ। ভগবান্ শব্দের অর্থ কি?

গুঃ। ভগ অর্থাৎ ছয়টী ঐশ্বর্য্য যাহাতে আছে তিনিই ভগবান্। বিষয়-ভোগ, জ্ঞান, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম এই ছয়টী গুণকে ছয়টী ঐশ্বর্য্য কহে।

শিঃ। ভগবান্ কাহাকে কহে ?

গুঃ। যিনি ঐশ্বর্য্যাদিতে অর্থাৎ যে প্রপঞ্চ সমূহ দ্বারা মায়াজাত জগৎ প্রকাশ হইয়া সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সেই তত্ত্ব ও শক্তি সমূহকে ঐশ্বর্য্য কহে ; ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য্য যাহাতে অন্বিত ; অর্থাৎ যাহা হইতে প্রকাশিত, তিনিই ভগবান্।

শিঃ। ভাগবত কাহাকে কহে ?

গুঃ। ঐশ্বর্য্যাদির বিশেষ বিবরণ যাহাতে বিবৃত। অর্থাৎ ভগবানের সগুণ ও নিগুর্ণাত্মক ভাব যাহাতে প্রকাশিত, সেই শাস্ত্রকে ভাগবত কহে। ভাগবত বলিতে ভগবৎ-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

"ব্রহ্ম কল্প উপস্থিত হইলে ভগবান্ হরি ব্রহ্মাকে ব্রহ্মসম্মিত ভাগবত কহিয়াছিলেন"। ব্রহ্ম কল্প বলিতে সৃষ্টির প্রথমাবস্থা। ব্রহ্ম সম্মিত বলিতে ব্রহ্মনিশ্চিয়াত্মক ; ব্রহ্মা বলিতে সৃষ্টি প্রকাশক ঈশ্বরের সগুণভাব। ভাগবত বলিতে যাহার দ্বারা ভগবানের বিভূতি বোধ হয়।

ইহার ভাব এই :—সৃষ্টি প্রকাশ হইবার অবস্থায় ব্রহ্ম মায়াতে মিশ্রিত হইয়া যে অংশ হইলেন, তাহাতেই ব্রহ্মা রুদ্রাদি নাম ধারণ করিলেন, যে ভাবে তিনি স্বভাবে রহিলেন, তাহাই সর্ব্বাশ্রয় বলিতে শ্রুতিতে নিহিত হইল। ইহার গূঢ় অর্থ এই :—যৎকালে নিগুর্ণ অবস্থা হইতে সগুণ অবস্থা প্রকাশ হইল, সেই অবস্থায় নিগুর্ণ ব্রহ্ম আত্মবিভূতিরূপী সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী সগুণে আরোপ করাতেই জীব ঈশ্বর স্বভাবে স্বভাবান্বিত হইয়া চৈতন্যময় হইতে লাগিল। সেই আদিতত্ত্বই ভাগবত। সেই ভাগবত অবস্থাকে সুখে বোধ করিবার জন্য ব্যাসদেব অবস্থা বোধক পুরাণ, মহিমা কীর্ত্তন পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। ভাগবত বলিতে যেন কেহ বর্ণাক্ষরযুক্ত ভাগবত না বুঝেন।

শিঃ। ভাগবত শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কি ?

গুঃ। আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বপ্রকাশকর্ত্তা। এতদ্ভিন্ন অপর কোন তত্ত্বেরই ঐরূপ ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মা আপন বাসনা হইতে লীলার্থে যে ভাব সমূহ প্রকাশ করেন, জ্ঞান তাহা অনুভব করেন। জ্ঞানাদি চারিটী মুখ্য জীবস্বভাব আত্মারূপী ভগবানকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিলে, স্বতঃ আত্মাই সেই প্রাকৃত আদি সৃষ্টি হইতে আত্মলীলা বা মাহাত্ম্যরূপী ভাগবত

ভাব সেই জ্ঞানাদি ধর্ম্মকে দিয়াছিলেন। সেই ভাগবত দ্বারা সহজে আত্ম-জ্ঞান লাভ হইতে পারে, এই জন্য শ্রীব্যাস ভাগবত শাস্ত্রকে জীবগণের মায়া মণ্ডিত ভীষণ দুঃখ নাশার্থে প্রকাশ করিতেছেন। এই দুঃখই ত্রিতাপ অর্থাৎ মনোময়, ভূতময়, ও জীবপ্রভাবময় শরীরের ত্রিভাগেই কর্ম্মজনিত ত্রিবিধ পাপ বর্ত্তমান আছে; তাহা সামান্য বিষয়সুখের আশায় অর্থাৎ কাম্য মায়া মোহাদি ভোগ হইতে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দুঃখ আবৃত থাকা সত্ত্বে জীবের ব্রহ্মদর্শন অনুভব হয় না। এই ভাগবত শাস্ত্রের দ্বারা ত্রিতাপ নাশ হইয়া ব্রহ্ম দর্শন হইবেই হইবে।

শিঃ। পুরাণ কাহাকে কহে?

গুঃ। যে উপন্যাস কল্পনা দ্বারা পুরাতনী কথা সমূহকে নূতন ভাবে প্রকাশ করা যায়, এবং যাহা পাঠমাত্রে প্রত্যেক জ্ঞানব্রতে ব্রতীর নূতন বোধ হয়, এমন চাতুর্য্যপূর্ণ রচনাকৌশলকে পুরাণ কহে।

শিঃ। বেদান্ত শাস্ত্র কাহাকে বলে?

গুঃ। যে শাস্ত্র বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর পরস্পারের মাহাত্ম্য অর্থাৎ বিষয় না থাকিলে বিষয়ী হইতে পারে না, এবং বিষয়ী না হইলে যে পদার্থকে বিষয় বলা যাইতেছে, তাহার ব্যবহারও অসম্ভব। বিষয় বিষয়ী বোধরূপী যে বেদান্ত মীমাংসা, তাহা অতীব কঠিন হওয়াতে ব্যাসদেব পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন জ্ঞান কথাকে সাধকের হিতার্থে নূতন অর্থাৎ কর্ত্তা, কার্য্য ও পরিচারক রূপে সাজাইয়া পুরাণ প্রকাশ করিলেন।

শিঃ। সাংখ্য শাস্ত্র কি?

গুঃ। যে শাস্ত্রের দ্বারা প্রকৃতি পুরুষ ভেদ সংখ্যাত হয়, তাহাকে সাংখ্য কহে। ইহাই পারলৌকিক অর্থাৎ মুক্ত হইবার প্রধান বিজ্ঞান শাস্ত্র। এই শাস্ত্রটী কি? না—নিষ্কামী হইবার উপায় স্বরূপ। অর্থাৎ এই সাংসারিক প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তিপর করিয়া ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করণ।

শিঃ। নিগম জ্ঞান কাহাকে বলে?

গুঃ। নিগম বলিতে যে জ্ঞানপথ দ্বারা জীব ও পরমাত্মা অর্থাৎ খণ্ড ও পূর্ণ ভাব যে একই, ইহা মীমাংসিত হইয়াছে, তাহাকে নিগম জ্ঞান কহে। বেদ হইতে উপনিষদাদি ও বেদান্তাদিকে নিগম কহে। উহাতে কেবল জীবেশ্বরৈক্য

সংস্থাপন হইয়াছে। সেই নিগম জ্ঞান দ্বারা জীবেশ্বরাভেদ ভাব বুঝিতে পারা যায়।

শিঃ। সোঽহং ভাবের উদয় কিরূপে হয়?

গুঃ। মনুষ্য মুক্তির ইচ্ছার ইচ্ছুক হইলে প্রেমে বা আত্মজ্ঞানে মগ্ন হইয়া থাকে। মায়া শক্তিকে চিত্তে অনুভব না করিতে পারিলে "সোঽহং" ভাবের উদয় হয় না। কিম্বা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের বোধ হয় না। যখন চিত্তের অনুভবে "সোঽহং" অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর, এই ভাবের উদয় হয় কিম্বা "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ জগতই ঈশ্বর এই ভাবের উদয় হয়, তখনি আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শিঃ। মুনিব্রত কাহাকে বলে?

গুঃ। যে ব্রতের দ্বারা আত্মীয় স্বজনের স্নেহ বন্ধন ছেদন করত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা যায় এবং ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করা যায়, তাহাকে মুনিব্রত কহে।

শিঃ। প্রায়োপবেশন কাহাকে বলে?

গুঃ। ক্ষুধা তৃষ্ণা বিজয় করিয়া ঈশ্বর চিন্তা বা বৈরাগ্যোপবেশন কে প্রায়োপবেশন কহে।

শিঃ। কর্ম্মাঙ্গ কাহাকে বলে?

গুঃ। দান, ব্রত যজ্ঞাদিকে কর্ম্মাঙ্গ কহে।

শিঃ। উপাসনাঙ্গ কাহাকে বলে?

গুঃ। তপ, যোগ, সমাধিকে উপাসনাঙ্গ কহে।

শিঃ। সন্ধ্যাবন্দনাদি কি?

গুঃ। সন্ধ্যা শব্দের অর্থ,—দুইটী বস্তু একত্রে মিশাইলে উভয় বস্তুর সন্ধি হইল বুঝিতে হয়। তদ্রূপ এই মায়া ত্যাগ করিবার কারণ জীবকে ক্ষণেক স্বরূপ ভাবনা করিতে হয়; সেই ভাবনায় মনে মনে আপনার জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলাইতে হয়; তাহাকেই সন্ধ্যা কহে।

শিঃ। হোম কি?

গুঃ। হোমাদি যজ্ঞ ক্রিয়া হয় অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। হোমটী স্বরূপ। পবিত্র কাষ্ঠ অগ্নি সংযোগে জ্বালিত করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রদান

করিলে, তাহাকে হোম কহে। অগ্নি জ্ঞানের রূপক, কাষ্ঠাদি ইন্দ্রিয়াদির রূপক ঘৃতাদি সাধনার রূপক। মন্ত্রাদি বিজ্ঞানের উপায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকে জ্ঞানাগ্নিতে জ্বালাইয়া সেই জ্ঞানে যে বিজ্ঞানের অহুতি দেওয়া যায়, তাহাই সম্যক প্রকারে ধারণা হয়। কর্ম্মরূপী হোম হইতে এই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

শিঃ। অশ্বমেধ যজ্ঞ কাহাকে বলে?

গুঃ। ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব কহে। ইন্দ্রিয়গণকে রিপুপরতা হইতে জ্ঞানপর করণার্থ কর্ম্মকে অশ্বমেধ যজ্ঞ কহে। ঐ যজ্ঞের ত্রিবিধ বিধি আছে। সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক। তামসিক বিধিতে লৌকিক ভাব প্রকাশ হয়। তামসিক ভাবে রিপু বলিতে অধর্ম্মগত নানা দেশবাসী রাজা ও জনগণ। ভগবান্ আত্মদ্বারা ধর্ম্মগত জীবকে অধর্ম্মগত জীব হইতে জিত করিয়াছিলেন; ইহাই তামসিক অশ্বমেধ।

বিশ্বব্যাপ্ত অধর্ম্ম প্রাবল্য হইতে জীবকে ধর্ম্মপর করিয়া ছিলেন, ইহাই রাজসিক অশ্বমেধ।

আর কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে জ্ঞানপর বা ঈশ্বর পর করণকে ধর্ম্মের সাত্বিক অশ্বমেধ কহে।

আত্ম জ্ঞানের অনুব্রত না হইলে ধর্ম্ম প্রকাশ হইবার যো নাই। ধর্ম্ম প্রকাশ না হইলে জ্ঞানাদির প্রকাশ হয় না। এ সমস্ত একত্র না হইলে পৃথিবী অর্থাৎ সংসার উত্তম রূপে পালিত হয় না।

শিঃ। গর্ভাধান যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি?

গুঃ। যে পিতা অপবিত্র বাসনায় সন্তানোৎপাদন করেন, সে পুত্র অপবিত্র হইয়া থাকে। বাসনার নববিধ সংস্কারে পুরুষ নারীতে রমণ করেন বলিয়া স্মৃতিতে নববিধ সন্তানের নাম আছে এবং তাহাদের পিতার ক্রিয়ানুসারে তাহাদের উত্তমাধম গুণ লাভ হইয়া থাকে। অনেকে বলিতে পারেন, যাহারা পাপী, তাহাদের কি উত্তম সন্তান হয় না? ইহার উত্তর যেমন জলের স্বভাবে অগ্নিময় দারু অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি পিতার কুস্বভাবে বাসনা জাত পুত্র কুবাসনা যুক্ত হয়। পরে অঙ্গারে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে যেমন পুনরায় তাহা অগ্নিময় হইয়া অঙ্গারত্ব হইতে বিচ্যুত হয়, তেমনি পাপীর ঔরসজাত বা পাপি-

নীর গর্ভজাত কুমার শিক্ষানুসারে উত্তম হইতে পারে। কিন্তু যাহারা একমাত্র ঈশ্বর নিষ্ঠ হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহাদের উত্তম সন্তান লাভ হয়ই হয়। তজ্জন্যই স্মৃতিতে পিতৃ পূজন ও ঈশ্বর পূজনান্তে সন্তান কামনা করিয়া রমণীতে রমণোচিত বিধায়ে গর্ভাধান যজ্ঞের বিধি বিহিত হইয়াছে।

শিঃ। পূজা ও কর্ম্মাদি করিবার প্রয়োজন কি ?

গুঃ। পূজা, উপাসনা, যজ্ঞ, ও কর্ম্মাদি সমস্তই বাসনাকে পশুবৃত্তি হইতে ঈশ্বর বৃত্তিতে আনয়নের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। আপনাকে পবিত্র করিতে হইলে, কর্ম্ম, যোগ তপস্যা বা দান ইহার কোনটীই ব্যর্থ নহে। পুষ্পের আদর যেমন সৌরভের জন্য, তেমনি ঈশ্বর ভক্তির জন্য প্রতি কর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে কর্ত্তব্য বলিয়া মায়াযুক্ত মানবের প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি ঈশ্বর ভক্তি বিনে কোনও কর্ম্ম করা হয়, তাহা নিষ্ফল হইবেই হইবে। অতএব কি কর্ম্ম, কি বৈরাগ্য যে কোন উপায় হউক না, ভক্তিযোগ যাহাতে নাই, তাহা নিষ্ফল বুঝিতে হইবে।

শিঃ। ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ, কি জ্ঞান যোগ শ্রেষ্ঠ ?

গুঃ। ভক্তিযোগ ভিন্ন ঈশ্বরকে কোন প্রকার জ্ঞান গোচর করিবার যো নাই। ভক্তিযোগে ঈশ্বর সংযুক্ত হইলে সাধক ঐশিক বিভূতিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারে। ভক্তিযোগ হইতেই ঈশ্বর জ্ঞান উপস্থিত হয়। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি ভক্তি বারিতে পরিস্কৃত বাসনাযুক্ত জীবাত্মাকে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করিয়া আপনার স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। ঈশ্বরকে জানিতে হইলেই অগ্রে ভক্তির আরাধনা করিতে হইবেই হইবে। এমন যে জ্ঞানবৃত্তি, যাহার দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, তাহাও এই ভক্তি যোগে লাভ হইতে পারে। ভক্তিযোগে ত্রিগুণ হইতে বিসঙ্গ হওয়া যায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক ত্রিগুণে জীবকে বিদ্যা ও অবিদ্যা সংমিশ্রিত স্বভাব প্রদান করিয়া থাকেন, যখন তিনগুণ সংযোগে বাসনা ও জীবাত্মা জগতে ক্রীড়া করেন, তখনি ঈশ্বর বিবেকের ভয় থাকে। কারণ স্বভাব আর তরঙ্গ একই প্রকার। কখন স্থির কখন অস্থির। সেজন্য সাধক ত্রিগুণাতীত হইতে ইচ্ছা করিয়া বাসনাকে কামনা হীন করিয়া থাকে। স্নেহ, মমতা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি সমস্তই মিলিত ত্রিগুণের স্বভাব। ঐ সকলেতে বাসনা আবদ্ধ থাকিলে,

পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। ভক্তিযোগের এত গৌরব যে বাসনাকে ত্রিগুণাতীত করিয়া পরমানন্দময় করিতে পারে। অতএব ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ।

শিঃ। সকাম শ্রেষ্ঠ, কি নিষ্কাম শ্রেষ্ঠ?

গুঃ। মানব চৈতন্যপক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি প্রকার ফল লাভ করিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদি সমাপন করিয়া থাকে। ঐ ফল যাহাতে না লাভ হয়, তাহা বৃথা বলিয়া পণ্ডিতগণ নিন্দা করেন। উহার মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম এই ত্রিবর্গ কর্ম্মফল সকাম কর্ম্মে লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞ ও দানাদিকে সকাম কর্ম্ম কহে। কেবল তপস্যাদিকে নিষ্কাম কর্ম্ম কহে। সকাম কর্ম্মাপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মে অধিক ফল লাভ হয়। কারণ সকাম কর্ম্মে কর্ম্মফল বোধে স্বর্গাদি লাভ হয় মাত্র, মুক্তি হয় না। কেবল নিষ্কাম কর্ম্মে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সেই জন্য সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ভাবে একেবারে ঈশ্বরে মন সংলগ্ন করা উচিত।

শিঃ। মন ও জ্ঞানে প্রভেদ কি?

গুঃ। ঈশ্বর ভূতগত চৈতন্য সহযোগে একটী স্বরূপ চৈতন্যের সংযোগ রাখিয়াছেন। সেই চৈতন্যময় বস্তুকে মন কহে। সেই মন হইতে যে চৈতন্যতেজ বিজ্ঞানে মিশ্রিত হইয়া কেবল তত্ত্ব আলোচনায় রত হইয়া স্বরূপ অবধারণ করিতে পারে তাহাকেই জ্ঞান কহে। জ্ঞানও চৈতন্যের প্রতিজ্ঞা। যেমন কিরণ দ্বারা সূর্য্য প্রকাশিত হন, এবং সেই কিরণকেও সূর্য্য স্বয়ং রক্ষণ করেন। তদ্রূপ আপনার স্বরূপ ভাব প্রকাশ করাইবার জন্য ঈশ্বর জ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানটাই ঈশ্বর প্রতিবিম্বের আভা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শিঃ। জ্ঞান ও প্রেম কি একই পদার্থ?

গুঃ। আত্মজ্ঞানে মজিয়া চৈতন্যশক্তির এবং মায়াশক্তির জ্ঞান জন্মে। ঐ সম্মিলনে মহাব্রহ্মে মিলন হয়। ইহাকেই মুক্তি কহে। ঐ স্বরূপ ভাবনা করিয়া আপনাতে পরমাত্মার আরোপ করিয়া যিনি আনন্দ অনুভব করেন, ঐ অনুভব শক্তির নাম প্রেম। জ্ঞান ও প্রেম একই পদার্থ; তবে জ্ঞানে মহামুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং প্রেমে স্বরূপভাবে বাসনার সহিত লয় হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়।

শিঃ সমষ্টি জ্ঞান কি রূপ?

গুঃ। যে জ্ঞান দ্বারা স্বরূপ অনুভব হয়, তাহাকে সমষ্টি জ্ঞান কহে। ঐ জ্ঞানদ্বারা মনুষ্যকে নিরাকার ভাবিতে হইলে দেহকে বিভাগ করিতে হইবে। যে দেহের মধ্যে আত্মা থাকিলে মনুষ্য কহা যায়, তাহার কোনটীর উপাধি মনুষ্য। দেহ ও একটী বস্তু নয়; তাহাকে ভাগ করিলে ভূত তত্ত্বে মিলাইবে। ভূত তত্ত্বে লয় করিতে হইলে সমস্তই অণুতে মিশ্রিত হয়; অবশেষে তেজও অণুতে একত্রিত ভাবিলে একমাত্র চৈতন্য শক্তি ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। পুনরায় অনুভবে ঐ চৈতন্য ও মায়া এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ভাবকে অদ্বৈত ভাব কহে। এই ভাবে ঈশ্বর নিরাকার। এই ভাবে ঈশ্বর এক। যতক্ষণ দৃশ্য জগৎ ও তাহার মধ্যস্থ জীবকে ভিন্নভাবে দেখা যায় ততক্ষণ উহাদিগকে ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বিজ্ঞান বুদ্ধিতে স্বরূপ ভাবনা করিলে এক অদ্বিতীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই বলিয়া বোধ হয়। সেই অদ্বিতীয় বস্তুই পরমাত্মা; বিশ্বের পালন ও সংহার কর্ত্তা। তাঁহারই বৈদিক নামান্তর কৃষ্ণ ও বিষ্ণু বুঝিতে হইবে।

শিঃ। "অদ্বৈত" শব্দটী কি?

গুঃ। অদ্বৈত বলিতে ঈশ্বর এক, এই অর্থ নহে। অদ্বৈতের প্রকৃত অর্থ, ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। বেদান্তশাস্ত্রের বিশেষ মীমাংসা দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে শব্দের ব্যষ্টি অর্থাৎ ভিন্নত্বই দ্বৈত আর সমষ্টিই অদ্বৈত। অদ্বৈত ভাবে প্রতি বস্তু হইতেই ঈশ্বরত্ব, নির্গুণত্ব, ও নিরাকারত্ব ভাবনা উপস্থিত হয়। যেমন একটী মনুষ্য। লৌকিকে মনুষ্যকে সাকার কহিল। যতক্ষণ মনুষ্যকে সাকার ভাবিবে, ততক্ষণ সাধকের তমোগুণ প্রভাবে বিজ্ঞানের উদয় হয় নাই। যখন সাধক বিজ্ঞানে মনুষ্যকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে, তখন সমষ্টি জ্ঞানে ইহা নিরাকার ও ঈশ্বর স্বরূপ বলিয়া বোধ হইবে।

শিঃ। দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান কিরূপ?

গুঃ। ঈশ্বর হইতে জীব পৃথক্ বস্তু এই জ্ঞানকে দ্বৈতজ্ঞান কহে। তাহাতেই মায়া মোহ শোক উপস্থিত হয়। কারণ ঈশ্বর নিত্য এবং ঈশ্বর ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। অনিত্য বস্তু যতক্ষণ চক্ষের উপরে থাকে, ততক্ষণ তাহাকে যত্ন করা উচিত; এই ভাবনায় দ্বৈতবাদীরা দেহের প্রতি এত মমতা

করে। অদ্বৈতবাদীরা জীবকে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবে, অতএব, তাহাকে নিত্য বলিয়া জানে। তাহারা মৃত্যুকে আত্মার রূপান্তর বিবেচনা করে, সেই হেতু তাহারা শোকাদি করে না।

শিঃ। জীবের জন্য শোক করা উচিত কি না?

গুঃ। যদি এই জীবদেহের ধ্রুব অর্থাৎ কিঞ্চিৎভাগ জীবাত্মা হয়, এবং অধ্রুব অর্থাৎ দেহভাগ অনিশ্চিত হয়; তাহা হইলে উভয়েই বিনাশশীল। ন্যায়মতে প্রস্তুত বস্তু মাত্রেই নিশ্চয় বলিয়া বোধ হয়; আর ক্ষণভঙ্গুর মাত্রেই অনিশ্চিত। প্রস্তুত ও ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত বস্তু নিত্য নহে। তাহার কারণ এই যে, যে বস্তু পরমাণুতে লিপ্ত তাহা দৃষ্টি গোচর হয় না। এই জীবদেহ দেখা যাইতেছে, অতএব তাহা কোনমতে নিত্য পদার্থ হইতে পারে না। যদি এই উভয় ভাবনা ত্যাগ করিয়া উহাকে ব্রহ্মময় ভাবা যায়, তাহা হইলেও অনির্ব্বচনীয় হইবে, কারণ ব্রহ্ম তো কাহারো সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব জীবের জন্য শোক অনুচিত। কারণ জীবের কিছুই নিশ্চয় নাই।

শিঃ। দেহের উপরে মায়া করা উচিত কি না?

গুঃ। এই দেহ পঞ্চভূত, কাল, কর্ম্ম ও তিনগুণের অধীন। মায়া শক্তিকে ত্রিগুণান্বিত কহা যায়। ঐ ত্রিগুণকে কালশক্তি ক্ষোভ প্রদান করিলে (অণু পরমাণু-স্বভাবদ্বারা সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ দ্বারা সংযোজিত হইলে) সেই কালশক্তির দ্বারাই আয়ু ও ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়। পরে কর্ম্মমতে যে বাসনায় জীব পূর্ব্ব জীবন ত্যাগ করে, সেই বাসনামতে যোনি প্রাপ্ত হয়। জাগতিক সকল দেহই পাঞ্চভৌতিক। দেহ বলিতে একটী বস্তু নহে, ইহা মায়াধর্ম্ম, কালধর্ম্ম, গুণধর্ম্ম, ও কর্ম্মধর্ম্মসংযোজিত থাকিয়া পঞ্চভূতরূপী জড়ে প্রস্তুত বস্তু। উহাদের অধীন বলিয়া দেহকে বা জীবাত্মাকে স্বাধীন করা যায় না। কেবল বাসনাকে স্বাধীন করিয়া ইচ্ছানুসারে ফল লাভ করা যায়। দেহের উপরেই মোহ, এমন দেহে মায়া করা কি প্রয়োজন।

শিঃ। এই জগৎ কি ঈশ্বর হইতে পৃথক্?

গুঃ। প্রতি জীব দেহ মাত্রেই পঞ্চভূতে গঠিত; তন্মধ্যে কেহ তৃণ, কেহ গবাশ্ব, কেহ বৃক্ষ পর্ব্বত, কেহ পশু মানব। ঐ জীব মাত্রই অপরকে আহার করিয়া থাকে। ইহা সকলেই জানেন। জীবাত্মা হইতে যখন দেহের

জন্মক্ষয় বুদ্ধি হয়, তখন সমস্তই এক বই অন্য নহে। কারণ সকলের আত্মা এক নিয়মে পালিত, সকলের দেহও এক নিয়ম হইতে ঘটিত। বিভিন্ন আকার, যাহা যাহে দেখা যায়, তাহা অনিত্য। তবে অনিত্য ত্যাগ করিতে সকলই ভূতময়, কালময় কর্ম্মময়, ও গুণময় বই আর কিছুই দেখা যায় না। অতএব সমস্ত যদি পৃথক্ পৃথক্ এক বস্তু হইতে ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, তখন সকলই এক জীবাত্মার জীবিত বলিতে হইবে। জীবাত্মা যখন আত্মার তেজ, এবং আত্মা যখন ঈশ্বরের চৈতন্যশক্তি, তখন ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই থাকিতে পারে না। যদি উৎস বিনাশ পায়, তবে স্রোতও বিনাশ পায়। উৎস থাকিলে স্রোত থাকে, কিন্তু উৎসও জল, স্রোতও জল। তবেই উভয়ে এক। তথাপি এই বুঝিতে হইবে যে উৎস জলোৎপাদনকারী, জল তাহার কার্য্য বই আর কিছুই নহে। সেই নিয়মে উৎসে ও জলে প্রভেদ। মায়া ত্যাগ করিলে সমস্তই এক। যেমন মনুষ্য ও মনুষ্যের ছায়া। ছায়াটী মনুষ্য হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু এক বস্তু ও নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর এই জগতের সহিত অন্বিত আছেন। যেমন এক হইতে দশ পৃথক্ হইতে পারে না, তেমনি ঈশ্বর হইতে জগৎ পৃথক্ নহে।

শিঃ। আয়ু কাহাকে বলে?

গুঃ। জগৎ যখন চৈতন্যবান হইল, তখন তেজ ভিন্ন কে চৈতন্য বহন করিবে বা জগৎ সজীব রাখিবে। তজ্জন্য চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ হইল। সূর্য্য কেবল তেজ, আর চন্দ্র কেবল হিম। অনুভবে যাহা বলীয়ান্ বোধ হয়, তাহাকে পুরুষ কহে। এই জন্য পুরাণে সূর্য্যকে পুরুষ আর চন্দ্রকে নারী কহে। হিম ও উত্তাপ সমসূত্রপাত হইলে, কখনই হিমের হিমত্ব থাকে না। ইহাই চন্দ্রমার পীড়ন বুঝিতে হইবে এবং হিম না হইলে উষ্ণত্ব বোধ হয় না, এইজন্য সূর্য্যের চন্দ্র প্রতি আসক্তি বুঝিতে হইবে। হিম সূর্য্যের কিরণে অতি চঞ্চল হয় অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়। সেই চঞ্চলতাকে অশ্ব কহে বলিয়া চন্দ্রের অশ্বিনী কল্পনা হইল। আর হিম সংযোগে উক্তরূপের চঞ্চলতাই সূর্য্যের পৌরাণিক অশ্বকল্পনা। এক্ষণে হিম ও উত্তাপের বৈজ্ঞানিক চঞ্চলতায় চৈতন্যজগতে প্রকাশিত করিয়া সকল সজীব করিয়া রাখিয়াছে। ঐ হিম ও উত্তাপের চঞ্চলতায় বায়ু চঞ্চল, জল চঞ্চল হইয়া চৈতন্যকে সর্ব্বভূতে প্রবেশ করাইতেছে।

যখন ঐ হিম ও উত্তাপ চৈতন্য মিশ্রিত হইয়া বায়ুতে পরিণত হয়, তখনি তাহা আয়ু নাম ধারণ করে। যখন জলেতে পরিণত হয়, তখনও আয়ু নাম ধারণ করে। প্রতি জীবদেহ উষ্ণতায় ও শীতলতায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জল ও বায়ুরূপে ঐ চৈতন্য প্রতি জীবের অন্তরে যাইয়া জীবকে সজীব রাখিতেছে। যাহারা রসবাসী, তাহারা জলরূপে রেচন ও পূরণে ঐ তেজ লাভ করিয়া সজীব রহিয়াছে। যাহারা বায়ুবাসী, তাহারা বায়ুকে রেচন পূরণ রূপে পাইয়া সজীব রহিয়াছে। ঐ রেচন পূরণকেই শ্বাস প্রশ্বাস কহে। শ্বাসে শীতলতা প্রবেশ করে, প্রশ্বাসে উষ্ণতা বাহির হইয়া যায়। এই দুই ক্রিয়াতেই জীবের জীবন সংরক্ষণ ক্রিয়া হইতেছে। ঐ শ্বাস প্রশ্বাসকেই আয়ুর্ব্বেদীরা আয়ুনাম প্রদান করিয়াছেন।

শিঃ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কিরূপে প্রকাশ হইল?

গুঃ। ধন্বন্তরী বলিতে আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বিষয়ক স্বভাব। ঈশ্বর কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবাদি লইয়া জীবভাবে জগতে লীলা করিয়া থাকেন। স্বভাবই ঈশ্বরস্বভাবে এ জগতে লীলা করিতেছে; নচেৎ বৃক্ষ পর্ব্বতাদিরও জীবন আছে, কিন্তু তাহারা মনুষ্যাদির ন্যায় চৈতন্যানুভবে অক্ষম। ইহার প্রমাণ মীমাংসা তত্ত্বে বিশেষরূপে ঋষিগণ জানাইয়াছেন যে, জীবদেহ আর কিছুই নয়, অদৃষ্টরূপী কর্ম্মের প্রকাশস্থল। সেই কর্ম্ম সমূহ প্রকাশভাবে স্বভাব নাম ধারণ করিয়া পরস্পরে পরস্পরের হৃদ্গত ভাব বুঝিতে ও দেখিতে পারে।

জীব স্ব-স্বভাবে থাকিলে প্রকৃত যে ঐশিক চিন্তা বা ভাব তাহা তাহাতে বর্ত্তমান থাকে এবং স্বয়ং জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে। এই জীবনের উদ্দেশ্য না বুঝিলেই সুখও দুঃখ মাত্র। ঐ সুখ ও দুঃখ মায়ার প্রভাব বুঝিতে হইবে।

মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জীবই পূর্ণ স্বভাবে অবস্থান করে। এই জন্য তাহারা আপনাপন জীবনের উদ্দেশ্য আপনারা বুঝিতে পারিয়া সুখ ও দুঃখে পীড়িত হয় না। অনেকে বলিতে পারেন পক্ষ্যাদির পীড়ন ও শাবকাদি হরণে সুখ দুঃখ বুঝিতে পারা যায়; সেটী বুঝা তাঁহাদের ভ্রম। শাবকাদি হরণে পক্ষ্যাদির ক্রন্দন বা পীড়নের বীভৎস চীৎকার উহাদের সুখ বা দুঃখ বোধক নাই। ভয়ের আধিক্য হেতু চীৎকার করে। শাবকাদিকে উহারা অপরিপক অবস্থায় নিজ স্বভাব মতে পালন করে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে আপন

স্বভাব বশতঃ চীৎকার করে। কারণ ঋষিরা বৃদ্ধ শুকপক্ষী ধরিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার সঙ্গীগণ শাবকাবস্থার ন্যায় ক্রন্দন করে না। এই প্রমাণে বুঝা যায় যে, যাহারা প্রকৃত স্বভাবের অনুবর্ত্তী হয়, তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া কিছুতে মুগ্ধ হয় না। জীব স্ব স্বভাবে থাকিলে আত্মরক্ষণোপায় আপনারাই প্রাপ্ত হয়। পীড়াদি হইতে যে মানসিক ও ভৌতিক বা সংস্কার তাহাকে আরোগ্য কহে। যে চৈতন্য দ্বারা ঐ সংস্কারক উপায় অবধারণ করা যায়, তাহাকেই ধন্বন্তরী স্বভাব বা অবতার কহে। পশুমাত্রেই ঐ চৈতন্যমতে আপনাদের চিকিৎসা আপন স্বভাব চৈতন্য হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেবল মনুষ্য মায়াতে মুগ্ধ হইয়া আত্মভাব ভুলিয়া সে চৈতন্য বিনাশ করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা স্ব-স্বভাবে থাকেন, তাঁহারাই জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া আয়ুজ্ঞাপক চৈতন্য এবং ঈশ্বর জ্ঞাপক চৈতন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও স্বভাবের এক অংশ, এই জন্য ঈশ্বরের অবতার রূপে গণ্য। এই চৈতন্য-স্বভাব হইতে যে শাস্ত্র প্রকাশ হয়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ।

"ভগবান্ ধন্বন্তরীরূপে যজ্ঞ হইতে দৈত্যগণকে রোধ করত অমৃতভাগ গ্রহণ করেন"। যজ্ঞ বলিতে জীবদেহ সৃষ্টি। দৈত্য বলিতে রিপু। রিপু প্রভৃতির বিপরীতক্রমে বায়ু কফ পিত্ত প্রভৃতির গতি বিশৃঙ্খল বশতঃ দেহে রোগের প্রকাশ হয়। এই জন্য আয়ুচৈতন্যরূপী ধন্বন্তরী রিপু ব্যতিক্রম আক্রমণ করিয়া দেহ সৃষ্টিরূপী যজ্ঞের অমৃত অর্থাৎ সঞ্জীবন লাভ করিয়া থাকেন।

শিঃ। গন্ধর্ব্ব বেদ কি ?

গুঃ। দেবতাগণের নিম্ন শ্রেণীতে অবস্থিত ও ঈশ্বরনিষ্ঠ কয়েকটী সিদ্ধ-শ্রেণী ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাগণের পরে সৃজন করেন; তাঁহারাই গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, চারণ প্রভৃতি নাম ধারণ করে। গন্ধর্ব্ব দেখিতে অতি সুশ্রী, সর্ব্বদাই সঙ্গীতে রত, আনন্দে উন্মত্ত এবং দেবগণকে সুখী রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই গন্ধর্ব্বগণ হইতে উৎপাদিত ঐশিক শাস্ত্রকে "গন্ধর্ব্ব বেদ" কহে। গন্ধর্ব্ব বলিতে উঁহারা মনুষ্যের ন্যায় জাতি বিশেষ নহে। ছয় রিপু ও কামনা যখন চৈতন্যময় হইয়া ঈশ্বরনিষ্ঠ হয় তখনি উঁহাদের মধ্যে,—কাম, গন্ধর্ব্ব নাম পায়, [illegible], লোভ, কিন্নর নাম ধারণ করে। ক্রোধ, সিদ্ধ নাম ধারণ করে। মোহ [illegible] নাম ধারণ করে। গন্ধর্ব্বই ঈশ্বরনিষ্ঠ কামের রূপক।

শিঃ। বেদ কি ?

গুঃ। বেদ বলিতে নিত্য জ্ঞান ; ঈশ্বর যে চৈতন্যময় উপায়ে জীবের হৃদয়ে উদয় হন, সেই উপায়ময় জ্ঞানই বেদ। ঈশ্বর আপনার ভাব শুদ্ধ চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত করেন, সেই শুদ্ধ চৈতন্যময় পুরুষেরা চৈতন্যতে প্রতিবিম্বিতঃবিশ্বের ভাব যে উপায়ে প্রকাশ করেন, তাহাই বেদ বলিয়া এবং তাহা অভ্রান্ত বলিয়া জগতে ব্যাপ্ত আছে।

কর্ম্ম, ভক্তি, উপাসনা, বিজ্ঞান এই চারি ক্রিয়াই বেদে বর্ণিত আছে। পূর্ব্বে উহারা এক বেদে ছিল। মহর্ষি ব্যাস ঐ চারি বিধিকে বিভিন্ন করিয়া যজুর্ব্বেদে কর্ম্ম, অথর্ব্ব বেদে ভক্তি ও উপায়, সামবেদে উপাসনা ও ঋগ্বেদে বিজ্ঞান স্থাপন করিয়া চারি ভাগে প্রকাশ করিলেন। সেই মুনি এক বেদ হইতে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারি বেদ উদ্ধৃত করিলেন। পরে তিনিই ইতিহাস ও পুরাণাদিকে প্রণয়ন করেন, এই কারণে উহাদিগকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়া থাকে।

শিঃ। বেদ কিরূপে প্রকাশ হইল ?

গুঃ। যে ক্ষমতা বা শাস্ত্রার্থ দ্বারা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় প্রকৃতি বুঝা যায়, তাহাকে বেদ কহে। বিদ্যাপ্রকৃতিতে ঈশ্বর স্বরূপ, আর অবিদ্যায় মায়ারূস্বরূপ বুঝা যায়। ঐ যে দুইটি স্বরূপের কথা বলিলাম, উহার উদ্ভাবনী শক্তি আত্মিক মাত্রেরই আছে। শাস্ত্র পাঠ করুন বা না করুন, অষ্ট সিদ্ধির সাহায্যে বা স্বাভাবিক আত্মজ্ঞানের সাহায্যে আপনা আপনিই প্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন একটী বীজের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বীজ নিহিত থাকে, বীজ তাহা জানিতে পারে না এবং জীবেও তাহা দেখিতে পায় না। কিন্তু যখন ঐ জীবকে সমষ্টি অবস্থা হইতে অঙ্কুরোৎপাদনাদি ব্যষ্টি কার্য্যে আনা যায়, তখন স্বভাবের সাহায্যে উহা হইতে কত শাখা কত প্রশাখা, কত ফল পুষ্প বীজ দেখা যায়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তেমনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী দেহের মধ্যস্থ ঐ পঞ্চকোষে সমস্তই আছে। সাধনা মাত্রেই প্রকাশ হইয়া থাকে। যে বেদ জগতে প্রকাশিত আছে, তাহাও ঐ নিয়মে হঠাৎ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শিঃ। বেদাদি প্রকাশ হইবার উদ্দেশ্য কি ?

গুঃ। এ জগত প্রপঞ্চের সহিত স্বাভাবিক মিলন হইবার জন্য তিন গুণ

ক্রমে বেদাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বেদাদি বলিতে জ্ঞানশাস্ত্র বুঝিবে। বেদ মধ্যে শব্দাংশ, প্রমাণাংশ, ও অর্থাংশ এই তিন অংশ আছে। শব্দাংশে তমোগুণী মুগ্ধ হইবে। প্রমাণাংশে রজোগুণী মুগ্ধ হইবে। অর্থাংশে সত্ত্বগুণী মুগ্ধ হইবে। শব্দাংশে ও প্রমাণাংশে বেদে, বিধি উপাসনা এবং তাহা হইতে ফললাভের উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাতে তমো ও রজোগুণীর উপকার হইল। সত্ত্বগুণী মাত্রেই জীবন্মুক্ত, তাহারা তো ফললাভের কামনা করে না। তাহারা সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া আপনারা নিষ্ফলভাবে অবস্থান করে। বেদার্থই নিষ্ফল কামনার প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ অর্থাংশই সত্ত্বগুণীর আদরের ধন। যতক্ষণ ফললাভে আশা, ততক্ষণ সংসারে রতি। মায়াতে মতি। যতক্ষণ নিষ্ফল আশা, ততক্ষণ সংসারে বিরতি; এবং মায়ার প্রতি অনাসক্তি।

শিঃ। বেদে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিধি আছে, তাহা জানিবার প্রয়োজন কি?

গুঃ। কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপী ভিন্ন বিধি রহিয়াছে। অর্থাৎ কোন বিধিতে জীবকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছে; কোন বিধির দ্বারা জীবকে কর্ম্মহীন ও জ্ঞান-পর হইতে বলিতেছে। কোন্ বিধির কোন্ ব্যক্তি অধিকারী এবং সেই বিধির অভিপ্রায় কি, ইহা না জানিয়া যদি কেহ কর্ম্মাচরণ করে, তবে তাহার অংশুই উদ্দেশ্য হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। কারণ চক্ষে আবরণ দিয়া পথে চলিলে বা পথের সীমা না জানিয়া গমন করিলে, পথের নানা দুর্দ্দৈব ঘটিবার সম্ভাবনা।

শিঃ। বেদে ভাষা ও অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় ইহার কারণ কি?

গুঃ। বেদ কেবল ইঙ্গিত শাস্ত্র হইত নয়। যেমন একটী বানরকে ধরিয়া তাহাকে বশীভূত করত কয়েকটী ইঙ্গিত শিখাইয়া, কোন ইঙ্গিতে নৃত্যভাব, কোন ইঙ্গিতে ক্রিয়াভাব প্রকাশ করিলে, ঐ বানর তাহা দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রচলিত জগতের ভাষা ও অক্ষরাদি সমস্তই ইঙ্গিত মাত্র। মন ইঙ্গিতের ভিখারী, কারণ উহা অন্তর্যামী। আমার ক্ষুধা পাইয়াছে। আমি ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিলে মানব মাত্রেই বুঝিতে পারিবে। সেই ইঙ্গিত স্বভাব সিদ্ধ। তাহাকে সহজ করিতে মহাদেব ও ব্রহ্মাদি পৌরাণিক সৃষ্টিকর্ত্তাগণ শব্দের ও অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া জগতে প্রকাশ করেন। তাঁহারা তপোবলে বিদ্যা

আত্মবিজ্ঞানে একটি কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কৌশল সমূহ আত্মভূত বলিয়া তাহা ঈশ্বর প্রণীত বলা যায়। ঈশ্বরের মায়া প্রকাশ না হইলে জীব কি প্রকারে শব্দ বা ভাষা প্রকাশ করিবে। সেই বেদের অতি সামান্য সূত্র পাইয়া প্রতি বিজ্ঞানবিৎ ঋষি তাহার বর্দ্ধন করিয়াছেন। ক্রমে ঐ বেদাংশ চারিভাগে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শিঃ। পত্র বা মসী দ্বারা যে সমূহ শ্লোক জগতে প্রচারিত আছে, তাহাই কি বেদ?

গুঃ। না,—ইঙ্গিত সমূহের মধ্যস্থ অর্থই বেদ। অর্থ ভিন্ন আর কিছুই বেদ—হইতে পারে না। বেদোক্ত ইঙ্গিতার্থ জ্ঞানহীন পাঠক কখনই বেদার্থ বুঝিতে পারিবে না। অতএব ঐ অর্থ কোথায় আছে, তাহার স্বরূপ ঐ বিজ্ঞানকোষে আছে। একবার ইঙ্গিত বুঝিলে সমস্ত ইঙ্গিতের অর্থ সহজেই বুঝা যায়। ইহা বিজ্ঞানময় কোষের ক্ষমতা। এই নিয়মে বিশেষরূপে এই প্রমাণিত হইল যে, বিজ্ঞানময় কোষেই বেদের আবির্ভাব। বেদই জগতের সারভাগ। ঐ বিজ্ঞানকেই সত্যলোক কহে।

শিঃ। মহর্ষি ব্যাস কি কারণে এক বেদকে চারিভাগে বিভিন্ন করিলেন?

গুঃ। সেই ভূত ও ভবিষ্যৎ বেত্তা ঋষি ধ্যানবলে যুগধর্ম্মের ব্যতিক্রমে কালের অব্যক্ত গতির হ্রাস বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ আগামী কলিযুগে মনুষ্যের বুদ্ধি জীবন ও কার্য্যাদির একেবারে হ্রাস হইবার বিজ্ঞানমতে সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহাদের প্রতি কৃপালু হইয়া মহর্ষি সহজরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন মাত্র। কারণ অল্প মেধাবান্ মনুষ্যে ইহা ধারণায় সক্ষম হইবে।

শিঃ। মহর্ষি ব্যাস ভূত ও ভবিষ্যৎ কিরূপে জানিতে পারিতেন?

গুঃ। সিদ্ধ মাত্রেই ভূত ও ভবিষ্যৎ বেত্তা হইতে পারে। কাল ধর্ম্ম ও প্রকৃতি ধর্ম্মে এই জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। তাহার ভাব যাহারা আলোচনায় জানিতে পারে, তাহারা কাল বেত্তা হয়, এবং কাল বেত্তা হইলেই উদ্ভূত বস্তুর পরিণামে কি হইবে বলিতে পারে, কারণ বর্দ্ধন ও হরণ সমস্তই কালধর্ম্মের ক্ষমতায় হয়। বৈদিক বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই অগ্রে যোগবলে কালধর্ম্ম অবগত হইতেন। প্রতি যুগান্তেই কারণ সমূহের ক্ষমতার হ্রাস হয়।

শিঃ। যুগান্তে মনুষ্যের দেহ কিরূপে হ্রাস প্রাপ্ত হয়?

গুঃ। ভৌতিক কারণ লইয়া যে ভাবে দেহ প্রস্তুত হয়, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালশক্তির হ্রাস হইলে তাহাদের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া থাকে। যেমন একটী বীজ উত্তম ফল হইতে গ্রহণ করিয়া প্রথমবার রোপণ করিলে উত্তম ফল হয়। পুনর্ব্বার সেই স্থানে সেই বীজ রোপণ করিলে, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ফল বা হীনতেজী ফল হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার বৃক্ষ ও ক্ষুদ্র ফল হইয়া আসে। তদ্রূপ এই জগতের বীজরূপী কারণ সমূহ কালধর্ম্মে রোপিত হইয়া প্রথমে প্রথম যুগে যে ভাবে ক্ষমতাবান্ হয়, দ্বিতীয়ে তদপেক্ষাহীন, তৃতীয়ে তদপেক্ষাহীন, চতুর্থে একেবারে হীনশক্তি হইয়া আসে। তাহাতেই দেহের খর্ব্বতা উপস্থিত হয়। দেহ হ্রাসে ধৈর্য্য বিনষ্ট হয়, ইহা বিজ্ঞান সিদ্ধ। একটী ক্ষীণদেহী যত ক্রোধী, পুষ্টদেহী তদ্রূপ নহে। ধৈর্য্য বিনাশে নানাপ্রকার কুমতি উপস্থিত হয়। কুমতিতে রিপুবশীভূত হইয়া মনুষ্যের পীড়ায় আয়ুহীন হইয়া থাকে। সেই কারণে ভগবান লোকগণকে অল্পমেধাবী অবলোকন করিয়া সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদরূপী তরুর শাখা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শিঃ। মহর্ষি ব্যাস কি স্বয়ং ভগবান ?

গুঃ। না, ব্যাস ঈশ্বরের কলাবতারের স্বরূপ। ব্যাস কর্ত্তৃক পুণ্যপথের আবিষ্কার ও কাম্যধর্ম্মের ফলাফল স্থির হইয়াছিল। তিনিই বেদ সমস্তকে বিভক্ত করিয়া সকলের গুরু হইয়াছেন।

শিঃ। এরূপ হীন বীর্য্য মনুষ্যের স্বভাব কি উপায়ে উন্নতিপথে ধাবিত হইবে ?

গুঃ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্য অথচ প্রিয়ভাষী, বিনীত, শান্ত, ও চপলা-বর্জ্জিত হয়, তাহারি স্বভাব শীঘ্রই উন্নতি পথে ধাবিত হয়। কাম্য কর্ম্ম দ্বারা সংসারে কালযাপন করিতে করিতে যদি পুণ্য দ্বারা আত্মার উন্নতি না করা যায়, তাহা হইলে তাহার আত্মার অধোগতি অর্থাৎ তাহার কামনা অধোগতি লাভ করে। কামনা নীচ হইলে সে কামনা সাধনা ভিন্ন উন্নতির পথে ধাবিত হয় না। বাসনা হইতে কামনার জন্ম, বাসনা দ্বারা জীবাত্মা দেহ ধারণ করিয়া থাকে। যতক্ষণ অভিলাষ ততক্ষণ কামনা। বাসনার লয় না হইলে প্রেমের বিলয়ে বিজ্ঞানের উদয় হয় না। বাসনা হইতেই জন্ম। বাসনা যখন রহিল,

তখন জন্ম অবশ্যই হইবে। পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের বাসনামতে জীবে পরজন্মে দেহ ধারণ করতঃ উচ্চ ও নীচ গর্ত্তজাত হইয়া ভোগাদি ভোগ করে। পাপী পাপিনীর গর্ভে ও ভোগহীন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

শিঃ। সংসার যাতনা কাহাকে কহে?

গুঃ। মায়া প্রপঞ্চাদি অর্থাৎ স্নেহাদি অভিমানাদিরূপী আমি ও আমার ভাবীয় বন্ধন জনিত যাতনা। এই অভিমান বা অহঙ্কার হইতে জীব পরের জন্য আপনি যাতনা ভোগ করে। অর্থাৎ পুত্রাদিকে সযতনে পালন করিতে করিতে মৃত দেখিলেও অযথা হাহাকারাদি করুণাত্মক নানা বিষয়িনী দুঃখ ভোগ করে। এইরূপ যাতনাকে অভিমান জনিত সংসার যাতনা কহে।

শিঃ। আত্মজ্ঞানীদের জ্ঞান দৃষ্টিতে কি দেখা যায়?

গুঃ। সেই ঈশ্বরে রুচি ও মতি লগ্ন হইলে নিজের জন্য অন্য চেষ্টা থাকে না। অন্যচেষ্টা বিরহিত হইলেই বিজ্ঞান দৃষ্টিলাভ হয়। তাহাতে যে ইতি পূর্ব্বে দেহের উপাধি "আমি" শব্দকে জীব বলিয়া অর্থাৎ পদার্থ প্রপঞ্চ বলিয়া জানিতাম, তাহা নষ্ট হয়। তাহাতে সেই আমি হইতে পরমাত্মা মহাব্রহ্ম অভিন্ন ইহাই দর্শন হয়। কিন্তু উপদেশ মতে সাধন করিলে ত্রিতাপ নাশ হইয়া থাকে।

শিঃ। ত্রিতাপ কাহাকে বলে?

গুঃ। অধিভূত, অধিদৈব, আর অধ্যাত্ম, এই তিনটী মানসিক ভাবকে তিনটী তাপ অর্থাৎ পীড়া কহে।

শিঃ। ঐ সাধনার উপায় কি রূপ, যাহাতে ত্রিতাপ নাশ হয়?

গুঃ। মনকে নিরুদ্ধ করিয়া কোন একটী কামনায় ইন্দ্রিয় সংযোজনা করাকে সাধনা কহে। ঐ সাধনা চারি প্রকার:—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহ ও পরজন্মফলভোগবিরাগ, শমদমাদিশামনসম্পত্তি, আর মুমুক্ষত্ব।

শিঃ। এই চারি প্রকার সাধনা কি রূপ?

গুঃ। ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই অনিত্য; এমন সাধনাকে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক কহে। ইহজন্মে উপার্জ্জিত ধন রত্ন মাল্যাদি দ্বারা শোভন ও কর্ম্ম দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি ভোগ বিষয়ক ফল প্রাপ্ত, এমন ভাব সাধনার নাম ইহ ও পর জন্ম ফলভোগ বিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধানকে শম-

দমাদিসাধনসম্পত্তি কহে। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে অপর বিষয়ে অন্তরইন্দ্রিয়কে আসক্ত হইতে না দেওয়াকে শম কহে। ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ ও কথন ভিন্ন অপর বিষয়ক কথা শ্রবণ ও কর্ম্ম হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়কে নিবারণ করাকে দম কহে। বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগ ও সংসার হইতে ইন্দ্রিয়াদিকে দমনের নাম উপরতি কহে। শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে। ঈশ্বর বিষয়ে মনের একাগ্রতাকে সমাধান কহে। গুরুবাক্য ও বেদান্ত বচনে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। মোক্ষের ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব কহে। এই প্রকার চারিটী সাধনা দ্বারা ঈশ্বরকে কর্ম্ম অর্পণ করিলে অর্থাৎ মনোগত সমস্ত বাসনা ঈশ্বরের পবিত্র পদে অর্পণ করিলে, ভূতগত, ইন্দ্রিয়গত, অর্থাৎ মায়াগত এবং আত্মগত পীড়া সমস্ত নাশ হইয়া থাকে। দেহের চিন্তা, সংসারিক সুখ দুঃখাদির চিন্তা এবং আত্মার উন্নতির চিন্তা সমস্ত যদি সেই ঈশ্বরে অর্পিত করিয়া কেহ বিশ্বাসে অবস্থান করে, তবে তাহা অপেক্ষা শান্তি আর কে লাভ করিতে পারে? সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম্মকারী। তাহারা যাহা করিবে তাহাই কর্ম্ম। যোগ কর্ম্মই ঈশ্বরে অর্পিত হইয়া থাকে; তাহাতেই সিদ্ধ হওয়া যায়। পদে বদ্ধাসন, হস্তে হৃদয় স্থির, কর্ণে অন্তর শ্রবণ, চক্ষে অন্তর দৃষ্টি, রসনায় নামোচ্চারণ, মনে অনুভব গ্রহণ, এই সমস্ত ক্রিয়াকে ঈশ্বরার্পিত কহে।

শিঃ। সংসারী হইলেই কর্ম্ম করিতে হয়। সেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি ধর্ম্মের উপার্জ্জন হইয়া থাকে। তাহা হইতে নিবৃত্তি কি প্রকারে হইবে?

গুঃ। যে বস্তু হইতে রোগের উৎপত্তি হয়, আবার সেই বস্তুই সংস্কৃত হইলে তজ্জাত রোগনাশকারী ঔষধ রূপে পরিণত হইয়া থাকে। যদি কেহ কোন ব্রতে আভাবিক্ত হয়, সেই ব্রত ক্রিয়া করিতে যদি তাহার ঈশ্বর ভাবনা না থাকে, তবে তাহার কর্ম্ম ফল লাভ হয় মাত্র। ব্রতোপদেশ মতে উপাসনা শিক্ষা হয়। তাহাতে ঈশ্বর ভাবনায় সিদ্ধি হয় না। সেই কারণে কর্ম্মেতেই লোকে অধিভূত, আধিদৈব, ও অধ্যাত্ম চিন্তায় পীড়িত হয়; আবার সেই কর্ম্ম দ্বারাই তাহা বিনাশ করিতে পারে। সাংসারিকগণকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট চিত্ত করিয়া মুক্ত বা পুণ্যপথগামী করিবার কারণ ঋষিগণ নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদে যজ্ঞাদির আলোচনা আছে। সেই যজ্ঞাদিকে নানা মতে লইয়া নানা তন্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

শিঃ। তন্ত্র কাহাকে কহে ?

গুঃ। জীব যে শাস্ত্রের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয় অবস্থায় পবিত্র ও মুক্ত হইতে পারে, তাহাকেই তন্ত্র কহে। এই তন্ত্র বা সংকল্প শাস্ত্র নারদাদি ও মহাদেবাদি রূপী স্বয়ং ভগবানই সংসারে প্রচার করিয়াছেন। এই তন্ত্র মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিবিধ গুণ গত ও ত্রিবিধ অধিকারী গত পরিত্রাণার্থ উপদেশ বর্ত্তমান আছে। অগণ্য তন্ত্র অগণ্য ঋষিগণ দ্বারা সংগৃহীত হইয়া পৃথিবীতে প্রকাশিত আছে। ঈশ্বরকে মানসোপচারে একেবারে সোঽহং ভাবে যে সকল সাধক ধারণা করিতে পারেন না, তাহাদের সাধনের লঘুত্ব হেতু এবং জ্ঞানের উন্নতি হেতু ব্রহ্ম নানা প্রকার কল্পিত মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সেই মূর্ত্তি সমূহে ঈশ্বরের বিভূতি মাত্র অঙ্কিত থাকিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিগুণময় হইয়া সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান ও বিশ্বাসের আধিক্য প্রদর্শন করিয়া দেয়। বেদোক্ত যে সকল মন্ত্রে সাধনার তারতম্যে সাত্ত্বিক বৃত্তিতে ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া উপাসনা সমস্ত নিহিত আছে, ঈশ্বর রূপে কল্পিত হইয়া বিবুধগণ দ্বারা সেই সকল মন্ত্রে আহুত ও বিসর্জ্জিত হয়েন। বিবুধগণ যে সকল শাস্ত্রে ঐ রূপ কাল্পনিক মূর্ত্তির বেদোক্ত বিধানে সাত্ত্বিক, রাজসিক তামসিক এই ভাবত্রয়যুক্ত কর্ম্মাঙ্গ বিধান সাধকের হিতার্থে প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকেই তন্ত্র কহে। এই তন্ত্রে ঈশ্বরের শক্তি কল্পনা করিয়া, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী, ও স্বরস্বতী প্রভৃতির রূপ কল্পনা হইয়াছে। ঈশ্বরের লীলা কল্পনা করিয়া রাস, দোল, রথ, ঝুলান এই সমস্ত কল্পিত হইয়াছে।

শিঃ। ঈশ্বরের শক্তি কি রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবী মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে ?

গুঃ। ঈশ্বরের চৈতন্য সহযোগে ও কাল শক্তির সহযোগে এবং ঈশ্বরের সদসদাত্মিকা শক্তির সহযোগে যে জগৎ প্রকাশক তেজোময় ও কারণময় শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাকেই মায়া কহে। মায়া হইতেই পার হইতে পারিলেই পরম চৈতন্যময় ঈশ্বর সন্দর্শন হয়, সেই জন্য মায়া পূজার বিধান তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া তান্ত্রিকেরা ঐ মায়াকে নানা রূপে কল্পনা করিয়াছেন। মায়াতে ত্রিগুণাত্মক শক্তি আছে। ঐ ত্রিগুণাত্মক শক্তির মধ্যে তমোগুণে কালী মূর্ত্তি, রজোগুণে দুর্গা মূর্ত্তি, এবং সত্ত্বগুণে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। মায়াতে চৈতন্য আছে। চৈতন্য দুইভাগে ভাজিত? একাংশে ঈশ্বর বিভূতিরূপে প্রকৃতিতে

চৈতন্যময় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকেই পুরাণে লক্ষ্মী কহে, তন্ত্রেও তাহাই কহে। আর এক চৈতন্যাংশ ঈশ্বরের স্বরূপানুভব করাইতে জ্ঞানতেজ রূপে প্রকৃতিতে অবস্থান করেন, তাহাকেই সরস্বতী কহে।

শিঃ। দুর্গা পূজা কি একটী যজ্ঞ?

গুঃ। দুর্গা পূজা একটী মহাযজ্ঞ। তন্ত্রে ইহার দুই পথ, সাত্বিক, তামসিক। সাত্বিকপথে আত্মজ্ঞান লাভ হয়; তামসিক পথে পুত্রাদি অর্জ্জন বা পাপ আহরণ করা যায়। ঐ দুর্গার তামসিক ভাবে আধুনিক পূজা হইয়া থাকে, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। সে প্রমাণ তন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

শিঃ। দুর্গা দেবীর সাত্বিক মতে পূজা কি রূপ?

গুঃ। সাত্বিক মতে সাধক গুরু ব্রাহ্মণের নিয়মানুসারে বা শাস্ত্রানুসারে স্বয়ং দেবী পূজা করিতে বসিয়া প্রথমে সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প ও বিকল্প মনের অবস্থা। সঙ্কল্প দ্বারা আমি যে পরমাত্মা স্বরূপ এই ভাবনা উপস্থিত হয়; আর বিকল্পে আমি জীব ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ হয়। ঘট শব্দে হৃদয়। সপ্ততীর্থ বারি সপ্ত প্রকৃতিস্থিত মন। শাখা পল্লবাদি ইন্দ্রিয় সমূহ। ঘটোপরিস্থ অন্নাধার মায়া। তদুপরিস্থ অম্বুগর্ত্ত নারিকেল জগৎগর্ত্তধারী ঈশ্বর। ঘটের উপরে চিত্রিত মূর্ত্তি আত্মা। তাহা ঈশ্বর প্রকাশক তেজ। ইহাই সঙ্কল্পে জানিবে। পরে সাধক যোগ সাধনাদি করিয়া তমোগুণী জীবাত্মাকে বাসনাদির সহিত বলি অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পিত করিয়া আত্মজ্ঞান রূপ মোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিবে। সেই জ্ঞানাগ্নিতে প্রকৃত ঈশ্বরানুভব করিয়া যজ্ঞত্যাগে ঈশ্বরময় হইতে পারিবে। এই এক কর্ম্ম তামসিকে আচরণ করিলে কি লাভ, আর সাত্বিকে আচরণ করিলে কি লাভ তাহা প্রকাশিত হইল। মনুষ্য কর্ম্ম ভিন্ন মুক্ত হইতে পারে না। প্রেম মার্গেও কর্ম্মাচরণ করিতে হয়। প্রথমে সেবা, সেবায় ধর্ম্ম শ্রদ্ধা, ধর্ম্ম শ্রদ্ধায় শাস্ত্র শ্রবণাশক্তি; তাহা হইতে রতি; রতি হইতে ক্রমে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের দৃঢ়ভক্তি দ্বারা বিশ্বাস হইলে ব্রহ্মময় হওয়া যায়। সাধনা বিনা কিছুই লাভ হয় না।

শিঃ। দুর্গা দেবীর সাত্বিক ভাব কি?

গুঃ। সাধককে মায়া বুঝাইবার কারণ; মায়াকে তেজোময়ী সুন্দরী কামিনী করিলেন। কামিনীরূপ করিবার হেতু এই; পুরুষের তেজ নারী

যোনিতে রূপান্তরিত হইয়া জীব প্রকাশ করে। তেমনি ঈশ্বরের তেজ ধারিণী মায়াকে নারীরূপে কল্পনা করা হইল। সেই মূর্ত্তির দশহস্ত কল্পনা করা হইল। জগতের সর্ব্বাংশ ব্যাপিনী মায়া এবং জগতই জ্যোতিষ কল্পনায় দশদিক সম্পন্ন। ঐ দশহস্ত বিস্তারে সর্ব্বব্যাপকতা প্রকাশ হইল। ত্রিনেত্র, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণী তেজাধার। দশহস্তে পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রকার অস্ত্র; ঐ অস্ত্র সমূহের দ্বারা ঈশ্বরের জগৎ শাসন, পালন, বর্দ্ধন ও হরণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। সিংহ চৈতন্য। অসুর রিপু। মহিষ হইতে প্রকাশিত অসুর অর্থাৎ মোহকে মহিষ কহে। ইন্দ্রিয় যখন অবিদ্যাতে মুগ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় তেজ রিপু নাম ধারণ করে। দেবীর চতুর্দ্দিকে অষ্ট শক্তি থাকিবার অর্থ যে মায়া অষ্টপ্রকার। জ্ঞান জ্ঞানস্বভাব প্রকৃতির মধ্যগত হইলে সাধকের জ্ঞানে বিদ্যাশক্তি প্রদান পূর্ব্বক আপনার প্রভাব তাঁহাকে জ্ঞাপন করে। ইহাই মায়ার রজোগুণী দুর্গার লঘুভাব।

শিঃ। দুর্গা দেবীকে কিরূপ ভাবে ধ্যান বা চিন্তা করা যাইবে?

গুঃ। দেবী যেন জটাজুট সমাযুক্তা, কপোলে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতা। পূর্ণচন্দ্রসম বদনে ত্রিলোচন শোভিত। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণময়ী নবযৌবনসম্পন্না, সকল প্রকার অলঙ্কারভূষিতা; মনোহর দন্ত ও পীনোন্নত পয়োধর সংযুক্তা, ত্রিভঙ্গময়ী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মৃণালের ন্যায় দশবাহুসমবেষ্টিতা; সেই হস্ত সমূহের মধ্যে দক্ষিণে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বান, শক্তি, বামভাগে খেটক, ধনুক, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা বা পরশু শোভিত রহিয়াছে। দেবীর অধোভাগে ছিন্ন শির মহিষ এবং সেই ছিন্ন স্থল হইতে খড়্গপাণি এক দানব প্রকাশ হইয়াছে। সেই অসুর দেবী কর্ত্তৃক শূলবিদ্ধ ও কেশ ধৃত হইয়া রক্ত মৃষিত অঙ্গ ও ভীষণ দর্শনাননযুক্ত হইয়া সিংহের দ্বারা আঘাতিত হইতেছে। দেবী দক্ষিণপাদ সমানভাবে সিংহোপরি রাখিয়াছেন। বামপদ ঊর্দ্ধ করিয়া তদঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি রাখিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িক, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডারূপা, চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি শোভিত আছে। সম্মুখে অমরবৃন্দ যেন সেই দেবীর স্তব করিতেছেন। ইনিই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষদা জগদ্ধাত্রী হইতেছেন; পূজক এইরূপ চিন্তা করিবেন।

শিঃ। রজোগুণী দুর্গামূর্ত্তিধরী মায়াকে কিরূপে পূজা করিতে হয়?

গুঃ। পূজারি অনুরাগ সমর্পণের তামসিক ভাবেই প্রতিমাদি কল্পনা করিয়া নৈবেদ্যাদি ও পুষ্পাদি প্রদান করেন। যখন পূজা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিতে হয়। ঐ সঙ্কল্পে এইরূপ ভাবনা করিতে হয় যথা;—আপনার চারিদিকে ছোটিকা বদ্ধ করিয়া, পরে ভূত শুদ্ধি করিবে, তদন্তে আপনার দেহের হৃদয়ে আত্মাকে দীপ শিখাকার ভাবিবে, সেই প্রজ্জলিত আত্মাকে "হংস" এই মন্ত্রে স্বযুম্না নাড়ির মধ্যদ্বারা মস্তকের সহস্রদল কমলস্থ পরমাত্মার সংযোজন করিবে; পরে পাদস্থ পৃথিবীকে লিঙ্গমধ্যস্থ জলে মিশাইবে, সেই জলকে হৃদয়স্থ তেজে মিশাইবে, সেই তেজকে মুখের বায়ুতে মিশাইবে, সেই বায়ুকে কপোল-মধ্যস্থ আকাশে মিশাইবে। পরে শূন্যময় ভাবনার বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কারাদির সহিত সহস্রদল কমলে পরমাত্মায় লীন হইয়াছি, সাধক এই চিন্তা করিয়া পরে মায়াবীজ মন্ত্র দ্বারা কুম্ভক, রেচক, পূরকাদি সহযোগে জপ করিবে। পরে ঐ ক্রিয়ার শারীরত্ব ধ্বংস করিয়া দেহকে ললাটগত অমৃত নিঃসৃত সুধাময় করিয়া শুদ্ধ করিবে। সেই দেহের যথাস্থানে পঞ্চভূত সন্নিবেশ করিয়া হংসঃ এই মন্ত্র সহযোগে জীবাত্মা যে কুলকুণ্ডলিনী গত হইয়া দেবীরূপে রহিয়াছেন, এইরূপে আত্মচিন্তা করিবে। পরে সেই ভাবনায় জীবন্যাস করণার্থ সর্ব্বাঙ্গে প্রাণস্থানে প্রাণ, ইন্দ্রিয়স্থানে ইন্দ্রিয় স্থাপন করিবে। পরে আপন দেহে মাতৃকা ন্যাস করতঃ ষটচক্র ভেদ করিয়া বীজ মন্ত্রে আপনাকে দুর্গারূপে কল্পনা করিয়া অঙ্গন্যাস করতঃ দেহময় পীঠস্থানে দেবীকে ধ্যান করিবে।

শিঃ। তমোগুণী মায়াশক্তি কালীদেবীকে কিরূপ ভাবে চিন্তা করা যাইবে?

গুঃ। প্রতি দেবীর ধ্যানেই স্বরূপের গূঢ়ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। দেবীকে করাল বদনা, ঘোর রূপা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা বলিয়া ভাবিবে। দক্ষিণা কালিকা বলিয়া তাঁহার নাম দান করিবে। দেবীর অবস্থা ভাবিতে হইলে যেন তিনি মুণ্ডমালা বিভূষিতা হইয়া আছেন, বামদিকের দুই হস্তে ছিন্নশির ও খড়্গ রহিয়াছে; দক্ষিণ দুই হস্তে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন; দিগম্বরী ও মহামেঘসম শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। কণ্ঠ হইতে যে সকল মুণ্ডমালা রূপে লম্বমান রহিয়াছে, তাহাতে যেন রুধির পতিত হইতেছে। উভয় কর্ণে কুণ্ডলের পরিবর্ত্তে অংশদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত শবদেহ যুগ্মভীষণরূপে শোভিত

রহিয়াছে। তিনি যেন পীনোন্নতপয়োধরা ও সর্ব্বদা হাস্যময়ী। তাঁহার কটীতটে শবসমূহের হস্তাদিতে কাঞ্চী হইয়াছে। তাঁহার সৃক্কদ্বয় হইতে রক্তধারা বিগলিত হইতেছে। তিনি ঘোর শব্দ করিতেছেন। মহাতেজোময়ী হইয়া আছেন এবং শ্মশানবাসিনী হইয়া আছেন। প্রভাতের সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় তাঁহার তিনটী নয়ন জ্বলিতেছে। শবরূপী মহাদেবোপরি সংস্থিতা হইয়া কি মহাকাল কি স্বয়ং উভয়েই বিকারীত ক্রিয়ায় অবস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এত যে ভীষণ তেজে রহিয়াছেন, তাহাতেও ঈষৎ হাস্যযুক্ত প্রসন্ন ভাব সমন্বিত তেজ বদনে প্রকাশ পাইতেছে। ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাভিলাষী সাধক এইরূপ ধ্যান করিবেন।

শিঃ। কালী দেবীর সাত্ত্বিক ভাব কি?

গুঃ। মায়ার মূর্ত্ত্যন্তর বলিয়া এই দেবী স্ত্রীমূর্ত্তিময়ী হইলেন। তমোগুণী বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ। অর্থাৎ ঘোরবর্ণা হইলেন। আর সংহার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া ভীষণারূপে কল্পিত হইলেন। প্রলয়ে কালশক্তি চৈতন্য হীন হয়েন, এই জন্য মহাদেব শববৎ হইলেন। মায়া কালশক্তির উপরে পদ দিয়া আপনার যে ত্রিগুণময় ক্ষমতা তাহাকে লইয়া সক্রিয়া অবস্থা হইতে অবস্থান্তরিত হইবার জন্য জগৎ সংহার দেখাইতে ঐরূপ নরঘাতিনীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। জগতের সকল প্রকার তত্ত্বকে ঈশ্বর আপন অঙ্গে ধারণ করেন। মায়া তাহাতেই প্রলয়কালে সজ্জিতা হয়েন এবং পরে জীবাত্মার কল্যানার্থে পুনরায় জগৎ প্রকাশ করিবেন। এই জন্য দুই হস্তে বর ও অভয় দান করিতেছেন। এই তো কালী মূর্ত্তি পূজক পক্ষে সাত্ত্বিক ভাবে ঈশ্বরের মায়া সহযোগে জগৎ সাংহার্য্য ক্রিয়া প্রকাশ পাইল।

শিঃ। সত্ত্বগুনী জগদ্ধাত্রী দেবীকে কি ভাবে চিন্তা করা যাইবে?

গুঃ। তামসিক ভাব;—নানালঙ্কার ভূষিতা, সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়া, চতুর্ভুজা, নাগযজ্ঞোপবীত ধারিণী, মহাদেবীকে ভাবনা করিবে। দেবী যেন প্রভাতী অরুণ বর্ণা ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। চারি হস্তের মধ্যে দুই বাম হস্তে শঙ্খ ও পদ্ম রহিয়াছে; দুই দক্ষিণ হস্তে চক্র ও পঞ্চবান রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে নারদাদি মুনিগণ তাঁহাকে সর্ব্বসিদ্ধিদা বলিয়া ভাবিতেছেন।

দেবী যেন রত্নদ্বীপ নামক মহাদ্বীপে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। প্রফুল্ল কমল তাঁহার আসনরূপে রহিয়াছে।

সাত্ত্বিক ভাবঃ—মায়া যখন প্রধান অবস্থা হইতে ঈশ্বর চৈতন্যবাহনে চৈতন্যজগতের সৃষ্টি করেন, সেই অবস্থার রূপকই এই মূর্ত্তি। জড় ও চৈতন্য ভেদে জগৎ দুই অংশে মিশ্রিত হইয়া মায়াবলে প্রকাশ পাইতেছে। চৈতন্যাংশ-কেই সত্ত্বাবস্থা কহে। চৈতন্যাংশ না বুঝিলে কখনই ঈশ্বরকে চৈতন্যময় অবস্থায় দেখা যায় না। সেই জন্য এই শক্তিরূপিণীর কল্পনা হইয়াছে। সিংহ চৈতন্য তেজ, চৈতন্য তেজকে বিজ্ঞানশক্তিও কহা যায়। তদুপরি কমলা-সন। এই কমলাসনই শিরস্থ সহস্রার পদ্ম। তদুপরি দেবী উপবেষ্টা, দেবী সত্ত্ব-তেজে উজ্জ্বল বলিয়া বাল সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কিরণময়ী। বস্ত্র তাঁহার রক্ত বর্ণ। রক্ত বর্ণই রজোগুণ; অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া রজোগুণ প্রকাশ হইয়া তাঁহাতেই সংলিপ্ত রহিয়াছে। দেবীর অঙ্গে নাগযজ্ঞোপবীত। নাগ শব্দে সর্প, সর্প শব্দের প্রধানভাব চঞ্চল। মায়া যে গুণে ক্রিয়ায় রত, তাহা অতি চঞ্চল। সেই চঞ্চলতাই অবিদ্যা নিস্তারিণী তামসি শক্তি। অর্থাৎ তমোগুণ। সেইরূপ তমোগুণ যজ্ঞোপবীত রূপে তাঁহাতে রহিয়াছে। যজ্ঞোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের চিহ্নকে যজ্ঞোপবীত কহে। তমোগুণের ক্রিয়াই যজ্ঞ। সর্পরূপে তমোগুণের ক্রিয়াও দেবীতে লগ্ন। অর্থাৎ মায়া জাত সত্ত্বগুণ হইতে রজো ও তমো উভয় গুণই প্রকাশ হইয়া তাহাতেই সংযুক্ত রহিয়াছে। দেবী চতুর্ভুজা। চৈতন্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সর্ব্বত্র বলিতে চতুর্দ্দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই চতুর্দ্দিক রূপ হস্তে শঙ্খ, ধনু, চক্র ও বান শোভিত রহিয়াছে। শঙ্খই বিবেকের রূপক। ধনু চৈতন্যের রূপক। চক্র বৈরাগ্যের রূপক। পঞ্চবান পঞ্চশক্তিময় বিজ্ঞানের রূপক। ঈশ্বর চৈতন্য রূপে জীবের হৃদয়ে থাকিয়া যে অংশে সত্ত্বগুণে স্বরূপ প্রদান করেন, তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন; সেই স্বরূপ অবস্থায় জীবাত্মাকে স্বরূপে আনাইবার জন্য চৈতন্যময় তেজ প্রকাশ হয়েন। সেই তেজে বিদ্যাযুক্ত মানবে ক্রিয়মান হয়। সেই চৈতন্যের ক্রিয়মান তেজ পরিণামে চারি ভাগে বিভক্ত। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান। এই চারি চৈতন্য ক্রিয়াকে যে সাধক ধারণা করিতে পারিবেন, তিনি ঐ চারি-অস্ত্রধর বিদ্যাযুক্ত শক্তিময় মায়া মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইবেন।

সেই মায়া বুঝিলেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের চৈতন্য সংস্থান বোধ হইয়া আপনি চৈতন্যময় হওয়া যায়। চৈতন্যময় হইলে ঈশ্বরকে সম্মুখে দেখা যায়।

শিঃ। লক্ষ্মী কাহাকে বলে ?

গুঃ। স্বর্গ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকাশক স্থান। মর্ত্ত অর্থাৎ ভূতাংশ বিকার ভাবাপন্ন হওনের স্থান। পাতাল অর্থাৎ ঐ উভয়ের আধার স্থান। এই তিন লইয়াই জগৎ। এই জগৎকে স্বয়ং ঈশ্বর যত প্রকার মায়ায় শোভিত করিয়াছেন তাহাকে বিভূতি কহে। যাহা দেখিলে হৃদয় সুস্থ হয়, যাহা ধারণ করিলে উদ্বিগ্ন চিত্ত স্থির হয়, যাহা সাধনা করিলে বিষ্ণুপদ লাভ হয়, যাহার তেজ লইয়া কাল, মায়া প্রভৃতি চালিত হয়েন, সেই মহাশক্তিই লক্ষ্মী নামে পুরাণে রূপকে আরোপিতা হইয়াছেন। ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি সেই চৈতন্য-রূপিণীকে আরাধনা করিয়া অন্তর্জ্জগৎ বহির্জ্জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। দৃশ্য পদার্থ মাত্রেই বহির্জ্জগৎ। ইহা ব্রহ্মার সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতি সাহায্যে স্বভাব হইতে ভূতাংশে নির্ম্মিত। ঐ প্রকৃতিই ব্রহ্মা। ঐ বহির্জ্জগতের অন্তরে যে সকল ক্রিয়া হইতেছে, তাহারা রুদ্র অর্থাৎ কাল শক্তির সাহায্যে প্রস্তুত। তাহারা এই ভূতাংশের পালক, বর্দ্ধক, ও উপসংহারক। সেই কাল শক্তিই মহারুদ্র। ঐ প্রকৃতি (ব্রহ্মা) ও কাল (রুদ্র) লক্ষ্মীকে অর্থাৎ ঈশ্বরের চৈতন্যরূপিণী শক্তিকে আরাধনা করিয়া পূজা করেন, অর্থাৎ চৈতন্য সাহায্যে জগৎ প্রকাশ করেন।

লক্ষ্মী দুই প্রকার :—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বাচক। প্রবৃত্তি বাচক লক্ষ্মীকে অপধর্ম্ম কহে। তদ্দ্বারা নিবৃত্তি আবৃত হইয়া থাকে। নিবৃত্তি বাচক লক্ষ্মীকে মোক্ষ লক্ষী কহে। মোক্ষলক্ষ্মী পাঁচ প্রকার :—বেদ, ধর্ম্ম, ক্ষমা, সত্য ও শ্রী। এই শ্রী বলিতে সত্ত্বগুণময় স্বভাব।

শিঃ। গঙ্গা কাহাকে কহে ?

গুঃ। ঈশ্বর ত্রিক্রিয়াবান্ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নাম ধারণ করিয়া-ছেন। প্রকৃতি শক্তিকে ব্রহ্মা কহে, বর্দ্ধন সংহরণ শক্তিকে রুদ্র কহে। প্রকৃতি দ্বারা সংসার সৃষ্ট হইলে পালন করিতে ব্রহ্মা সেই সংসারকে বিষ্ণুপদে অর্পণ করেন। ঐ সংসার দানকে রূপকে অর্ঘ্যদান পুরাণে কহিয়াছে। মাননীয় ব্যক্তির সমীপে যাইলে বা তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে, তাঁহার

পাদমূলে জল দিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে হয়। জল, ফল, পুষ্প প্রভৃতি শান্তিজনক পূজোপহারকে অর্ঘ্য কহে। রূপকে মনুষ্যরূপে আনিয়া বিষ্ণুকে ব্রহ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বে সাজাইয়া ব্রহ্মা দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান বিধি স্থির করা হইল। এই অর্ঘ্য প্রদানের কারণ কি? চৈতন্যশক্তি না হইলে জগৎ পালিত বা জীবন্ত হইবে না। বিষ্ণু স্বয়ং চৈতন্যরূপ। ব্রহ্মশক্তি বাহ্য জগৎকে চৈতন্যবান করিতে তাঁহাকে বিষ্ণুপদে নিক্ষেপ করিলেন। বিষ্ণুপদলগ্ন হইবা মাত্রেই সেই অর্ঘ্য বারি মহা স্রোত রূপে পরিণত হইল; অর্থাৎ চৈতন্য পাইয়া জগৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ঐ স্রোতকে গঙ্গা কহে। জলঃ স্রোত মাত্রকেই গঙ্গা কহা যায়। পূর্ব্বে জড় জগৎ চৈতন্যহীন ছিল, পরে ঈশ্বরের চৈতন্য তাহাতে প্রতিভূ হওয়াতে বৰ্দ্ধিত হইল। তবেই জগতের মধ্যে গঙ্গারূপিণী চৈতন্য রহিল। সেই চৈতন্যই গঙ্গারূপে পুরাণে কল্পিত। পুরাণে গঙ্গা যেমন ত্রিধা হইয়াছিল, তেমনি চৈতন্যও জগতের কল্পনা ক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ চৈতন্য যেমন মর্ত্ত্যে আসিতে এক ধারায় মহাদেবের মস্তকে পতিত হয়, তেমনি মর্ত্ত্য জগতের মধ্যে কালশক্তি থাকিয়া আন্তরিক ক্রিয়া করিতেছেন। কালশক্তির সাহায্য লইয়া চৈতন্য মর্ত্ত্য জগতে রহিয়াছেন, নচেৎ তাঁহাকে ভূতাংশে থাকিতে হয়। আমরা ভুবনে যে জলরূপী গঙ্গাকে দেখিতে পাই, তাহা পূর্ব্বোক্ত গঙ্গা জ্ঞানের প্রমাণ মাত্র।

শিঃ। গঙ্গা যদি চৈতন্যরূপিণীই হইলেন, তবে তিনি স্রোতোরূপে কল্পিতা কেন হইলেন?

গুঃ। যে জলীয় ভাগ একবার ঊর্দ্ধে একবার অধোভাগে বায়ুপেষণে ও তেজঃপেষণে গমন করে, তাহাকে স্রোত কহে। চৈতন্যও তদ্রূপ, কল্পনায় এবং রিপুই ইন্দ্রিয়াদির সহযোগে প্রস্ফুটিত ও বিলীন হইতেছে। ঐ প্রস্ফুটনে ও বিলীনতায় যে চৈতন্য কলুষিত হইলেন তাহা নহে। চর্ম্ম চক্ষের ও জ্ঞান-চক্ষের দর্শন ক্রমে ঐ রূপ অনুভব হয় মাত্র। যেমন সূর্য্য মেঘাবৃত থাকিলে বাহ্য জগতের জড়তা হইয়া আসে, তাহা বলিয়া সূর্য্য তেজোহীন নহেন; তেমনি স্বভাবে চৈতন্যকে অজ্ঞানাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিলে তাহার ভাব জ্ঞান ক্রিয়ার মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই নিয়মে গঙ্গাস্রোত চৈতন্যস্রোতের রূপক মাত্র।

শিঃ। পুরাণে গঙ্গাকে মুক্তিদায়িনী কেন বলেন ?

গুঃ। চৈতন্য বিনা মুক্তি নাই। সেই নিয়মে গঙ্গা বিনা মুক্তি নাই। পুরাণ অপূর্ব্ব বস্তু, অল্পবুদ্ধি মানবের উপাদেয় রত্ন। মানবের জ্ঞান না হইলে কখন তাহারা ঈশ্বর ও নিরাকার সাধনা করিতে পারে না। সেই জন্য পুরাণে ব্যাস এমন উপায় স্থাপন করিয়াছেন যে, সেই নিরাকার সাধনা ও ভাবনা সমূহকে একেবারে রূপকে সাকার করিয়া অজ্ঞানী দিগকে বুঝাইয়াছেন। ঐ উপদেশ ক্রমে যখন স্বভাবের প্রভাব প্রখর হইয়া জ্ঞান প্রকাশক হইবে, তখন তাহারা একেবারে নিরাকার ধারণা করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

শিঃ। তুলসী কাহাকে বলে ?

গুঃ। গঙ্গা কাহাকে বলে তাহা আমি ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি। জগতের চৈতন্যরূপিণী মায়াকে গঙ্গা কহে। পূর্ব্ব প্রমাণ মতে মহাচৈতন্য শক্তিকে লক্ষ্মী কহে। চৈতন্য শক্তির সহিত মায়ার সম্মিলনই গঙ্গা ও তুলসী সম্মিলন বুঝিতে হইবে। তুলসীই লক্ষ্মীর নামান্তর মাত্র। তুলসী বলিতে বৃক্ষ পত্র নহে, চৈতন্য শক্তি। পার্থিব তুলসী পত্রে ভূত চৈতন্যপ্রদরস আছে বলিয়া উহাকে তুলসী কহে।

শিঃ। স্ত্রী বলিতে কি ?

গুঃ। স্ত্রী বলিতে ঃ—ত্রিগুণ সম্পন্না। রতি, ভক্তি, মোহ সহকারে যে কামিনী যে পুরুষকে ভজনা করেন, তিনিই তাঁহার স্ত্রীপদ বাচ্য। জীবাত্মা ঐ রতি, ভক্তি ও মোহের বশীভূত হইয়াই এমন কষ্টের সংসারকে তুচ্ছ বোধ করিয়া থাকেন। যখন শুদ্ধ প্রকৃতিতে সাধক ঐ রতি, ভক্তি, মোহ দেখিতে পাইবেন, তখন কি আর তাঁহার মুক্ত হইতে বিলম্ব হয়, কখনই নয়। নারী ও নরে যে কি ঐশিক সংযোগ, তাহা মানবে ভ্রান্ত হইয়া বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বর স্বয়ং প্রকৃতিরূপে অবস্থান করিয়া এবং স্বয়ং পুরুষ রূপে রূপান্তরিত হইয়া উভয়কে উভয় দ্বারা আকর্ষণ করিতেছেন। স্ত্রীমূর্ত্তি কখন জননী হইতে-ছেন, কখন কন্যা হইতেছেন। এই মায়া জ্ঞাপনের ভাব অতি ভয়ানক। মোহকেই অপ্সরা কহে।

শিঃ। উর্ব্বশী স্বর্গ কামিনী অপ্সরা। সর্ব্বদাই নিত্যগীতে দেবতাদিগের মনোহরণ করেন। চিরযৌবন সম্পন্না হইয়া আছেন। ইহার অর্থ কি ?

গুঃ। মোহরূপা আকর্ষণী শক্তি ইন্দ্রিয়াদিকে ঈশ্বর পথে মুগ্ধ করিতে উর্ব্বশী মেনকাদি রূপ ধারণ করেন। অর্থাৎ যাহার ভাব ভঙ্গিতে হৃদয় সকল সংলিপ্ত হইতে অপহৃত হয়, তাহারাই অপ্সর নামে খ্যাত। মোহ যখন ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়েন, তখন তিনি মন ও বাসনাকে একেবারে ঈশ্বরের প্রকৃতি প্রেমে উন্মত্ত করিয়াছেন। যেমন পার্থিব কামুকগণ বেশ্যাদিগের কপট রমণীয়তাতে মুগ্ধ হইয়া জীবন সর্ব্বস্ব দিতে কষ্ট বোধ করে না। সেটী কেবল মোহ যখন রিপু অবস্থায় থাকে, তাহারই তেজ। তেমনি মোহ যখন অপ্সর অবস্থায় থাকে; তখন সাধককে ঈশ্বরপক্ষে এমন সংলগ্ন করে যে আপনি সাধক পুরুষ হইয়া ঈশ্বরকে প্রকৃতি ভাবিয়া তাঁহাতে প্রেমের রমণ করেন। ইহাই জীবাত্মার প্রেমলীলা।

শিঃ। এই পঞ্চভৌতিক দেহের নির্ব্বাণ কি রূপে হয় ?

গুঃ। আর্য্য বিজ্ঞান মতে এই দেহে প্রাণ স্থাপক ছয়টী পদ্ম বা চক্রস্থল আছে। গুহ্যদ্বারে একটী সন্ধিস্থান, তাহাকে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম কহে। নাভিমূলে একটী সন্ধিস্থান, তাহাকে মনিপুর পদ্ম কহে। হৃদয়ে একটী সন্ধিস্থান, তাহাকে অনাহত পদ্ম কহে। কণ্ঠে একটী সন্ধিস্থান, তাহাকে বিশুদ্ধ পদ্ম কহে। তালুতে একটী সন্ধিস্থান, তাহাকে বিশুদ্ধাগ্র পদ্ম কহে। শির দেশে একটী সন্ধিস্থান, তাহাকে আজ্ঞা পদ্ম কহে। তদূর্দ্ধে ব্রহ্ম তালুতে একটী শূন্য পদ্ম আছে, তাহাকে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম কহে। এই দেহ ছয় কোষে নির্ম্মিত ; তন্মধ্যে মাতৃজ তিনটী, আর পিতৃজ তিনটী। মেদ, মজ্জা অস্থি এই তিনটী পিতৃজ, আর স্নায়ু, শোনিত, চর্ম্ম এই তিনটী মাতৃজ। ঐ ছয় কোষকে পঞ্চ বায়ু পঞ্চ প্রাণ রূপে পালন করিতেছে। তাহাদিগকে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান কহে। প্রাণ বায়ুর দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণার কার্য্য হয়। অপান বায়ুর দ্বারা উদরস্থ বস্তু বহির্গমন হয়। সমান বায়ুর দ্বারা রস ও অপ্রয়োজনীয় সার বিভাজিত হয়। উদানে হিক্কন, বাক্য ইত্যাদির ক্রিয়া হয়। ব্যান বায়ু সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত থাকে।

এই পঞ্চ বায়ুকে নিরোধ করিতে পারিলে দেহ হইতে জীবাত্মা বিমুষ্ট হইয়া আত্মায় গমন করে। তাহাও সাধন সাধ্য। কুম্ভক অর্থাৎ নিশ্বাস বায়ু লইয়া অন্তরে ধারণ ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়স্থ প্রাণ বায়ুকে একেবারে স্বাধিষ্ঠান পদ্মে

নিরোধ করিতে হয়। সেই বায়ুর সহিত অপান বায়ু মিশিলে তাহাকে উর্দ্ধগতি করিয়া নাভিতে আনিতে হয়। (ইহাকে গুহ্য শ্বাস ও নাভি শ্বাস কহে)। নাভিস্থ সমান বায়ু প্রাণে মিশিলে তাহাকে পুনরায় হৃদয়ে অনাহত পদ্মে আনিতে হয়। (ইহাকে বক্ষশ্বাস কহে)। বক্ষঃস্থল হইতে সেই বায়ু কণ্ঠে নিরোধ করিতে হয়। (পীড়িত ব্যক্তিরা ইহাতেই বিনষ্ট হয়, ইহাকেই কণ্ঠশ্বাস কহে)। যোগীগণ কণ্ঠ হইতে সেই বায়ুকে তালুতে লইয়া যান। তালু হইতে সেই বায়ুকে আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করাইয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া একেবারে নিরোধ পূর্ব্বক জিহ্বাকে তালু ছিদ্রে প্রবেশ করণান্তর প্রাণায়াম অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তা করিতে থাকেন। প্রাণায়ামীদের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, কারণ প্রাণাদি বায়ুগণের ক্রিয়াতেই ক্ষুধাদি হইত, তাহা নিরুদ্ধ হইলে আর ক্ষুধাদি ক্রিয়া কি প্রকারে হইবে? প্রাণায়ামাবলম্বন করিয়া যোগী জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে অনন্তকাল জীবিত থাকিতে পারেন। জীবনী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, ঐ বায়ুকে সুষম্না নাড়ীতে প্রবেশ করাইয়া জ্ঞানপদ্মরূপ সহস্রদল পদ্মে ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে তাহা ভেদ করিয়া ব্রহ্মতালু দ্বিধা করত বাহির করিয়া দেন, ইহাকে ইচ্ছা মৃত্যু কহে; ইহাতে স্মৃতির নাশ হয় না, জ্ঞানের নাশ হয় না; তাহা প্রমাণাসাধ্য!! ইহাকেই ঈশ্বরে জীবন প্রদান কহে।

শিঃ। কর্ম্ম দ্বারা সুকৃতি লাভ করিলে লোকে কি পর জন্মে একেবারে জ্ঞানবান্ ও ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারে?

গুঃ। কর্ম্ম দ্বারা সুকৃতি লাভ করিলে লোকে বাহিরে, বা তপঃ, জন, সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে; কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করিতে কখনই পারে না। আত্মজ্ঞানী বা ঈশ্বরানুগ্রহে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রভাবে ঐ সকল লোকের বাহিরের কথা দূরে থাকুক, প্রতি জীবের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। অষ্টসিদ্ধিবান্ ব্যক্তির ঐ প্রকার অবস্থা যথার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা যোগ শাস্ত্রের নিয়ম।

শিঃ। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা কিরূপ?

গুঃ। সর্ব্বতীর্থে স্নান, অসংস্কৃত দেহ ধারণ, সামান্য শয্যায় শয়ন, এবং সামান্য পবিত্র আহারীয় ভোজন করিয়া অবধূত বেশে আত্মীয়গণের অলক্ষিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে হরিতোষণ ব্রত সমূহ আচরণ করাকেই

ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা কহে। ইহার গূঢ়ভাব বুঝিতে হইবে। অনাশক্ত ভাবে সংকর্ম্ম ফলের অবস্থাকে সর্ব্বতীর্থে স্নান কহে। ভোগবিহীনতাকে অসংস্কৃত দেহ কহে। সর্ব্বত্র শান্তিলাভকে সামান্য শয্যায় শয়ন কহে। রিপু প্রভৃতি হইতে স্বাধীনভাবে থাকাকে পবিত্র ও সামান্য আহারীয় ভোজন কহে। ইন্দ্রিয়াদি হইতে স্বাধীন হওনকে অবধূত বেশ অর্থাৎ জটাবল্কলাদি ধারণ কহে। এ স্থলে আত্মীয়গণের অলক্ষ্য বলিতে অধর্ম্মলিপ্সা অলক্ষ্যে। পৃথিবী বলিতে সমস্ত সংসার। ব্রত বলিতে মানসিক শান্তির সাধন। যজ্ঞে আত্মতত্ত্ব গৃহীত হয়,আর ব্রতে বাসনার পরিশুদ্ধতা হইয়া থাকে। এরূপ নিয়ম মনে প্রাকাশ করা যে যাহার দ্বারা সদাতুষ্ট হরির তুষ্টি গ্রহণ করা যায়। ইহার ভাব এই যেঃ—ঐ বুদ্ধি যখন জীবের হৃদয়ে অর্থাৎ জীবের উপভোগ্য মনোরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিল, তখন উহা নানা প্রবৃত্তিতে জীবের বাসনায় মুগ্ধ হইয়া ছিল। এক্ষণে সদা তুষ্ট হরির চৈতনময় প্রকৃত মনো রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব অবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। জীবের ভোগগৃহ ত্যাগ করিলেই আপনিই সেই সংস্কার প্রকৃতি করিয়া দেয়।

শিঃ। তীর্থই বা কি? আর তীর্থ দর্শনেই বা ফল কি?

গুঃ। তীর্থ মাত্রেই ধর্ম্মার্জ্জনের স্থান। যেমন সামান্য হট্টে কেহ বস্তু ক্রয় করিতে, কেহ বস্তু বিক্রয় করিতে গমন করে, তদ্রূপ তীর্থও ধর্ম্ম ও জ্ঞানোপদেশের বিক্রয় স্থান। তথায় কেহ ধর্ম্ম জ্ঞানোপদেশ ক্রয় করিতে গমন করে, কেহ বা তাহা বিক্রয় করিতে গমন করে। ইহার এই ভাবার্থ যেঃ—মনুষ্যেরা চারি প্রকার অবস্থা এই সংসারে প্রাপ্ত হয়। ঐ চারিটীর নাম, উত্তম, মধ্যম, অধম, অধমাধম।

যাহারা জন্ম মাত্র মায়াকে বুঝিয়া মায়াতে মুগ্ধ না হয়, তাহাদিগকে উত্তম অবস্থার লোক কহে। উত্তমাবস্থার লোকগণ বিনা শিক্ষায় প্রকৃতি দেখিয়া জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন। এই অবস্থায় নারদ, শুকদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন।

যাহারা মায়াতে আবৃত হইয়া পুনরায় সাধন বলে সত্বরে মায়া ত্যাগ করিতে পারে, তাহাদিগকে মধ্যমাবস্থার লোক কহে। মধ্যম অবস্থার লোকেরা সাধনা বলে আপনারাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এই অবস্থায়

মহর্ষিগণ, পরমহংসগণ, ও অপরাপর আত্মজ্ঞানীর শ্রেণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহারা মায়াতে আবৃত হইয়া উপাসনা ও কর্ম্মবলে জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদিগকে অধম অবস্থার লোক কহে। এই অবস্থায় প্রায় সকল সংসারীই আবদ্ধ। অধম অবস্থার লোকেরা গুরুর উপদেশক্রমে ভজন, পূজন, যজন প্রভৃতি দ্বারায় জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যাহারা কর্ম্ম উপাসনা প্রভৃতি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ঘোর পাপী হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে অধমাধম অবস্থার লোক কহে। এই অবস্থার লোকেরা গুরু উপদেশেও জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না; কারণ তাঁহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। সেই ভক্তি ও বিশ্বাস না হইলে জ্ঞান পাইবার উপায় আর নাই দেখিয়া তাঁহাদের কারণই তীর্থের প্রয়োজন। তীর্থে ঈশ্বরের মায়াজাত মূর্ত্তির প্রতিমা স্থাপিত থাকে। উপদেশ দিবার কারণ বহু গুরু তথায় উপস্থিত থাকেন।

মানবের জীবাত্মা কখন কলুষিত হয় না। মন রিপুর বশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে একেবারে অধীন করিলে তাহাদের বুদ্ধি হিতাহিত ক্রিয়াশূন্য হয়। হিতাহিত ক্রিয়াশূন্য হইলে নাস্তিক হইতে হয়। স্বর্ণ যেমন আপন উজ্জ্বলতা পঙ্কাবৃত হইলেও রক্ষা করে, তেমনি যিনি যতই পাপী হউন, জীবাত্মা জ্ঞানের অনুভবে আবৃত থাকিবেই থাকিবে। তাহাতে পাপী মাত্রেই অনুশোচনা উপস্থিত হয়।

বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ ও ভক্তিতে বিশ্বাসস্থির করিতে অধমাধমকে তীর্থে গমন করিতে হয়। তীর্থে যাইবার কারণ এই:—নয়নের স্বধর্ম্মে লোকে ক্ষণেক মুগ্ধ হয়। তীর্থস্থ প্রতিমাদি দেখিয়া, স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া, যোগিগণের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা দেখিয়া নাস্তিক প্রথমেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। ঐ মোহে সে আরো মুগ্ধ হইতে ইচ্ছা করিয়া সাধুসেবা করে। তাহাতে তাহার ভক্তি উপস্থিত হয়। ভক্তি হইলে বিশ্বাস দ্বারা সে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

সংসার কলুষিত মনকে বিশ্বাসের পথে পথিক করিতে আর্য্য ঋষিগণ কত কত পীঠস্থান, কত কত তীর্থস্থান, জপ এবং সাধনা সিদ্ধির কারণ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সংখ্যা করা যায় না। তন্ত্রোক্ত মতে মহাপীঠস্থানে জপকরণ এবং তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ এ সমস্তই মনোরূপ মত্ত হস্তীকে বশ করিতে বই আর কোন

কারণ নহে। মন একটী পারদলগ্ন দর্পণের ন্যায়। দর্পণকে যেমন যে স্থানে রাখা যায়, তথাকার চিত্র তাহাতে পতিত হয়; তেমনি মনও এই ভুবনের যে অবস্থায় বা যে আচারের মধ্যে পতিত হয়, তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। পীঠস্থানে বা তীর্থ স্থানে সর্ব্বদাই সকলে ঈশ্বরের অর্চনা, ঈশ্বরের মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে। তাহা দেখিয়া মুগ্ধমন তাহাতে সহজে মুগ্ধ হয় বলিয়া ঋষিগণ তীর্থ বা পীঠস্থানের অবতারণা করিয়াছেন। পীঠাদি স্থানে মন শীঘ্র বশীভূত হয় বলিয়া অতি ত্বরায় ধারণার উদয় হইয়া থাকে। এই প্রমাণে এই বোধ হইবে। যেমন রোগীর পক্ষে ঔষধ ব্যবস্থেয় আর নীরোগীর পক্ষে নয়, তেমনি চঞ্চল চিত্তের পক্ষে তীর্থ প্রয়োজনীয়, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। ঋষিগণ একাবারে মনকে ইন্দ্রিয়গণের সহিত বশীভূত করিয়া জ্ঞাননেত্রে সমস্ত দেখিতে ছিলেন। তাঁহারা জীবন্মুক্ত অবস্থা উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের চিত্তের চাঞ্চল্যও নাই, তীর্থের প্রয়োজনও নাই।

শিঃ। সাধু সহবাস করিবার কারণ কি?

গুঃ। মায়া হইতেই শোক, ব্যাধি ও অপরাপর বিপদের উদ্ভব হইয়া থাকে। মায়া ত্যাগী জনের ঐ সকল কখনই সম্ভব হয় না। যেমন দুঃখী সুখীর আশ্রয়ে থাকিয়া সুখ আহরণ করিতে চেষ্টা করে, তেমনি মায়ায় মুগ্ধ বিপদাক্রান্ত সংসারিগণও সেই বিপদ হইতে শ্রান্ত মনকে শান্ত করিতে সাধুগণের স্মরণ বা সাধুসেবা করিয়া থাকে। যেমন মাতা পিতা শরীরের জন্ম দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা এই দেহকে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিতে পারেন, এমন বিশ্বাস থাকাতেই দেহেতে কোন কষ্ট পাইলে ঐ সকল গুরুজনকে স্মরণ করা যায়, তেমনি মায়াজাত কষ্ট নিবারণার্থে সাধুগণের পন্থা স্মরণ এবং তাঁহাদের সহবাস করা বিধেয়। এই জন্য প্রভাতে প্রদোষে নানাবিধ পুণ্য শ্লোকের স্তোত্র পাঠ শাস্ত্রে লিখিয়াছেন।

শিঃ। ধর্ম্ম পন্থা কি? আর অধর্ম্ম পন্থাই বা কি?

গুঃ। দ্যূত, পান, নারী ও সূনা এই চারিটীই প্রধান অধর্ম্ম। ছলনা জাত ক্রিয়া মাত্রকেই দ্যূত কহে। দ্যূত দ্বারা সত্যের নাশ হয়। মদ্যাদি পানকে পান কহে। পান ক্রিয়ায় মদ আবির্ভূত হয়। প্রাণি বধকে সূনা কহে। সেই মদের দ্বারা নাশ হইয়া থাকে। মায়াযুক্ত মন্দাদি বোধক ক্রিয়া স্মরকে

স্ত্রী কহে। নারী সঙ্গে অপবিত্রতা হয়। সেই অপবিত্রতাই তমোনাশের কারণ। ঐ চারিটি অধর্ম্ম দ্বারা চারিটী ধর্ম্মাংশ নাশ হইয়া প্রকৃতি বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। মিথ্যা, কাম, মদ, রজঃ, বৈরীভাব এই পাঁচটী ঐ পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম হইতে প্রকাশ হয়।

কিন্তু ধর্ম্ম হইতেই অধর্ম্মের প্রকাশ হয়, ইহা একেবারে মীমাংশায় চূড়ান্ত রূপে প্রমাণিত আছে। যেমন দুগ্ধ হইতে ক্ষীর মাখন প্রভৃতি হয় এবং তক্র দধিও হইয়া থাকে; তদ্রূপ এই অবিদ্যা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় মন হইতে পুণ্যময় ও পাপময় উভয় ভাবেরই আবির্ভাব আপনিই হইয়া থাকে। ঐ পুণ্যময় ভাবকে ধর্ম্ম কহে। তৎসাহায্যে মায়ায় কলুষিত হওয়া যায় না। আর ঐ পাপময় ভাবকে অধর্ম্ম কহে; তদ্দ্বারা মায়া মণ্ডিত হইয়া বিষ্ঠাজাত কীটের ন্যায় হইতে হয়।

ধর্ম্ম পন্থার চারিটী উপায় আছে। দয়া, সত্য, তপস্যা, পবিত্রতা। এই জীবদেহের স্বভাবটি বড় কোমল পদার্থ। ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ উহাকে ভোগ করে। ইন্দ্রিয়গণ ও রিপুগণ যখন স্বভাবের বশীভূত না হয়, তখন বিপরীত ভাবের আবির্ভাব হয়। যেমন এক জন ইন্দ্রিয় দমন করিবার কারণ হট যোগ আরম্ভ করিয়া একভাবে এক স্থানে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহার মন ভক্তি বা বিশ্বাস পাইল না। কারণ সে বিশ্বাস শিক্ষা করে নাই। অতএব অবিশ্বাসযুক্ত হট ক্রিয়ায় তাহার ইন্দ্রিয় তেজোহীন হইল। সে যে সাধনায় যাইতে ছিল, তাহাতে সিদ্ধ না হইয়া অধর্ম্মের বশীভূত হইল। সে যে সকল মাদক দ্রব্য সেবনে মনকে দৃঢ় করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিল; তাহার বিকার ক্রিয়া বশে সে মাদকেরই বশীভূত হইল; তাহার যোগ-ভঙ্গে একেবারে আলস্য ও মাদকতার ঘোর অনার্ম্মিক হইয়া উঠিল। এইরূপ নিয়মে অবস্থান করিয়া ক্রিয়াবশে স্বভাব রিপুর বশীভূত হইলে ঈশ্বরে তাহার অবিশ্বাস হইল। জীবাত্মা সেই পাপীর দেহের ভৃত্য হইল। ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ জীবাত্মাকে ভৃত্য করিয়া তাহার সাহায্যে অধর্ম্ম প্রভাবে সেই দেহ রাজত্বে রাজত্ব করিতে থাকে। স্বভাবও রিপু এবং ইন্দ্রিয়ের বলে আসিয়া মন, বাসনা, জীবাত্মা প্রভৃতির সহিত কোটী কোটী জন্ম নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এই দেহেই স্বর্গভোগ ও নরক ভোগ হয়। দেহের ও মনের শান্তি, হৃদয়ের বিশ্বাস। সকল বিষয়

বিভবে চিন্তাহীন হইলে, আত্মজ্ঞানে পরমানন্দের অনুভব করিতে পারিলে, তবে এই দেহেই স্বর্গলাভ হইবে। নচেৎ পাপে মগ্ন থাকিয়া কৃমির ন্যায় হইতে হইবে।

শিঃ। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, মনের ভাব কিরূপ হয়।

গুঃ। যতক্ষণ সমাজ, ততক্ষণ উচ্চ নীচ কুল। যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ তুমি আমি ভেদ। যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচার। এই কয়েকটী অবস্থা ত্যাগ করিলে সব এক। যাঁহারা বৈষ্ণব পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহাদের সমাজ কি করিবে? তাঁহারা দেহের মান্য চাহেন না, তাঁহাদের ভেদ জ্ঞান কি করিবে, তাঁহাদের সংসর্গ বা মান্য কি করিবে? তাঁহারা রিপুর বশে আত্ম গরিমা চাহেন না। তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সমজ্ঞানে এক পদ্মে যেমন ভ্রমর, মধুকর, খঞ্জন, একত্রে মধুপান করে, তদ্রূপ সকলেই সেই হরিপাদপদ্মের মধুপান করিতে ইচ্ছা করেন।

শিঃ। জ্ঞানের মূর্ত্তি কি রূপ?

গুঃ। আত্মায় তুষ্ট যে ব্যক্তি, তাঁহার মূর্ত্তি অতিশয় তেজোবান্, সর্ব্বাবস্থায় সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে:—জ্ঞান জীবের মিত্র, আর মায়া জীবের শত্রু। মায়াতে সুখ ও দুঃখাদি রূপ নানা প্রকার আন্তরিক পীড়ায় জ্বলিতে হয়। তাহাতেই চিন্তা নামক অগ্নি শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি যে প্রকার চিন্তা করিবে, তাহার সেই প্রকার বাহ্যভাব প্রকাশ হইবে এই নিয়মে মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখিলেই হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করা যায়। সুখ চিন্তা ও দুঃখ চিন্তা উভয়ই অগ্নি। দুঃখ চিন্তায় অন্তঃকরণ ক্লেশানুব করে, এই জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ অল্পকালেই ক্লান্ত হয়। তাহাতেই আয়ু সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই মৃত্যু হয়। শরীরের খর্ব্বতা এবং নানা প্রকার পীড়ায় শরীরকে জীর্ণ করে। সুখ চিন্তায় অন্তঃকরণ প্রসাদিত থাকে; এই কারণে শান্তিভাব বাহ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। এই উভয় চিন্তাই জ্ঞানের শত্রু। জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে একেবারে চিন্তাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, চিন্তার নির্ব্বাণে নিদ্রাগত ব্যক্তি সুখস্বপ্নদর্শনাবস্থায় আনন্দময় মূর্ত্তিতে যে ভাবে নিদ্রিত থাকেন; জ্ঞানীর সেই সুখমূর্ত্তি প্রকাশ হয়। এই দেহ বহুরূপীর গঠনে গঠিত। ইহার অন্তরে যে ভাব প্রকাশিত হইবে, বাহিরেও তাহা দেখা যায়। ইহার

প্রমাণ অধিক কি দিব, একটী স্থূলকায়কে যদি প্রাণদণ্ড করিব বলিয়া কোন কারাগারে এক নিশা রাখা যায়; পরদিন প্রভাতে তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দেখিলে বেশ দেখা যায় যে, তাহার মৃত্যুচিন্তা দেহের অর্দ্ধেক কান্তি নাশ করিয়াছে। আবার সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ যদি রাজ সিংহাসনে বসান যায়, তাহা হইলে সে আবার পূর্ব্বাপেক্ষা কান্তিধারী হইয়া থাকে। যখন সুখ দুঃখের এত পরিবর্ত্তন, তখন আনন্দে যে কত পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা আর বলা যায় না। জ্ঞানে সর্ব্বদা প্রশান্ত হৃদয় হয়। জ্ঞানীর শরীর হইতে এমন ভাবে একটী তেজ প্রকাশিত হয় যে, তাহার দ্বারা অজ্ঞানীর নয়ন দৃষ্টি কুণ্ঠিত হয়। ইহার প্রমাণ এই যে, তেজ হইতেই রূপের উৎপত্তি। যেমন তেজোহীন হইলে পীড়া হয়, সেই পীড়ায় মানবের রূপ নাশ হয়; তেমনি আবার সুস্থ হইলে রূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ জানা যায়, তেজ হইতেই রূপের প্রকাশ। যাঁহারা পূর্ণ জ্ঞানী তাঁহারা সুস্থ, অতএব পূর্ণ তেজোবান্। অজ্ঞানী পূর্ণ সুস্থ নহে, এই কারণে সে জ্ঞানীর সহিত সমান তেজবান্ নহে। যেমন স্বল্প দীপ্তিমান প্রদীপ সূর্য্যের আলোকে তেজোহীন হয়; তেমনি অল্প তেজোবান্ অজ্ঞানী জ্ঞানীকে অধিক তেজোবান্ দেখে।

শিঃ। অষ্টাঙ্গ যোগ কি রূপ?

গুঃ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগক্রিয়ায় যোগী সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্নান ও হোমাদি ক্রিয়ার ধর্ম্ম শিক্ষাকে নিয়ম কহে। হটযোগে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া উপবেশন বিধিকে আসন কহে। শ্বাস রোধ করাকে প্রাণায়াম কহে। ইন্দ্রিয়গণকে মনের অধীনে আনিয়া তাহাদের জয় করাকে প্রত্যাহার কহে। ঈশ্বর ভাবনাকে ধারণা কহে। আপনাকে বিষয়রূপ হইতে গুণাতীত করাকে ধ্যান কহে। অর্থাৎ ধ্যানে আপনাকে ঈশ্বরময় ভাবিতে আরম্ভ করিতে হয়। সত্ব, রজস্তমোগুণী থাকিলে বিষয়াসক্ত হইতে হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া জড়ভাবাবলম্বন করিলে তাহাকে ধ্যানাবস্থা কহে। আত্মাকে পরমাত্মাময় দেখিয়া দেহকে আধার স্বরূপ বুঝিলে তাহাকে সমাধি কহে। এই সমাধিতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা কোন প্রকার বাহ্য জ্ঞান থাকে না। বুদ্ধি অন্তরে আনন্দ ভোগ করিয়া অন্তরে বিলীন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বাক্য নির্গত হয় না, নয়ন উন্মীলিত হয় না, প্রাণবায়ু

স্তম্ভিত হইয়া থাকে মাত্র। এই সমাধিস্থ যোগীর মায়াজাত গুণক্রিয়া নাশ হইয়াছে, মায়ার সহিত তাঁহার বাসনাও নষ্ট হইয়াছে। বাসনা যখন বিনাশ হইয়াছে, তখন তাঁহার মুক্তি অবশ্যই হইবে। তিনি সমস্ত কারণাদিকে নিরুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়াছে, তাঁহার মনস্থিত আশা নিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি আহারেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়চেষ্টবিহীন হইয়াছেন। এক্ষণে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া আছেন। এইটী সমাধির শেষ অবস্থা।

শিঃ। যোগী পুরুষের সমাধি অবস্থায় যদি কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে, তাহাতে কি কি দোষ হয়?

গুঃ। এই সমাধি অবস্থায় ক্ষণেক অন্য মনস্ক বা অন্য কথা কহিলে বহু দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে নয়টী প্রধান:—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকতা, চঞ্চলতা। পাতঞ্জলে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

শিঃ। ব্রহ্মলীন-ভাবনা কি রূপ?

গুঃ। আমি শব্দ আত্ম ভিন্ন আর কাহারো উপাধি নয়। সেই আত্মাকে বিদ্যাশক্তি বলে দেখিলে নিগুর্ণ বোধ হয়, নিগুর্ণ হইলে তাহার কার্য্যও নাই বলিতে হইবে। কার্যকেই লিঙ্গ কহে। কার্য্যমাত্রেই বিনাশশীল। আত্মকার্য্য শূন্য, অতএব অবিনাশী। যাহা সম্ভব অর্থাৎ প্রকাশিত বা নবপ্রস্তুত হয়, তাহা প্রকৃতিমতে বিনষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা যখন বিনাশরহিত, তখন তিনি অসম্ভব অর্থাৎ জাত নহেন। এই সকল লক্ষণ ঈশ্বরের ভিন্ন আর কাহারো হইতে পারে না, অতএব আত্মাও ঈশ্বরের স্বরূপ। আত্মাই যখন আমি, তখন আমিও ব্রহ্ম স্বরূপ বলিতে হইবে। এই ভাবনাকে ব্রহ্মলীন ভাবনা কহে।

শিঃ। সজ্ঞানে ব্রহ্মে লীন হইয়া কিরূপে দেহত্যাগ করিতে হয়?

গুঃ। ঈশ্বরে সম্মিলিত হইবার জন্য আপনাতে প্রজাপত্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ইষ্ট অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়। কারণ উহার দ্বারা যোগাঙ্গের সাধনা স্থির হইয়া থাকে। সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া স্নেহশূন্য ও অহঙ্কারহীন হইতে হয়। সংসারের সহিত যত প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ থাকা যায়, তাহাদিগকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হয়। বাহ্যিক বাক্য ত্যাগ করিয়া তাহাকে ইন্দ্রিয়াদির সহিত মনে অর্পণ করিতে হয়। মনকে যোগবলে প্রাণে অর্পণ

করিতে হয়। প্রাণকে অপানে আকর্ষণ করিয়া অপানের সহিত মৃত্যুব্যাপার সমস্তকে সেই যোগে পঞ্চত্বে উৎসর্গ করিয়া আপনি আত্মাকে ব্রহ্মরূপী ভাবিতে হয়। ইহাকেই জীবন্মুক্তি কহে।

শিঃ। ব্রহ্ম নির্ব্বাণ কি রূপ?

গুঃ। বিচক্ষণ বলিতে জ্ঞানী; ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানী সেই ব্রহ্মগতি লাভ করিবার জন্য ইহ ও পরলোকের কামনা পরিত্যাগ করেন। ভক্তি কর্ম্ম করিয়া অনেক সাধকে পরলোকে স্বর্গাদি ভোগ বৈকুণ্ঠাদিভোগ বাসনা করেন। বাসনা মতে জীবের জন্ম। বাসনা পবিত্র হইলে জীবের পবিত্র জন্ম হয়। কিন্তু জন্ম হইলেই মায়ার অধীন হইতে হয়। তাহাতে পুনরায় পাপের ভয় থাকে। সেই জন্য জ্ঞানবান্ ভক্ত আর জন্ম মরণের ইচ্ছুক না হইয়া সকল কামনা বিসর্জ্জন করেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মকেই স্বরূপ ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়া কি স্বর্গ কি মর্ত্ত্য কোন আশাই করেন না।

শিঃ। তুরীয় অবস্থা কাহাকে বলে?

গুঃ। প্রাণাদি বায়ুকে প্রাণায়ামাদি দ্বারা রোধ করিয়া বাসনার সহিত ঐ প্রাণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়। মন এবং বুদ্ধিই বাহ্য বিষয়ের কর্ত্তা। বাহ্য বিষয়ের অনুভব রোধ না করিলে আন্তরিক ক্রিয়ার আবির্ভাব হয় না। সেই কারণে মন ও বুদ্ধিকে বাহ্য বিষয় হইতে গ্রহণ করিয়া ঐ প্রাণের সহিত মিলাইইতে হয়; তাহা হইলে দেহের সর্ব্ব ক্রিয়া একত্র হইয়া যায়। সেই অবস্থাকে তুরীয় অবস্থা কহে। হৃদয়ে প্রাণ, মন, বাসনা, বুদ্ধি একত্রিত হইলে, যে ভাবনা করা যায়, তাহার স্বরূপ অনুভব হয়ই হয়। তাহার প্রমাণ যোগশাস্ত্রে বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি যাহারা অষ্টাঙ্গ যোগ সিদ্ধ হইয়া, ঐ তুরীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহারা অদৃষ্ট বস্তুকেও দেখিতে পায়েন; অচিন্তনীয় ভাবকেও বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। ঐ সমস্তই তেজের ক্রিয়া। যেমন একটী বিষয় কার্য্য করিতে হইলে ক্ষণেক হৃদয়ে মনকে স্থির করিতে পারিলে, বুদ্ধি তাহার সদুপায় প্রকাশ করিয়া থাকে; তদ্রূপ একেবারে বাহ্য ক্রিয়া নাশ হইলে এবং হৃদয়ে ব্রহ্মভাবনা করিলে ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকেই। তাহার অধিক প্রমাণ বাক্যে প্রকাশ হইবার নহে; ক্রিয়ায় বুঝাইতে হয়।

শিঃ। যোগের কোন অবস্থায় দেহী বাহ্যে জড়বৎ প্রতীয়মান হয়েন?

গুঃ। ঐ তুরীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলে আর তিন স্থান জয় করিতে হয়। ঐ তিনটীর নাম জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন। এই জগৎ সংসারে এত বস্তু দেখা যায়; ইহা কি সকল সময় স্মরণ থাকে, কখনই নহে। ঐ জাগ্রৎ, সুষুপ্তি এবং স্বপ্ন, এই তিন অবস্থায় জীব সংসারের সকল সুখ দুঃখ বিস্মৃত হয়। জাগ্রতে ক্রিয়া করিলে নিদ্রায় স্মরণ থাকে না। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা জাগরণে বিশেষরূপে বুঝা যায় না। ইহার কারণ কি? মনের চঞ্চলতা। মনই স্মৃতির আধার। মন জাগরণে নানা কার্যাক্ষম হইতেছে। নিদ্রায় জীবাত্মার সুখানুভব করিতেছে; স্বপ্নে প্রাচীন স্মৃতি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। এই প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তনে বহুদিনের ঘটনা একেবারেই বিস্মৃত হওয়া যায়। কিন্তু ঐ তিন অবস্থাকে জয় করিয়া তুরীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলে, বাহ্যিক স্মৃতি অন্তরে যাইয়া বিরাজিত থাকে। বিষয় চেষ্টা না থাকায় জ্ঞানেন্দ্রিয় সাধনার ধন হরির অনুভব, নিরন্তর হৃদয়ে করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় দেহী বাহ্যে জড়বৎ প্রতীয়মান হয়েন, কিন্তু অন্তরে তাঁহার চৈতন্যরাশি অনলবৎ জ্বলিতে থাকে। বাহ্যজ্ঞান রোধকে অবিক্রিয়া কহে।

শিঃ। যোগিগণ শ্বাস জয় করিয়া দীর্ঘায়ু হইতে চেষ্টা করেন কেন?

গুঃ। লোকেরা সংসারে আপাততঃ মনোহর কত কত সারাসার বস্তুতে মুগ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মে কায়িক সুখ সম্পদ কিছুই নাই; কেবল ইহ জগতে আত্মার পরমানন্দ অনুভব করা যায় মাত্র। অতএব ভগবানের এমন গুণ যে, লোকে সেই আত্ম শব্দকে এত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে যে, জাগতিক সংস্থিতি সহসা ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমহংসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে নিঃশব্দ হইয়া পর্য্যটন করে। যাঁহারা আত্মানন্দ উপভোগ করিয়া দেহরক্ষা করত জীবন্মুক্ত হয়েন, তাঁহারাই পরমহংস পদে বাধ্য হয়েন। বৈষ্ণবগণের পক্ষে পরমহংস পথই শ্রেষ্ঠ পথ। দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিলে, স্বরূপানন্দের উপভোগ হয় না। এই জন্য যোগিগণ শ্বাসজয় করিয়া যোগবলে দীর্ঘায়ুঃ হইতে চেষ্টা করেন।

শিঃ। মুক্ত ও বিমুক্ত এই দুই শব্দের প্রভেদ কি?

গুঃ। মুক্ত বলিতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অহঙ্কাররূপী অজ্ঞানাবরণ দ্বারা অনবরুদ্ধ। মুক্ত বলিতেই যথেষ্ট শুদ্ধভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। অহঙ্কারাত্মক

ও অভিমানাত্মক অজ্ঞানে যে আবদ্ধ হয়, তাহার পরিশুদ্ধাবস্থায় তাহাকে মুক্ত কহা যায়। বিমুক্ত বলিবার তাৎপর্য্য কি? না বিশেষরূপে মুক্ত। অর্থাৎ যিনি আদি হইতে অন্ত পর্যান্ত কোন সময়েও ঐ অজ্ঞান দ্বারা আকৃষ্ট নহেন বলিয়া তাঁহাকে বিমুক্ত বলা যায়।

শিঃ। যাঁহারা মুক্ত পুরুষ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ নহে, তাঁহারা কি কারণে শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তন করিবে? মুক্ত হইলে তো কোন আশা থাকে না?

গুঃ। তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ। কিন্তু শ্রীহরি এমনি গুণ সম্পন্ন বস্তু যে, তাহার গুণে মুক্ত পুরুষের মনও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জলে কমল স্বভাবতই প্রকাশ হয়, কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপ না হইলে প্রস্ফুটিত হয় না; তদ্রূপ মুক্ত পুরুষেরাও যদি হরিতে মনোনিবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাদেরও মন কলুষিত হইবার সম্ভাবনা; কারণ মায়াকে বিশ্বাস নাই।

শিঃ। সাধুসঙ্গ লইবার ফল কি?

গুঃ। মনকে পরিশুদ্ধ করিতে না পারিলে কখনই সাধুসঙ্গ বোধ হয় না এবং সাধুসঙ্গ না হইলে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তিনি যে সকলের সন্নিহিত হইয়া সমস্ত পালন সৃজনাদি করিতেছেন, ইহা বোধ হইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস হয় না। অতএব যাহাদের বাসনা ইন্দ্রিয়শক্তিগণকে বাহ্য ক্রিয়ায় অর্থাৎ বিষয়সুখে নিরত করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বদাই অসদ্বর্ত্তি অর্থাৎ কামাদি রিপুপর ইন্দ্রিয়শক্তিময় হইলে উহাদের আকর্ষণে মনকেও তৎপর করিয়া থাকে। যাহাদের মন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম না হয়, তাহারা ঈশ্বরের মহিমাপ্রকাশরূপী ভক্তগণকেই বোধ করিতে পারে না, কারণ সাধুসঙ্গ না হইলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ঈশ্বর উপলব্ধি হইতে পারে না।

শিঃ। ঈশ্বরানন্দ লাভ করিবার উপায় কি?

গুঃ। বিদ্যাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ। মায়ামধ্যগত চৈতন্যের বিজ্ঞানময় প্রতিভাকে বিদ্যাশক্তি কহে। জীব যদি কর্ম্মফল নাশ করিবার জন্য সেই বিদ্যাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করিতে পারে।

শিঃ। আত্মা ভিন্ন ব্রহ্মকে অনুভব কেহই করিতে পারে না, কিন্তু জীবাত্মার কি ব্রহ্ম অনুভবের ক্ষমতা নাই?

গুঃ। প্রকাশ্য সকল বস্তু যাহা সৃষ্টি জীবের জীবনের উপাদান রূপে দৃষ্টি গোচর হয়, সে সমস্তই মায়ার দ্বারা সংশ্লিষ্ট বলিয়া সৃষ্ট-জীব মাত্রেই মায়াতে ভুলিতে থাকে অর্থাৎ বিস্ময়ের দ্বারা কর্ম্মী হওয়াতে বিস্ময়ের অতীত হইতে না পারাতে সত্যকে দেখিতে পায় না। সত্য যদি তাহাদের নহে, তবে সৎবোধ হয় কেন? না, তাহাতে ব্রহ্মতেজ মায়ার দ্বারা প্রভাসিত হইতেছে। এই জন্য সত্যকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা প্রকাশ রহিয়াছে। কারণ বাস্তবিক মিথ্যা কিছুই নহে, সত্যের আশ্রয়ীভূত ছায়া মাত্র। ইহাতে ইহা বুঝান হইল যে আত্মা ব্যতীত জীবাত্মার কোন ক্ষমতা নাই যে বিস্ময় বা মায়াগত কার্য্য ব্যতীত উহা আর কিছু বোধ করিতে পারে। কিন্তু জীবাত্মা যে চিরকাল মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, আপনার স্থিতি ও গতি দেখিলে মুক্ত হইতে পারিবে, এমন শক্তিও তাহাতে আছে।

শিঃ। কিরূপ অনুভবে ঈশ্বর স্বরূপ বোধ হয়?

গুঃ। রূপধারী জীব মাত্রেই একেবারে অপরূপ ধারণা করিতে পারে না। সেই নিমিত্ত পূজা, উপাসনা, মন্ত্রধারণা প্রভৃতির কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন কোন রোগীকে নীরোগী করিতে হইলে প্রথমে তাহার রোগ স্থির করিয়া পরে রোগনাশকারী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়; তবে রোগ নাশ পায়; তদ্রূপ যে ঈশ্বরকে কেহ কখন দেখে নাই; অথচ কর্ম্ম দেখিয়া অনুভবে তাহাকে অনুমান করিয়াছে, সেই অনুমানীয়রূপে মিশিতে হইলে, সেই অনুমানীয় রূপের চিন্তা করিতে হয়। অনুমানে যে সকল প্রভাব প্রকাশ হইয়াছে; তাহা মনে অবলোকন করিতে করিতে সেই চিন্তাশীল ব্যক্তির স্বরূপ বোধ হয়। তাহা বোধ হইলেই তাহাতে তন্ময় ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া যায়। স্বপ্নে যেমন মন স্থির হয়, এমন আর কখন সংসারির পক্ষে ঘটে না। স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায় তাহা যেন স্পষ্ট ও তাহাতে মগ্ন আছি বলিয়া বোধ হয়; তদ্রূপ যোগিগণের মন স্থির হইলে আপনাকে ঈশ্বরে মণ্ডিত দেখে।

শিঃ। মানসী পূজা কিরূপ?

গুঃ। এই দেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। স্থূল ভাগ ভূতময়, ইহা কেবল কূর্ম্মাবরণের ন্যায় সূক্ষ্ম ভাবের আবরণ মাত্র। সেই সূক্ষ্ম ভাব বাসনামতে যে ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিবে, ভূতময় আবরণ তাহাতেই

পরিবর্ত্তিত হইবে। এই মাত্র স্থূল দেহের ক্রিয়া। সেই সূক্ষ্মদেহকে চৈতন্য বা মনোময় কহে। যখন সাধক আপন মনোময় দেহে একমাত্র ঈশ্বরকল্পনা করেন, তখনি তিনি ভক্ত বলিয়া জগতে বিখ্যাত হয়েন; ঐ মনোময় দেহ সমর্পণের নাম ভক্তি। সেই ভক্তি স্থির করিতে হইলে মানসী পূজার আবশ্যক। ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া সেই রূপকে আপনার মনোময় দেহে মণ্ডিত করিয়া আপনার মনোময় দেহে ঈশ্বররূপের প্রত্যেক অঙ্গ কল্পনা করত পূজা করণকে মানসী পূজা কহে।

শিঃ। সংসারী কি স্বরূপ ভাবনা করিতে পারে না?

গুঃ। বৈরাগ্যতেই স্বরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। সংসারাসক্ত চিত্তে স্বরূপভাবের উদয় হয় না। কারণ সংসারে মায়ার খেলায় সর্ব্বদাই মন চঞ্চল থাকে। মনের ক্রিয়া ইন্দ্রিয় সাহায্যে হয়। ইন্দ্রিয় ক্রিয়া বাসনা ও রিপু সাহায্যে হয়। অতএব সংসারী কখনই স্বরূপ ভাবনা করিতে পারে না। স্বরূপ ভাবনার চেষ্টা করিলেই সংসারী বাতাহত মেঘের ন্যায় সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া হৃদয়ে বিশ্বাসকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে।

শিঃ। গুণ কীর্ত্তন শ্রবণের ফল কি?

গুঃ। শ্রবণ, মনন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান ও প্রেমের উদয় হয়। স্বরূপ বোধ না হইলে ঐ প্রেম ধারণা করিতে পারা যায় না। সেই জন্য গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে বিশ্বকর্ত্তার অনুভব মনে মনে করিতে পারা যায়। এই কীর্ত্তনই মহাকীর্ত্তন। এই কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ঈশ্বর ভাবের আবেশ হয়। এই কীর্ত্তন বীজমন্ত্ররূপ ও বীজাক্ষররূপ হৃদয় কমলে বৃত হয়। এই কীর্ত্তনই পরমুখে শ্রবণ করিয়া বাহেন্দ্রিয়কে মুগ্ধ করিতে হয়। এই কীর্ত্তনই সাধনান্তরে ভিন্নরূপে ভিন্ন সাধনায় জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে। কীর্ত্তন ভিন্ন ভাবের আদরের ধন আর নাই। শ্রীহরির গুণ এবং মহিমা শ্রবণ করিলে তাঁহার বিশ্বাস স্থির হইবে। তিনি বিশ্বাসের সাহায্যে প্রেমের দেখা পাইবেন। প্রেমানন্দে মজিলে "সোহহং" ভাব তাঁহাকে আবৃত করিবে। তখন তিনি হরিময় হইয়া পরমানন্দে দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত হইবেন। ধন্য কৌশল। এমন উপদেশ যেন প্রতি পাপী প্রত্যহ শ্রবণ করে।

শিঃ। ঈশ্বরকে পুরুষ বলা হয় কেন?

গুঃ। একভাবে সাধারণ বুদ্ধির গোচর হইবার জন্য সাকার সাজানো হইয়াছে; আর এক ভাবে সকল শোভার আকর স্বরূপ নিরাকার ভাব বুঝান হইয়াছে। সাধারণ সাধকেরা পুরুষ বলিতে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তা বা সকল পুরুষের বা জীবের কর্ত্তা বুঝিবেন। জ্ঞানীতে ব্রহ্মাণ্ডরূপী পুরির অন্তর্যামী নিরাকার ব্রহ্মতেজ বুঝিবেন।

শিঃ। ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বে প্রভেদ কি?

গুঃ। কাল, চৈতন্য, সদসদাত্মিকাশক্তি, মিলনে প্রধান ও মহত্ত্বাবস্থা হয়। সেই অবস্থায়, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রকাশ হয়। ঐ তিন গুণে ঈশ্বর প্রতি-বিম্বিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে অহংকার প্রকাশ হয়। ঐ অহংকার হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মন, দেবতা, ইন্দ্রিয়, ও ভূতাদি প্রকাশ হয়। এই সকল কারণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও স্বরূপ চৈতন্য পতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অণ্ড কহে। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড। পরে ঈশ্বর স্বরূপ চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশিলে এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ঈশ্বর কারণাবস্থায় পরিণতির নাম ব্রহ্মাণ্ড এবং কার্য্যাবস্থায় পরিণতির নাম বিশ্ব। ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বে এই মাত্র প্রভেদ।

শিঃ। বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রভেদ কি?

গুঃ। সংসারে দুইটী পথ আছে। ঐ দুইটীর মধ্যে একটীতে ভোগ সাধনে জীব উন্মত্ত হয়। অপরটীতে বৈরাগ্য সাধনে জীব মুক্তির আশায় আশ্বাসিত হইয়া থাকে।

ভোগ বলিতে প্রবৃত্তি। জীব জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বর হইতে ও মায়া হইতে যে দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া ও কাল কর্ম্ম স্বভাব মতে পরিণাম লাভ করিয়া থাকে; তাহার মধ্যে ঐ ছয় সম্পত্তি মাতা পিতার সম্পত্তির স্বভাব মতে বিকারিত হইয়া প্রত্যেক জীব নূতন স্বভাবান্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার অন্তরে সত্ত্বগুণাধিক্য থাকে, সে কোন না কোন মতে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া নিবৃত্তির অনুসারী হয়। কাহারও স্বভাবে তমোগুণাধিক্য থাকে, এই প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি পথে যাইবার চৈতন্য, উপদেশ বা শিক্ষায় লাভ হইতে পারে।

ইন্দ্রিয়াদি তমোগুণ পর স্বভাব হইলে তাহা হইতে বাসনার ছয়টী বিকার প্রকাশ হয়, তাহাকে ছয় রিপু কহে। যাহার তমোগুণী স্বভাব মণ্ডিত বাসনা

ঐ রিপুপর হইয়া থাকে, তাহাকে প্রবৃত্তিশালী জীব কহে এবং বাসনা রিপু অনুসারী হইলেই প্রবৃত্তি কহা যায়। এই প্রবৃত্তিই ভোগ বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। ঐ রিপু স্বভাবতঃ উহাদের নাশ সহজে হয় না। ঐ রিপু সকলেতে বাসনা নিরস্ত না হইয়া রিপু সকলকে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয় সকলকে জ্ঞানপর করিতে পারিলেই জীব নিবৃত্তির পথিক হইতে পারে। রিপুকে জ্ঞানপর করণের নামই নিবৃত্তি।

এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকেই তন্ত্রেতে দক্ষিণ ও উত্তর মার্গ কহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই দুইটী ভিন্ন পথ নাই। ঈশ্বর এমন দয়ালু যে ঐ দুই পথেতেই আসক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মা এই দুই পথের আশ্রিত ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বলিতে জীবাত্মা। জীবাত্মা বাসনার পরিশুদ্ধতা মতে ঐ দুই পথের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। এই জন্য কেহই ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। যাঁহারা প্রবৃত্তির অনুসারী, তাঁহারা জ্ঞানরূপী দর্পণহীনে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দময় রূপ দেখিতে পাইতেছেন না। যাঁহারা নিবৃত্তির অনুসারী, তাঁহারা জ্ঞানরূপ দর্পণ দ্বারা ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাতে মিশ্রিত হইতেছেন।

এই দুই পথের মধ্যে প্রবৃত্তিসূচক ভোগ বা কর্ম্মসাধন পথকে অবিদ্যা কহে। আর নিবৃত্তিসূচক মোক্ষসাধন পথকে বিদ্যা কহে।

শিঃ। ঈশ্বর কি ভাবে পুরুষ ও কি ভাবে প্রকৃতি?

গুঃ। ঈশ্বর—কাল, চৈতন্য ও সৎ এই ত্রিশক্তিময় হইতেছেন। যখন ঐ তিনটী একটী ভূত হয়, তখনই ঈশ্বরের রূপান্তর হইয়া শক্তি ও বস্তু এই দুই ভেদ হয়।

ঈশ্বরের বাসনা চৈতন্য মিশ্রণে যে ভাবে ক্রিয়াপর হয়েন, সেই ভাবকে শক্তি কহে। স্বতঃ বাসনা চৈতন্যাদি কাল ও সতের সহিত মিলিলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে বস্তু কহে। এক ঈশ্বরই অবস্থা ভেদে বস্তু ও শক্তি হইলেন। শক্তি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বস্তুকে লইয়া যে ভাবে জগৎ প্রকাশ করেন, সেই মিশ্রিত চৈতন্যভাবকে মায়া কহে। ঐ মায়া দুইভাবে বিভক্ত। একাংশ শক্তিগত মায়া। অপরাংশ বস্তুগত মায়া। বস্তুগত মায়া পুরুষ। এবং শক্তিগত মায়া প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সহযোগে পুরুষ কার্য্যপর হইয়া জগৎরূপে

পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। ইহাই শ্রুতির নিয়ম বুঝিতে হইবে। ঐ পুরুষ মায়া হইতে যে চৈতন্য প্রবাহ-বস্তু সংগ্রহ করিয়া জগৎ প্রকাশের উপযোগী করিতে-ছেন, তিনি চৈতন্যময় স্বভাব বা পুরুষ বা পৌরাণিক ব্রহ্মা। আর যে শক্তির সহযোগে স্বভাব ক্রিয়পর হইতেছে, তিনি চৈতন্যের শক্তি বা শক্তি প্রকৃতি। কেহ ইহাকে অবিশুদ্ধা মায়াও কহিয়াছেন।

দেহের মধ্যস্থলকে নাভি কহে। পুরুষের বীর্য্য ঐ নাভিস্থলের নিম্নে রক্ষিত হয়। ব্রহ্মা চৈতন্য প্রকৃতি। ঈশ্বর আপনার অন্তরস্থ বীর্য্য হইতে প্রকৃতিনাম্নী শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে প্রকৃতি কহে। তাহাই বিজ্ঞান চৈতন্য বুঝিতে হইবে। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের প্রকাশক বা কারণাবস্থাই ব্রহ্মা বা প্রকৃতি।

শিঃ। পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কি প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ ?

গুঃ। চৈতন্য হইতে জগতের প্রকাশ যে ভাবে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই জড়ভাগই চৈতন্যভাগের স্থূলভাগ বুঝিতে হইবে। সেই স্থূল ভাগই জড়জগৎ। সূক্ষ্মভাবই ঈশ্বরের ভাব। একটী মানবদেহ পরীক্ষা করিলেই স্থূল সূক্ষ্ম বোধ হইবে। নিদ্রা, জাগ্রত, স্বপ্ন, ও তুরীয় এই চারি অবস্থায় যে অংশের অনুভব হয়, তাহাই নিত্য ও চৈতন্যময় এবং সূক্ষ্ম বলিয়া অবিহিত ; আর কেবল জাগ্রতে যে অংশের অনুভব হয়, তাহাই স্থূল বা জড়।

প্রতি মানবের সূক্ষ্ম চৈতন্যের ক্রিয়া প্রকাশের জন্য সেই চৈতন্যের জড়রূপে বাসনার ক্রিয়ামতে প্রকাশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মনুষ্য জীবনের বাসনা যে স্বভাবমণ্ডিত, তাহার ক্রিয়াও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। মনুষ্য জীবনের বাসনা যদি পদদ্বারা গ্রহণ করা অভিপ্রেত করিত, তাহা হইলে পদ দ্বারাই গৃহীত হইত, কিন্তু তাহা না করাতে হয় নাই। বাসনার তেজেই নয়ন দেখি-তেছে ; হস্তপদাদি প্রকাশ হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলভাগ প্রকাশ হইয়াছে এবং সূক্ষ্মভাগ চৈতন্যময় এবং স্থূল ভাগই তাহার আবরক হইয়া, এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ রহিয়াছে।

এই বাসনা থাকাতে বেশ বুঝা গেল যে চৈতন্য ও চৈতন্য চালক একটী শক্তি আছে। চৈতন্য ত ঈশ্বর, আর চৈতন্যচালক শক্তিই মায়া। যেমন বাসনার

তেজে জীব নানারূপী নানা ক্রিয়াবান্ হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ মায়ার তেজে চৈতন্য নানা ক্রিয়াময় হইয়া জগৎরূপে ও জীবভাবে প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে চৈতন্যের ও মায়ার মিলন ক্রিয়ার প্রকাশ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি ইহাই বুঝান হইল; কিন্তু ঈশ্বর কেবল যে সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত তাহা নহেন, তিনি অবিনশ্বর অর্থাৎ মায়ার অতীত।

"তিনি স্বয়ং অগুণ হইয়া আছেন", অগুণ বলিতে মায়াহীন অবস্থা। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা প্রমাণ করা দুরূহ, তবে উপনিষদাদিতে স্বভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

চৈতন্য ও বাসনা বিভিন্ন পদার্থ নয়, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াময় বটে। চৈতন্য জড়ভাবে রূপান্তরিত হইলে জড় ও চৈতন্য মধ্যবর্ত্তি উভয়ের সংমিশ্রণ চৈতন্য প্রকাশিত শক্তিকে মায়া বা ঈশ্বর বাসনা কহে। যদি চৈতন্য ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হয়, তাহা হইলে মায়া চৈতন্যে লয় পায়। মায়া লয় পাইলেই জগৎ লয় পায়। চৈতন্যকে প্রকাশ ও ক্রিয়াপর করিবার জন্য কাল ও সৎ এই দুই নিত্য ঈশ্বরাংশ চৈতন্যকে পীড়িত করিয়া যে স্থূল অবস্থায় আনয়ন করে, তাহাই মায়া প্রকৃতি।

ইহাতে বেশ প্রমাণিত হইল যে একা চৈতন্যই বাসনাতে পরিবর্ত্তিত; ইহাতে চৈতন্য বাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বহু গুণী বুঝা গেল। সূর্য্য যেমন আপন তেজে আপনা অপেক্ষা স্থূল ভূতরূপ জল প্রকাশ করে এবং সূক্ষ্মভাবে আপনাতে উহা গ্রহণ করে, তদ্রূপ ঈশ্বর চৈতন্যের আকর হইতেছেন। তাঁহার শক্তির ভাব বাসনা তাঁহাতেই লীন হইতে পারে। যে অংশে বাসনা নাই অর্থাৎ জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য এবং সর্ব্বাধাররূপে বর্ত্তমান। এই ভাবনা অল্পমাত্র যোগভাবনা না হইলে বুঝা যায় না। কারণ ইহা তর্কের বস্তু নহে; ব্রহ্মবোধ বস্তু। ইহাতেই ঈশ্বর অগুণ হইয়া আছেন এবং তাহা হইতে সগুণ ভাবের প্রকাশ হইয়াছে। অধিকন্তু সেই সগুণভাবই জগৎ, এই জগতই তাঁহাতে অধিষ্ঠিত বুঝিতে হইবে। ইহা বুঝিলেই তত্ত্ব বোধ হইবে। তত্ত্ববোধ হইলেই প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ইহা বোধ হইবে।

শিঃ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র কিভাবে সগুণ ঈশ্বরের রূপান্তর হইলেন?

গুঃ। কাল চৈতন্য ও সৎ এই তিনটী নিত্য চৈতন্যময়-বস্তুর ক্রিয়াপর অব-

স্থাই তিনটী শক্তি। দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই তিনটীই মায়ার শক্তি। সেই তিনটী শক্তি মিশ্রিত হইয়াই মায়ানামে একটী চৈতন্যাংশ প্রকাশ হইয়া থাকে।

এই তিনটী শক্তিঃ—কাল, কর্ম্ম, স্বভাব আর তিনটী চৈতন্যশক্তির সহিত মিলিত হইয়া চৈতন্যময় ও জড়ময় জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য কালাদি স্বভাব, দ্রব্যাদি স্বভাবের ধারক। ঐ তিন স্বভাব পূর্ণ সগুণ ঈশ্বর উক্ত মায়াস্থিত ত্রিশক্তি গ্রহণ করিয়া এই জগৎ প্রকাশ করেন বলিয়া, সগুণ ঈশ্বরকে ত্রিশক্তিধারী কহে। ঐ সগুণ ঈশ্বর হইতে কাল ও অহঙ্কার শক্তির এবং চৈতন্য প্রবাহিকা শক্তির প্রকাশ হইয়া এই জগৎ সুনিয়মে প্রকাশ হইয়াছে। সেই কালই হর নামে বিখ্যাত।

"সগুণ ঈশ্বরের বশীভূত হইয়াই কাল হরণ করিতেছেন"। সম্মিলিত সমষ্টি হইতে অভিষ্ট ভাগের উদ্ধারকে হরণ কহে। যেমন ১০ হইতে ৫ নামক সংখ্যা উদ্ধার করিতে হইলে ২টী পাঁচ প্রকাশ হইলে পূর্ণ ১০ সংখ্যার লয় হয়। তদ্রূপ সৎ ও চৈতন্য মিশ্রণাবস্থাকে কাল ঈশ্বরের বাসনাজাত উদ্দেশ্যরূপী জীব ও জগৎ প্রকাশ করিবার জন্য চৈতন্য ও সৎকে প্রয়োজনমতে অংশ করিয়া রূপান্তরিত করিতেছেন। এইজন্য কালের নাম হর। কাল সগুণ ঈশ্বরের বশীভূত। কারণ ঈশ্বরের সগুণভাব না পাইলে কালের কি ক্ষমতা যে কার্য্যপর হয়।

"ব্রহ্মা তাঁহার নিয়োগ মতে সৃজন করিতেছেন"। উদ্দেশ্য বস্তুর অবস্থা প্রকাশের নাম সৃজন। ঈশ্বর পক্ষে জগৎ ও জীবই উদ্দেশ্য বস্তু। অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত চৈতন্য শক্তিই ভূতাদি, মনাদি ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মা অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত চৈতন্যশক্তি এই ভূত, মন ও ইন্দ্রিয়াদিময় জগৎ জীব প্রকাশ করিতেছেন। স্বতঃ চৈতন্য-রূপান্তরে ব্রহ্মা হইলেন বলিয়া পর ব্রহ্মের দ্বারায় নিযুক্ত হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টি করিতেছেন। এই জন্য ব্রহ্মাকে জগতের স্রষ্টা কহিয়া থাকে।

"ঈশ্বর স্বয়ং পুরুষরূপে বিশ্ব পরিপালন করিতেছেন"। সর্ব্বতোভাবে আত্মবশ করণের নাম পালন। পুরে শয়ন করাকে পুরুষ কহে। ঈশ্বর পরম চৈতন্যাবস্থা হইতে জীব বা আত্মারূপে মায়া মধ্যগত হইয়া মায়ার সকল বিভূতিকে অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, ও মনাদিকে সজীব রাখিয়া আত্মবশ রাখিয়া-

ছেন ; এই জন্য পুরুষরূপে বিশ্বপালন করিতেছেন বুঝিতে হইবে। এই পুরুষ রূপকে বিষ্ণু কহে।

শিঃ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই তিন কি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ?

গুঃ। শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম নির্গুণ অবস্থা হয়েন। নিজ নির্লেপ স্বভাব হইতে সক্রিয়ভাবে তিনি জগতে ও জীবে পরিবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছা করিয়া "আমি এক হইয়াও বহু হইব" এই বাসনা করিলেন। সেই বাসনাযুক্ত কার্য্যের পরিণতোন্মুখ ব্রহ্মাবস্থাকে সগুণ ঈশ্বর কহে। সেই সগুণ ঈশ্বর চৈতন্যের, কালের ও সদসদাত্মিকা শক্তির সহবাসে প্রতি রূপান্তরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি নাম ধারণ করিয়াছেন।

শিঃ। ঈশ্বর নানারূপে রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্টি করিলেন কেন ?

গুঃ। ঘটাদির মুখ্য কারণ যেমন মৃত্তিকাদি ঘটত্বে পরিণত হইলে আর মৃত্তিকত্ব থাকে না ; তদ্রূপ ঈশ্বর যদি জগতের সূক্ষ্ম কারণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নারায়ণরূপে এই বিশ্ব আপনাতেই প্রকাশ করিলেন, তখন আপনিই বিশ্বরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন বুঝিতে হইবে। যদি ঈশ্বরের এই পরিবর্ত্তন নিত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না। একেবারেই প্রকাশ্য জগৎ প্রকাশিত হইয়া প্রলয়ে বিনষ্ট হইবার সময়ে ঈশ্বরত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে তিনি সৃষ্টিকর্ম্মাদির জন্য মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বহুগুণান্বিত হইয়াছেন।

শিঃ। ঈশ্বর কি স্বয়ং জগৎকে বর্দ্ধন, উৎপাদন এবং হরণ করিতেছেন ?

গুঃ। ঈশ্বর জগতের মধ্যে সাক্ষিস্বরূপ আছেন ; তাঁহার কৃত মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যাবল পাইয়া এই জগৎ পালন করিতেছে। তাঁহার কৃত কালশক্তি ঐ মায়াভূত বিদ্যা ও অবিদ্যাবলের সহিত মিশিয়া জগৎকে বর্দ্ধন, উৎপাদন এবং হরণ করিতেছেন।

শিঃ। ঈশ্বর কি রূপে ভিন্ন জীব দেহে পরিণত হয়েন ?

গুঃ। যিনি প্রলয়ের পরে সংসার সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া, আপনার বীর্য্য হইতে মায়া রূপিণী প্রকৃতিকে সৃজনগুণবতী করত আপনি অনামস্বরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন ; এবং সেই অনামস্বরূপ নিজ তেজ হইতে নাম সংযুক্ত ভিন্ন জীবদেহে পরিণত হয়েন।

শিঃ। কোন ব্যক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব অভ্রান্ত প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন?

গুঃ। ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব কেহই অভ্রান্ত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। কারণ বস্তুর ভাব বস্তু ভিন্ন কেহই সম্যক প্রকাশ করিতে পারেন না। অপরে প্রকাশ করিলে ভ্রম হইবে। কারণ কি সাধক, কি সিদ্ধ, যে কেহই হউক না, ঈশ্বরের আনন্দময় ভাব কিঞ্চিন্মাত্র পাইলেই উন্মত্ত হইয়া যান। কেহই সে ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহা বিজ্ঞানে বিশেষ মীমাংসিত হইয়াছে। প্রমাণে বোধ হয় না।

শিঃ। যখন সকল মনুষ্য একভাবে ঈশ্বরের পাল্য, তখন তিনি কেন ভক্তকে দেখা দেন, আর ভক্তিহীনকে দেখা দেন না?

গুঃ। তিনি পূর্ণরূপে আপনার ব্রহ্মময় ধামে অর্থাৎ চৈতন্যময় স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কোন অংশ স্বরূপ চৈতন্যে মিলিত হইয়া রহিয়াছে, আবার কোন অংশ অবিদ্যায় মণ্ডিত হইয়া আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। অবিদ্যাভাবে মনোময় দেহকে যাহাদের বাসনা ব্যাপ্ত রাখে, তাহাদিগকে ভক্তিহীন কহে। অন্ধকার যেমন আলোকের বিরোধী, অবিদ্যা তেমনি বিদ্যাশক্তিরূপ ঈশ্বরানুভবের বিরোধী। অতএব ভক্তিহীনের নিকটে ঈশ্বর অবস্থান করেন, কিন্তু প্রকাশিত হন না। কারণ আলোকের ক্ষীণত্বই অন্ধকার। অন্ধকারেও আলোক আছে, কিন্তু নয়নের ক্ষমতা অভাবে অনুভব হয় না। তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। যাঁহারা ভক্তি আলোক জ্বালিয়া মায়ান্ধকার দূর করিয়াছেন, তাঁহারাই পরম বস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। যাঁহারা ভক্তিরূপ পরম বস্তুর জ্যোতি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অন্ধকারে থাকিয়া ঈশ্বর সত্ত্বেও ঈশ্বরকে দেখিতে পায়েন না।

শিঃ। ঈশ্বরকে যজ্ঞ পুরুষ কেন বলা যায়?

গুঃ। পদ্ম বলিতে ব্রহ্মাণ্ড। অগ্রে ঈশ্বর আপন বীর্য্য হইতে ব্রহ্মাণ্ড বা কারণভাব প্রকাশ করিয়া পরে তাহা সংরক্ষণার্থে ও ব্যাপ্তি অর্থে নিজ শক্তিকে প্রকাশ করিলেন। এই জন্য ব্রহ্মা ঈশ্বরের নাভিপদ্মের উপরে প্রকাশিত হইয়াছেন পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রকাশ হইয়া সেই ঈশ্বরেতে কতকগুলি যজ্ঞের সামগ্রী দেখিলেন। যজ্ঞ বলিতে কর্ম্ম। এস্থলে কারণ হইতে কার্য্য প্রকাশের নাম যজ্ঞ। ঐ কারণকে ব্রহ্মা ঈশ্বরের অবয়ব বলিয়া স্বীকার

করিলেন। ঐ কারণ হইতে স্থূলভাব প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বরের অবয়ব হইতে যজ্ঞীয় সামগ্রী প্রকাশ হইল। এই যজ্ঞই বিশ্ব নির্ম্মাণ যজ্ঞ।

ব্রহ্মা যে পুরুষ রূপের রূপান্তর, তাহাকে বিজ্ঞানে অহংকারাবস্থা কহে। অহংকার হইতে সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণী শক্তিভেদে এই প্রকাশ্য জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। যে উপায়ে অহংকার অবস্থা হইতে মনোময়, ইন্দ্রিয়ময়, এবং ভূতময় জগৎ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকে যজ্ঞ কহে। ব্রহ্মার অবস্থা হইতে ব্রাহ্মীশক্তি ঐ রূপান্তর করেন বলিয়া ঐ স্বাভাবিক কর্ম্মকে যজ্ঞ কহে। এই যে সৃষ্টিরূপী যজ্ঞ ইহাতেই ঈশ্বর যজ্ঞ পুরুষ রূপে বর্ত্তমান আছেন।

পুরে যিনি শয়ন করেন তিনিই পুরুষ; যজ্ঞ বলিতে সৃষ্টিতত্ত্ব। ঈশ্বরের সগুণত্ব এইভাবে বোধ হইল যথা:—সৃষ্টির সূক্ষ্মকারণরূপী তত্ত্বের মধ্যগত সগুণ ঈশ্বর। এই ভাবকে ঋষি ব্যাস পার্থিব যজ্ঞের রূপান্তরে কহিলেন মাত্র বুঝিতে হইবে।

শিঃ। পার্থিব যজ্ঞ কিরূপ?

গুঃ। পার্থিব যজ্ঞে বলি দিবার জন্য ছাগাদি পশু আনিবার বিধি আছে। বলি দিবার সময়ে পশুর কর্ণে এই বলিয়া বলি দিতে হয় যে "হে পশু, ঈশ্বরের প্রীতার্থে তোমাকে বলি দিতেছি, পুনর্জ্জন্মে তোমার আর পশুজন্ম লাভ করিতে হইবে না"। ব্রহ্মার উদ্দিষ্ট যজ্ঞে পশু শব্দে কর্ম্ম বা জীবাদৃষ্টকে বুঝাইতেছে। কারণ জীবাদৃষ্ট সাধনা ভিন্ন পুনরায় ঈশ্বরে মিলিত হয়েন না। এই ভাবে বনস্পতি বলিতে যুপকাষ্ঠ বা ঈশ্বর পক্ষে আকর্ষণ প্রসারণী স্বভাব। ঐ স্বভাবই জীবাদৃষ্টকে উচ্চ নীচগামী করিয়া থাকে। সংকল্প চিহ্ন এবং আসনার্থে যজ্ঞে কুশের ব্যবহার হইয়া থাকে। এ স্থলে কুশ বলিতে পরিণাম করণ শক্তি বা নিয়ম। দেব যজন স্থান বলিতে ভূতাদি। কাল বলিতে হ্রাস বৃদ্ধি করণ শক্তি। বস্তু বলিতে নৈবেদ্য করণ পাত্র। এ স্থলে জীব স্বভাব। স্বভাবের পরিণাম ক্রিয়া ঔষধি এবং স্নেহরসাদি। ঔষধি বলিতে গন্ধ, স্নেহ বলিতে ঘৃত, রসাদি বলিতে মিষ্ট তিক্তাদি। যজ্ঞ ভূমি সংস্কার করণ বস্তুকে মৃত্তিকা ও গোময় কহে। এস্থলে মায়া স্বভাবকে মৃত্তিকা বুঝাইল, কারণ জগতের প্রত্যেক সংস্কার মায়াদ্বারা হইয়া থাকে। জলও মায়ারূপী; কারণ জলে নিবৃত্তি বাচক সংস্কার হইয়া থাকে। ঋক বলিতে সর্ব্বকারণ নির্ণয়াক বা তত্ত্ব।

বোধক উপায়। সাম বলিতে সেই উপায় বোধক উপদেশ। যজু বলিতে উপায় ও উপদেশ মিশ্রিত কর্ম্ম। ঈশ্বর পক্ষে বা অহংকার পক্ষে উক্ত শ্রুতিত্রয় সূক্ষ্ম তম, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিভাবযুক্ত পরিবর্ত্তনীয় তত্ত্ব সমূহ মাত্র। চাতুর্হোত্র মিশ্রণ শক্তি বা স্বভাব। জ্যোতিষ্টোমাদিকে ইন্দ্রিয়দেবতার সূক্ষ্মভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। মন্ত্রাদিকে তাহাদের শক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। দক্ষিণাকে তাহাদের পরিণাম এবং ব্রতকে তাহাদের কর্ম্ম কহে। দেতানুক্রমকে ইন্দ্রিয় কহে। কল্প ও সংকল্পকে মনের সূক্ষ্মাবস্থা কহে। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক উপায় ভেদকে গতি কহে; তাহার পরিণাম স্বভাবকে মতি কহে। প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্ণকে লয় কহে। ব্রহ্মা এইরূপ জগৎপ্রকাশক উপায়বলীকেই যজ্ঞোপ-যোগী বস্তু বলিয়া বর্ণন করিলেন।

শিঃ। মনুষ্য কাহাকে বলে?

গুঃ। মনুষ্য বলিতে যে জীব জাতি সংকল্প ও বিকল্পাত্মক। মনোরূপী আত্মার সক্রিয় অনুভব শক্তি যখন বিষয়পর হইয়া থাকে, তাহাকে বিকল্পাত্মক মন কহে। আর মনোরূপী আত্মার সক্রিয় অনুভব শক্তি যখন তত্ত্ব বা চৈতন্যের অনুসারী হইয়া স্থির হয়, তখন সংকল্পাত্মক মন কহে। এই দুই অবস্থার মন যে জীবদেহেতে আছে তাহারাই মনুষ্যনামে বিজ্ঞানে বাচ্য।

শিঃ। ভুবন শব্দ কি?

গুঃ। বৈজ্ঞানিকেরা এই দেহকে এবং জগৎকে উভয়কেই ব্রহ্মাণ্ড কহেন। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই দুই বিশেষণ শব্দের প্রভেদ রাখেন। দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কহে। জগৎকে মহাব্রহ্মাণ্ড কহে। এই উভয় ব্রহ্মাণ্ডকেই ভুবন কহে। সেই ভুবনদ্বয়, দিগ্বিনির্ণয়ার্থে ত্রিধা হইয়া থাকে; উর্দ্ধভাগকে স্বর্গ কহে। মধ্যভাগকে মর্ত্ত কহে। অধোভাগকে পাতাল কহে। এই ভুবনকে অংশে রাখিতে বিজ্ঞানবিদেরা চৌদ্দভাগ করিয়াছেন। জগৎকে বিষুব রেখার মধ্যস্থ করিয়া উর্দ্ধাধঃ স্থির করত উপরিস্থ অর্দ্ধকে সপ্তভাগে আর নিম্নস্থ অর্দ্ধ-ভাগকে সপ্তভাগে ভাজিত করিয়াছেন। মহীতল হইতে রসাতল সপ্তাংশ। নভোমণ্ডল হইতে সত্যলোক সপ্তাংশ। দেহেরও ঠিক ঐরূপ ভাগ।

শিঃ। দেহের চৌদ্দভাগ কি রূপ?

গুঃ। দেহের মস্তককে স্বর্গ কহে। কটী অবধিকে মর্ত্যকহে। পদতল

অবধিকে পাতাল কহে। এই ত্রিভুবনই চৌদ্দ অংশে ভাজিত। তন্মধ্যে কটী দেশকে বিষুব রেখা করিয়া নাভি স্থলের উপরে সপ্তলোক স্থির হইয়াছে। ঐ সপ্তলোকের শেষ অংশই সত্যলোক।

এই দেহের বা জগতের যে অংশে সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব অবস্থান করে, তাহাকেই কোষ বলা যায়। ঐ কোষ অবস্থা ভেদে পঞ্চ প্রকার। মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, অন্নময় ও আনন্দময়।

অন্ন ও প্রাণময় কোষদ্বয় যে সূক্ষ্ম চৈতন্যের পালনে পালিত হইতেছে, তাহাকে অহংকার সৃষ্টি বা অহংকার চৈতন্যাংশ কহে। বিজ্ঞানময় কোষ যে চৈতন্যাংশের দ্বারা পালিত হইতেছে, তাহাকে বুদ্ধিসৃষ্টি বা বুদ্ধিচৈতন্যাংশ কহে। আনন্দময় কোষ, যাহার দ্বারা পালিত হইতেছে, তাহাকে চিৎচৈতন্য বা চিত্ত চৈতন্যাংশ কহে। মনোময় কোষ যাহার দ্বারা পালিত হইতেছে, তাহাকে মানস চৈতন্যাংশ কহে।

ঐ বিজ্ঞানময় কোষ হইতেই জীব সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে। এই স্থানের বা বিজ্ঞানময় স্বাভাবিক তেজের সাহায্যে উপস্থিত কল্প বুদ্ধি; অনুকরণ ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই উদ্ভব হয়। জীবাত্মা এই অংশে পরিশুদ্ধ থাকেন; এবং ঐ বিজ্ঞান অবস্থায় থাকিলেই জীবাত্মা আপনাকে স্বরূপ বোধ করিয়া অভিমান বিবেচনা করিতে পারেন। ঐ বিজ্ঞানে তত্ত্বমসি মহাবাক্য ধ্বনিত হয়। অর্থাৎ জীব সজ্ঞানে পরমাত্মাময় হইয়া থাকেন। যেমন পর্ব্বতের উপরে থাকিলে নিম্নস্থ জীবগণ কি করিতেছে এবং আমি কত উপরে আছি, এই অভিমান হয়। তেমনি প্রাণাদি অপর চারি কোষস্থ জীবাংশ সংসার প্রকৃতিতে থাকিয়া কি করিতেছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ কি না, তাহা বিজ্ঞানময় কোষস্থ জীবাত্মা বিজ্ঞান ক্ষমতায় বুঝিতে পারেন। এই বিজ্ঞানময় কোষকেই সত্যলোক কহে।

শিঃ। সাধনা করিতে হইলে প্রথম সাধকের নিয়ম কি?

গুঃ। যোগ শাস্ত্রের নিয়ম প্রথম সাধকের প্রতি এই নিয়ম আছে। সাধক পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসিয়া নয়ন দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে স্থির রাখিবে। নয়নই বাহেন্দ্রিয়ের মধ্যে মায়াভাব বোধ করে। নয়নের সাহায্যেই মন সহজেই মুগ্ধ হয়। তাহাতেই চিত্তের চঞ্চলতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব

পদ্মাসন বা কোন আসনে বসিয়া ইন্দ্রিয়গণ নিরোধ করিয়া চিত্তকে একীভাবাপন্ন করিতে নয়ন দৃষ্টিকে নাসাগ্রে স্থাপন করিতে হয়। এই কৌশলটী মহাবিজ্ঞান-সাধ্য !! চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ করাই নাসাগ্রে দৃষ্টি সংরক্ষণের উপদেশ। এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে তবে নয়ন মুদিলেও বিষয়ান্তর দৃষ্টি হয় না। তাহা ভ্রম। স্বপ্নেও বিষয়ান্তর দৃষ্টি হয়। জাগ্রৎ, সুষুপ্তি, স্বপ্ন এই তিন অবস্থা হইতে অতীত করিয়া নয়নকে একস্থানে আকর্ষিত করিতে হইবে। তাহার সাহায্যে চিত্ত অপর ভাবনায় ধাবিত হইতে পারে না। কেহ ক্ষণেক নয়ন মুদিয়া থাকিলে তাহার নানা ভাবনা মনে অনুভূত হয়। কিন্তু নয়ন দৃষ্টি যদি একটী বস্তুতে সংযোজিত হয়, তাহা হইলে মানসিক ক্রিয়া একেবারে সেই এক বস্তুতে লিপ্ত হইয়া থাকে। অপর স্থানস্থিত কোন একটী বস্তুতে নয়নদৃষ্টি একভাবে রাখা মহা আয়াস সাধ্য। কারণ তথায় অপর বস্তু নয়ন গোচর হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিলে নাসিকার অগ্রভাগ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। চিত্তের একটী ভাবের প্রথমাবস্থাই নাসাগ্র-দৃষ্টি সংরক্ষণ।

শিঃ। মহা জীবন্মুক্তি কিরূপ ?

গুঃ। এই জীবন্মুক্তির ক্রম মহামুনি শঙ্করাচার্য্য স্বপ্রণীত ভাষ্যে বিশেষরূপে লিখিয়াছেন। তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই স্থানে দিতেছি।

যখন লোকে ঈশ্বরের ভক্তি স্থির করিয়া তাহাতে আপন আপন আত্মা লীন করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন আপন দেহকে প্রথমে নীরোগী ও সুস্থ করিবে। অর্থাৎ যাহারা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনে হীনবল, রতিক্রিয়ায় হীনবল হইয়াছে, তাহাদের এই কার্য্য হইবে না। যাহারা হীনবল প্রযুক্ত কফজাত বা বায়ুজাত যক্ষ্মা, কাশী, হাঁপানী প্রভৃতি রোগাক্রান্ত, তাহাদের এ সাধনা হইবে না। এই সাধনার জন্য যৌবনাবস্থা হইতে নিয়মিত রতিক্রিয়া করিয়া শরীরকে সতেজ রাখিয়া মানবকে বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইতে হইবে। যে সময়ে লোকে ভক্তি ও বিশ্বাস সাহায্যে আত্মজ্ঞানে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিবে, সেই সেই আনুভাবিক ঈশ্বরে আপনাকে সমর্পিত করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে সেই সেই সময়েই চেষ্টা করিবে। তাহার ক্রম এইঃ—

বিশ্বাস স্থির হইলে সুস্থদেহী বৈরাগ্য আশ্রয়াস্তে নিরুদ্ধচিত্ত হইয়া সকল

ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করিবে। ইচ্ছাশক্তি হইতে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ। সেই ইচ্ছাশক্তিকে রিপুহীন করিয়া মনে লয় করিতে হইবে। মনটী কেবল মাত্র স্মৃতিস্থান। ইচ্ছাহীন হইলে জগতের আশা সমস্ত লয় পায়। বাসনা লয় পাইলে, মন যে এতদিন চঞ্চল ছিল, তাহা স্থির হয়। মনস্থির হইলে তাহাতে জগৎ ও আমি এই স্মৃতি থাকে। তাহা নাশ করিয়া ঐ মনকে প্রাণে আকর্ষণ করিতে হয়। প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। যখন ইচ্ছা ও স্মৃতি বিনাশ হইল; তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা কি প্রকারে প্রকাশ হইতে পারে? যদি কেহ মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হয়, তাহার বাহ্যিক চেষ্টা থাকে না। কারণ তাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত সেই সময়ে মনে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ মাদকতার তেজ তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, অতএব তাহার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না। ইচ্ছা প্রকাশ হয় না বলিয়া তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রকাশ হয় না। এমন কি উন্মত্তের ইন্দ্রিয়ক্রিয়া থাকে না বলিয়া, তাহাকে আঘাত করিলে সে উন্মত্ততা নাশেও তাহা অনুভব করিতে পারে না; সেইরূপ বিশ্বাসের ও বৈরাগ্যের তেজে ইচ্ছাকে নিরোধ করিলে মানব না করিতে পারে, এমন কাজই নাই। এমন কি গলায় দড়ি দিতে বা বিষ ভক্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যদি কেহ, গলায় দড়ি দিবার বা জলে ডুবিয়া দেহত্যাগ করিবার উদ্যোগী কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে যে, ঐ সকল সময়ে তাহার মনের অবস্থা কি প্রকার ছিল, সে ঠিক বলিবে যে সে ইচ্ছাহীন এবং ঐ মানসিক স্মৃতিতে মরিতে কৃতসঙ্কল্প ছিল। যে কোন রিপুর বলে ইচ্ছাকে বশীভূত করিতে পারিলে মানবে অসম সাহসিক কার্য্য করিতে পারে। সেইরূপ মুক্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঐ ভক্তি ও বিশ্বাসের তেজে ইচ্ছাকে নিরোধ করিলে বৈরাগ্যের আশ্রয় পাইতে পারে। তখন স্মৃতিতে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। এই জীবদেহে শ্বাস প্রশ্বাসই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রকাশক। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ুই দেহ পালন করিতেছে এবং দেহকে নীরোগ রাখিয়াছে। ঐ বায়ু সকলের মধ্যে প্রাণ ও অপান শ্রেষ্ঠ। আর সকলে ঐ দুইটীর অধীন। ঐ দুইটীকে নিরোধ করিতে পারিলে দেহ নাশ হয়। জীবন্মুক্তিচ্ছু ব্যক্তি, পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে লীন কি ভাবে হয় তাহা দেখাইতে এই প্রমাণ দিতেছি যে, কদলী

বৃক্ষের ফল প্রকাশিত হইলে যেমন বৃক্ষ দেহটী ক্রমে ক্রমে আপনা আপনিই লয় হয়, তেমনি প্রাণ ও অপানকে মনের সহিত নিরোধ করিলে স্থিরের সহিত চৈতন্য একত্র হয় এবং সেই সংযত অবস্থায় দেহটী লয় পাইয়া থাকে।

শিঃ। ঐ সকল যোগাবলম্বনে দেহের কিরূপ কষ্ট হয়?

গুঃ। মুক্ত পুরুষ ও সংসারী পুরুষ দুই অবস্থার লোক। সংসারী-দেহে মায়া রাখিয়া তাহাতে চৈতন্য রাখে। মুক্ত পুরুষ দেহ হইতে চৈতন্য লইয়া মনে দান করে। তাহাতে ঐ কুম্ভক বা প্রাণায়ামাদি সাধনের যে কষ্ট, তাহার অনুভব হয় না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি চৈতন্যকে মনে রাখিয়া দেহকে বিশ্রাম করায়, সে অবস্থায় দেহকে কাটিলে সে জানিতে পারে না; তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তি কিম্বা যোগী দেহ হইতে চৈতন্য লইয়া মনে স্থাপন করে।

শিঃ। দেহ নাশের ক্রিয়া বা অবস্থা কিরূপ?

গুঃ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্বাস প্রশ্বাসেই ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় হয়। তাহা নাশ করিতে ও প্রাণকে বশীভূত করিতে হইলে শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া প্রাণায়াম অবলম্বন করিতে হয়। ঐ প্রাণায়ামবলে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ হইয়া একমাত্র চৈতন্যযুক্ত স্থিতি থাকে। অপান বায়ুর ক্রিয়ায় দেহজাত মল মূত্র ত্যাগ হয়। মল মূত্র ত্যাগ করিলে দেহ শূন্য হয়, এবং তাহা হইতে পুনরায় যে অভাব হয়, তাহাতেই প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণার আবশ্যক হইয়া থাকে। মল মূত্র ত্যাগ না করিলে দেহের মধ্যস্থ অভাব হয় না। অভাব হইলেই পুনরায় প্রাণের প্রকাশ হইতে পারে এবং প্রাণ হইতে সকল ইন্দ্রিয় চেষ্টা প্রকাশ হইয়া সাধনা ভঙ্গ হইতে পারে। ঐ প্রয়াসে অপানকে রোধ করিতে হয়। যে উপায়ে প্রাণরোধ হইয়া থাকে, সেইরূপে নিশ্বাস রোধ করিয়া অপানমূলে স্বীয় পদের গোড়ালী স্থাপন করিয়া অপানজয়াসনে উপবেশন করিলে অপান জয় হয়। অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রকাশ ও মূত্র পুরীষ ত্যাগ নাশ হয়। ঐ সকল ক্রিয়া না হইলে দেহ মধ্যস্থ প্রাণ ও অপান বায়ু বহির্গমন করিতে চেষ্টা করে। বহিঃস্থ স্নিগ্ধ বায়ু অন্তরে গিয়া লঘু হইয়া তাহা বাহির হইতে চেষ্টা করে। সেই প্রাণাপান বায়ু মিলিত হইলে সমান বায়ু তাহার সহিত মিলিত হয়। সমান বায়ুতে আহারীয়কে সারাসারে বিভাগ করিয়া থাকে। সমান প্রাণাদিতে মিশ্রিত হইয়া উর্দ্ধে আসিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় যোগীর ও রোগীর

উভয়েরই সমান অবস্থা হইয়া থাকে, নচেৎ মৃত্যু হয় না। যখন রোগীর রোগ বশে প্রাণ ও অপান ক্রিয়া মিলিত হইয়া সমানকে পীড়ন করিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহাকে নাভিশ্বাস কহে। যোগী পীড়াহীন হইয়া চৈতন্যের সহিত মনকে লইয়া থাকে। তাহার দেহ বিনাশ জনিত ক্রিয়া বোধ হয় না। যেমন উন্মত্তের বাহ্যিক পীড়ন বা আন্তারিক পীড়ন বোধ হয় না, মনেই অনুভব ক্রিয়া হয়। সেই স্মৃতি যদি চৈতন্যে লয় পায়, তবে অনুভব ক্রিয়া কি প্রকারে হইবে? যোগী দেহ নাশের ক্রিয়া ঐ প্রকার কৌশলে স্থির করিয়া পরে ভাবনাকে স্থির করিয়া থাকে।

শিঃ। যোগী দেহ নাশ করিবার সময় যে ভাবনা মনে স্থির করেন, সে ভাবনা কিরূপ?

গুঃ। ঐ যে চৈতন্য সম্মিলিত মনের কথা কহিলাম; ঐ মন যতক্ষণ চৈতন্যের সহিত দেহে থাকিবে,ততক্ষণ অল্প পরিমাণে জীব বলিয়া স্মৃতি রাখিবে, তাহা নাশ করিতে ঐ স্মৃতিতে চৈতন্যবলে যোগী এই ভাবনা করেন। এই যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা—যাহার আশ্রয়ে মনের স্মৃতি ক্রিয়া ও জীবাত্মার শরীর গ্রহণ হইতেছে। ইনি ব্রহ্ম, সেই চৈতন্য হইতেই দেহের ক্রিয়া ও আমি রূপ অহঙ্কার হইয়া থাকে, অতএব "আমি" চৈতন্যের নামান্তর মাত্র। আর আমিও ব্রহ্ম। এই দেহ পঞ্চভূতের সহযোগে মিশ্রিত। ঐ পঞ্চভূত আবার সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের বশীভূত। ঐ আবার অবিদ্যার বশীভূত। অবিদ্যা আবার বিদ্যার বশীভূত।

শিঃ। দেহ কি ভাবে গঠিত?

গুঃ। দেহ কাল ধর্ম্মের সাহায্যে ও মায়ার মধ্যস্থ অবিদ্যা প্রকৃতির সাহায্যে পঞ্চভূতরূপে পরিণত হইয়া নানা ভাবে গঠিত। যৎকালে জগৎ প্রকাশিত হয় নাই, তখন ঈশ্বর স্বীয় চৈতন্যশক্তির দ্বারা জগৎ প্রকাশক অণু পরমাণু সমূহকে সচেতন করিয়া তাহাদের প্রকৃতি নাম দেন। সেই প্রকৃতিতে দুইটী স্বভাবও দেন। তাহার একটী অবিদ্যা ও আর একটী বিদ্যা।

শিঃ। অবিদ্যা ও বিদ্যার স্বভাব কিরূপ?

গুঃ। অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়েই ত্রিগুণ বিশিষ্টা। অবিদ্যা যে ভাবে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ ধারণ করে, তাহা হইতে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ও দেহক্রিয়া সাধিত হয়।

প্রকৃতি ঈশ্বরের চৈতন্যশক্তিযুক্ত অণু পরমাণু মাত্র। ঐ প্রকৃতিস্থ অবিদ্যা স্বভাবে জাগতিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। যাহা হইতে কাল ধর্ম্মে তিন গুণের আবিষ্কার হয়। কালধর্ম্মে আয়ু স্থির হইয়া থাকে। অতএব আয়ু স্থির হইলে তাহার পালন, বর্দ্ধন, ও হরণ ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। এই তিনগুণ অবিদ্যা স্বভাব পাইয়া প্রকৃতিস্থ অণু পরমাণু সংযোজনে পঞ্চভূতে আখ্যাত হয়। ঐ পঞ্চভূত হইতেই দেহ। তবে দেহ লয় পাইলে তাহা পঞ্চভূতে মিশাইবে। পঞ্চভূত আবার অবিদ্যায় মিশাইবে। এই অবিদ্যাকেই ব্যাস "একত্ব" কহিয়াছেন। ঐ অবিদ্যা স্বভাব বুঝিয়া মুক্ত ব্যক্তি বিদ্যার আশ্রয়ে "আমি কে" জানিতে পারে। যেমন স্বপ্নে বাহ্যিক অনুভব দূর হইয়া জীবাত্মা আপনাতেই অনুভূত হন; তেমনি অবিদ্যা জ্ঞানে সমস্ত অবিদ্যার কৌশলরূপী ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত দেহকে জীব ত্যাগ করেন; ঐ ত্যাগ কালে মুক্ত জীবের স্মৃতি কোথায় গমন বা কাহাকে অনুভব করিতে ইচ্ছা করে? একমাত্র পরমাত্মা কে। পরমাত্মা জানিতে হইলে স্মৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অবিদ্যার ত্যাগে যখন আপনিই বিদ্যা প্রকাশ হয়, তখন পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞানবলে যাহাকে এতক্ষণ চৈতন্য বলিয়া কল্পনা করা হইতেছিল, তাহাকে আত্মা বলিয়া জানা যায়। আত্মার পূর্ণতাই ঈশ্বর। স্মৃতির সহিত জীব আত্মায় মিলিত হইয়া, স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ে আসক্ত বোধ করে, তাহার ভেদজ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ জীব স্মৃতিতে ব্রহ্ম ও আত্মা একই সূর্য্য কিরণবৎ দেখিয়া থাকেন।

শিঃ। এই লয়ের পর কি হয়?

গুঃ। পূর্ব্ব সাধনায় দেহ ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। দেহ আপন স্বভাবে আপনি নাশ হইয়া থাকে। চৈতন্য মনে থাকাতে মনের অনুভব হয় না। সে স্মৃতিবলে আপনাতে আপনি এই মাত্র বুঝিতে পারে। এই লয়ের পরে যে কি হয়, তাহা আমি কিম্বা আমার ন্যায় সাংসারিকে বলিতে পারে না। কারণ ইহাপেক্ষা অধিক অনুভব হয় না।

শিঃ। মুক্ত হইলে যে পুনরায় দেহধারণ হয় না, তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস হইবে?

গুঃ। যেমন একটী চনক দানা, অগ্নিতে না ভাজিয়া ভূমিতে ফেলিলে, তাহা হইতে অঙ্কুর হয়, কিন্তু ভাজিয়া ফেলিলে, তাহার অঙ্কুর হয় না; তদ্রূপ এই

জীবাত্মা আত্মার তেজ ; ঐ তেজ যদি পঞ্চভূতের মিশ্রণ ত্যাগ করিয়া মহাতেজ-রূপী পরমাত্মাতে মিলিত হয়, তবে তাহার অঙ্কুর হয় না। পঞ্চভূত মিশ্রিত জীবাত্মার তেজ লইয়াই জন্ম হয়। পঞ্চভূত হইতে সেই তেজ অপহৃত হইলে আর সে তেজের কখনই প্রকাশ হয় না। পঞ্চভূত অবিদ্যাতে মিলিয়া পুনরায় অপর জীবাত্মার সহযোগে কার্য্যকারী হয়। একটু প্রণিধান করিয়া বুঝিলে, জ্ঞানীতে বুঝিতে পারিবেন। প্রতি যুগে ধর্ম্ম এক এক অংশ হীন হয়েন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগ গত হইয়াছে, সেই কারণে ধর্ম্মের তিন অংশ নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কলি উপস্থিত।

শিঃ। কলি শব্দ কি?

গুঃ। কলি বলিতে অধর্ম্মযুক্ত উপায়। ধর্ম্মের হিংসা যে করে, সেইই কলি। স্বভাববশে কলিতে সমস্তই অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। তাহা কাহারো নিবার্য্য নহে। ঐ সময়ে জ্ঞানরূপিণী মহাবিদ্যা অবিদ্যাবশে অজ্ঞান মণ্ডিতা হয়েন। কালধর্ম্ম হইতে মানবের স্বভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যখন মায়া ধর্ম্ম হইতে কালধর্ম্ম পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করে, তখন মানবের স্বভাবের বিপরীত ভাব হইয়া থাকে। এই দেহ প্রকৃতি ধর্ম্মে চালিত। এই দেহ যখন বলহীন ও স্বাস্থ্যহীন হয়, তখন মানবের কালধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। তাহাতে পূর্ব্ব মত স্বভাব থাকে না। সেইজন্যই বৃদ্ধ বয়সে বা রোগে মায়া, মমতা নাশ হইয়া থাকে। কালধর্ম্ম হইতে চেষ্টার আবিষ্কার হয়। ঐ চেষ্টা হইতে ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়। ঐ ইন্দ্রিয় সকলকে হীনতেজ করিলেই দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া আসে। আলস্য, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, প্রভৃতির অবৈধ ক্রিয়ায় ঐ ইন্দ্রিয় তেজহীন হয়। রাত্রে নিদ্রা, আর দিবাকালে বৃথা চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল অপ্রিয় আলস্যাদির উদ্ভব হয়। পৃথিবীর পালন কর্ত্তা ধর্ম্ম। প্রজাগণ স্বধর্ম্মে থাকিলে, পৃথিবীর কোন শোভা নষ্ট হয় না। অধর্ম্ম প্রকাশ হইলে সমাজে নানাপ্রকার কলহ ও ব্যাভিচারে পৃথিবীর হ্রাসাবস্থা উপস্থিত হয়।

শিঃ। মন কি কাল ধর্ম্মের বশীভূত?

গুঃ। মন ও চৈতন্য কাল ধর্ম্মের ও প্রকৃতির বশীভূত নহে, তবে আবৃত বটে। তাহা সর্ব্ব-যুগেই সমান কার্য্যকর হইতে পারে।

শিঃ। কাল ধর্ম্ম হইতেই কি জীবের স্বভাব হইয়া থাকে ?

গুঃ। কালধর্ম্ম, মায়াধর্ম্ম এই দুই ধর্ম্ম হইতে জগদীয় জীবের স্বভাব হইয়া থাকে। স্বভাবও আর এক ধর্ম্ম। পৃথিবী যত প্রলয়ের সন্নিহিতা হয়েন, ততই কালধর্ম্মের ও প্রাকৃতিক ধর্ম্মের বৈপরীত্য হইয়া থাকে। ইহা বিজ্ঞানে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যখন কালধর্ম্মে ও মায়াধর্ম্মে মনুষ্যের স্বভাবের উৎপত্তি, তখন তাহাও বিপরীতাচরণে ব্যাপ্ত হয়। তাহাতে সুনিয়ম বা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ধর্ম্মের বিনাশ হয়; মানবগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। ইহাকেই কলির আবেশ কহে। ঐ সময়ে লোক যজ্ঞহীন হওয়াতে মেঘ বর্ষণ করে না।

শিঃ। যজ্ঞ কাহাকে কহে ?

গুঃ। জাগতিক ক্রিয়া মাত্রকেই যজ্ঞ কহে। তেজ হইতেই জগতের সকল ক্রিয়া চলিতেছে।

কর্ম্মসহযোগে মনের তামসিক বৃত্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া ঈশ্বরকে কর্ম্মফল সমর্পণ করণোপায়। যশকামী যিনি হইবেন, তিনি যজ্ঞ করিবেন। যশকামী হইলেই নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ আচরণ করিতে পারিবেন, নচেৎ যশ লাভ হইবার যো নাই। যশও সামান্য পদাথ নহে। বাসনা উন্নতি বিষয়ক চৈতন্যময় বস্তু বুঝিতে হইবে।

শিঃ। মুমুক্ষুর কি উপায় অবধারণ করা উচিত ?

গুঃ। তমো ও রজোগুণের মোহন হেতু শব্দময় বৈদিক নিয়মে উপাসনা ও তদনুযায়িক ফললাভ ত্যাগ করিয়া বৈদিক অর্থে মনোনিবেশপূর্ব্বক বৈরাগ্য সাহায্যে শুদ্ধাত্মা হইয়া অবিকার চিত্ত হওয়াই বিধেয় এবং ইহাতেই জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়।

একটী দৃঢ় বাসনা করিয়া শয়ন করিলে স্বপ্নে যেমন সেই বাসনানুযায়িক চিত্র দৃষ্ট হয় এবং মিথ্যাই সেই চিত্রের সম্ভোগ হয়। জাগরণে আর স্বপ্নসুখ অনুভব হয় না; তেমনি তমোগুণী ও রজোগুণী বৈদিক নিয়মে শব্দাংশ ও প্রমাণাংশরূপী উপাসনা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল লাভ মিথ্যাই লাভ করে; কারণ তাহাতে বাসনামতে পুনরায় এই সংসারে আসিয়া সাংসারিক নিয়মে বশবর্ত্তী হইতে হয়। তবে আর সংসারাসক্তি হইতে উত্থিত কর্ম্মফলে

কি সুখ হইল। এই জন্য বলিতেছি, মুমুক্ষুগণের পক্ষে বৈরাগ্যই প্রধান উপায়। অতএব মুমুক্ষুগণ যেন কর্ম্মফল সমুহকে ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য সাহায্যে জীবন্মুক্ত হয়েন।

শিঃ। কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে দেহ নাশ হইবারতো সম্ভাবনা?

গুঃ। কর্ম্ম ও তাহার ফলাফল ব্যতিরেকেও দেহ ধারণ করা যায় এবং সেই ভাবে দেহ ধারণ করণ পূর্ব্বাপেক্ষা সুখকর;—মন এই দেহের কর্ত্তা। সেই কর্ত্তারূপী মনের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে বহু সংখ্যক ভৃত্য আছে; ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ মনরূপ ভূপতির প্রধান কিঙ্কর; সর্ব্বদাই নিকটে থাকে এবং ঐ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ মনরূপ ভূপতির নিকৃষ্ট কিঙ্কর; উহারা মনের দূরে থাকে। মনের অনুজ্ঞা প্রকাশ হইলে প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয় বহন করে। তাহাদের নিকট কর্ম্মেন্দ্রিয় সেই অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অনুজ্ঞামত ক্রিয়া করে। ঐ ক্রিয়াকেই কর্ম্ম কহে। কর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বাহিক ও আন্তরিক। বাহিক ক্রিয়ায়, মনের অনুজ্ঞার আন্তরিক ভাব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় বাহ্যে প্রকাশ করে। আন্তরিক ক্রিয়ায় কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ বাহির হইতে বিষয় গ্রহণ করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তরে প্রকাশ করে। গ্রহণ, চলন, আহার করণ, এই সমস্ত বাহিক ক্রিয়া। কারণ উহারা মনের অনুমতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিচার করণ, চিন্তন; এ সমস্ত আন্তরিক ক্রিয়া কারণ উহারা বাহ্য বিষয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই উভয় শ্রেণীর ক্রিয়া আবার তিনভাবে ক্রিয়াবান হয়। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার কর্ম্ম জগতে প্রকাশিত আছে। মায়া, মোহ, স্নেহ, মমতা, দুঃখ ও সুখানুভব এই সমস্তই তামসিক কর্ম্ম। আত্মীয় সকলের মায়া বন্ধনে থাকিয়া কিছুতে নাই; এমন ভাবের কর্ম্মকে রাজসিক কর্ম্ম কহে। কেবল দৈবের উপরে দেহ সংরক্ষণের ভার দিয়া ঈশ্বরে তন্ময়িত হওয়াকে সাত্বিক কর্ম্ম কহে। এই যে কর্ম্ম সমূহের কথা কহিলাম, উহাদের প্রত্যেকের ফল আছে। যেমন সুবিজ্ঞ কৃষক ভূমিকে সারাদি দ্বারা উর্ব্বরা করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিয়া সুফল গ্রহণ করে। অজ্ঞ কৃষক তাহা পারে না। তেমনি ঐ রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম সমূহও যে দেহে ক্রিয়াবান হইবে, ইন্দ্রিয়গণ মনের সহিত যে ভাবে পরিশ্রান্ত হইবে, তাহাতেও ফল হইবে বটে। মন ইন্দ্রিয়কে সাত্বিক-

ভাবে পরিশ্রান্ত করিলে এই দেহ হইতে সুফল গ্রহণ করা যায়। আমি যে কর্ম্মফলের নিন্দা করিলাম, তাহা ব্যর্থ ও মায়াযুক্ত রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম এবং তদুপযোগী ফল বলিয়া জানিবে।

এই সাত্ত্বিকী অনুষ্ঠান মায়া সঙ্গমীর হওয়া বড় দুঃসাধ্য; সেই জন্যই বলিলাম যে, সমীক্ষমান্ ব্যক্তি মুক্তিরূপী আনন্দলহরীতে ভাসিতে ইচ্ছা করিবে, সে যেন রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম ও তাহার ফলের প্রতি অপ্রমত্ত অর্থাৎ অনাসক্ত এবং ব্যবসায় বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ ইহাতে কিছুই নিত্যসুখ নাই, এমন জ্ঞান হইবে। এইরূপ অনাসক্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি সাধকের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এ জগতে ঈশ্বর প্রতি বিশ্বাস করিলে কি অলভ্য হইতে পারে? কিছুই নয়।

ঈশ্বর এই দেহ সংরক্ষণের সমস্ত উপায় তো রাখিয়াছেন। দেখ এমন অনন্ত সীমাবান্ পৃথিবী মণ্ডল থাকিতে দুগ্ধফেননিভ কৃত্রিম শয্যায় প্রয়াস কেন? এমন যুগল বাহুরূপ উপাধান থাকিতে, তুলা নির্ম্মিত কোমল শিরোধানে কি প্রয়োজন? এমন দিগ্বস্ত্র ও বৃক্ষ বল্কল থাকিতে উত্তম দুকূল বসন কি প্রয়োজন?

যদি বল বস্ত্র বিনা উলঙ্গ থাকা লোকালয়ের অবৈধ এবং বল্কল, স্থান, জল, এ সমস্তের জন্যও যাচ্ঞার প্রয়োজন হইতে পারে!! এ কথা মনেও ভাবিবে না। কারণ লোকালয়ের পথিমধ্যে কি ছিন্ন বস্ত্র পতিত নাই! এমন যে সদাশয় বৃক্ষাবলি রহিয়াছে, তাহাদের নিকটে সুফল ভিক্ষা করিলে তাঁহারা কি ভিক্ষা দেন না?

এমন যে অতলস্পর্শ জলশালী নদী ও সরিতাদি তাহারা কি শুষ্ক হইয়াছে? জল প্রদান করেন না? এমন যে অসংখ্য পর্ব্বতে গুহাদি থাকিবার স্থান রহিয়াছে, তাহারা কি বৈষ্ণবগণের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। অধিক আর কি বলিব, সেই যে অজিত দেবতা শ্রীহরি, তিনি কি তাঁহার ভক্তগণকে রক্ষা করিতে পারেন না? এ সমস্ত জানিয়াও তবে কেন বুধবৃন্দ, ধনমদে অহংকারে অন্ধ ধনিগণকে ভজনা করেন।

শাস্ত্রে আছে এবং নারদ পঞ্চরাত্রে বিশেষরূপে লেখা আছে এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরও ইহা স্থির মত যে—যাঁহারা বিষ্ণুকে আত্মসমর্পণ করিয়া বৈষ্ণব

হইয়াছে, তাহারা যেন ভোজন ও আচ্ছাদনের জন্য ক্ষণকাল চিন্তা না করেন। কারণ সেই বিষ্ণুই বিশ্বম্ভর অর্থাৎ বিশ্বপালক; অতএব যিনি বিশ্বকে পালন করিতে প্রস্তুত, তিনি কি ভক্তগণকে উপেক্ষা করিবেন?

শিঃ। বৈষ্ণব কাহাকে বলে?

গুঃ। যাঁহারা বিষ্ণু ভিন্ন আর কাহাকেও না জানেন এবং আত্মবিস্মৃতি হইয়া আপনাকেও বিষ্ণুময় ভাবেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবপদে বাচ্য হয়েন। যদি প্রমাণ চাহেন, আমার মতে প্রহ্লাদকে মনে করুন; চৈতন্যদেবের জীবনীপাঠ করিয়া অন্তরে তাহার চিত্র দেখুন। কিম্বা বিচার করিয়া শ্রীমতি রাধার বিরহ বা রাসলীলা পাঠ করুন। ভক্তের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবেন। আজীবন বৈষ্ণব হওয়া বড় দুঃসাধ্য!! একমাত্র নারদই আজীবন বৈষ্ণব। এমন যে ব্রহ্মা, তিনিও আজীবন বৈষ্ণব হইতে পারেন নাই। মহাদেব জীবনের অনেকাংশ বৈষ্ণব ছিলেন। স্বয়ং বলদেবও অনেক সময়ে কৃষ্ণকে ভুলিয়া ছিলেন। যতক্ষণ ঈশ্বর হৃদয়ে এবং সাধকের বৈরাগ্য উদয়ে জীবেশ্বর একীভাব হয়, ততক্ষণই সাধক বৈষ্ণব নামের যোগ্য। সেই সময়ে সাধকের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত রাজসিক তামসিক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাত্বিক আনন্দে মাতিয়া উঠে। তাহাদের হৃদয়ে সেই মুকুন্দ অবস্থান করিতেছেন। জীবন্মুক্তির যে সুখ, তাহা বৈষ্ণবেই ক্ষণেক জানিয়াছে। অতএব বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া আপনাপন আত্মাকে ভজনা করিবে।

শিঃ। কিরূপে আত্মাকে অনুভব করা যায়?

গুঃ। আমি ইতি পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি যে, "আমি কে" এ পরিচয় প্রদান না করিলে, যাঁহার পরিচয় লইব, তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ "আমিকে" ইহাও না জানিলে পরকে নিজের কথা বলা অগ্রে বুদ্ধির সাহায্যে চিত্তের মধ্যে জ্ঞান বলে বিবেচনা করিতে করিতে সেই আত্মার অনুভব করা উচিত। অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া যতক্ষণ মানবে জীবেশ্বর ভেদজ্ঞান থাকিয়া অবৈষ্ণব থাকিবে, ততক্ষণই মায়াদেবী অবিদ্যা অংশ মানবকে আবদ্ধ রাখিবে। জ্ঞানই আত্মাপ্রদর্শক। অজ্ঞানই মায়া প্রদর্শক। বালক যেমন নয়ন মনোহারী বস্তুতে সহজে মুগ্ধ হয়। অজ্ঞান তেমনি বাহ্য মনোহর বস্তুতে আসক্ত হইয়া অবিদ্যায় মুগ্ধ হয়। জ্ঞান সাহায্যে অবিদ্যাচরণ হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যাচরণে

আবৃত হইতে হয়। সেই বিদ্যাচরণের সাহায্যেই আত্মার অনুভব হয়। আত্মার অনুভব হইলে আত্মারই ইন্দ্রিয়কে কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয় না। সূর্য্য ও কিরণ যেমন অভেদ; তেমনি আত্মা ও পরমাত্মা অভেদ। ত্যার মতে আত্মা অনুভূত হইলে জীবেশ্বর একানুভূত হইল। কারণ আত্মাই জীব। শ্রীহরি চিন্তাকে অনাদর করিয়া পশু ভিন্ন এমন কে আছে যে বিষয় চিন্তার আদর করিবে? ঐ বিষয় চিন্তারূপী বৈতরণীতে পতিত হইয়া আপনাপন কর্ম্মজাত পাপের পরিতাপে পীড়িত হইতেছে, এমন স্বজনকে দেখিয়া কে বিষয় চিন্তার আদর করিবে?

শিঃ। বৈতরণী কাহাকে বলে?

গুঃ। যম দ্বারের সন্নিহিতা নদীকে বৈতরণী কহে। ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণে আছে। কর্ম্মফলের বিচার যেখানে হয়, তাহাকে যমপুরী কহে। এ শব্দটী আলঙ্কারিক শব্দ। অলঙ্কার মোচন করিলে জ্ঞানই যম। বিষয় চিন্তাই বৈতরণী। অজ্ঞানকৃত বিষয় কর্ম্মের ফলাফল লোকে কখন বোধ করিতে পারে? যখন তাহার অনুতাপ উপস্থিত হয়। জ্ঞানের উদ্রেক না হইলে অনুতাপ হয় না। জ্ঞানের দ্বারাবধি বিষয়চিন্তা অবস্থিত আছে। জ্ঞানের সমীপে যাইতে পারে না। কারণ জ্ঞানাগ্নির সন্নিহিত হইলে একেবারে দগ্ধ হইবে। জ্ঞান দূরে থাকিলে জ্ঞানের উত্তাপে উহা ধূমিত হইতে থাকিবে; উত্তাপে দগ্ধকেই অনুতাপ কহে।

যেমন একজন চোর একটী বস্তু অপহরণ করিল। সে শাস্তির কষ্টে যখন মনে মনে মনে বিরক্ত হইয়া পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলের নিন্দা করিতে থাকে, তখনি তাহার অবস্থা ভেদ বোধ হয়। সেই ভেদ বোধই জ্ঞানের কার্য্য। ঐ বৈরাগ্য তাহার অন্তরে দূরপথে জ্ঞানালোক যেমন প্রকাশ হইল, অমনি সে যে কর্ম্ম হইতে উপস্থিত ফলভোগ করিতেছিল, সেই কর্ম্মকে নিন্দা করিতে লাগিল। উহাই তাহার অনুতাপ। যে বিষয় চিন্তার মোহে সে অপহরণ করিয়াছিল, তাহাই মায়া। যে বিষয় চিন্তার বলে অনুতাপ হইতে লাগিল, তাহাকে বৈতরণী প্রবাহ কহে।

এই পৌরাণিক কথার অলঙ্কার চ্যুত করিলে ইহা যে কতদূর প্রমাণ্য হইল, তাহা বলিতে পারি না। যাহাতে পতিত থাকিলে নিস্তারের তরণী নাই,

তাহাই "বৈতরণী" শব্দে বাচ্য!! ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে বিষয় চিন্তা হইতে উদ্ধার না হইয়া পতিত থাকিলে নিস্তারের উপায় নাই!! এই জন্যই বিষয় চিন্তাকে বৈতরণী ও কর্ম্মীগণকে তদ্‌পতিত অনুতাপিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিঃ। যোগীগণ সাধনা বলে সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু সংসারাসক্ত জনের পক্ষে উপায় কি?

গুঃ। ভক্তের সাধনার তারতম্যে ধারণার তারতম্য উপস্থিত হয়। ভক্তের মধ্যে যিনি জন্মাবধি ভক্তি ও প্রেমে উন্মত্ত, তাঁহাকে আর প্রথম অভ্যাস করিতে হয় না; তিনি আপনা আপনিই শ্রীহরিতে লয় প্রাপ্ত হয়েন। যে সকল ভক্তের সংসারে আসক্ত মন, একবার বিষয়া-মোদে উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষেই নানা প্রকার কল্পিত ধারণার আবশ্যক। কারণ অরণ্য বিহারী পশু একেবারে সমাজ শিক্ষা শিখিতে পারে না।

যখন সংসারী আত্মজ্ঞানী হইয়া আত্মার সেবায় নিযুক্ত হইল। তখন তাহার বিশ্বাস স্থির হইল, কারণ সে ব্যক্তি অন্তর দৃষ্টিতেই রত রহিল, বাহ্য দৃষ্টিতে আর রত হইল না। এইঅবস্থা উপস্থিত হইলে সংসারাসক্ত সাধকের তুরীয় অবস্থা উপস্থিত হইল। এই তুরীয় অবস্থায় সাধক তমো ও রজোগুণ হইতে অতিক্রান্ত হইয়া সত্ত্বগুণের পথিক হয়। যখন সাধকের মন ইন্দ্রিয় বিকারে রত ছিল, তখন সে তমোগুণী ছিল, তখন স্নেহ, মমতা, ও রিপুর আধিক্য তাহাকে উন্মত্ত করিয়া ছিল। যখন সাধক বৈরাগ্য বলে কিঞ্চিৎ জ্ঞান পাইয়া প্রেমিক হইল, তখন তাহার মন আর সংসার প্রেমকে ভাল বাসিল না; তখন সে কামিনী প্রণয়কে মুক্তিপথের কালসর্প; স্নেহ মমতাদিকে মুক্তি পথের দস্যু মনে করিল। তখন ক্ষণিক রিপু প্রাবল্য হইতে নিস্তার পাইয়া ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য লইল। ক্রমে সাধক সাধনা বলে যেমন রজোগুণ ভেদ করিয়া সত্ত্বের আশ্রয় লইতে লাগিল, অমনি তাহার মন হইতে রজোগুণ-জাত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ে লয় পাইতে লাগিল। সাধক আর নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহ্য জগৎ দেখিতে চাহিল না। সাধক আর হস্ত দ্বারা বাহ্য বস্তুকে শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিল না। সাধক আর দেহরূপী জগৎ ব্যতীত পদ দ্বারা বাহ্য জগতে যাইতে ইচ্ছা করিল না। জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রবল

হইল। সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিল। সাধক তুরীয় অবস্থায় অবস্থান্তরিত হইল।

এই যে হস্ত পদাদি চক্ষু কর্ণাদি দেখিতে পাইতেছ, ইহারা যখন বাহ্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, অর্থাৎ কর্ণ শব্দ শুনিতে, পদ গমন করিতে, চক্ষু শোভা দেখিতে থাকে, তখন উহারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে গণ্য হয়, এবং যখন উহারা বাহ্যক্রিয়া ত্যাগ করিয়া অন্তরে ক্রিয়াবান হয়, তখনই উহাদের অন্তর ক্রিয়াবান জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। সেই জন্যই প্রচলিত কথায় চক্ষু কর্ণাদিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদাদিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। এ আখ্যা বাহ্যবোধ মাত্র। মন অভিলাষ প্রকাশ না করিলে পদের কোন সাধ্য নাই, যে কোথাও যায়।

সংসারীর গতি অতি সামান্য, কারণ তাহাতে শ্রম আছে। বলক্ষয়ে আর সে গতি পায় না; কিন্তু যোগীর গতি অনন্ত যোজন। এই দেহের সীমা নাই। এই দেহই অসীম জগৎ, ইহার সর্ব্বত্র যখন পরিভ্রমণ করিতে পারিবে, তখনি আত্মার সাক্ষাৎ লাভ হইবে। যখন সাধক আত্মাকে অনুভব করিয়া অদ্বৈতভাবে উন্মত্ত হইবে, তখনি প্রেম আপনি আসিয়া সাধককে পরম পথে লইয়া যাইবে। মনই সাধ্য বস্তু। এই অবস্থায় মন আগমন করিলে পরম পথে যাইবার উপায় আছে।

শিঃ। পরমপথে যাইবার উপায় কি?

গুঃ। পরমপথে যাইবার বহু উপায় আছে। তন্মধ্যে একটী সহজ উপায় বলি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ ধারণা সাধনার প্রকাশ আছে। সকল সাধনার পূর্ব্বভাগ স্থূল ও শেষভাগ সূক্ষ্ম। যখন সাধক আত্মজ্ঞান বলে বলী হইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইবে, তখন স্থূলভাবে চিত্তের সহিত পরমাত্মার অনুভব করিবে। ইহাকেই অপর বিধানে সাত্ত্বিকী পূজা কহে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, মনন, পূজন ও নিদিধ্যাসন—সাত্ত্বিক ব্যাপারে এই কয়েকটিই প্রয়োজনীয়। এক্ষণে পূজন বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর।

সাধক আপনার হৃদয়ে যে অবকাশময় স্থান দেখিতে পাইবে, যথায় মন নিরোধ করিলে চিত্ত স্থির করিয়া আত্মার অনুভব করিতে পারিবে, তাহাকেই অনাহত পদ্ম বলিয়া থাকে। সেই অনাহত পদ্মে পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীহরিকে

ভাবনা করিয়া মনকে তন্ময় করতঃ অভেদভাবে "সোঽহং" হইয়া যাইবে; এইটিই সারূপ্য প্রাপ্তির লক্ষণ।

শিঃ। স্বাধিষ্ঠান, মূলাধার, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাপুর এই ছয় পদ্মের মধ্যে অনাহত পদ্মেই ভাবনা করার প্রয়োজন কি?

গুঃ। এই দেহটি অনুভবের গৃহমাত্র। পঞ্চভূত সংজ্ঞা সংমিশ্রণ হইয়া একটী মাত্র শরীর নাম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভূত ক্রিয়াতেই অনুভব প্রকাশ হয়। ঐ অনুভব ক্ষমতাকেই শরীরচৈতন্য কহে। ঐ চৈতন্য হইতে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বিজ্ঞান লাভ হইলেই ঐশ্বরিক ক্রিয়া আপনিই তাহাতে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত। কর্ম্মজ ও অকর্ম্মজ। কর্ম্ম বিজ্ঞানে প্রকৃতিতত্ব নিরূপিত হয় এবং অকর্ম্মজ বিজ্ঞানে ঐশিক চিন্তার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রেরই কিঞ্চিন্মাত্র বিজ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন।

আকর্ষণী শক্তি হইতে সৎবস্তুর অনুভব হয়। ইহা একেবারে দর্শনের চূড়ান্ত মীমাংসা, যেমন চক্ষের কোন প্রকার বর্ণ নাই, কিন্তু দৃশ্যবস্তু যে প্রকার বর্ণময়ই হউক, তাহার আঁকর্ষণ মতে চক্ষুর দৃষ্টি বস্তুর বর্ণ দৃষ্টে স্থির করিতে পারে। ঐ আকর্ষণী ক্ষমতা সৎবস্তু না হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন বায়ু যদি স্পর্শিত না হইত, তাহা হইলে কখনই দেহের উপরে বায়ু স্পর্শন প্রকাশ পাইত না। এস্থলে বায়ু একটী সৎবস্তু, তাহার আকর্ষণমতে দেহ শৈত্য ও উষ্ণত্ব অনুভব করিতে পারিল। সাধারণ বুদ্ধিতে আকর্ষণীকে দেহের ক্রিয়া বলা যায়। কিন্তু উহা দেহের নয়, চৈতন্যের ক্রিয়া। চৈতন্যই তেজোরূপে দেহেতে বর্ত্তমান, অবস্থাভেদে আকর্ষণ যেমন অনুভূত হইবে, চৈতন্য তাহাতেই প্রকাশ পাইবে, ইহাই বিজ্ঞান বিবেচনা। এই উদাহরণে বেশ বুঝা গেল যে, কি অন্তরে, কি বাহ্যে সৎবস্তুর আকর্ষণ না হইলে কোন-ক্রমেই চৈতন্যের প্রকাশ হয় না। চৈতন্য, মন, বাসনা, এই তিনটীই দেহের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তা। চৈতন্যের সাহায্যে মন অনুভব করেন, মনের সাহায্যে বাসনা, ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। আকর্ষণী ক্ষমতা হইতে কি বাহ্য কি অন্তর সকল স্থানের ক্রিয়া প্রকাশ হয়। সৎ চিন্তায় অন্তর আকর্ষণী প্রকাশ ও বাহ্য বস্তু হইতে বাহ্যিক আকর্ষণী প্রকাশ হইয়া

থাকে। বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে অসৎভাগ ত্যাগ করিতে হয়। বস্তুতঃ কোন একটী বস্তু অসৎ হইলেও তাহাকে অবস্থাগত সৎ বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, নচেৎ অনুভব হইবার উপায় নাই। কারণ তাহা না হইলে, আকর্ষণী ক্ষমতা প্রকাশ হইবে না। একটী অসৎ পরিপূর্ণ উপন্যাস মধ্যস্থ নায়কাদির চিন্তা করিতে হইলেও তাহাকে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষবৎ সৎ বলিয়া ভাবিতে হয়। কারণ যাহা অসৎ তাহাতে কিছুই নাই, তাহার আকর্ষণ নাই, অতএব কোন অনুভবের ক্ষমতাও নাই। এক্ষণে আর একটী বিচার এই, মনে যেমন সৎ ভিন্ন অনুভব হয় না, তেমনি শূন্য ভিন্ন অনুভব প্রকাশ হয় না। যথায় শূন্য নাই, তথায় একটা না একটা ক্রিয়া প্রকাশ আছে; সে স্থান ক্রিয়া মণ্ডিত বলিয়া অপর ক্রিয়া প্রকাশ অসম্ভব। যেমন শিরায় রক্ত সঞ্চারিত বলিয়া তাহাই ক্রিয়াবান রহিয়াছে। মস্তকে বুদ্ধিস্থিতঃ, তথায় বিচার হইতেছে। তথায় অনুভব হয় না। বিজ্ঞান বুদ্ধিতে বুঝিলে শূন্য ভিন্ন চিন্তা ক্রিয়ার অসম্ভব। দেহ মধ্যস্থ সকল স্থানই ভূতগত ক্রিয়ার ব্যাপ্ত, তাহাদের ক্রিয়া ফলই অনুভাব্য। সেই অনুভবই দেহস্থ শূন্যাধারাস্থিত সৎবস্তু। দেহের মধ্যে যে ছয় স্থানে অনুভব ক্রিয়া প্রকাশ হয়, তাহাকেই ছয়দল পদ্ম কহে। তন্মধ্যে হৃদয়ই প্রধান ও প্রথমানুভাব স্থান। সেইজন্য হৃদয়রূপী অনাহত পদ্মে শ্রীহরির কল্পিত রূপ ধারণা করা আবশ্যক। সেই ধারণা হইতে অনুভব প্রকাশ পাইবে। ঐ অনুভব হইতে শ্রীহরিরূপী চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে। চৈতন্য হইতে মন শ্রীহরিময় হইবে। মন শ্রীহরিময় হইলে বাসনাও হরিময় হইল। বাসনায় শ্রীহরি বিলীনে বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার হরিতে বিলীন হইবে। তখন আর সাধকের বাহ্যিক ক্রিয়া প্রকাশ হইবে না। যিনি যোগী; এই অবস্থায় তিনি প্রণায়াম বশে বাহ্য জগৎ হইতে অন্তরে লীন হইবেন। যিনি সহজ প্রেমিক, তিনি শববৎ সমাধি অবস্থায় নীত হইবেন। যখন এই চৈতন্য বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানপথে পঁহুছিল, তখন শ্রীহরির কল্পিতরূপ ভস্মীভূত হইয়া আপনাপনি স্বরূপ রূপের প্রকাশ হওয়াতে সাধক বিজ্ঞানানন্দে ভাসিতে লাগিল। এ অবস্থাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। প্রমাণে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রকাশ হয় না।

যে মুর্ত্তি প্রাদেশ মাত্র বলিয়া অনুভব হইতেছিল, বিজ্ঞান সাহায্যে তাহাই

জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কারণ দেহস্থ কারণাদিতেই জগৎ ব্যাপ্ত। যেমন নীল বর্ণ কাঁচের মধ্যে থাকিলে জগৎকে নীলবর্ণ দেখা যায়, তেমনি আপনাকে হরিময় দেখিলে জীবন্মুক্ত জন আপনা হইতে অভিন্ন জগৎকে হরিময় দেখিবে।

শিঃ। শ্রীহরিকে কেন প্রাদেশ মাত্র পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিলেন? তাঁহার স্বরূপ ধারণার মধ্যে স্থূলভাবে যেরূপ প্রকাশ করিলেন, তাঁহার সূক্ষ্মভাবে কি পাওয়া যায়?

গুঃ। প্রাদেশ বলিতে সহজ কথায় বিঘত। ঐ বিঘত বলিবার অর্থ আছে। নাভিস্থ মনিপুর পদ্ম হইতে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ পদ্মের ব্যবধানই হৃদয় দেশ। ঐ স্থানটীর ব্যাবধান প্রত্যেক দেহীর স্ব স্ব হস্তের তর্জ্জনী হইতে অঙ্গুষ্ঠ অবধি পরিমিত। ঐ স্থানকে কথান্তরে অনাহত পদ্ম কহে। এই অনাহত পদ্মে চিন্তার উদ্ভব কেন হয়। এবং এই স্থানে ধারণাই বা কেন হয় তাহা মহাদেব স্বপ্রণীত শিবসংহিতায় বিশেষ বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন। মহাদেব বলিয়াছেন যে,—"দেহের মধ্যে চতুর্থ পদ্মই অনাহত" নামে আখ্যাত, ইহা হৃদয়ের মধ্যস্থিত, ইহাতে দ্বাদশটী পত্র আছে। সেই পত্রে (ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ) এই দ্বাদশটী অক্ষর আছে। এবং সেই পদ্মের মধ্যভাগে (যং) এই বায়ুবীজের স্থিতি। সেই অনাহত পদ্মের রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ স্বরূপ ভগবান বাস করেন, তাঁহাকে ভজনা করিলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সকল ক্রিয়ার শুভফল হইয়া থাকে। তথায় কাকিনী শক্তিও আছেন। জগতের কামনাকে বাণলিঙ্গ কহে। বাসনাজাত চৈতন্যকে কাকিনী শক্তি কহে। কামনা বাসনা হইতে প্রথম প্রকাশ্য অভিপ্রায়ই ক হইতে ঠ অবধি দ্বাদশটী বায়ুজাত বর্ণ। বর্ণ সমুদয়ই বায়ুর ঘাত প্রতিঘাত ও জিহ্বার উচ্চারণ ভেদের ইঙ্গিত মাত্র। ঐ দ্বাদশটী বর্ণ উচ্চারণ করিতে অধিক বায়ুর প্রয়োজন, এবং শূন্য হইতে বায়ুর বিকাশ। সেই জন্য দেহবিৎগণ হৃদয়কে শূন্য স্থান এবং "যং"কে বায়ুবীজ কহিয়াছেন। তত্রস্থ অভিপ্রায় প্রকাশক ক হইবে ঠ অবধি বর্ণকে হৃদয় পদ্মের পত্ররূপ কল্পনা করা হইল। বায়ুই সর্ব্ব প্রকাশক, শূন্য সর্ব্বধারক। অগ্নি বীজ, পৃথ্বীবীজ প্রভৃতি যে কোন বীজই থাকুক, সকলি বায়ু বীজের আভাস মাত্র। হৃদয়ের সাহায্য ব্যতীত কামনা বা বাসনা প্রকাশ হয় না। অতএব যে কেহ যে কোন বিষয়ে সেই কামনা বা বাসনাকে ধারণা করিতে পারিবে,

সেই ব্যক্তিই তাহাতেই জয়লাভ করিবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধক হৃদয়ের মধ্যেই প্রথমে অভিষ্ট কল্পনা নিরোধ করিলে, হৃদয় ও সাধনা মতে উদ্দেশ্য সফল করিয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা বিশেষ বিবেচনার সহিত হৃদয়কে বাসনার আলয় জানিয়া সাধ্যবস্তু তাহাতে আরোপ করিয়া সাধনার্থ উপদেশ দিয়াছেন। যদি বাসনা ও কামনাই বিষ্ণুময় হয়, তবে জীবে প্রলয়াবধিই বিষ্ণুময় হইয়া থাকিবে। কারণ বাসনা হইতে জন্ম এবং কামনা হইতে ইহলীলা।

বিষ্ণুকে এইরূপে কল্পনা করিবে যথা:—তিনি পুরুষ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী, প্রসন্নবদন, পদ্মনয়ন, পীতবাসী, নানা রত্নভূষিত বলয়াঙ্গদকঙ্কণ কিরীটবান, হৃদয়পদ্মাসীন কৌস্তুভকণ্ঠ, বনমালী, সর্ব্বদাহাস্যরত, ভক্তমনাভি-লাষপূর্ণ ইঙ্গিতযুক্ত।

এই পুরুষরূপী কল্পিত বিষ্ণু, বিরাট রূপের সূক্ষ্মাংশ মাত্র। বিজ্ঞানী বিরাট বুঝিয়া সূক্ষ্ম ভাবিতে তাহাতে সে সারূপ্য পাইবে। কল্পিত বিষ্ণুর সহিত বিরাটের এই ঐক্য যথা:—পুরুষ বলিতে চৈতন্য; চতুর্ভুজ বলিতে সর্ব্বব্যাপী। শঙ্খাদি বলিতে জ্ঞান বৈরাগ্য বিবেক বিজ্ঞান। ভূষণাদি বলিতে কারণ সমূহ। বনমালা বলিতে প্রকৃতি, কৌস্তুভধারী বলিতে স্বপ্রকাশ ও তেজোবান— এইটী বীজ ভাবনা, সাধকের বিশ্বাস ও জ্ঞানভেদে বিরাট ও, বৈষ্ণবী কল্পনা হয় মাত্র।

জ্ঞানযোগের অগ্রে ভক্তিযোগে। ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইলে সহজ প্রেমিক হওয়া যায়।

শিঃ। ভক্তিযোগ-সিদ্ধ কিরূপে হয়?

গুঃ। যাঁহারা একেবারে জ্ঞান লাভ করিতে না পারেন, তাঁহারা ভক্তিতে বৈষ্ণবীকল্পনায় সিদ্ধ হইয়া সেই ভক্তির সাহায্যে যেমন ভূমি খননে আপনিই বারি প্রকাশ হয়, তেমনি আপনি জ্ঞানলাভ করিয়া বিরাট বুঝিতে পারেন। ভক্তিযোগ-সিদ্ধের উপায় এই যে:—যেমন কোন একটী প্রেমিক উপবন মধ্যে বিহারিতা কোন সুন্দরী কুমারীকে দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য স্বগৃহে আগমন করত সেই সুন্দরীর রূপ একে একে আপনার হৃদয়ে কল্পনা করিয়া বাসনা ও কামনাকে সেই সৌন্দর্য্যময়ী করিয়া আপনাকে কামিনীর জন্য উন্মত্ত করিয়া

ফেলে এবং ভবিষ্যৎ কালে প্রণয়ে আবদ্ধ হইবার জন্য সে ব্যক্তি কখন কামিনীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, কখন গজেন্দ্র নিন্দিত গতি, কখন কমলনিভ বদন, কখন বিদ্যুতের ন্যায় কটাক্ষ এই সমস্ত একে একে ভাবিতে থাকে এবং ভাবিতে ভাবিতে তাহা যেন স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তন্ময় হইয়া যায়। তেমনি ভক্তিযোগে ঈশ্বরকে পূর্ব্ব কল্পনায় কল্পিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরময় করিতে হয়। যখন ঐ কামুকের ন্যায় বাসনাকে ও কামনাকে সাধকে ঈশ্বরময় করিতে পারিবে, তখন তাহার ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইবে। কামুক যেমন সেই অবস্থায় ঐ কামিনীর সঙ্গলাভে উৎসুক হইয়া তাহার শরীরের যথার্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পর্শন আকাঙ্ক্ষা করে, সাধকও তেমনি ঐ বৈষ্ণবী রূপের আকর স্বরূপ বিরাট লাভ করিতে আপনাপনিই আশা করিয়া থাকে। যখন এই আশা হয়, তখন সাধন বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কামুক যেমন প্রণয়ে তন্ময় অবস্থায় প্রেমের আধার বা পুত্তলীকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া আপনি তাহার সেবক হইতে পারিলে সুখী হয়। সাধকও বিজ্ঞান বলে বিরাটময় হইয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করে। সারূপ্য লাভের এইটীই প্রধান উপায় বুঝিতে হইবে।

শিঃ। সিদ্ধ যোগী যদি দেহত্যাগ করেন, এবং তিনি দেহত্যাগান্তে হরিময় হইয়া কি ভাবে থাকিবেন?

গুঃ। যে যোগী জ্ঞানের সহিত থাকিবেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থির ভাবাবলম্বন করিবেন। এবং বিপদহীন স্থানে সুখাসনে উপবেশন করিবেন। যোগী যোগবলে ঈশ্বরে রমন করিয়া যখন দেখিবেন যে কালভোগ্য দেহ নাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন তিনি যে যোগবলে জ্ঞানলাভ করিয়া ঈশ্বরময় হইয়াছেন, দেহান্তে কি প্রকারে সেইরূপ ঈশ্বরময় হইয়া থাকিবেন, এই ভাবনা ভাবিবেন। যোগী এই ভাবনায় সিদ্ধ হইয়া বিজ্ঞান বুদ্ধিতে বুঝিবেন যে, প্রাণ বায়ুই সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং মানস সকল ভাবনার কর্ত্তা। জীবাত্মা এই উভয়ের আকর্ষক। বাসনা সকলের সংযোজন কারিণী। বুদ্ধি পথ প্রদর্শক। জ্ঞানবলে এইটী বুঝিয়া ঐ কয়টী শুদ্ধ বস্তুর সহিত যোগী নাশপ্রায় দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। এক্ষণে সহজ বুদ্ধিতে বুঝিয়া,—মন, জীবাত্মা ও বুদ্ধি—ত্যাগ করিলে কর্ত্তা পাওয়া ভার। বিজ্ঞানমতে বুঝিলে কারণ সমূহের অবিদ্যা পরিণাম হইতে স্বভাব লাভ হয়, তাহাও তিনগুণময়।

কারণ সমূহ কালশক্তির সাহায্যে বিকারীভূত হইলে ইন্দ্রিয়াদি হয়। ইহাতে বেশ বুঝাগেল কারণ সমূহ হইতে অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার যোগে এবং কালের যোগে স্বভাব মতে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেই মানব, পশু, পক্ষীর সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর চৈতন্যরূপে যখন কারণে আবিষ্ট হইয়া কারণ সমূহকে ক্রিয়াবান্ করেন; সেই কারণ মিশ্রিত চৈতন্য হইতে বিজ্ঞান মতে কোন অংশে জীবাত্মা, কোন অংশে মন, কোন অংশে বুদ্ধি, কোন অংশে জ্ঞান প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়। এক চৈতন্য বিহনে কারণাদি বৃথা। কারণ বৃথা হইলে সমস্তই বৃথা। চৈতন্য হইতে স্বভাব ভেদে কামনার উদ্ভব। দেহের কর্ত্তা চৈতন্য, তাহার ক্রিয়া সহচরী বাসনা। সেইহেতু বিজ্ঞান মতে চৈতন্যকে পুরুষ বলা যায়। এই পুরুষ শব্দেব অর্থ দেহধারী জীব। কি নারী কি নর সকলেতেই উহা কল্পিত। বিজ্ঞানে সাধক বলিতে বাসনাযুক্ত চৈতন্য। সেই চৈতন্য বাসনার স্বভাবে দেহের পালন কর্ত্তা হন। তাহারি ক্রিয়া সাধক মধ্যে জীবাত্মাদি নাম লয়েন। যেমন শাখা প্রশাখা ছেদনে বৃক্ষ শোভাহীন হয়, তেমনি স্বভাব মতে ইন্দ্রিয়াদির কদাচারে চৈতন্যাংশ মন ও জীবাত্মাদি কলুষিত হইয়া বাসনাবলে কলুষিত ভাব ধারণ করে। বাসনা চৈতন্যের সহিত মিলিয়া যখন জীবাত্মাদির উদ্ধার করতঃ স্বরূপে রাখেন, তাহাকেই মুক্তাবস্থা কহে। এক্ষণে কি উপায়ে সেই মুক্তাবস্থার সহিত কারণ মণ্ডিত দেহত্যাগ করিয়া কারণ হইতে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যে অবস্থান করাযায় তাহার উপায় বিধানার্থে পূর্ব্বোক্ত মৃত্যুযোগ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ঐ প্রক্রিয়া মহা বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার অবস্থিত রহিয়াছে পরে বলিতেছি। যে যোগী ঐ প্রক্রিয়ায় মরিতে ইচ্ছা করিবেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থিরভাবে নির্জ্জন প্রদেশে সুখাসনে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত সাধনা করিবেন।

শিঃ। যোগী কি প্রকারে মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় জানিতে পারিবেন? এবং যিনি যোগী তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন করিয়া সাধনা করিবার কি প্রয়োজন?

গুঃ। যোগীগণ প্রাণায়ামাদির দ্বারা স্বীয় স্বীয় চৈতন্য বলে জীবাত্মাকে ক্রিয়াবান রাখিয়া বহুকাল জীবন ধারণ করেন মাত্র। এই যে দেহটি এটি কালের হস্তে অবস্থিত। যেমন উই পোকা কাষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে

কাষ্ঠকে মৃত্তিকায় পরিণত করে, তেমনি কাল এই দেহকে ক্ষণে ক্ষণে নাশ করিতেছেন তবে সংসারী ও অযোগীগণের দেহ শীঘ্র নাশ পায়। তাহার কারণ এই যে ভয়, নিদ্রা, মৈথুন চিন্তা রিপুতাড়না প্রভৃতির তেজে দেহ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয়িত হইয়া যায়। অন্তরস্থ তেজ বায়ুরূপে কল্পিত হইয়া এই দেহ সংরক্ষণ করে ; তাহাদের নাম পঞ্চ প্রাণ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, ইহারাই পঞ্চ প্রাণ, ইহাদের বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। যোগী মুদ্রা ও অষ্টাঙ্গযোগ বলে ঐ পঞ্চপ্রাণকে নিরোধ করিয়া ভয়, নিদ্রা, চিন্তাদির হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া সংসারী অপেক্ষা এই দেহকে বহুকাল পর্য্যন্ত পীড়া ও মৃত্যু হস্ত হইতে রক্ষা করেন। যেমন একখানি কাষ্টকে স্বভাব দ্বারা ক্ষয় করাইলে তাহা বহু কালান্তে ক্ষয়িত হয় এবং অস্বাভাবিক ভাবে অনলে দগ্ধ করিলে নিমেষে নাশ করা যায়, তেমনি এই দেহকে কেবল কালরূপী প্রকৃতিতে স্থাপন করিলে বহুকালে নাশ পায়। আর ঐ ভয় নিদ্রাদিরূপ অনলে নিক্ষেপ করিলে অল্পদিনেই নাশ পায়। সেই জন্য যোগীগণ প্রাণাদির ও মনের চেষ্টা যোগবলে সাম্য করিয়া ভয়াদি হইতে প্রজ্বলিত পীড়াদি রূপ অনল হইতে দেহকে রক্ষা করত স্বভাবের উপরে দেহকে রক্ষা করেন। কিন্তু কালে ও দেহ শত বর্ষ মাত্র স্বরূপে থাকে যোগীগণ তাহা হইতে অনেক কাল বাঁচিবার জন্য ঐ যে কালক্ষোভক পঞ্চ প্রাণ উহাদের নিরোধ করেন। যেমন রৌদ্রই ফলের উৎপাদনকারী এবং ফলের পরিপককারী হয়, তেমনি ঐ পঞ্চ প্রাণ ও দেহ সংরক্ষণ ও বর্দ্ধনকারী এবং কালের সাহায্যে দেহের বিনাশকারীও হইয়া থাকে।

ঐ প্রণাদির চেষ্টা হইতেই ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ এই যে প্রাণের ক্ষোভে ক্ষুধা উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে পদ আহারান্বেষণে গমন করিল। হস্ত গ্রহণ করিল। নয়ন ও জিহ্বা রস ও উপাদেয় বিবেচনা করিল। দন্ত চিবাইল, উদান বায়ু গিলিল। সমান বায়ু তাহাকে পরিপাক করিল। ব্যান বায়ু তাহার সারাংশ শরীরের পুষ্টি করিল। অপান বায়ু অসারাংশ বাহির করিয়া দিল। দেহের সকল ক্রিয়াতেই প্রাণের শ্রেষ্টত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঐ প্রাণাদির চেষ্টা হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হয়। উহারাই দেহের শ্রেয় ক্ষয় করণ ও বর্দ্ধনের ন্যায়ক। ঐ শ্বাস প্রশ্বাসের তেজে প্রাণাদির ক্রিয়া হয়। তাহা হইতে

ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হয়। ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইতে রিপুগণের ক্রিয়া হয়। সকলের মুখ্যকারণ শ্বাস জয় করণ। শ্বাস জয় করিলে প্রাণচেষ্টা হ্রাস হয়। তাহার সহিত আর আর সকলের চেষ্টা হ্রাস হইয়া থাকে। ঐ শ্বাস-ক্রিয়া জয় করিতে অভ্যাস করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। পূর্ব্বে বলা হইল যে, ঐ শ্বাস জয় হইতেই দেহের নাশ ও রক্ষা হইয়া থাকে। এবং ঐ শ্বাস জয় হইতেই যোগীগণে দেহ রক্ষা করেন এবং কালবশে দেহ অসমর্থ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন।

এই যে শ্বাস জয়ের কথা বলা হইল, উহাকে জয় করা সহজ ব্যাপার নয়। সেই শ্বাস জয় করণের স্থুলভাবে যোগবিৎগণ আসন কল্পনা করিয়াছেন। এই দেহ যত শূন্যভাবে থাকিবে ততই শ্বাস কম হইবে। এই দেহ যত পূর্ণভাবে থাকিবে ততই শ্বাস ক্রিয়া অধিক হইবে। প্রাণকে নিরোধ করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করিতে পারিলে দেহ শূন্য হয়। এবং চঞ্চলতা নাশ করিয়া শিরাদি সঞ্চালন সমান করিতে পারিলে শ্বাস মান্দ্য হইয়া আসে। ঐ শ্বাস মান্দ্য হইলেই অন্তরের ক্রিয়া নাশ হইয়া যায়। অন্তরের ক্রিয়া নষ্ট হইলে বাহিরে শান্তিলাভ করা যায়। ঐ শ্বাসজয় করণার্থ শিরা সমূহ সমান করণার্থ ও দেহ শূন্যার্থ যে সকল আসন কল্পনা হইয়াছে তাহাদের নাম পদ্মাসন উগ্রাসন স্বস্তিকাসন। এই কয়েকটী আসনের মধ্যে যে সাধক যাহাতে সুবিধা বুঝিবেন অর্থাৎ শরীরকে স্থির করিতে পারিবেন, তিনি তাহা ব্যবহার করিতে পারেন।

দেহের ক্রিয়া থাকিলে চিত্ত অস্থির হয়; বিজ্ঞান ধারণার ক্ষতি হইতে পারে। সেই জন্য যোগীগণ অষ্টাঙ্গ যোগে যেমন আয়ু বৃদ্ধি করেন তেমনি আবার উহাকে ক্ষয় করিতে পারেন। মৃত্যুকালে যোগী প্রাণাদির চেষ্টার সহিত অপর চেষ্টা বিলয় পূর্ব্বক শুদ্ধ পরমাত্মায় বিজ্ঞান স্থাপন করিয়া থাকেন। তাহাতেও বাহ্যক্রিয়া নাশার্থ নির্জ্জন স্থানের আবশ্যক। আন্তরিক ক্রিয়া নাশার্থ অষ্টাঙ্গ যোগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। দেহটী ভূত সমষ্টি মাত্র। ভূত-ক্রিয়া প্রকাশ হইলেই দেহস্থ ভূতের চঞ্চলতা হইয়া থাকে, কারণ উভয়ের আকর্ষণ আছে। যেমন শব্দ হইলেই কর্ণ শ্রবণ করে। আকর্ষণ আছে। তাহাতে মজ্জার কম্পন হয়। সেই মজ্জার কম্পন হইতে ভয় হয়। সেই ভয় বোধ করিতে বুদ্ধি মনকে চঞ্চল করে। মন তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে

বাসনা সেই দিকে ধাবিত হয়। একা শূন্য হইতে উত্থিত বাহ্যিক ক্রিয়া শব্দ হইতে সকলের বিকার হইল। এই প্রকার ক্রিয়ার সাহায্যেই চৈতন্যের অনুভব হইয়া থাকে। সেই সকল বিপদ হইতে ত্রাণার্থ নির্জ্জন স্থানের আবশ্যক। আন্তরিক ক্রিয়ার নাশার্থে আসনের আবশ্যক। বিজ্ঞানময় হইবার জন্য ধ্যান, ধারণা, সমাধির আবশ্যক। মৃত্যুযোগে যম নিয়মাদির প্রয়োজন নাই। উহারা দেহ পোষনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

শিঃ। দার্শনিকেরা ঈশ্বর নিরাকরণ করিতে এত কষ্ট কেন স্বীকার করিয়াছেন?

গুঃ। এই যে জগৎ, বিকারে প্রস্তুত। প্রতি প্রলয়ে ইহার সংস্করণ হইতেছে। জগৎ বলিলেই চৈতন্যাদি সকলের উল্লেখ হইল বুঝিতে হইবে। জ্ঞান মন যখন সকলে বিনাশীভূত দেখিল, তখনি কে বিনাশ-কর্ত্তা বা স্রষ্টা স্বভাব দ্বারা দেখিতে চেষ্টা করিল। তাহার জানিবার ক্ষমতাই বিজ্ঞান। দার্শনিকেরা যখন ঈশ্বর নিরাকরণ করিলেন, তখন বুধমণ্ডলী বলিলেন, এই এত কষ্টের জীবনযাত্রা বা ইহলীলা ইহারা বাসনা মতে জন্মে জন্মে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং বাসনাই সুখ দুঃখাদি ভোগ করাইতেছে। আবার তাঁহারা বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞান বলে দেখিলেন এই যে সুখ দুঃখাদি ইহারা স্বভাব হইতে অনুভূত হইতেছে। ইন্দ্রিয়াদি ও রিপু প্রভৃতির কুপথ গমনে স্বাভাবিক পীড়া উপস্থিত হইয়া সুখ দুঃখাদি সংযুক্ত সংসারে পতিত হইয়া বাসনা কলুষিত হইতেছে। তাহাতেই জন্ম জন্মান্তরে দুঃখযোনি লাভ হইতেছে জ্ঞান লোপ হইতেছে। যদি সৃষ্টি কর্ত্তার উপর নির্ভর করিয়া এই বাসনা শুদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে জীবাত্মার চিরকাল জ্ঞান থাকিবে। জন্ম জন্মান্তরে জ্ঞান থাকিলে স্বভাবের অধীন হইয়া সুখ দুঃখাদির অধীন হইতে হইবে না। সর্ব্বদাই মনকে পরমানন্দ রাখিয়া স্বরূপ চৈতন্য ও ঈশ্বরানন্দ ভোগ করা যাইবে এবং সংসার যাতনা উপরত হইবে। ইহাই জীবের নিরুপাধিত্বের লক্ষণ ও যাতনা হইতে নির্ব্বাণের উপায়। সেই জন্যই সংসারী ঈশ্বর বলিয়া কি দুঃখে কি সুখে সুখী হয়। কেহই ঈশ্বর নামে অনিচ্ছা করে না। যাহারা অনিচ্ছা করে, তাহারা অজ্ঞানী কি বৃক্ষাদির ন্যায় জীবনসত্ত্বে অনুভবহীন। যোগীগণ সেই জন্য সকল যাতনা হইতে শান্তিলাভ করিয়া নিরুপাধি হইবার নিমিত্ত সকল প্রকার

মায়াবর্জ্জিত পরমশান্তিরূপ সেই বৈষ্ণব পদকে শ্রেষ্ট ভাবিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন এবং বাসনানুযায়িক সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত হন।

শিঃ। সদ্যমুক্তি ও ক্রমমুক্তি কাহাকে বলে?

গুঃ। সদ্যমুক্তি ও ক্রম-মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ক্রম মুক্তির বিশেষ বিবরণ আবশ্যক বিধায়ে বলা হইতেছে। সদ্যমুক্তিকে ধারণাসিদ্ধ হইয়া নিরুপাধি ব্রহ্মে মিলিতে হয়। কিন্তু ক্রম-মুক্তির নিয়ম তাহা নহে। ক্রমমুক্তিতে সাধকে দেহত্যাগ না করিলেও সমস্ত অনুভব করিতে পারেন এবং সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। যাঁহারা ক্রম মুক্তিতে সিদ্ধ হইতে পারেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডে অষ্টাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন এবং সেই অষ্টাধিপত্য সিদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত মিলিত হইয়া শূন্যমার্গে বিহার করিতে পারেন। ঐ শূন্যমার্গে বিহার করিতে পারিলেই ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করা হইল। সিদ্ধগণ এইরূপে শূন্যমার্গে বিহার করিয়া শ্রীহরির লীলামধ্যে গমন পূর্ব্বক আত্ম-রমণ করিয়া থাকেন এবং ইহাকে পরম ইষ্টপদ বলিয়া পরমানন্দিত হয়েন। এই ক্রম মুক্তিকে তান্ত্রিকেরা বিশেষরূপে প্রিয় বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা ইহাকে পরম পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমি শিববাক্য দ্বারা তাহার প্রমাণ করিতেছি। অনেকেই বোধ হয় ব্রহ্মাণ্ড বলিতে জগৎকে বুঝিবেন। কিন্তু যোগীগণের ব্রহ্মাণ্ড তাহা নহে। যোগীজনে দেহকেই ব্রহ্মাণ্ড কহেন। এই দেহে সপ্ত সমুদ্র, অষ্ট কুলাচল নদ নদী, সরোবরাদি এবং জীব প্রভৃতি রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই দেহে শূন্য, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল রহিয়াছে। সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ এই দেহেই রহিয়াছে। যোগীজনে এই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অনুকরণে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নামকরণ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা বহিস্থ দৃশ্যমান জগৎকে অপার্থিব ভাবিয়া নিজের আয়ত্ব জগৎ দেখিতে উৎসুক হয়েন। এক্ষণে শিব বাক্য দ্বারা দেহ ও জগৎ যে অভেদ এবং দেহের স্থান ভেদীয় নাম লইয়া যে জগতের স্থানভেদের নাম হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিতেছি। বৈষ্ণব শাস্ত্র, উপনিষৎ, ও শ্রুতির মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মহাদেব গৌরীকে যে সময়ে যোগশিক্ষা দিবার উপক্রম করিতেছেন সেই সময়ে যোগের পূর্ব্ব উপদেশ দেহ তত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে। সেই দেহতত্ত্বটি অতি প্রাঞ্জল ভাবে তন্ত্রে নিবিষ্ট আছে।

এই মহাব্রহ্মাণ্ডরূপী জগৎটীই ঈশ্বরের স্থূলতর রূপ, আর প্রত্যেক জীবদেহ তাহার আংশিক রূপ। ঐ স্থূলতর রূপের সহিত আংশিক রূপের সমন্বয় করিয়া এক করা হইল। অর্থাৎ যে উপায়ে মহাব্রহ্মাণ্ডরূপী বিশ্বদেহ বিরাটকে এবং ক্ষুদ্রদেহী জীবরূপী বিরাটকে এক বোঝা যাইবে তাহাকে যোগ কহে। এই জীব দেহে সপ্তদ্বীপ সুমেরুগিরি নদ নদী পর্ব্বত, ক্ষেত্র, ঋষি, মুনি, নক্ষত্র, গ্রহ তীর্থ, পুণ্যপীঠ, পীঠদেবতা, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী জল, বায়ু, আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এ সমস্তই আছে। যে মানব শরীরস্থ এই সমস্ত রহস্য জানিতে পারে এবং পূর্ব্ব বর্ণিত জ্ঞানের সহিত আপনার ঐশ্বর্য্য সম্পাদন করিতে পারে তাহাকে যোগী কহে।

এই দেহের নাম ব্রহ্মাণ্ড, মেরুদণ্ডই ইহাতে সুমেরু ; ঐ সুমেরুর শৃঙ্গ মস্তকে বিস্তীর্ণ আছে। তাহাদের মধ্যে বামশৃঙ্গে চন্দ্র উদিত হইয়া সুধাবর্ষণ করিতেছেন ; সেই সুধা দুইভাগে বিভক্ত। তাহার একটীস্রোত দেহের পুষ্টির জন্য গঙ্গারূপী যে ঈড়া নাড়ি দেহের বামে রহিয়াছে তন্মধ্যে গমন করিয়া সকল শরীরে ব্যাপ্ত হইতেছে। অপর একটী স্রোত জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ দুগ্ধের ন্যায় তাহা মেরুর মধ্যস্থা সুষুম্না নাড়িতে বহিতেছে। মেরুর মুলদেশে সূর্য্য দ্বাদশ কলাযুক্ত হইয়া শরীরের দক্ষিণ মার্গ বিহারী পিঙ্গলা নামক যমুনা পথে কিরণ প্রদান করিয়া চন্দ্রের সুধা শোষণ করিতেছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া যোগী জগৎ ও দেহ এক ভাবিয়া অষ্টাঙ্গযোগ সিদ্ধ ও অষ্টযোগ লক্ষণ সিদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারে। যে যোগীর কেবল ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া হয়, দেহের প্রতি ভেদ ভাব না থাকাতে তাহার ভেদানুভব হয় না। যখন কল্পান্ত হয় তখনও তাহার ঐশিক বিস্মৃতি নাশ পায় না।

অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিতে সিদ্ধ হইতে পারিলেই মন ইন্দ্রিয়েতে রমণ করিতে পারে। এবং তাহার সহিত যোগাচার সিদ্ধ হইলে সাধক কল্পান্তস্থায়ী হইয়া দেহের মধ্যস্থ শূন্যে বিহার করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে পারে এবং অনুমানমতে বাহ্য জগতেও ভ্রমণ করিয়া স্বপ্নবৎ সমস্ত সম্মুখে দেখিয়া সত্য ভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

যে সকল যোগীগণ পবনান্তরাত্মা হইয়াছেন, অর্থাৎ যে সকল যোগী যোগ-বলে বায়ু সাধন করিয়া প্রাণ ও চৈতন্যময় নাড়ি সকলে বায়ু প্রবেশ করাইয়া

চৈতন্যময় হইয়াছেন, তাঁহারা এই ত্রিলোকের অন্তরে ও বাহিরে অবাধে প্রবেশ করিতে পারেন ; ভূ, ভুব,স্বঃ, নামক স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল রূপী তিন লোক। কারণ ও চৈতন্যাবস্থাকে স্বর্লোক কহে। প্রকৃতিময় স্থানকে ভুবলোক কহে। বিকারী ক্রিয়াভূত অর্থাৎ জন্ম মরণাদি ব্যাপক ও প্রকাশ্য জগৎ ব্যাপ্ত অবস্থাকে ভূ কহে। ঐ তিন লোকেই ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডই দেহ। দেহের অন্তরে পরিভ্রমণ করিলেই ত্রিলোকের অন্তরে ভ্রমণ করা হইল ; আর অহঙ্কারাদি ভেদ করিয়া প্রকৃতিময় হইলেই ত্রিলোকাতীত হইয়া বহির্জ্জগৎ দেখা হইল। এই যে ক্রমমুক্ত যোগীগণের গতি প্রকাশ করিলাম, ইহা যজ্ঞাদিকর্ম্মী প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোন প্রকার বিদ্যাভ্যাসে পাওয়া যায় না, কোন প্রকার যোগে বা তপস্যাতে নাই ; কোন প্রকার সমাধিতেও লাভ হয় না। অতএব ক্রমমুক্তি অপেক্ষা রমণীয় অবস্থা আর নাই। কিন্তু পূর্ণ লয় একটী প্রধান উপায়।

শিঃ। পূর্ণ লয় কিরূপ ?

গুঃ। এই যে জঠর প্রদেশ, ইহাতে যে পদ্ম আছে, তাহাকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য দ্বাদশকলাযুক্ত তপনরাজ এইস্থানে কিরণ বিতরণ করেন। সেই কিরণকে বৈশ্বানর তেজ কহে। বৈশ্বানর তেজের সাহায্যে সমান ক্রিয়া হইয়া প্রাণীর দেহে বিবিধ প্রকার আহারীয়ের রসপাক প্রাণীর দেহকে বলিষ্ঠ করিয়া থাকে। তজ্জন্য দেহপ্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি জীবাত্মার সহিত প্রফুল্লিত থাকে। সেই অগ্নির সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনী প্রফুল্লিত হইয়া সুষুম্না মার্গস্থ পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া অপরাপর সকল নাড়িকে চৈতন্যময় করে। সেই চৈতন্য, কারণ ও বৈশ্বানর তেজ সাহায্যে ব্রহ্মমার্গরূপী সুষুম্নার দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে আগমন পূর্ব্বক আদিত্যাদির পথ অতিক্রম করিয়া প্রকৃতি হইতে অতীত হইলে কালের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। এই প্রকার অবস্থায় উপস্থিত হইলে যদি সাধকের পরমাত্মাময় হইতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা মৃত্যু বা জীবন্মুক্ত কিম্বা সদেহে ত্রিলোক ভ্রমণ ও অদেহে ত্রিলোকাতীত হওন কিম্বা মনেন্দ্রিয়ে অবস্থান করিতে ইচ্ছা হয় তাহা আচরণ করিতে এই উপায়ের আবশ্যক। চৈতন্যময় হইলে সাধক আপনার সাধ্যমত বলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা নেত্রদ্বয় আচ্ছাদন করিবে। কুম্ভকে বায়ুরোধ করিবে।

তাহা হইলেই সাধকের হৃদয়ে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য ও সুষুম্নার তেজ মিলিত হইয়া ভীষণ জ্যোতিঃপ্রকাশ হইবে। জ্যোতিকে সাধক শূন্যাকৃতি জগদ্ব্যাপ্ত বলিয়া আপনাকে জ্যোতির্ম্ময় দেখিবে। সেই মহাতেজই আত্মা। তখন অপর উপাধি দূর হইয়া এক জীবাত্মাই সর্ব্বস্ব হইবে। ইহাকে মহা প্রলয় কহে। এই অবস্থানেতেও কর্ম্মজাত দ্বৈতভাব থাকিবার সম্ভাবনা। পরে পূর্ণ লয় হইবার জন্য সাধক ঐ নিয়মে ক্ষণেক থাকিলে অন্তর হইতে নানা প্রকার নাদ শ্রবণ করিবে প্রথমে মধুকরের ন্যায় ধ্বনি প্রকাশ হইবে, তদন্তে বেণুশব্দ প্রকাশ হইবে। তদন্তে বীণা নাদের ন্যায় শব্দ প্রকাশ হইবে। তদন্তে জগতানুভব নাদরূপী ঘণ্টা নাদের ন্যায় শব্দ প্রকাশ হইবে। এই অবস্থায় যোগীর মন বাসনা ও ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া একীভাব ধারণ করিবে। পরে হৃদয় হইতে ভীষণ রূপে মেঘধ্বনির ন্যায় শব্দ উঠিয়া ভূত বিকার হইতে জীবাত্মাকে শূন্যে লয় করিবে। ইহাই পূর্ণ লয়। এই অবস্থায় সাধক যদি দেহ রাখেন তাহা হইলে ভূতভবিষ্যতজ্ঞ হইয়া বাহ্য বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইবেন, আর যদি দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করিয়া কেবল চৈতন্যানুভব করেন, তবে আপনার হৃদয়াকাশে যেন লীন হয়েন। তাহা হইলে ঐ হৃদয়স্থ শূন্য যখন যাহা শূন্যে লয় হইবে সাধকের কর্ত্তৃরূপী মানসেন্দ্রিয় ও চৈতন্যের সহিত সেই শূন্যে লয় হইবে।

বৈশ্বানর অগ্নির সাহায্যে বিমান পথে লইয়া ব্রহ্মরূপী সুষুম্নার দ্বারা সাধক পবিত্র হইয়া শিশুমার চক্র অবধি গমন করিবে।

শিঃ। দেহত্যাগ বা দেহাতীত অবস্থার অনুভব ও স্মৃতি সংরক্ষণ কিরূপে সম্ভব হইবে?

গুঃ। ঐ গতি কি উপায়ে প্রমাণিত হইতে পারে, তাহার অতি সহজ উপায় আছে; যেমন একটী ফল হইতে তাহার সার গ্রহণ করিলে ফলাপেক্ষা সারটী অধিক গুণকারী হয়। ফলেও যে যে গুণ ছিল সারেও তাহা থাকে। তদ্রূপ যে সকল সারবস্তু লইয়া এই দেহকে জীবিত এবং ক্রিয়াবান্ দেখা যায় তাহারা যদি একত্রভাবে অসাররূপী দেহকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে কি তাহাদের আপনার ক্রিয়া আপনাতে বিরাজিত থাকে না? অবশ্যই থাকে।

যেমন তেজ হইতেই বীজাদির অঙ্কুর হয় তদ্রূপ তেজ হইতেই জগতের

ক্রিয়া হইয়া থাকে। তেজ না থাকিলে ইন্দ্রিয়, চৈতন্য, মন বাসনা কোন প্রকার কার্য্যকারী হইতে পারিত না। সেই তেজের প্রকাশ-কর্ত্তা বায়ু। বায়ু শূন্য তেজ এই তিনটি মুখ্য ভূতাংশ। ঐ তিনটির একত্র মিলনে জলের আবিষ্কার হয়। জল একেবারে হয় না। বায়ু, শূন্য তেজ, এই তিনের মিলনে এক প্রকার বিকারী তেজ হয়, তাহা দুইভাগে বিভক্ত। একভাগে তরলতা সম্পাদন করে, তাহাকে যজুর্ব্বেদ মতে মহাসার কহে। অপর একভাগ অপর ভূতাংশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে ইহাকে যজুর্ব্বেদে সার কহে। ঐ দুই বিকারি তেজ হইতে বারির প্রকাশ। ঐ সকল ভূত মিলনে এবং তেজাদিতে পৃথ্বির প্রকাশ। একমাত্র-চৈতন্য বলে দেহজ তেজ ও মহাসারের ক্ষমতায় দেহে একপ্রকার রস জন্মে তাহাকে শোণিত কহে। সেই শোণিত হইতে মজ্জা উৎপন্ন হয়, তাহার সাহায্যেই দেহের সংস্কার হইয়া থাকে। এ স্থানে তাহা প্রমাণ বাহুল্য। বিজ্ঞান মতে ভূতগত তেজ ও চৈতন্য উভয়ের সংযোগে দেহের ভূতক্রিয়া যোনীমতে রূপ ও চৈতন্য মতে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হইয়া থাকে।

একটী গৃহের বায়ু সঞ্চার আবদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি জ্বালিলে তেজের আধিক্যে যেমন তৎক্ষণাৎ গৃহপ্রবেশীর চৈতন্য হৃত হয়, তেমনি বায়ু আকর্ষণে তাহাতে অগ্নি প্রবেশ হইয়া যোগীজনের চৈতন্য হৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান মতে চৈতন্য হইতেই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকাশ। যেমন ফলের সাররূপী বীজে সমস্তই বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ দেহের সাররূপী চৈতন্যে ও জ্ঞানেন্দ্রিয়তেই মন জ্ঞানাদির অবস্থান।

যেমন সুর সংযুক্ত তার বীণার উপর সাজাইলে ঘাত প্রতিঘাত মতে তার আপনার হৃদয়স্থ সুর প্রকাশ করে, আবার তাহাতে আপনাতেই আপনার ক্রিয়ার অন্তর্হিত করে, তেমনি চৈতন্যাদি দেহে থাকিয়া ভূতপীড়নে ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছিল, দেহ ত্যাগে স্বরূপে অবস্থান করিল। ইহা যদি বিজ্ঞানে মীমাংসিত হইল, তখন কেন না দেহত্যাগ বা দেহাতীত অবস্থার অনুভব ও স্মৃতি সংরক্ষণ সম্ভব হইবে? অবশ্যই হইবে।

শিঃ। সৃষ্টির মধ্যে নাম, রূপ, ও গুণ ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন?

গুঃ। মনুষ্য, গো, ব্যাঘ্র ইত্যাদি জাতি বাচক সংজ্ঞাকে নাম কহে। তার উহাদের দ্বিপদ, চতুষ্পদ, লোমশ প্রভৃতি ভেদকে রূপ কহে, এবং বুদ্ধাদি

পক্ষ্যাদিরও স্বাভাবিক বর্ণকে গুণ কহে। মনুষ্যাদিকে স্থূলভাবে বুঝিতে হইলে পদার্থতত্ত্বে সকলেই এক এবং রূপের ভেদে বিবেচনা করিতে হইলে, বাসনা জাত কর্ম্মস্বভাব প্রকাশ হয়। সেই বাসনাই নিত্য ও জীবের কর্ম্ম-কারিণী। তাহা চৈতন্যময়ী। সেই বাসনা জীবাত্মাকে লইয়া যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ তাহার যোনীমতে রূপ প্রদান করিবে। তজ্জন্যই কেহ দ্বিপদ, কেহ চতুষ্পদ, কেহ বৃষ, কেহ কীট পক্ষী হইয়া সংসারে বিহার করিতেছে। আর পীত শুক্লাদিবর্ণ এক শুক্ল বর্ণেরই তেজ, তার তারতম্যের রূপান্তর। ভূত সকলের গুণভেদে তেজের তারতম্যে শ্বেত পীত কৃষ্ণাদি বর্ণ প্রকাশ হয়। বিজ্ঞান মতে জলের বর্ণ শ্বেত, পৃথিবীর হরিৎ, পবনের নীল, অগ্নির লোহিত ইত্যাদি। ঐ শ্বেত বর্ণ তেজ ভেদে যদি নীলের সহিত পবন গুণে যোগ হয় তাহা সবুজ হয়। যেমন দুর্ব্বাঘাস দেখিতে সবুজ। কিন্তু বস্তুতঃ উহা অধিকাংশ জল, অল্প পৃথ্বি তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বিধায়ে যখন পৃথিবীর উপরে প্রকাশ না হয়, তখন ঈষৎ হরিৎযুক্ত শ্বেতবর্ণময় থাকে; কিম্বা দুর্ব্বা বনে কতকগুলি দুর্ব্বার উপরে কোন প্রকার কঠিন আচ্ছাদন দিয়া বায়ু রোধ করিলে, সবুজাংশ নাশ হইয়া দুর্ব্বা আপনিই পীতযুক্ত শ্বেতাবস্থায় আগমন করে। ইহাতে বেশ প্রমাণ হইয়াছে যে, তেজের তারতম্যে ও ভূতাদির সংযোগ তারতম্যে বর্ণাদি প্রকাশ হইয়াছে। ভূতাদি মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকাশ হইয়াছে। মহত্তত্ত্বই প্রকৃতি।

শিঃ। মায়া শক্তি হইতে কোন কোন শক্তি প্রচারিত হইয়াছে?

গুঃ। ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রকৃতি। নববিধ ঋষি প্রজাপতি; যাহার দ্বারা সৃষ্টির নিয়ম রক্ষা হয়। স্বভাবকে কর্ম্ম কহে। ঈশ্বরের সর্ব্বভূত বর্ত্তমানীয় শক্তিকে বিষ্ণু কহে। মনপ্রকাশক শক্তিকে মনু কহে। ইন্দ্রিয় শক্তিকে দেবতা কহে। নিয়ম সংস্থাপন কর্ত্তাকে ধর্ম্মপতি কহে। স্বভাবকে অন্যায়াচরণে নিরত করাকে অধর্ম্ম কহে। জড় জগতের মধ্যগত তমোগুণী কালকে রুদ্র কহে। জড় ও চৈতন্য উভয় সংযোজক ও বিয়োজক কালকে সর্প কহে। এই সকল তত্ত্বই যে শক্তি হইতে প্রচারিত, সেই প্রধান শক্তিকে মায়া কহে।

শিঃ। জীব দেহে কয় প্রকার শক্তি আছে?

গুঃ। জগৎ দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ চৈতন্যময়, আর একভাগ

জড়ময়। জড়তা প্রকাশক ও নিকট সম্বন্ধে সম্বন্ধীভূত যে চেতনাবস্থা এই জড়েতে ক্রিয়া করিতেছে তাহার বিভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশক কারণ শক্তি সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। চৈতন্যময় ক্ষমতার দ্বারা বায়ুরুদ্ধ ও প্রসারিত হইয়া সজীব জগতে ও পূর্ণ জগতে শব্দের সহিত স্বরের প্রকাশ হয় তাহাকেই গন্ধর্ব্বী শক্তি কহে। এই গান্ধর্ব্বী শক্তি সকলের স্বভাবের সহিত এমন মিশ্রিত যে ইহার ভেদ প্রকাশ করা দুরূহ। এই জন্য কল্পনায় বা কৃষ্ণের বেণুতে গান্ধার রাগের আলাপ পুরাণে কথিত আছে। আনন্দপ্রকাশক চৈতন্যময় অবস্থার প্রকাশক শক্তিকে বিদ্যাধরী শক্তি কহে।

অঙ্গভঙ্গী দ্বারা চৈতন্যপ্রকাশক শক্তিকে চারণ শক্তি কহে। মায়া প্রকাশক বিভূতিকে অর্থাৎ প্রকাশ্য জগতের ও জীবপক্ষের আত্মশোভনোপায়কে যক্ষ শক্তি কহে। চৈতন্যের বিষয় সংমিশ্রণ শক্তিকে রক্ষ কহে। চিত্তের বিবিধ গতিপ্রকাশক শক্তিকে উরগ শক্তি কহে। জ্ঞানকে বিষয়সংমিশ্রিত-কারণ শক্তিকে নাগ শক্তি কহে। স্বভাবকে বৈরাগ্য আনয়ন করণ শক্তিকে ঋষি শক্তি কহে। কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট প্রকাশ শক্তিকে পিতৃ শক্তি কহে। সংশয় শক্তিকে দৈত্য কহে। রিপুকে দানব কহে। জ্ঞানকে সিদ্ধ শক্তি কহে।

রূপান্তর বৃত্তি ও লয় বৃত্তি যে সকল শক্তির দ্বারা মায়ার সাহায্যে হয় তাহার পরিচয় সামান্য ভাবে বলা হইতেছে। জীব চৈতন্য ও ভূত চৈতন্য বিভিন্ন হইলে ভূত চৈতন্যকে প্রেত শক্তি বা অবস্থা কহে। এই শক্তির প্রকাশক কাল, সেই জন্য মহাদেবের সহচর রূপে উহার গণ্য। জীবাবস্থা হইতে শবাবস্থা হইলে শবদেহের বিলয় তৎক্ষণাৎ যে শক্তির সহযোগে হয় না তাহা-কেই প্রেত শক্তি কহে। জীবাদৃষ্ট যদি বাসনার দ্বারায় অপরিশুদ্ধ অবস্থায় ভূতগত ও জীবগত চৈতন্য হইতে পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে পিশাচাবস্থা বা অপরিশুদ্ধাবস্থা কহে। ইহাও কালের সহযোগে কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। ভূত বলিতে পরস্পর মিশ্রিত ও চৈতন্যহীন সূক্ষ্ম জগৎ অর্থাৎ পঞ্চভূতাবস্থা; ইহাও কালে লীন।

মৎস্যাদি আকার প্রকাশক শক্তিকে যাদো শক্তি কহে। মনুষ্য যোনি ব্যতীত অপর ভূচর মাত্রকেই মৃগ কহে। ভেদবস্থা প্রকাশক শক্তিকে মৃগ

শক্তি কহে। খেচর জীবকে পক্ষী কহে। তদবস্থা প্রকাশক শক্তিকে পক্ষী শক্তি কহে।

শিঃ। চৈতন্য শক্তি কয় প্রকার?

গুঃ। যে চৈতন্য শক্তি দ্বারা অহঙ্কার নাশ হইয়া আত্মজ্ঞান আহরণার্থ গুরু ও বেদান্ত বাক্য বিশ্বাস আকর্ষিত হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা কহে। যে চৈতন্য শক্তির দ্বারা আপনার ভাব অপরের হৃদয়ঙ্গম করাইতে ও অপরের ভাব নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ করিতে পারাযায়, তাহাকে মৈত্রী বহে। যে চৈতন্য শক্তির দ্বারা আপনার ও পরের কথা অনুভব করা যায়, তাহাকে দয়া কহে। যে চৈতন্য দ্বারা সুখও দুঃখ সমান বোধ হইয়া ধৈর্য্য উৎপাদিত হয, তাহাকে শান্তি কহে। যাহার দ্বারা আত্মার চরিতার্থতা বোধ হয়, তাহাকে তুষ্টি কহে। যাহার দ্বারা মনোময় দেহ প্রশান্ত থাকে, তাহাকে পুষ্টি কহে। যাহার দ্বারা উত্তমাধম বোধে মন হৃষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহাকে ক্রিয়া কহে। যাহার দ্বারা বাসনাকে রিপু হইতে জ্ঞানপথে লীন করা যায়, তাহাকে উন্নতি কহে। যাহার দ্বারা সদসৎ বিচার করা যায়, তাহাকে বুদ্ধি কহে। ইহা মনের একটী অংশ রূপ। যাহার দ্বারা চিত্ত স্মৃতিময় থাকে, তাহাকে মেধা কহে। যাহার দ্বারা অহংকার লোপ হয়, তাহাকে তিতিক্ষা কহে। যাহার দ্বারা আপনাকে হীন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে লজ্জা কহে। এই লজ্জায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যাহার মধ্যে ঐ সকল শক্তি একত্রিত হইয়া ক্রিয়াপর হয়, তাহাকে মূর্ত্তি কহে। মূর্ত্তি বলিতে চিত্র। মনোময় দেহ যে ভাবাপন্ন হইবে, উপরন্তু দেহও তদ্ভাবাপন্ন হইবে। কারণ অন্তর শোকান্বিত হইলেই ভূতময় দেহ শোকান্বিত দেখাইবে। অন্তর যে ভাবে থাকিবে, বাসনা যে ভাবে ক্রিয়া করিবে, জীবও সেই ভাবাপন্ন হইয়া জগতে ভ্রমণ করিবে। ঐ সমস্ত ভাব একত্রিত হইয়া যে শক্তি মনোময় ও ভূতময় সূক্ষ্ম কারণাবলী সংযোগে ত্রৈশিক স্বভাবের অনুসারী হইয়া জীবকে লইয়া তাহার বাসনাময় হইয়া জগতে অবস্থান করে, তাহাকে মূর্ত্তি কহে।

ত্রৈশিক স্বভাবকে ধর্ম্ম কহে। ইহার দ্বারা বাসনা অদৃষ্টানুসারে জগতে জীবরূপে নানাবিধ জীবভূত বিভূতি অর্থাৎ জীবানন্দ বা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ঐ ধর্ম্ম বা মূর্ত্তির সংযোগে যে চৈতন্যাবস্থা প্রকাশ হয়, বিজ্ঞান-

ঋদেরা তাহাদের সম্পূর্ণ অংশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একাংশে নিত্য চৈতন্য অবস্থান করে, তাহাই পরমাত্মা বা সূক্ষ্ম বিরাট রূপ। আর একাংশে অনিত্য চৈতন্য অবস্থান করে, তাহাই জীবাত্মা বা জীবরূপ।

ঐ জীব রূপের শ্রেষ্ঠই মানব জাতি। নর বলিতে বিজ্ঞানার্থ তত্ব। মানব সকল তত্বের অংশে সৃষ্ট এই জন্য মানব বলিতে নর বুঝায়।

পরমাত্মাকে নারায়ণ কহে। এই নারায়ণই পরমাত্মা বা জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শিঃ। জীবাত্মা কি পরমাত্মার কামনা আছে?

গুঃ। বাসনার সংযোগে মন ক্রিয়াপর হইলে অপরাপর ইন্দ্রিয় শক্তি যে স্বভাব প্রকাশ করিবে, তাহাকেই কাম বা কামনা কহে। সেই কামনা পূর্ণ না হইলে অভাব জনিত যে দুঃখ প্রকাশ হইবে, তাহাকে ক্রোধ কহে। কামনা দুই প্রকার। নিত্য ও অনিত্য। মায়াযুক্ত কামনাকে অনিত্য কামনা কহে। আত্মজ্ঞান কামনাকে নিত্য কামনা কহে। যাহারা নিজ স্বভাবে নিজেই সিদ্ধ তাঁহারাই কৃতী। মহাদেবাদি কালশক্তি, উঁহারা, আপনার স্বভাবেই উন্মত্ত অপর স্বভাবে উঁহাদের বিচলিত করিতে পারে না। যখন সৃষ্টি রূপী ঈশ্বরবাসনা কালেতে পতিত হইবে; তখনিই,সেই বাসনা কাল মধ্যে কামরূপে প্রত্যক্ষিত হইবে। সেই ভাবের পূর্ব্বে কাল ঈশ্বরের প্রলয় শরীরে তাঁহার অন্তরে তৎপ্রাপ্তিরূপী নিত্য কামনায় মুগ্ধ ছিল। সেই নিত্য কামনাকেই অনিত্য কামনা বিচলিত করাতে কাল মধ্যে যে পূর্ব্ব অভাব প্রকাশ হইল তাহাই রুদ্রাদির ক্রোধ ও কামের ভস্ম বা গৌরীর তপস্যা বলিয়া পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। ঐ নিত্য ও অনিত্য কাম যাহাতে নাই এমন যে অবস্থা তাহাই নিত্য ব্রহ্মাবস্থা বা স্বরূপের ভেদাবস্থা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের অংশই অধিকানধিক ভেদে পরমাত্মা ও জীবাত্মা নামে জগতে প্রচারিত। ব্রহ্মের যেমন কোন কামনা নাই; তদ্রূপ ব্রহ্মের সগুণ ভাবরূপী জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাসনা ব্যতীত কামনা কিছুই নাই।

শিঃ। কোন সময়ে ঈশ্বর ও জীব সমদর্শন হইয়া পড়ে?

যুগান্ত সময়ে অর্থাৎ যখন প্রলয় প্রকাশ হইতেছে। জীব বলিতে অদৃষ্ট বা কর্ম্ম। যাহার দ্বারা নানা রূপে বৃক্ষ পশু মনুষ্যাদি ভাবে জগতে জীবদেহ প্রকাশ

হইয়া থাকে। পৃথিবীময় বলিতে সর্ব্বভূত কারণময়। বেদমার্গ বলিতে সকল জীবের জ্ঞান স্বভাব। যখন প্রলয় হয় তখন ভগবান আত্মদত্ত কাল, কর্ম্ম, স্বভাব ও মায়া সকলি হরণ করিয়া আপনাতে সংরক্ষণ করেন। ইহাই বেদ-বচন। মহুই এ স্থানে জীব প্রকাশ শক্তি। জীবাদিই কর্ম্ম বা অদৃষ্ট আর ভূতাদি সূক্ষ্মকারণই মায়া বা কারণবারি। বেদমার্গই স্বভাব। ইহাদের সহিত ভগবান্ প্রলয় কালে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এই কালে ঈশ্বর ও জীব সমদর্শন হইয়া পড়ে।

শিঃ। যখন স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় তখন ঈশ্বর অবিনাশী কি রূপে বুঝিব?

গুঃ। জীব যে স্বভাবাপন্ন হইয়া অদৃষ্ট বশে প্রকাশ হয়, সেই অদৃষ্ট নাশে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়; এবং তৎসহযোগে প্রকাশ স্বরূপ দেহেরও নাশ হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনাবস্থাকে মরণ কহে।

জীবের বাসনাস্বভাব অদৃষ্ট স্বভাবে যে ভাবে ক্রিয়াপন্ন করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ করিবে বর্ত্তমান অদৃষ্টের শেষে অর্থাৎ রূপান্তরে সেই শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনায় ঐ বাসনাই স্বভাবাপন্ন হইয়া অদৃষ্ট লাভ করিয়া থাকে; তাহাতে নানাভাবাপন্ন জীব ইহ জগতে প্রকাশিত হয়। এই ভাবটী প্রায় মনুষ্যতেই দেখা যায়। অণ্ডজ প্রভৃতির মধ্যে অতি অল্পই ভেদ দৃষ্টি হয়। ঐ অদৃষ্টই ঈশ্বরের জীব লীলার বাসনা। "আমি বহু হইব" এই যে ঈশ্বরের বাসনাগত ভাব, তাহা হইতেই অদৃষ্ট প্রকাশ। এক জন্মে অদৃষ্ট বশতঃ বাসনার ক্রিয়াযুক্ত শুদ্ধিতে যে স্বভাব লাভ হয় পরজন্ম অদৃষ্ট সেই স্বভাবাপন্ন হইয়া বাসনামতে জন্ম গ্রহণ করে। বাসনা কর্ম্মমত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের "বহু হওন" নামক অদৃষ্টকে লইয়া রূপান্তরে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

যদি এই ভাবেই ঈশ্বরের থাকা সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইতে পারিতেন না। জগতের বিলয়ের সহিত তাঁহার বিলয়ের সম্ভাবনা হইত। কারণ অদৃষ্ট বাসনাহীন না হইলে ঈশ্বর প্রভায় যুক্ত হইতে পারে না। বিদ্বান-গণ বহু অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে ঈশ্বর ঐ ধর্ম্মে জগতের কার্য্য করেন, কিন্তু জগতের সূক্ষ্ম কারণে বিরাজ করিতেছেন। ঐ সূক্ষ্ম কারণ যখন অবি-নাশী এবং তাহারা যখন ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপে থাকে তখনই তাহারা পরিবর্ত্তন-

হীন, এবং অপরের সাহায্যে চালিত বা বশীভূত নহে। ঐ শক্তিই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ এবং জগৎরূপী কার্য্য হইতে পৃথক্ রহিয়াছেন। প্রাণীগণের অদৃষ্ট তাঁহার বাসনা মাত্র, প্রকৃত অবস্থা নহে। কারণ নিত্য বস্তুর পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এই কারণে ঈশ্বর সদাযুক্ত ও সদাযুক্তরূপে অদৃষ্টরূপী হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। ত্রিস্বভাব মণ্ডিত হইয়া ঈশ্বর তিন অংশে বিভক্ত হইলেন। এক অংশে গুণ সকলের ব্যত্যয়রূপী অদৃষ্ট নামে রহিলেন; অপর অংশে অদৃষ্টের পালন হেতু অমৃত নামে রহিলেন। ঐ কারণাবস্থার পালন হেতু অপরাংশে অভয় নামে রহিলেন। সপ্ত পাতালই কার্য্য ও কার্য্যের লয়াবস্থা। ভুবঃ স্থূল কারণাবস্থা, স্বঃ সূক্ষ্মকারণাবস্থা। ঐ স্ব ছয় ভাগে বিভক্ত। ঐ ছয় ভাগও ভুবঃ এই সমস্ত কারণ-ভূমিকে সপ্ত স্বর্গ কহে আর সপ্ত পাতালকে কার্য্য ও বিলয়ভূমি কহে।

অমৃত, ক্ষেম ও অভয় এই তিন অংশই ঈশ্বরের ত্রিপাদ। ঐ অমৃত সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত। জগৎ হইতে কারণ ও সূক্ষ্ম কারণ পর্য্যন্ত উহার ব্যাপ্তি; উহাই অদৃষ্টকে অমরণ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষেম বলিতে প্রাপ্তাবস্থার রক্ষা। ঈশ্বর জগৎলীলা করিতে যে ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যে কারণাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা যে শক্তির দ্বারা রক্ষিত হয় তাহাকে ক্ষেম কহে। আপন শক্তিকে মায়ার অতীত করণপূর্ব্বক আপনাতে সংরক্ষণ করণের নাম অভয়াবস্থা।

ঐ ভূ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন স্থানে ঈশ্বর পূর্ব্বোক্ত তিন অংশে প্রাপ্ত আছেন। ভূরাদি লোক সকলের শিরোদেশে যে সকল লোকের স্থিতি তাহারা ক্রমান্বয়ে ঐ তিন অংশীভূত ঈশ্বরকে স্বরূপে ভোগ করিয়া থাকে। কারণ তথায় কার্য্য নাই; বিশেষতঃ বাসনা স্বভাবে পরিণত হয় না। স্বর্লোকের শিরোদেশে মহর্লোক। প্রলয়ে যখন কার্য্য ও স্থূল কারণাবস্থা বিলয় হইয়া উত্তাপ চৈতন্যরূপী সংকর্ষণের মুখাগ্নিতে সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হয়, তখন সূক্ষ্মকারণাবস্থারূপী মহর্লোক ঐ উত্তাপের পীড়া কিছুমাত্র স্পর্শ করে। কারণ উহা স্থূলভাগের সন্নিহিত। ইহার ভাব এই যে কার্য্যস্থলে ঈশ্বরের তিন অংশ পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু সূক্ষ্ম কারণ স্থলে তাহা নহে। তবে মহর্লোক অতি সূক্ষ্ম নহে বলিয়া অমৃত ও ক্ষেম সর্ব্বত্র চিরকাল থাকে না। প্রলয়কালে চঞ্চল হয়। পরে মহর্লোকের শিরোদেশে জনলোক; তথায় অতি সূক্ষ্মতাবশতঃ কার্য্যজগতের

পরিবর্ত্তনে অমৃত ক্ষেমাদির পরিবর্ত্তন সংযুক্ত হয় না। পরে তাহার শিরোদেশে তপোলোকের স্থিতি ; এ স্থানে অমৃত ক্ষেম পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অভয়েরও সঞ্চার হইয়া থাকে। তপোলোকের উপরে সত্যলোক, এ স্থানে অমৃত ক্ষেম ও অভয় নিয়মিত থাকে। কারণ তদুপরি বৈকুণ্ঠলোক বা ব্রহ্মলোক। তাহাই ঈশ্বরের পরম স্বভাব। তথায় আর বিলয় বা ঈশ্বরাংশের তারতম্য নাই। এই জন্য ঈশ্বর ভূতজগতে অংশের পরিবর্ত্তন ও সূক্ষ্মস্বর্গে অংশের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া আপনি অবিনাশী হইয়া আছেন।

শিঃ। ব্রহ্মভাবুকগণের গতি কয় প্রকার ?

গুঃ। বেদমতে ব্রহ্মভাবুকগণের ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে ;—কল্পান্তগতি, হিরণ্যগর্ভগতি, ও ভাগবতী গতি। যাঁহারা দেহত্যাগ পূর্ব্বক বাসনাবলে চৈতন্যের সহিত মুক্ত হইয়া শূন্যাবস্থান করেন, তাহারা কল্পান্ত উপস্থিত হইলে মহাপ্রলয়াবস্থায় স্মৃতিক্রমে পুনর্ব্বার জগৎ সৃজন কালে বাসনামতে আত্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ প্রলয়কালেও যদি তাঁহাদের স্মৃতি শূন্যাবস্থায় থাকিয়া স্বরূপ রূপে লিপ্ত থাকে প্রলয়ান্তেও তাহা থাকিবে। স্মৃতি থাকিলেই বাসনা সেই মত হইল। বাসনা হইতেই আত্মত্ব। শূন্যানুভবী বাসনা হইলে আত্মাও শূন্যত্বে অবস্থান করিয়া থাকে। এটী বৈজ্ঞানিক মীমাংসা। মুগ্ধজনের অনুভব হওয়া বড় কঠিন। ইহাকেই ব্রহ্মভাবুকগণের কল্পান্ত গতি কহে। নারদ ভৃগ্বাদি প্রভৃতির এই গতি হইয়াছে।

যাঁহারা ভূতাংশ হইতে ইন্দ্রিয় ও বাসনাকে প্রকৃতিতে লয় করিয়া জীবাত্মাকে প্রকৃতিময় করেন, অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য হইয়া প্রাণায়ামে বা অপর কোন উপায়ে ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া "সোহহং" ভাবে অবস্থান করেন, তাঁহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্মৃতিলাভ করেন। অর্থাৎ যত দিন না তাঁহাদের সাধনীয় প্রকৃতি হইতে লব্ধ জ্ঞানপ্রকৃতির নাশ হইবে, ততদিন তাঁহারা কতবার ছিন্ন বস্ত্রকে নব ধারণের ন্যায় নবদেহ গ্রহণ করিবেন, ততবারই এক প্রলয় পর্য্যন্ত শুদ্ধ স্মৃতি থাকিবে। ইহাকেই হিরণ্যগর্ভ গতি কহে।

তৃতীয় ভাগবতী গতি। ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। যখন কালশক্তি ও চৈতন্য হইলে কারণ সমূহ তেজোময় হইল। তখন তাহারা শক্তিময় হইয়া প্রকৃতি নাম ধারণ করিল। সেই প্রকৃতির স্বভাব পরিণামে অনেকাংশ অনেক উপায়ে

বিহিত হইয়া যে অংশে ভূত প্রকাশ হইয়া দৃশ্যজীব জগৎ প্রকাশ হইল তাহার প্রথমাংশকে মহত্তত্ত্ব কহে। সেই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের প্রকাশ। এই অহঙ্কার মায়াজাত স্বভাব। এই মুগ্ধ স্বভাব বলে জীব প্রকৃতির অধীন। জ্ঞানই প্রকৃতি হইতে স্বাধীন। সেই জ্ঞানই স্বরূপজ্ঞাতা এবং সেই জ্ঞানই শূন্যোপরি অবস্থিত। চৈতন্য শূন্যভাবনায় শূন্যময় হইতে পারিলেই আপনিই জ্ঞানময় হইতে পারিবে। ইহাকেই ব্রহ্মাণ্ডান্ত গত শূন্য বিস্তার কহে।

ঐ অহঙ্কার হইতে বোধ প্রকাশ হয়, তাহাতেই চৈতন্য সাহায্যে মন ভূত-ক্রিয়ানুভব করিয়া থাকেন। ভূতক্রিয়া ত্যাগ করিলেই আপনাকে জ্ঞানময় করা যায়। দেহকে ক্রিয়াস্থল আত্মাকে কর্ত্তা করিলে ক্রিয়া সকলকে কর্ত্তার সেবার্থ হইয়াছে এই অনুভব হইয়া থাকে। ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। এ অবস্থায় জীবের উপরে জীবত্ব দৃষ্ট হয় কিন্তু অন্তরে জীব স্বয়ং শূন্যভাবে অবস্থান করেন। এ অবস্থায় আসিবার প্রমাণ এই যথাঃ—যেমন ইন্দ্রিয় নিয়মন হেতু নিদ্রা উপস্থিত হয় এবং তদবস্থার অনুভবকে স্বপ্ন কহে। অধিকন্তু সেই স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুতে লিপ্ত বলিয়া জীবাত্মার বোধ হয়, তদ্রূপ যোগ নিদ্রায় ইন্দ্রিয় নিয়মন করিয়া লয় স্বপ্নে মনকে প্রথমে পৃথিবীময় বলিয়া ভাবিতে হয়। তাহা হইলে মন আপনিই পৃথিবীত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহার প্রমাণ এই যথাঃ—যেমন একখানি রঙ্গিন কাঁচে চক্ষু রাখিয়া দেখিলে সমস্তই রঙ্গময় দেখা যায়, তদ্রূপ মনোরূপী চৈতন্য চক্ষুতে পৃথিবীত্বরূপী কাঁচ ভাবনা ধারণ করিলে আপনিই মন পৃথিবীত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। কারণ ভেদভাবরূপী অহঙ্কারকে ইন্দ্রিয় নিয়মনের সহিত লয় করা পূর্ব্বেই হইয়াছে। ঐ প্রক্রিয়ায় পৃথিবী ভাবনা বোধ হইলে জল ভাবনা, তদন্তে তেজ ভাবনা, তদন্তে শূন্যভাবনা উচিত, এই অবস্থাই সিদ্ধ অবস্থা এবং জীবন্মুক্ত অবস্থা। যোগশাস্ত্রে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে।

শিঃ। কল্প কাহাকে কহে ?

গুঃ। সৃষ্টির পরিবর্ত্তনাত্মক সময়কে কল্প কহে। কল্প তিন প্রকার যথাঃ—ব্রহ্মকল্প, অবান্তরকল্প ও পাদ্মকল্প। প্রাকৃত অর্থাৎ কারণ সৃষ্টিই ব্রহ্মকল্প আর বৈকৃত সৃষ্টিরূপী জীব সৃষ্টিই অবান্তর কল্প হইতেছে। পদ্ম সম্বন্ধীয়—পাদ্ম। পাদ্ম সম্বন্ধীয় সৃষ্টির পরিবর্ত্তন সূচক কালকে পাদ্মকল্প কহে। পদ্ম বলিতে

ব্রহ্মাণ্ড। কালের সৃজন ক্ষমতায় পরিণামে যে অবস্থায় এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী পদ্মের প্রকাশ হয় তাহাকে পাদ্মকল্প কহে। এই সৃষ্টি কল্প বুঝাইতে কেবল মাত্র বিজ্ঞান না দেখাইয়া ভগবান্ ব্যাস নানাবিধ উপাখ্যানের সহিত উহা বুঝাইয়াছেন।

ঈশ্বর জগৎ সৃজনার্থ আমি বহু হইব এই ইচ্ছাময় হইয়া যে প্রকাশ অবস্থাপন্ন হয়েন, তাহাকেই পদ্মরূপী কহে। আমি বহু হইব এই ইচ্ছাই আদি সৃষ্টি। কিম্বা আমি বহু হইব এই সগুণ অবস্থাই আদি সৃষ্টি। সেই অবস্থার নাভি হইতে অজ জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। নাভি বলিতে মধ্যদেশ অর্থাৎ সক্রিয় ভাব। যে মধ্যভাগ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য সক্রিয় হইয়া জীব দেহের ক্রিয়াসম্পাদন করে তাহাকেই নাভি কহে। ঈশ্বর পক্ষেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঈশ্বর উর্দ্ধভাগে নির্গুণ ও অধোভাগে বিকারিত গুণময় হওয়াতে তাঁহার মধ্যভাগ সক্রিয় হইয়া ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক গুণময় হইয়া থাকে। এই জন্য ঈশ্বরের সগুণ ভাগকে নাভি কহে। সেই সক্রিয় অবস্থা হইতে অজ জন্মাইয়াছিলেন। অজ বলিতে ;—অ—বিষ্ণু; জ—জাত অর্থাৎ বিষ্ণু হইতে জাত কিম্বা জন্ম বলিতে যে অবস্থায় দুঃখ সুখাদিরূপী কালের পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হয়। যিনি সেই কালের সংঘটিত পরিবর্ত্তন না প্রাপ্ত হয়েন তিনিই অজ হইতেছেন।

এই অজের পৌরানিক অর্থ ব্রহ্মা। ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক সূক্ষ্ম কারণাবলীর সমষ্টিকে বা তেজকে অজ বা ব্রহ্মা কহে। সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক শক্তিরূপী ব্রহ্মাকে ঈশ্বর আপনার মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান বলিয়াছিলেন।

ঈশ্বর আত্মশক্তি হইতে যখন বিশ্বনির্ম্মানার্থ কৌশলরূপী অজকে সৃজন করিলেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণেচ্ছা শক্তি ও তত্ব সমস্তই তাহাতে প্রদান করিলেন। কারণ যতক্ষণ ঘূর্ণিত হইবার শক্তি কুলালের চক্রে থাকে ততক্ষণই তাহা,ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। পরম জ্ঞান বলিতে ;—ব্রহ্মাকে যে শক্তিতে জানা যায় তাঁহাই পরম জ্ঞান সেই জ্ঞান ঐ নির্ম্মাণ কৌশলরূপী ব্রহ্মাতে না প্রদত্ত হইলে এই জীব ও জগৎ কি নিয়মে দৃষ্ট হইতে পারে। সেই যে ঈশ্বরের বর্ত্তমানত্ব জ্ঞান তাহাকেই সুরগণে ভাগবত কহেন, ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম

তত্ত্বকে সুর বা দেবতা কহে। ইন্দ্রিয়াদি মানস শক্তির দ্বারাই জীবে ক্রিয়াপর; সেই ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মার মধ্যগত ঈশ্বরের বর্ত্তমানত্ব সূচক আলোচনা করিয়া সেই জ্ঞানকে ভাগবত অর্থাৎ ঈশ্বর বোধক জ্ঞান শাস্ত্র কহেন।

শিঃ। জ্ঞানের মধ্যে কোন্ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ?

গুঃ। ইন্দ্রিয় শক্তিগণের সমষ্টি একত্র হইলেই জ্ঞানরূপী ক্রিয়া করে। সেই জ্ঞান দ্বারা পুঞ্জিত হইয়া ব্রহ্ম বোধার্থে যে জ্ঞানের পরিবর্ত্তনাত্মক ভাব উপস্থিত হয়, তাহার দ্বারা জ্ঞানাত্মক ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহ পবিত্র হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানটী জ্ঞান প্রকাশক শক্তি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি। তত্ত্ব-জ্ঞান রূপী তত্ত্বমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান আকর্ষিত হইলেই আত্মবোধ এবং ব্রহ্মবোধ হইয়া থাকে।

শিঃ। ভগবান্ যদি সকল জীবে চৈতন্যময় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মানব ভিন্ন অন্য অন্য জীবে কেন স্বরূপানুভব করিতে পারে না?

গুঃ। পরমাত্মার জীব লীলার মধ্যে স্বরূপানুভব লীলাই মানব শরীরীর লীলা। ভগবান সকল জীবে চৈতন্যময় হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে স্বরূপানুভব করিতে পারে না। কারণ তাহাদের চৈতন্য প্রদান করেন নাই। মনরূপী তেজের যে চৈতন্য মিলনী অংশ তাহা মানব ভিন্ন আর কাহারো নাই অতএব অপর জীবের মন নাই বলিয়া জ্ঞান প্রকাশ করিতে অক্ষম। জ্ঞান উদয় না হইলে আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ করা যায় না। আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ না করিলে বিজ্ঞান প্রকাশ হয় না। বিজ্ঞানাবস্থা উপস্থিত না হইলে পরমাত্মার অনুভব হয় না।

শিঃ। যদি সমস্তই ঈশ্বরের লীলাই হইল এবং তিনি যদি আপনাপনি অনুভবের জন্য এই দেহ লীলা করিতেছেন, তবে আবার তাঁহাকে ভাবিবার প্রয়োজন কি?

গুঃ। আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বর মানবদেহরূপ দর্পণ প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ দর্পণ ও নিজের তেজাংশ। ঐ তেজাংশ সংস্থানার্থ মায়াজাত দেহক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহা শোধনার্থ মানবের স্বাধীন বৃত্তি স্থির করিয়া দিয়াছেন। ঐ স্বাধীন বৃত্তিরূপিণী চৈতন্যের নাম বাসনা। ঐ বাসনা মায়াতে মিলিয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে-

ছেন। ঐ মায়া ও বাসনা হইতে ক্রিয়াজাত মিথ্যাভূত একটী উপায় প্রকাশ হয়, তাহাই অবিদ্যাংশ বলিয়া জগতে প্রকাশিত। সেই অবিদ্যা ভীষণা রাক্ষসী কেবল কামাদি রিপু সমূহকে প্রসব করিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে তাহার দাস করিয়া মনকে তাহাদেরই প্রভুত্ব অনুভব করায়; ইহাতে জীবাত্মারূপ দর্পণে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়ে। জীবাত্মা ঈশ্বর তেজে দেহে বিরাজিত থাকা সত্ত্বে তিনি অগত্যা ঐ মায়াজাত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া ঈশ্বরকে দেখা দেন না। সেই জন্য ইন্দ্রিয় ও বাসনা মায়াজাত ক্রিয়াতীত না হইলে মন পরিশুদ্ধ হইবে না। মন পরিশুদ্ধ না হইলে জীবাত্মার অবিদ্যা নাম্নী মায়াবরণ নাশ হইবে না। ঐ মায়াবরণ না গত হইলে ঈশ্বর আপনার স্বরূপ জীবাত্মাকে দেখিতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন না; এবং জীব ও ঈশ্বরের প্রতিবিম্বে বিম্বিত হইয়া ঈশ্বরময় হইতে পারিবে না। এই মায়াবরণ বিনাশ করিবার জন্য জীবকে ঈশ্বর যাহাতে দেখিতে পান এবং জীব ঈশ্বরে যাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন এই সমস্ত উপায় বিধানার্থ পূর্ব্বোক্ত যোগসমূহ প্রকাশ হইয়াছে।

শিঃ। ইন্দ্রিয়াতীত হওনাবস্থা কাহাকে বলে?

গুঃ। ইন্দ্রিয় প্রাণাদি ক্রিয়াপর হইয়া দেহে অবস্থান করিতেছেন ঐ ক্রিয়া হইতে পরমার্থ সাধন এবং মায়া সাধন দুই কার্য্যই হইয়া থাকে। পরমার্থ সাধনের উপায়ই এ স্থানে প্রকাশ হইতেছে। ইন্দ্রিয়াদি ও প্রাণাদি মায়া সাধন ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় ক্রিয়া মনে প্রতিভাত না করিয়া ঈশ্বর যেমন প্রত্যেককে প্রত্যেকের তেজে ক্রিয়াপর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ভাবে ক্রিয়াপর হওনের নাম ইন্দ্রিয়াতীত বা প্রাণাতীত হওন। যোগীর কর্তৃত্ব যখন জীবাত্মায় সমর্পিত হয়, তখনি যোগী পরিশুদ্ধ হইয়া ক্রম বা জীবন্মুক্ত অবস্থার পথিক হয়েন। এই অবস্থায় জীবাত্মা ঈশ্বরকে আপন তেজ দর্শনে প্রতিবিম্বিত করিয়া সমুদ্র ও তরঙ্গ যেমন অভেদ এবং তরঙ্গরূপী জীবাত্মা যে সমুদ্রের ক্রিয়া প্রকাশক স্বরূপ তাহা বুঝাইয়া স্থির হইয়া থাকে। এইটীই বেদান্তের "সোহহং" ভাব। জ্ঞানভক্তিময় সাধকের "সারূপ্য নির্ব্বাণ" এবং প্রেমময়ের "সমাধি অবস্থা"। সেই অবস্থায় মন আর ইন্দ্রিয়াদির অনুভব কর্ত্তা নাহে। ইন্দ্রিয়াদি তখন দেহ সংরক্ষণার্থে আপন আপন ক্রিয়ায় তৎপর হয়। নাসিকায় সুগন্ধ প্রবেশ করিয়া অন্তরস্থ বায়ুযন্ত্র পরিষ্কার করিয়া থাকে,

সে সুগন্ধে মনের আসক্তি প্রকাশ হয় না। রসনার মিষ্ট বা তিক্ত রস আস্বাদিত লইয়া উদরসাৎ হওত তেজোৎপাদন ও ঔষধাদির ক্রিয়া করে, তাহাতেও মন অনুরত হয় না। ত্বকে সেই সময়ে শীতোষ্ণ স্পর্শন হয়, কিন্তু মন তাহাতে সুখ দুঃখ অনুভব করে না। কর্ণ শব্দ পায় মাত্র, সেই শব্দে মন ভয় বা উৎসাহাদি ক্রিয়াপর হয় না। প্রাণ, অপান, সমানাদি বায়ুপঞ্চ দেহের চৈতন্ত সম্পাদন করে মাত্র, মনকে রিপুপর করিতে পারে না। এই সমস্ত ক্রিয়াকেই যোগীর পক্ষে ইন্দ্রিয়াতীত হওনাবস্থা কহে। এ অবস্থায় যোগী পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যবিকারশূন্য হইয়া যোগবলে সহস্রদলে রমণ করিয়া থাকেন। যদি সংসারী ব্যক্তি সংসার লীলার আস্বাদনে বীততৃষ্ণ হইয়া মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা অনায়াসেই পারেন।

শিঃ। সংসার কি নিন্দনীয় স্থান? সংসারে না থাকিলে ঈশ্বরের প্রজাবৃদ্ধিরূপী নিয়ম লঙ্ঘন হইবার তো সম্ভাবনা?

গুঃ। সংসার শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে যাইলে দেখা যায়,—"সংপূর্ব্বক স্থ ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয়" করিয়া সংসার শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে। সংশব্দের অর্থ পীড়া, স্থ ধাতুর অর্থ প্রবেশ; যাহাতে পীড়া সর্ব্বোতোভাবে প্রবিষ্ট আছে তাহাকে সংসার কহে। মায়া অর্থাৎ সদসদাত্মিকা শক্তি কাল দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া ত্রিগুণ সহযোগে ক্রিয়ামান হইয়া দুইটী স্বভাব বিশিষ্ট হয়েন। একটী ঈশ্বর চৈতন্তের সম্মুখাবস্থিত, আর একটী তাঁহার পশ্চাদবস্থিত। সম্মুখাবস্থিত স্বভাবকে বিদ্যা কহে। পশ্চাদবস্থিত স্বভাবকে অবিদ্যা কহে। ঐ দুইটী স্বভাব আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় এক বস্তু কেবল প্রকাশ আর অপ্রকাশ ভেদ মাত্র। ঐ দুই স্বভাব, গুণ, ক্রিয়া, কাল চৈতন্ত সহযোগে যথায় ক্রিয়া করিয়া থাকে তাহাকেই সংসার কহে। জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াধীন ও ইন্দ্রিয় রিপুর অধীন হইলেই সে জীবাত্মার অবিদ্যাবরণ পতিত হয়, জীবাত্মা অবিদ্যা স্বভাবজাত মিথ্যাভূত অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া স্নেহ, মোহ, জরা পীড়াদিতে আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মানব জীবের পক্ষে এই অবস্থাটীই অধিকাংশ ঘটিয়া থাকে, এই জন্য ঐ মায়াংশকে সংসার কহে। সংসারে কেবল যে মানব থাকে তাহা নয়; সংসারবাসী বলিলেই শাস্ত্রমতে অবিদ্যাংশজাত সকল প্রকার জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ জীব বুঝিতে হইবে। এই

সংসারে যে জীবাত্মা বিদ্যাস্বভাবে মণ্ডিত তাহা ঈশ্বরের সন্নিহিত। বিদ্যা স্বভাবে অতি অল্প জীবেই থাকিতে সক্ষম হইয়া থাকে। সংসারেই জন্ম বটে, জন্ম বলিলেই যদি সংসার সর্ব্বাংশে আদরের বস্তু হইত, তাহা হইলে জীবের পক্ষে সংসারাপেক্ষা মাতৃগর্ভ আদরের স্থান বলিতে হইবে। তবে কেন গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ বলিয়া লোকে দুঃখ করে। সংসারে নিষ্কাম ভাবে মায়া মোহ দিতে অভিভূত না হইলেই লোকে বৈরাগী হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারে পরস্পরের অবিদ্যাধিক্য প্রবল থাকাতে একটী জীবের কণামাত্র অগ্নিতুল্য বিদ্যাপ্রকৃতি সাগরতুল্য অবিদ্যার মধ্যে রক্ষা অসম্ভব এই জন্য বৈরাগীর বা মুমুক্ষুর পক্ষে সংসার ত্যাগ উচিত হইতেছে। কিন্তু সংসার ত্যাগ হইলেই যে ভাগবতী গতি লাভ হইল তাহার যো নাই। যেমন সংসারে মায়া মোহ যোগে জীব আবদ্ধ হইয়া সকল অহঙ্কার সংসারে দিয়াছিলেন; তেমনি আবার ঐরূপ অভিলাষ ও বাসনাকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ঐশিক সমর্পণকে ভক্তিযোগ কহে। ঐ ভক্তিযোগে কি সকাম, কি নিষ্কাম সকলেই নিস্তার পাইবে। নিষ্কামী স্বরূপ চিন্তামণি পাইবেন। সকামী কামনার ফল পাইবেন। ইহা শ্রুতি তন্ত্রাদিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণিত আছে। সংসারী যদি মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্য অনেক উপায় আছে:—সংসারীর পক্ষে দান যজ্ঞাদি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি বিহিত আছে, তাহাতে ক্ষণিক মোক্ষরূপ স্বর্গলাভ হয়। এই স্বর্গলাভকে বাসনা ও আত্মার পরিশুদ্ধি মাত্র কহে। ঈশ্বর বিচ্ছেদ হয় না, কিন্তু নিষ্কামীর উপায় রূপ তপস্যা, যোগ প্রভৃতিতে যেমন ঈশ্বরের মুক্তগতি সমূহ লাভ হইয়া থাকে সকামীর তাহা হয় না। যিনি মুক্ত পক্ষে যে কার্য্যই করুন না, ভগবানে ভক্তিযোগ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাঁহাকে ভক্তিযোগে আবদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাগবতী গতিতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলেও পাওয়া যায় এবং পুণ্যফলরূপী স্বর্গেও পাওয়া যায়।

শিঃ। ভক্তিযোগের সাধন কি?

গুঃ। জীব কি ভাবে তাঁহাকে স্বরূপ দেখাইবেন এবং তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিয়া সমুদ্রও তরঙ্গরূপে অভেদ হইবেন, তাহার উপায়ের প্রথম দ্বারই ভক্তিযোগ। ঐ ভক্তিযোগের সাধন করিতে হইলে কামনায় ব্যাপ্ত হইতে হয়। কামনা মনের ধর্ম্ম বা তেজ। ঐ কামনা সকাম ও নিষ্কাম ভাবে

ক্রিয়াবান। মন সকাম ও নিষ্কামভাবে অবস্থান করিয়া পুরুষরূপে আপনার তেজে বাসনা নাম্নী নারীর তেজ রতির সহিত দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ। বাসনাতে রতিতে সম্মিলন না হইলে কোনপ্রকার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশ্বাস প্রকাশ হয় না। বিশ্বাস প্রকাশ না হইলে প্রেম বা জ্ঞান পাওয়া যায় না। প্রেম বা জ্ঞানলাভ না হইলে পরম পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই জন্যই ভক্তিযোগের ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ রতি, রতি ভিন্ন কোন বস্তুর অনুভব হয় না।

শিঃ। রতি কাহাকে বলে?

গুঃ। রম্ ধাতুর উত্তর তি প্রত্যয় করিয়া রতি শব্দলাভ হয়। কামনা সংযুক্ত মনের রমণ-স্থলই রতি। এক বিষয়ে একান্ত অর্থাৎ চঞ্চলভাব হীন রমণকে রতি কহে। এক ঈশ্বর ব্যতীত অপর পাত্রে এই চৈতন্যভাব প্রকাশ হয় না। তবে সংসারে পবিত্র ক্রিয়া করিলে ঐ রতি হইতে এক প্রকার পবিত্র ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, তাহাকেই অনুরাগ, প্রেম ইত্যাদি কহে। সংসারের মধ্যে এমন যে প্রিয় সামগ্রী-রূপী জননী, রমণী, কন্যা পুত্রাদি, এ সমস্তেও জীবের ঐ বৃত্তির ছায়া স্বরূপ অনুরাগ ও প্রেমাদি সংঘটিত হয়; যথার্থ রতির ক্রিয়া হয় না।

শিঃ। ঐ রতি কি মদন দেবের স্ত্রী?

গুঃ। এই কামনা যুক্ত মনকে পুরাণে মদন রূপে কল্পিত করা হইয়াছে; আর তাহার স্ত্রীকে রতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই রতিকে কামনা তেজযুক্ত স্বভাবরূপ মন এবং রতির সংযোগে ব্রহ্মা জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। এই অবস্থাকে সকাম ভাব কহে এবং অকামযুক্ত রতির প্রভাবে ব্রহ্মা ঈশ্বর প্রকাশ করিতেছেন, ইহাকেই নিষ্কামভাব কহে। এই নিষ্কাম ভাবের রূপকই মহাদেবের "মদনভস্ম" পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। আর সকাম ভাবের চিত্রই ব্রহ্মার "সাবিত্রী মিলন" কল্পিত হইয়াছে। এক ঈশ্বর যখন আপন চৈতন্য-শক্তিকে সদসদাত্মিকা তেজে মিলাইয়াছেন, তখন কার্য্যকারণ কর্ত্তা ব্রহ্মা নামধারী হইয়াছেন, চৈতন্য শক্তিকে সাবিত্রী করিয়াছেন। যখন কালতেজে আপন চৈতন্যশক্তিকে মিলাইয়াছেন তখনই আপনাকে মহারুদ্র মহাদেব এবং চৈতন্য-শক্তিকে উমারূপে কল্পিত করিয়াছেন। যখন স্বরূপ-তেজে অবস্থিত আছেন, তখন আপনাকে বিষ্ণু এবং চৈতন্যশক্তিকে লক্ষ্মী নামে কল্পিত করিয়া-

ছেন। ইহাই পৌরাণিক গণের কল্পনা। অতি গূঢ়ভাবে এই সমস্ত আলোচিত হয় ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার "সাবিত্রীমিলন" সকামভাব, গঙ্গার মিলন নিষ্কামভাব। রুদ্রের—কি উমা কি গঙ্গা উভই নিষ্কাম ভাব, তন্মধ্যে নিষ্কাম উপাসনায় যে শক্তিতে ফল আশা থাকে, তৎপ্রকাশিকা বাসনাই নিষ্কাম শক্তি। উমারূপিণী আর পূর্ণ নির্ব্বাণ বা মোক্ষপ্রদায়িকা শক্তিই গঙ্গা। বিষ্ণুর পক্ষে গঙ্গা সর্ব্বমোক্ষপ্রদায়িকা এবং লক্ষ্মী বিভূতিপ্রকাশিকা অর্থাৎ জগৎপ্রকাশিকা বুঝিতে হইবে। এইরূপ গূঢ় আলোচনায় পুরাণে কূটার্থ প্রকাশ আপনিই হইয়া থাকে।

শিঃ। মদন ভস্মের গূঢ়ভাব কি ?

গুঃ। যখন জীবের অবিদ্যাংশ ত্যাগ হইল,তখন জীব আপনার অবস্থায় দেখিল কি ? না নিজের প্রভাব রূপ ইন্দ্রিয়াদি রূপী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে মোহরূপী রিপু মুগ্ধ করিয়া স্পর্শ করিয়াছে। অবিদ্যা-নাশে বিদ্যা-চৈতন্য প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি তখন বৃহস্পতিরূপী বুদ্ধির সাহায্যে আপন চিন্ময় ব্রহ্মের নিকটে রিপু দমনের উপায় স্থির করিতে গমন করিলেন। জীব-স্বভাব চৈতন্যরূপী ব্রহ্মা বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয় দেবতাগণকে রুদ্ররূপী কাল শক্তির সহিত ঐ শিক ফললাভ রূপী উমানাম্নী বিদ্যাশক্তির মিলন করাইতে বলিলেন। এই বিদ্যাশক্তিকে মহামায়া কহে। ইহার কারণ এই, কালের ক্রিয়া শক্তি আছে, আর ঈশ্বর চৈতন্যযুক্ত মায়াতে ঐ ক্রিয়া সংযুক্ত জীব কি ভাবে ঈশ্বর-সান্নিধ্য হইতে পারে তাহা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইন্দ্রিয়াদি মনের অধীনে থাকিয়া সকাম ছিলেন। এক্ষণে আপন আপন সকাম বৃত্তিরূপী কাম নামক তেজের সহিত রতি সংযোগে বসন্তরূপী ভক্তির সহিত কালের সম্মুখে আগমন করিলেন। কালের মস্তকে নিষ্কাম চৈতন্যশক্তি গঙ্গা ক্রিয়া করিতেছেন। সকাম মনরূপী মদন বাসনা তেজরূপী রতির সংযোগে আপনার সকাম তেজ কালের অধীন করিলেন। কাল সেই তেজে আকর্ষিত হইয়া ত্রিনয়ন রূপী সত্ত্ব, রজঃ, তমোনামক ত্রিনয়নের শিরস্থিত সত্ত্ব নামক নয়ন হইতে সত্ত্ব জ্যোতি প্রকাশ করিয়া সকাম মনরূপী মদনকে ভস্ম করিলেন। একা রতি রহিলেন। ভক্তিরূপ বসন্তও রহিলেন। ভক্তিযোগে নিষ্কাম রতি ঈশ্বরে মগ্ন হইল। কামনা আপন তেজ ইতি পূর্ব্বে কালের দেহে করাইয়াছিলেন

বলিয়া কালকে সকাম শক্তি উমাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ব্ভে বিজ্ঞান অবস্থারূপী কার্ত্তিকেয়ের জন্ম দিতে হইল। ইহাই কামনা ও রতি ব্যাপ্ত জীব প্রতিবিম্বভূজ ঈশ্বরের লীলা ইহারই সারভাগ মাত্র। ভক্তিযোগে নিষ্কাম রতিকে আত্মার সহিত যদি সম্মিলন করা যায় তাহা হইলে জীবের পূর্ব্বোক্ত ভাগবতী গতি লাভ হয়। আত্মাতে ভক্তের নিষ্কাম রতি স্থির হইলেই তাহাতেই বিশ্বাস স্থির হইল বুঝিতে হইবে।

শিঃ। যাহা অনুভব হইবার যো নাই তাহার প্রতি বিশ্বাস কি প্রকারে স্থির হইবে?

গুঃ। ঈশ্বর অনুভবের বস্তু বটেন। সকলেই অনুভব করিতে পারেন। ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইলে ন্যায়ের অনুমাপক লক্ষণের সাহায্য লইতে হয়। ক্রিয়া দর্শনে অন্তর্যামী কর্ত্তার সিদ্ধান্ত করণোপায়কেই অনুমাপক লক্ষণা ন্যায় কহে। যেমন আগ্নেয় পর্ব্বতের অন্তরে অগ্নি আছে ইহা পর্ব্বতের বাহিরের ধূম দেখিয়া নিশ্চয় করা যায়। তদ্রূপ দৈহিক ক্রিয়া দর্শনে আত্মার স্থির হয়। আত্মার স্থির হইতে পরমাত্মা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। যেমন সকল কার্য্যের মধ্যেই অগ্নি আছে, ঘর্ষণেই প্রকাশ পায়। তেমনি ঈশ্বর সর্ব্ব জীবের অন্তরে নিবিষ্ট আছেন জীবাত্মা রূপে লীলা করিতেছেন এবং সেই লীলা জাত ক্রিয়া দ্বারাই জীবাত্মারূপে আপনিই আপনার স্বরূপানুভব করিতেছেন। যেমন কুঠারধারী স্বীয় হস্তে কুঠার না ধরিলে কুঠারের কোন সাধ্য নাই যে ক্রিয়াবান হয়। তেমনি বুদ্ধ্যাদি পদার্থ। কারণ সদসদাত্মিকা শক্তিতে চৈতন্য ও কাল যতক্ষণ না সংযুক্ত হইবে ততক্ষণ উহা কোন ক্রমেই চৈতন্যবান বা ক্রিয়াবান হইতে পারে না। জড় ও চৈতন্য এই দুই বস্তুর সংযোগে ও বিয়োগেই জগতের প্রকাশ ও হ্রাস কল্পিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভাবক যন্ত্র। এই সকল যন্ত্র যতক্ষণ চৈতন্যের আবেশ না হইবে ততক্ষণ ইহারা কোন ক্রমেই ক্রিয়াবান হইতে পারিবে না। সেই হেতু উহাদের ক্রিয়া দেখিয়া দেহে যে চৈতন্যময় বস্তু আছে এবং তাহাও অন্তর্য্যামী রূপে রহিয়াছে ইহা প্রমাণ হইল। অধিবস্তু প্রত্যক্ষানুভব হইল। সেই চৈতন্যপ্রদ তেজকেই আত্মা কহে। আত্মা শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে এই অর্থ লাভ হয় যে,—"যে বস্তু সর্ব্বত্র স্বকীয় তেজে ব্যাপ্ত আছে"।

শিঃ। এক্ষণে আত্মার অনুভব হইল, কিন্তু পরমাত্মার প্রত্যক্ষানুভব ঐ অনুমাপক ন্যায়ে কি প্রকারে হয়?

গুঃ। প্রত্যক্ষানুভব করিতে হইলে ঐ লক্ষণ সহযোগে সত্য মিথ্যা স্থির করিতে হয়। যেটী সত্য সেটী অনুভব পক্ষে প্রত্যক্ষ। যেমন মরীচিকায় ও ক্ষুদ্রোর্ম্মিযুক্ত সরোবরে তৃষাতুরের অভিলাষ তৃষ্ণা নিবারণ করা। অনুমাপক লক্ষণে দূর হইতে উভয়কেই জলাশয় বলিয়া স্থির হইল বটে, কিন্তু তৃষ্ণাতুরের অভিলাষ যাহার দ্বারা মিটিবে তাহাই সত্য বলিয়া স্থির হইবে। মরীচিকার সাধ্য নাই যে তৃষার শান্তি করে। অতএব অনুমাপক লক্ষণে ঈশ্বর নির্ণয় করিতে গিয়া, ঈশ্বর নির্ণয়রূপ উদ্দেশ্য পরিতোষ না হইলে কখনই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করা হয় না। এক্ষণে ভক্তে পুনর্ব্বার আত্মাতে ও ঈশ্বরেতে অনুমাপক ন্যায়ে বিচার করুন তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভব হইবে। বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত মীমাংসা করিতে গিয়া আত্মাকে তরঙ্গ ও ঈশ্বরকে সাগর বলিয়া তুলনা করিয়া ঈশ্বরের অন্তর্য্যামীত্বের নিশ্চয় ও সত্ত্বের নিশ্চয় করিয়াছেন। যেমন সাগর দর্শন করিতে গেলে, কেবল তাহার তরঙ্গই দৃষ্ট হয়। সাগর সেই তরঙ্গরূপে পরিণত হইয়া জগৎব্যাপ্ত শরীরে অবস্থিত রহিয়াছেন; কিন্তু আপনার গুণ ক্রিয়া ও প্রভাব সেই তরঙ্গরূপী ক্রিয়ার দ্বারা জগতে প্রকাশ করিতেছেন। এই ঘটনা দেখিয়া এই গুণ ক্রিয়া স্থূলরূপী তরঙ্গ দর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি সমুদ্রের সত্ত্বাকে অনিশ্চিত বলিতে পারে। তদ্রূপ আত্মারূপ মহা চৈতন্যময় ঈশ্বরের লীলা বস্তু যে তাঁহারি ক্রিয়ায় ক্রিয়াবান্ ইহা স্থির হইল। সমুদ্র যেমন আপন অংশকে তরঙ্গ করিয়া লীলা করিতেছেন ঈশ্বরও তদ্রূপ আপন চৈতন্যাংশরূপী আত্মার দ্বারা জাগতিক লীলা করিয়া সমুদ্রের ন্যায় আত্মার অন্তরে অন্তর্য্যামী রূপে রহিয়াছেন। এই প্রকার ন্যায় ও বেদান্ত মতে ঈশ্বর যে প্রত্যক্ষ অনুভব বস্তু অতএব সত্য তাহা বর্ণিত হইল। বেদান্ত যে "সোহহং" বীজ আছে তাহাও সত্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কারণ (সঃ + অহং) সোহহং। সঃ শব্দে ঈশ্বর, অহং শব্দে আত্মা। ও ন্যায়ের তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণে, জীবাত্মা ঈশ্বরের ক্রিয়াধার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শিঃ। তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ কিরূপ?

গুঃ। কোন একটী বিষয় মীমাংসা করিতে বলিলে সেই মীমাংসার

হেতুকে স্বরূপ লক্ষণ কহে, আর তাহার ক্রিয়াকে তটস্থ লক্ষণ কহে। এক বস্তু বটে তবে সমান ভাব এবং সক্রিয় ভাব এই মাত্র ভেদ। যেমন কিরণ ও সূর্য্য। সূর্য্য যে তেজময় বস্তু, কিরণ তাহার তেজ ও তেজ প্রকাশক অংশ বটে। এস্থলে কিরণ তটস্থ লক্ষণ আর সূর্য্য স্বরূপ লক্ষণ। এইরূপ ঈশ্বর ও জীবে অভেদ।

শিঃ। যদি ঈশ্বর ও জীবে অভেদই হইল তবে জীবের পক্ষে পুনর্ব্বার ঈশ্বর স্মরণের প্রয়োজন কি?

গুঃ। যেমন সমুদ্র হইতে এক অংশ জল লইয়া অপর পাত্রে রক্ষণ করিলে সেই জলাংশের সমুদ্র নাম থাকে না এবং সমুদ্রের ন্যায় কিম্বা সে যখন সমুদ্রে ছিল সে অবস্থার ন্যায় ক্রিয়াবান হয় না; তদ্রূপ জীব রিপু ও অবিদ্যা মায়ারূপ পাত্রে পতিত হইয়া তৎক্রিয়াবান্ বা তদ্যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। জীবাত্মার উদ্দেশ্য চৈতন্য প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর চৈতন্যময়, তাঁহার চৈতন্যাংশ জড়ে পতিত হইয়া কি লীলা প্রকাশ করে তাহা তিনি অনুভব করেন মাত্র। যেমন সমুদ্র হইতে আধারভূত জল হইলে আর তাহার সহিত সমুদ্রের কোন সম্পর্ক থাকে না। তেমনি জীব-চৈতন্য রিপুপর হইলে আর তাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ থাকে না। এস্থলে রিপু বলিতে অবিদ্যা সম্পন্ন রিপু বুঝিতে হইবে আধার ভূত জলাংশ যেমন পুনরায় আধার বিনাশে সমুদ্রে মিশিতে পারে এবং সমুদ্রময় হইয়া স্বরূপ ক্রিয়াবান হয়, তেমনি জীবাত্মাও ঈশ্বরময় হইতে পারে। তবে অবিদ্যা সংযুক্ত রিপুগণকে অবিদ্যা হইতে বিযুক্ত করিতে হয়, তবে সেই রিপু সমূহ বিদ্যাভাবে মণ্ডিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদিকে শুদ্ধ চৈতন্য প্রদান করে, তবে জীবাত্মার ও পরমাত্মার মিলন হয়। এই ক্রিয়ার জন্যই যোগ তপাদি নিষ্কাম ভাবের প্রয়োজন, দান যজ্ঞাদি সকাম ভাবের প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। যাহাতে ঈশ্বর চৈতন্য জীবাত্মারূপী চৈতন্যাংশ অবিদ্যাযুক্ত রিপুতে পতিত হইয়া ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত না হয়, তজ্জন্য জীবাত্মার পথ প্রদর্শক মনকে সর্ব্বদাই হরিকথা শ্রবণাদি করিতে হয়। উহাতে সত্ত্বগুণ থাকে, তমোযুক্ত অবিদ্যা প্রবেশ করিতে পারে না। জীবাত্মার জাগতিক বিকার হয় না। এই মীমাংসায় সকলের হৃদয়েই ঈশ্বর যে সকলের পক্ষে স্মর্ত্তব্য, শ্রুতযোগ্য, এবং কীর্ত্তনযোগ্য তাহা মীমাংসিত হইল।

শিঃ। মনুষ্য পক্ষে মুক্তি দিবার জন্য ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন, অপর জীবের কেন করেন নাই?

গুঃ। জীবাত্মা যদি পরমাত্মা দেখিতে পায় তাহা হইলে সে কেন অবিদ্যার অন্ধকারে থাকিবে, এবং অবিদ্যার অন্ধকারে না থাকিলে জীবের সংসার লীলা হয় না; ঈশ্বরের জীব-দেহের ক্রিয়া হয় না। অপর জীব অবিদ্যা বলে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরের ক্রিয়া করে মাত্র তাহারা তো অবিদ্যায় পীড়িত হয় না। যেমন জলে যাহাদের জন্ম তাহারা জলই ভাল বাসে, জল বিহনে মরিয়া যায়। তদ্রূপ অপর জীবরূপে ঈশ্বর মায়ালীলা করিবেন বলিয়া আপন ইচ্ছায় অবিদ্যার মধ্যেই তাহাদের সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা অবিদ্যাকেই আশ্রয় ভাবিয়া তাহাতেই মগ্ন থাকে। কিন্তু মনুষ্য বিদ্যাশক্তিতে জন্মলাভ করে বলিয়া ইহাদের অবিদ্যা পীড়ন অনুভব হয়। কারণ জীবাত্মা এই জন্ম হইতেই স্বরূপে যাইতে পারেন; এবং সারূপ্য প্রাপ্ত হইবার জন্যই এই মানব জন্ম স্বয়ং ঈশ্বর আপনার স্বরূপ তেজে সৃজন করিয়াছেন। এই হেতু মনুষ্যের পক্ষে যজ্ঞ দান, তপস্যা প্রভৃতি সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মে পূর্ব্ব জন্ম জাত অবিদ্যাযুক্ত জীবাত্মার মলিনতা বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য সাধকের হিতার্থে তন্ত্রে ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে।

শিঃ। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি?

গুঃ। ঈশ্বর সগুণ ভাবে মায়া মধ্যগত হইয়াই জীবভাবাপন্ন হয়েন; তখন তাঁহার পূর্ব্ব সম্বন্ধ বোধ হয় না। এই জন্য রামচন্দ্র রাবণ-বধকালে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন।

শিঃ। এক ব্রহ্মই যদি জীবরূপী হইলেন, তবে জীব মধ্যে ও প্রভেদ কেন দেখিতে পাই?

গুঃ। মায়া মধ্যগত হইয়া জীব ব্রহ্ম-স্বভাব ভুলিয়া যায়। এবং সেই জীবভাব নানা স্বভাবীয় দেহ পাইয়া তাহা প্রাক্তন স্বভাবের দ্বারায় আবৃত হওয়াতে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় মাত্র; বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।

শিঃ। যদি ব্রহ্ম সগুণে জীবভাব হইয়া পড়িলেন, এবং বিভিন্নভাবাপন্ন হইয়া স্বরূপ ভুলিলেন, তবে তাঁহার মুক্তির উপায় কি?

গুঃ। কাল ও প্রকৃতি বা মায়া অর্থাৎ যে সকল প্রধান শক্তির দ্বারা এই

জগৎ ও জীবরূপে ঈশ্বর পরিবর্ত্তিত হয়েন. সেই শক্তি সমূহের অতীত যে নির্গুণ রূপ তাহার আশ্রয় লইলেই জীবের আমি ও আমার ভেদত্ব ও ব্রহ্মজীব সম্বন্ধত্ব নষ্ট হওয়াতে স্বরূপ ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে।

শিঃ। যদি মায়াই সৃষ্টি শক্তি তাহা হইলে মায়াকে কিরূপে ত্যাগ করা যায়?

গুঃ। এ স্থলে পাঠক ব্রহ্মাকে মানবের ন্যায় না ভাবিয়া জগৎ-ব্যাপ্ত ঐশিক বিজ্ঞান নিহিত-চৈতন্য-তেজ বলিয়া ভাবিবেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন সৃষ্টি প্রকাশক চৈতন্যতেজ মধ্যেই চৈতন্যের জনক স্বরূপ ঈশ্বর তত্ত্ব উহাতে নিহিত আছে। সেই তত্ত্ব সমূহই ভাগবত তত্ত্ব। এবং তাহাই জীবের জ্ঞাত হওন উদ্দেশ্য। কারণ, ক্রোধীর যেমন ক্রোধের উদ্দেশ্য বিচার করিলে ক্রোধ নাশ পায়, তেমনি মায়া মণ্ডিত ঈশ্বরাংশের জীবের) পক্ষেও মায়া বিচার করিলে এবং তাহা বোধ হইলে মায়া দূর হইতে পারে। সৃষ্টি-শক্তিই সৃষ্টি বাসনা করিয়া থাকেন।

শিঃ। জীবস্বভাব মায়াবরণে আবৃত থাকা প্রযুক্ত কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে?

গুঃ। সংসারে জীব-স্বভাব মায়াবরণে আবৃত থাকা প্রযুক্ত দ্বিভাবাপন্ন হইয়া থাকে। একটীকে স্বভাবের স্বধর্ম্ম কহে। অপরটীকে স্বভাবের বৈধর্ম্ম কহে। পূর্ব্ব কর্ম্মফল হেতু বা অসংস্কৃত বিজ্ঞান বুদ্ধি হেতু জীব আপন সত্য-ভাব ভুলিয়া সত্যাবরক যে মিথ্যা তাহাতেই রত হয় তাহাকে বৈধর্ম্ম ভাব কহে। এবং ঐ সত্যভাবে অবস্থানের নাম স্বধর্ম্মভাব। ঐ দ্বিবিধ ভাবের মধ্যে অনিত্যভাব নিত্য ভাবের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে, এবং তাহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য।

শিঃ। মায়ার প্রভাব হইতে কিরূপে জ্ঞান দৃষ্টি হয়?

গুঃ। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বা প্রলয়ের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম ফল লইয়া বাসনা নামক বীজ পঞ্চতত্ত্ব নামক ক্ষেত্র রসে অঙ্কুরিত হইয়া ঈশ্বরের চৈতন্য ও কাল নামক আয়ু লইয়া এই বিশ্বে সজীব পদার্থের উৎপাদন করিতেছে। সেই বাসনাই মায়ার সূক্ষ্মাংশ হইতে উৎপন্ন। মায়াতে যে বিদ্যা ও অবিদ্যারূপ দর্পণ আছে তাহার বিদ্যা দর্পণে মায়া ভেদ করিয়া জ্ঞান দৃষ্টিপ্রকাশ করা যায়

এবং অবিদ্যা দর্পণে মায়া ভেদ করা যায় না। বাসনা সেই অবিদ্যা ও বিদ্যার সূক্ষ্মাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ঈশ্বরের চৈতন্যকে লীলাময় করিতেছে। অধিকাংশ জীব বাসনার নিম্ন অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় আগমন করে। অতি সামান্যাংশ জীবই পরিশুদ্ধ বাসনায় জীবত্ব লাভ করিয়া থাকে। লোকে জন্মাবধি মায়াতে আবদ্ধ থাকেই; তবে কেহ কেহ কিঞ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়া মায়াভেদ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। কেহ বা মায়াকেই শ্রেষ্ঠ দেখিয়া মোহিত থাকে যেমন এক শ্বেতবর্ণ হইতে জ্যোতির তারতম্যে সবুজবর্ণ হয়, অথচ সবুজ বর্ণের মধ্যে নয়ন রাখিলে আর শ্বেত বর্ণ দেখা যায় না। কিন্তু সবুজ দেখিয়া তাহাকে বিচার করিলে সবুজের অন্তরেই শ্বেতের দৃষ্টি হইয়া থাকে। তদ্রূপ অজ্ঞানী লোকেরা প্রথমে সন্ধিহান হইয়া মায়াতে মুগ্ধ হইয়া মায়াকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে। পরে যত জ্ঞানোৎকর্ষ হয় ততই মায়ার মধ্যে যে ভগবান বাসুদেব ভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহা জানিতে পারে।

ভগবান বিশ্ব লীলার জন্য মায়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেমন নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া আপন মূর্ত্তি দেখিলে দ্রষ্টার আনন্দ হয়, তেমনি ঈশ্বর মায়ার দ্বারা ভূষিত হইয়া জীব লীলা করিতেছেন মাত্র। তিনি যে জীবগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য মায়াকে করিয়াছেন তাহা নয়। সেই মায়াই সংসার এবং সেই মায়াই তাঁহার এক প্রকার ভূষিত রূপ। কিন্তু দুর্বুদ্ধি মানবগণ ভূষিত বস্তব্য বস্তুকে অন্বেষণ না করিয়া আপনাদের পরমতত্ত্ব না জানিয়া পরম বস্তুর ভূষাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনারাই মুগ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই মায়ার ক্ষমতাই অহংতত্ত্ব। তাহাতেই জীবের পরম বস্তুর বিচ্ছেদে সোঽহং ভাব বিনষ্ট হইয়া অহং দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। যেমন কর্ণধার-হীন তরণী অগাধ সাগরে চঞ্চল হইয়া থাকে। তদ্রূপ জীব অহংভাবে উন্মত্ত পরম পদার্থ ভুলিয়া এই মায়া মণ্ডিত সংসারে আপনারাই জন্মান্ধ হইতেছে। এই বিশ্ব সেই ভগবানের রূপ। তবে যে কেহ তাঁহাকে আপনার বলিয়া জানিতে পারিতেছে না সে কেবল আপনাপন দুর্বুদ্ধির দোষে বুঝিও; কারণ মায়াতে তাহারা মুগ্ধ হইয়াছে।

শিঃ। কোন্ কোন্ বস্তুতে জগৎ ও জীব প্রস্তুত হইয়া ক্রিয়া হইতেছে?

গুঃ। পঞ্চভূত তন্মাত্রা জগতের উপাদান স্বরূপ। কর্ম্ম বলিতে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বাসনার পরিণাম, তাহাই জন্মের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। কাল বলিতে আয়ু ও চৈতন্য সংযোগে জন্মের ও উহাদের ক্ষোভকারী অর্থাৎ প্রকাশক ও বিনাশক। স্বভাব বলিতে জন্মের নিমিত্ত স্বরূপ কর্ম্মের পরিণাম অর্থাৎ প্রকাশ্য কার্য্য। জীব বলিতে ভোক্তা। ইহাই ত্রৈশিক তেজ। এই কয়েকটী বস্তুতেই জগৎ ও জীব প্রস্তুত হইয়া সংসার-ক্রিয়া হইয়া থাকে।

শিঃ। অন্তর্জ্জগৎ ও বাহ্য জগৎ কাহাকে বলে?

গুঃ। অন্তর্জ্জগতে মনন করিতে হইলে বাহ্য জগৎ হইতে নেত্রদৃষ্টি তিরোহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান-বাদীরা কহেন অন্তরে যে ভাবের উদয় হয় তাহার ক্রিয়া অনেকাংশে কার্য্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অন্তরে আনন্দে নিমগ্ন হইলে সর্ব্বাঙ্গের বাহ্যদেশে প্রফুল্ল অবস্থা প্রকাশ হয়। ঐ রূপ অন্তর্লীন মহাযোগাবস্থাকে যোগীরা ভগবৎলোক বা বৈকুণ্ঠলোক কহে। ঐ অবস্থায় জীবের আর জীবভাব বা সাংসারিক দুঃখ ভাব থাকে না। একপ্রকার অলৌকিক পরমানন্দের ভাব উদয় হইয়া থাকে।

লৌকিক ভাবকে লীলাগত ভাব কহে। এই লীলাগত ভাবকে নৃলোক কহে। নৃ শব্দে তত্ত্ব। তত্ত্ব সকল যাঁহার আশ্রয়ে থাকে অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া অদ্ভুত ভাবে ক্রিয়মান হইতে থাকে, সেই সক্রিয় অবস্থাকে নৃলোক কহে অর্থাৎ বাহ্য জগৎ।

শিঃ। দৃষ্টি কাহাকে বলে?

গুঃ। চৈতন্য জ্যোতির ক্রিয়াকে দৃষ্টি কহে। দৃষ্টি দুইভাগে বিভক্ত। আন্তরিক ও বাহ্যিক। বাহ্য হইতে চৈতন্যের যে তেজ দ্বারা অনুমান সংগ্রহ হয় তাহাকে বাহ্য দৃষ্টি কহে। ঐ অনুমান অন্তরে যে তেজ দ্বারা অনুভূত হয় তাহাকে অন্তর্দৃষ্টি কহে। সত্যানুভব করাই দৃষ্টির প্রধান ক্রিয়া। ইন্দ্রিয় দোষে সত্যানুসন্ধানে অক্ষম হইলে তাহাকেই দৃষ্টিহীন কহে। এই দৃষ্টিহীন দুই অবস্থায় হয়। একপীড়ায়। আর এক অধর্ম্মাক্রান্ত রিপুর মায়ায়। বাহ্য দৃষ্টিই ক্রিয়াপর। অন্তর দৃষ্টি অনুভবপর যাহার বাহ্যদৃষ্টি বিপ্লব সে অসত্যকে সত্য বলিয়া অন্তরকে ক্রিয়াপর করে। যেমন কামের বশীভূত হইয়া কামুক, কুৎসিতার সহগামী হইয়া, তাহাকে ভাল দেখে, কিন্তু তদপেক্ষা নিজ স্ত্রী

সুন্দরী হইলেও, তাহার রূপ তাহার চক্ষে ভাল দেখায় না। জ্ঞান-বিচার ভিন্ন সত্য-দৃষ্টি লাভ হয় না। বেদ বলিতেছেন যে—ওরে জীব! তোমার পক্ষে আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য হইতেছেন। শ্রুতির অনুসারে—শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তনাদিই সেবা ভাবের উপযুক্ত। যাঁহাকে কখন দেখি নাই তাঁহার বিষয় বা কার্য্য শ্রবণ করিলে, তাঁহার কার্য্য বুঝিয়া তাঁহাকে অনুভব করিলেই মানস দৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই দর্শনই মহাসিদ্ধি। তাহাকেই নিদিধ্যাসন কহে।

শিঃ। সাধনারপক্ষে সেবাভাব শ্রেষ্ঠ কি জ্ঞান-ভাব শ্রেষ্ঠ?

গুঃ। যাহারা অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ মাত্র করিয়া ঈশ্বরানুভবানন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে তাহারাই সেবা ভাবের অনুগামী হয়। এই সেবাভাবে ঈশ্বরকে পৃথক করিতে হয়; কারণ প্রভু ও আমি এই দ্বৈতবোধ না হইলে সেবা হয় না। এইভাবটী কেবল সাধারণ লোকগণের প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধির জন্য। কারণ দ্বৈত ভাব থাকিতে দেহে মমতা থাকিবে; অর্থাৎ আমি রূপী দেহী না থাকিলে ঈশ্বরকে বা প্রভুকে কে ভাবিবে? এই ভাব প্রথমাবস্থার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। ইহা শ্রুতির মত। কিন্তু এইভাবে যতক্ষণ না জ্ঞানোদয় হইবে ততক্ষণ বৈকুণ্ঠ লাভ হয়না। সেই জন্য স্বয়ং মৈত্রেয় বলিলেন "প্রতিলভ্য সোধং" অর্থাৎ বৈরাগ্যবল দ্বারা ভক্তে বোধ লাভ করিতে পারিলে বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারিবে। ঐ বোধ শব্দের অর্থ জ্ঞান, ইহা স্বয়ং স্বামী ভাগবতের নানা স্থানে অর্থ করিয়াছেন।

মৈত্রেয় মতে এবং শ্রীধর স্বামীর মতে ইহার অর্থ এই যে,—ঈশ্বরকে এই দুই ভাবে লাভ করা যায়—একভাবে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনাদি শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিষয় আশা নাশ করত অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইলে; তাহাতে বৈরাগ্যবলে জ্ঞান লাভ করিলে বৈকুণ্ঠ বা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। বৈরাগ্য বলিতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আত্মায় নিরত হইয়া অনিত্য বিষয়ে বিরতি হওন। ইহাকে সেবাভাব কহে। কারণ প্রথমে শ্রবণাদির জন্য আত্মাকে বা ঈশ্বরকে প্রভু ও আপনি পাপী জীব অর্থাৎ দাস এইভাবে উপাসনা করিয়া শেষে বৈরাগ্য আশ্রয় কালে প্রভুদাসভাব নাশ হইয়া আত্মময় হইতে হয়; নচেৎ বিষয় দুঃখ বা আধ্যাত্মাদি দুঃখ নাশ হয় না।

অপর ভাবে যম নিয়মাদির দ্বারা দেহের ও চিত্তের শান্তি স্থাপন করতঃ প্রকৃতিজাত আধ্যাত্মিকাদি পীড়া হইতে উপরত হইয়া আত্ম-সমাধি দ্বারা জীবন্মুক্ত হওতঃ অন্তে সেই মুক্ত পুরুষে প্রবেশ করিতে হয়।

সেবাভাবেঃ—যম নিয়মাদির, ও আত্ম সমাধির আচরণ পূর্ব্বক স্বতঃ ঈশ্বরে আত্মসমর্পন করিতে হয় না ; জ্ঞান ভাবে সাধকে ভাবে যে, ঈশ্বর সর্ব্বময়, তাঁহাকে যে প্রকৃতির দ্বারা পীড়িত হইয়া জানিতে পারি নাই, সেই প্রকৃতির পীড়াকে না জয় করিলে কালে আবার প্রকৃতি পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হইলে, ক্ষণিক ঈশ্বরানন্দ নষ্ট হইতে পারে। অতএব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক স্নেহ, মমতা, রিপু, বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য্য চন্দ্রাদির পীড়নাদি হইতে একেবারে আপনাকে স্বাধীন করিবার জন্য জীব সেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, এই ভাবিয়া বাসনাকে ঈশ্বর-পর করতঃ আপনিই ঈশ্বরে মিশ্রিত হয়। ঐ যম নিয়ম সমাধি প্রভৃতি যোগাবলম্বনার্থ প্রথমতঃ আয়াসের আবশ্যক হইয়া থাকে। সেই আয়াসে কৃতকার্য্য হইলে প্রলয়াবধি সাধকের অখণ্ড মুক্তাবস্থা থাকে। সাধারণ লোকে ঐ অবস্থাপন্ন হইতে না পারাতে কেবল চিত্তকে ঈশ্বরপর করিলেও তাহাতে মুক্তি আছে, এই নিয়মে মহাপ্রভু নূতনরূপে সেবাভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এই সেবাতে ঐহিকে অতি সামান্য আনন্দ। কারণ ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাকৃতিক ও রিপুগত পীড়া হইতে সেবকগণের দেহ শান্তি না পাওয়াতে ভৌতিক দেহ সুস্থ সর্ব্বদা থাকে না।

সেই অসুস্থতা যে সময় না থাকে ঐহিকে সাধকে সেই সময়মাত্র আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু চিত্তের শুদ্ধি হেতু পরলোকে তাহাদের পক্ষে যোগীর সহিত সমান গতি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক পীড়াকে না জয় করিলে ঐ চিত্তের শুদ্ধি হওয়া ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ প্রযুক্ত বৈরাগ্য প্রকাশ হওয়া অতিশয় দুরূহ।

সেবাকে শ্রেষ্ঠ করিলে নানা ভাবে ঈশ্বর দূষিত হয়েন। যে প্রভু ভৃত্যের দ্বারা আপনার মহিমা প্রচারের আবশ্যক বোধ করেন এবং যে ভৃত্য তাঁহার সুখ্যাতি অধিক প্রচার করে সেই কীর্ত্তীচ্ছু প্রভুই সেই লোককে অধিক প্রিয় ভাবেন। ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া তাহার সাক্ষাৎ লাভ কর, আমার দেখা পাইবে, আমাকে আপনার সমস্ত অর্পণ করিয়া এক হইয়া

যাও, আমাতে মুক্ত হইবে। সেবা ভাবে ঈশ্বরের সমীপে আত্ম-সমর্পণ অসম্ভব এবং আত্মদর্শন অসম্ভব অতএব সেবাকে শ্রেষ্ঠ করিলে ঈশ্বরকে শ্রুতিমতে কীর্ত্তির বশীভূত বলিতে হয়। অতএব সে ভাবের সেবক হওয়াপেক্ষা হৃদয় পরিশুদ্ধ করণার্থই সকলেরই সেবক হওয়া উচিত। কিরূপ? যেমন চুম্বুকের ঘর্ষণত্ব লাভ করিলে লৌহও চুম্বুকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যাহারা চৈতন্যাদি ভক্তির প্রতি আসক্ত হইয়া আপনাপন অনিত্য তেজকে তুচ্ছ ভাবে। তাহাদের পক্ষে ঈশ্বর আত্মভাব-রূপী বৈকুণ্ঠ দান করেন; বিশেষতঃ যাহারা আত্ম-সমাধি রূপে ঈশ্বরে চৈতন্য শক্তির দ্বারা প্রবিষ্ট হয়েন তাহাদেরও ঈশ্বর আত্ম-স্বভাব রূপী মুক্তি দেন, অর্থাৎ তাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

শিঃ। উপদেশ শ্রেষ্ঠ, কি জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যাদি শ্রেষ্ঠ?

গুঃ। সাধনা ব্যতীত কখনই জ্ঞানাদি উপার্জ্জিত হইতে পারে না। যে সাধক সাধনার প্রকরণ না জানে তাহার সাধনাও হইতে পারে না। অতএব পথ প্রদর্শক বা পথের সীমা বা অবস্থা নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইলে পথিক যেমন অভীষ্ট স্থানে যাইতে পারে; তদ্রূপ পূর্ব্ব সুরিগণ (আত্মজ্ঞান যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন) আত্মজ্ঞান উপভোগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভার্থে যে সকল উপায় বা সাধন প্রকরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই যথার্থ। যদি কেহ বলেন যে সাধনাতেই ফল লাভ হয়, কিন্তু সাধক-জনের পক্ষে ভক্তি, জ্ঞান, ও বৈরাগ্যাদি উপদেশ ব্যতীত লাভ হইতে পারে না। কারণ উপদেশ দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ না হইলে সাধক জ্ঞানের দ্বারা কি অনুভব করিবে? ভক্তিদ্বারা কিসে বিশ্বাস স্থাপন করিবে? বৈরাগ্য দ্বারা কোন বিষয় ত্যাগ করিয়া কোন বিষয়ে অনুরত হইবে? উপদেশ ভিন্ন বিষয়ের নির্দ্দেশ অসম্ভব।

শিঃ। কাম্য বা নির্ব্বাণোপদেষ্টা গুরু শ্রেষ্ঠ, কি জীবন্মুক্ত গুরুই শ্রেষ্ঠ?

গুঃ। কাম্য বা নির্ব্বাণোপদেষ্টা গুরু অপেক্ষা জীবন্মুক্ত গুরুই শ্রেষ্ঠ। কারণ কাম্য কর্ম্মে রতি এবং প্রবৃত্তির অধীনতায় বাসনার উত্তম মধ্যমে সুকৃতি নিষ্কৃতি যুক্ত জন্মলাভ করিতে হয়। অতএব কাম্যকর্ম্ম মুক্তিচ্ছুর পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে।

নির্ব্বাণ-উপদেশ—বাসনা বিলয় করিয়া যোগমার্গে আত্মাকে স্বরূপানন্দে

রাখিয়া "সোঽহং"ভাবে জীবনকে বিলয় করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মাময় করিয়া, ভোগাভোগ গৃহরূপী দেহকে নাশ করিতে হয়। দেহজাত মন নামক ইন্দ্রিয় হইতেই অনুভব। যদি দেহের কষ্ট নিবারণার্থে জীবে নির্ব্বাণ-সুখ মনে অনুভব করিতে বা পরকে জানাইতে না পারিল তাহা হইলে মানবের আশা সফল হইল কৈ? ইহাতেই একেবারে নির্ব্বাণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না।

জীবন্মুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা। জাগ্রৎ, সুষুপ্তি, স্বপ্ন এই তিন অবস্থাকে ত্যাগ করিয়া তুরীয় অবস্থায় মন রাখিয়া চিত্রপটস্থ চিত্রের ন্যায় মায়াচিত্র হৃদয়ে অনুভব করিয়া মুক্তভাবে অবস্থান করাই জীবন্মুক্তের উদ্দেশ্য। যথার্থ ঈশ্বর যে ভাবে এই জগতে থাকিয়াও নির্লিপ্ত আছেন; জীবন্মুক্তিও সেই ভাবের অনুকরণ বুঝিতে হইবে। সকলি দেখিলাম, সকলি করিলাম, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হইলাম না। রতি না রহিল, প্রবৃত্তি না থাকিল, আসক্তি কোথায় থাকিবে? আসক্তি না রহিলে স্রোতে যেমন তরঙ্গ ফেলিলে তরঙ্গই স্রোতের বেগে ভাসে; স্রোত তরঙ্গের অধীন হয় না; তেমনি জীবন্মুক্তের স্বভাব জগতে ভাসিতে থাকে। জগৎ তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারেন না।

শিঃ। মন কিরূপে দেহের মধ্যে অনুভব-কর্ত্তা হইল?

গুঃ। হিম ও উত্তাপের সাম্যাবস্থাকে চৈতন্য কহে। হিম ও উত্তাপ হইতেই সকলের ক্রিয়া প্রকাশ হয়। আমরা ভূতগণের মধ্য হইতে হিম ও উত্তাপ অনুভব করি বলিয়া অনুভব করিতে পারি। নচেৎ উহা এত সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে যে তাহা বোধগম্য হইবার যো নাই। ঐ সূক্ষ্মাংশের মধ্যে হিমাংশ চন্দ্রনামে বিখ্যাত, উত্তাপাংশ সূর্য্যনামে খ্যাত। হিমরূপী চন্দ্র ও উত্তাপরূপী সূর্য্য চৈতন্যের আকর্ষণে কি জীব কি জগৎ সকলই আকর্ষিত হইয়া যথা নিয়মে রহিয়াছে। হিম ও উত্তাপ ইহারা পরস্পর পরস্পরের বোধক হইয়া বিশুদ্ধ অবস্থায় চৈতন্য নাম ধারণ করিয়া নিত্যভাবে ঈশ্বরে শক্তিরূপে অবস্থান করে। কেবল হিম নামক চৈতন্যাংশ হইতে মনের প্রকাশ হয়। সকল চৈতন্যশক্তির অনুভবকর্ত্তাই মন। কি জীবদেহ কি জগৎ সর্ব্বত্রে হিমই উত্তাপের অনুভাবক ইহা বিশেষরূপে মীমাংসিত আছে। উত্তাপাধিক্য হইলে কেবল উত্তাপের পরিমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু হিমাধিক্য হইলে উত্তাপের

পরিমাণ পাওয়া যায়, ইহাতেই হিমময় চৈতন্যই সকলের অনুভব কর্ত্তা যথার্থতঃ ঐ হিমময় চৈতন্যই চন্দ্র। ঐ চৈতন্যাংশ যখন দ্রব্যাত্মক সাত্ত্বিক অহঙ্কারে প্রবিষ্ট হয় তখনই মন নামে কি দেহে কি জগতে প্রকাশ হয়। এই জন্য চন্দ্রকে মনের অধিষ্ঠাতা কহে (পূর্ণ শক্তি হইতে অংশীভূত শক্তি ভূতান্তরে অবস্থিতি করে। ইহার মধ্যে ঐ পূর্ণাংশকে অল্পাংশের অধিষ্ঠাতা কহে। এই নিয়মে মনের অধিষ্ঠাতাই চন্দ্র হইতেছেন। এই জন্যই মন দেহের মধ্যে অনুভব কর্ত্তা বলিয়া বিজ্ঞানে আলোচিত হইয়াছে।

শিঃ। চৈতন্যের উত্তাপাংশে কি কি প্রকাশ হইল ?

গুঃ। শূন্যের মিশ্রণে যে উত্তাপময় চৈতন্যশক্তি মনের বোধক হয় তাহাকে দিক্‌দেবতা কহে। শূন্যের শব্দ গুণে বোধকরূপে একটী স্বভাবের প্রকাশ হয়। ঐ শূন্যাংশ উত্তাপময় চৈতন্যাংশে মিশ্রিত থাকাতে শব্দ বিষয়ভূত বস্তু বা ঘটনা মন দ্বারা অনুভূত হয়। প্রত্যেক দেহের বা জগতের শূন্যাংশের স্থান বা দ্বার আছে। সেই দ্বার দ্বারা মন শূন্যবোধক চৈতন্য অনুভব করেন। ঐ দিক্‌-শক্তি যে দ্বার দিয়া মনের গোচর হয় তাহাকে কর্ণ কহে। বায়ুভূত বায়ু নহে। চৈতন্যরূপী মনের বায়ু নামক মহাভূত বোধক জ্ঞানাত্মক অহঙ্কার মিশ্রিত চৈতন্যশক্তি বুঝিবে। এই শক্তিদ্বারা ভূতরূপী বায়ু মনের গোচর হয়। ইহা যে পথ দ্বারা মনের অনুভূত হয় তাহাই ত্বক্ নামে দেহে কল্পিত হইয়াছে। ত্বক বলিতে স্পর্শ ক্ষমতা প্রকাশক শক্তি। সেই শক্তি ও চৈতন্য সম্মিলনে কর্ম্মগত হইয়া মনের গোচর হইয়া থাকে।

যে উত্তাপ চৈতন্য শক্তি তেজ নামক ভূতের মধ্যে অহঙ্কার সহ মিশ্রিত হইয়া মনের বিষয়ীভূত হয় তাহাকে অর্ক দর্শন শক্তি কহে। তেজের গুণরূপ ইহাতে মিশ্রিত হওয়ায় ঐ শক্তি যে দ্বার দিয়া মনের গোচর হয় তাহাকে চক্ষু কহে, এবং এই এইজন্য চক্ষু প্রকাশ-ভাবাপন্ন রূপ দেখিতে পায়। তেজই রূপের প্রকাশ কর্ত্তা। চক্ষুর দ্বারাই দেহস্থ তেজ প্রকাশ হইয়া অপরের রূপ আকর্ষণ করিয়া থাকে। এইজন্য তেজকে রূপের প্রকাশ কর্ত্তা এবং চক্ষুকে তেজের বোধক বা প্রকাশ কর্ত্তা কহে।

যে উত্তাপ চৈতন্য রসের মধ্যে মিশ্রিত হইয়া অহঙ্কার-সহযোগে মনের গোচর হয় তাহাকে প্রচেতা শক্তি বা দেবতা কহে। ইহা জিহ্বা দ্বারা মন

সমস্ত রসানুভব করিতে পারে। যে উত্তাপময় চৈতন্য গন্ধযুক্ত পৃথ্বীতত্ত্বের মধ্য দিয়া অহঙ্কার সহযোগে মনের গোচর হয়, সেই শক্তিকে অশ্বী দেবতা বা শক্তি কহে। ইহা দ্বারা মন গন্ধ সহযোগে পৃথ্বীতত্ত্ব অনুভব করেন। যে পথ দিয়া ঐ তত্ত্ব মনের গোচর হয় তাহাকে নাসিকা কহে। এই নাসাদ্বার দিয়া বায়ু হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চ প্রাণের কার্য্য করে, এবং পঞ্চ প্রাণ ব্যতীত দেবদত্ত, ধনঞ্জয়াদি বায়ুরও কার্য্য করিয়া থাকে। দেহ সংরক্ষণার্থ যত প্রকার বায়ুর ক্রিয়া হয় সমস্তই কেবল নাসা দ্বার দিয়া দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য দেহ পক্ষে নাসাই বায়ুর উৎপাদক বা প্রকাশক বুঝিতে হইবে।

যে উত্তাপের চৈতন্যাংশ অগ্নিময় শক্তির অর্থাৎ তেজের মধ্য দিয়া অহঙ্কার সহযোগে মনের গোচর হয় তাহাকে বহ্নিশক্তি কহে। এই তীব্র সূক্ষ্ম শক্তির কার্য্যকে বাক্য কহে। বহ্নি বলিতে তেজের তীব্রভাব বুঝিতে হইবে। তীব্র-ভাব বলিয়া বাক্য অতি ত্বরায় মনের গোচর হয়।

যে উত্তাপ চৈতন্য বায়ুর বল নামক গুণের মধ্য দিয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে ইন্দ্র শক্তি বা দেবতা কহে।

যে উত্তাপ চৈতন্য পবনের সহঃ নামক গুণের মধ্য দিয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে উপেন্দ্র দেবতা বা শক্তি কহে। উপেন্দ্র শক্তি অপর শক্তি ও ভূতাদির ভার বহন করে। এই শক্তি পদ নামক দেহস্থ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক।

যে উত্তাপ চৈতন্য পবনের প্রাণ নামক গুণের মধ্য দিয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে মিত্র শক্তি কহে। পবনের প্রাণ নামক স্বভাব দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কারে সংযোজিত করিয়া থাকে। প্রাণ শব্দের প্রধান অর্থ সকলের পরস্পর আকর্ষণ। পবনের প্রাণ স্বভাব হেতু অপরাপর ভূতের সহিত পবন মিশ্রিত থাকিয়া আপনার গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ পরস্পর আকর্ষণ শক্তিকে দেহের মধ্যে দেহ ধারণ শক্তি কহে। ভূত সকলকে চৈতন্যময় রাখিবার জন্য এবং দেহস্থ সারাসার বিভাগ করিয়া দেহকে সুস্থ রাখিবার জন্য প্রাণের আবির্ভাব। ঐপ্রাণ ভূতদেহ সংরক্ষণের জন্য প্রাণ, অপান,সমান, ব্যান ও উদান এই পাঁচ নামে অবিহিত এবং ইন্দ্রিয় সকলকে সংরক্ষণের জন্য নাগ, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, কূর্ম, কৃকর এই পাঁচনামে অবিহিত। ঐ প্রাণ স্বভাব যখন

আপন স্বভাবে থাকে, তাহা হইতে মন অভাব বোধ করিয়া থাকেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণাই দেহের অভাব। প্রাণে উহা বোধ হয়। প্রাণ সমান নামক স্বভাবে ঐ অভাব দূরীকরণার্থ বাহ্যিক ভূতাংশ হইতে তেজ লইয়া যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট করে। প্রাণের অপান স্বভাবে অভাব পূর্ণ হইলে অবশিষ্ট অসার দ্রব্যকে বাহির করে ও অন্তরস্থ তেজকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায় এবং ব্যান স্বভাবে চৈতন্ত ও তেজকে সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত করে।

মিত্র শব্দের অর্থ বন্ধু অর্থাৎ যিনি জীবের সকল কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন। চৈতন্ত পবন সংমিশ্রণে ভূতগণের সংরক্ষণের জন্ত প্রধান দ্বার স্বরূপ অপান স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহার তেজ লইয়া প্রাণাদি ক্রিয়াপর হয়। অপানের ক্রিয়াদি যদি হ্রাস হয়, তাহা হইলে প্রাণাদি তৎসহযোগে নাশ পায়। এইজন্ত বিজ্ঞানবিদেরা অপান অর্থাৎ বায়ুদেশে এক ইন্দ্রিয় শক্তির স্থিতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্ব সংরক্ষণ ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার নাম মিত্র দিয়াছেন।

যে উত্তাপ চৈতন্ত পবনের ওজঃ নামক স্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে প্রজাপতি দেবতা বা শক্তি কহে। ঐ শক্তি দ্বারা জীব ভূততেজ ও চৈতন্ত তেজ প্রাপ্ত হইয়া বীজরূপে বহু হইয়া প্রকাশ হইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জীবের চৈতন্ত ও ভূত সম্মিলন বোধ হয়। এই জন্ত ঐ বীজ প্রকাশক শক্তির নাম প্রজাপতি। প্রত্যেক জীবদেহে আপনা-পন ভূতগত ও চৈতন্তগত তেজ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আছে। বাসনা ঐ তেজে জীবকে লইয়া বহু হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সকল তেজের সহিত বাসনা ঐ শক্তির সাহায্যে জীবকে ক্রিয়াপর করেন বলিয়া, দেহস্থ সকল সংযোগে ভূত ও চৈতন্ত উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার অনুভব প্রকাশ করে। সেই অনুভবই আনন্দ। ঐশিক সকল শক্তিতে ঐরূপে মন সম্মিলন হইলে আনন্দের আবির্ভাব হয়। এই জন্ত বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরের আনন্দ হইতে সকলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই শ্রুতি বেদে উপদেশ দিয়াছেন। দেহের মধ্যে ঐ আনন্দকে মৈথুনানন্দ কহে। ভূতগত ও চৈতন্তগত সারভাগকে ওজঃ কহে। ঐ ওজঃ এত সূক্ষ্ম যে তাহা বায়ুধর্ম্মে মিশ্রিত হইয়া বায়ুর একটী গুণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বাসনা ঐ ওজের সহযোগে জীবাংশ লইয়া অপর

জীব প্রকাশ করেন। দেহের যে দ্বার দিয়া জীবের প্রকাশ হয়, তাহাকে উপস্থ কহে। ঐ উপস্থ ইন্দ্রিয় প্রজাপতির শক্তির অধীন বলিয়া বিজ্ঞানবিদেরা অনুভব করেন। অতএব সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে চৈতন্যের প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

শিঃ। রাজসিক অহঙ্কার হইতে কি কি প্রকাশ হইল?

গুঃ। অহংকার যে রূপে ত্রিধা হইল এ কথা ইতি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ ও শুদ্ধ চৈতন্য মিশ্রণে কাল, কর্ম্ম, স্বভাব মতে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছিল। চৈতন্যাংশরূপী জ্ঞান, ক্রিয়া এবং রজোগুণের মিশ্রণে কাল, কর্ম্ম, স্বভাব সংযোগে রাজসিক বা তৈজসিক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ঐ রাজস অহঙ্কারে জ্ঞান ও ক্রিয়া অন্তর্হিত ছিল; এক্ষণে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাববশে তাহা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। চৈতন্যানুভাবক ভূতগত শক্তিকে জ্ঞানশক্তি কহে। ঐ জ্ঞান শক্তি যখন ভূতগত হইয়া জীবের কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবধর্ম্মে সক্রিয় হয়, তখন তাহাকে বুদ্ধি কহে। চৈতন্যকে ভূতগত করিয়া ভূত সকলকে ক্রিয়াপর করিতে চৈতন্যের যে শক্তি রূপান্তর হয়, তাহাকে ক্রিয়াশক্তি কহে। ঐ ক্রিয়া ভূতগত হইলে, প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ দুই বুদ্ধি ও প্রাণের কার্য্য প্রকাশ হইবার জন্য দেহে যে দশটী অংশ প্রকাশ হয়, তাহাকে ইন্দ্রিয় কহে। দশটী ইন্দ্রিয়ের নাম ও কার্য্য সকলেই জ্ঞাত আছেন। এই যে বুদ্ধির কথা বলা হইল, ইহা চৈতন্য দ্বারা চালিত হইয়া বাসনার ভাব অর্থাৎ জীবের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সাত্ত্বিক ও তামসিক এই উভয় অবস্থার সম্মিলনে চৈতন্যময় পদার্থ বুদ্ধি নামে থাকাতে, ইহা মন ও দশ দেবতাদি সাত্ত্বিক এবং ভূতাদি তামসিক এই উভয় অবস্থাতেই ক্রিয়াপর হইয়া থাকে। প্রাণের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এই উভয় শক্তি সাত্ত্বিক ও তামসিক অংশে মিশ্রিত হইয়া জীবের কার্য্য করিয়া এই দেহ লীলা সম্পাদন করিতেছে। ইন্দ্রিয় সকল আপনাদের প্রকাশ শক্তিরূপী দেবতাগণের ক্ষমতায় মনের গোচর হয়; বুদ্ধি ও প্রাণ সেই মন হইতে কি চৈতন্যগত, কি ভূতগত, সকল স্বভাব অনুভব করিয়া দেহের ও জীবের শুভাশুভ কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা মূল কারণ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে আর পাওয়া যায় না। এক্ষণে কারণ সৃষ্টি হইতে কার্য্য সৃষ্টি হইল।

শিঃ। ঈশ্বরকে কেন কার্য্যের কারণ বলা যায়?

গুঃ। যেমন পঞ্চভূত রস মিলনে গো দেহে দুগ্ধ উৎপাদিত হয়। তাহা বলিয়া কি ভূত সমষ্টিই কি দুগ্ধের কারণ হইবে? কখন না, কারণ তাহারা গো দেহ না পাইলে দুগ্ধে পরিণত হইত না। এস্থলে দুগ্ধের মুখ্য কারণ যদিও পঞ্চভূত, কিন্তু চৈতন্য-স্থানীয় গো। সেই কারণে ঈশ্বরকে কার্য্যের কারণ বলা যায়।

শিঃ। কারণ সমূহ কি স্বয়ং কার্য্যক্ষম হইতে পারে না?

গুঃ। যেমন আপনা হইতে উদ্ভূত ডিম্বকে পক্ষী তেজ প্রদান না করিলে তাহার জীবনী ক্ষমতা হয় না। তেমনি কারণ সমূহ চৈতন্যবিশিষ্ট না হইলে কখনই কার্য্যক্ষম হইতে পারে না।

শিঃ। কারণ হইতে কি প্রকারে কার্য্য-প্রকাশ হইল?

গুঃ। জগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কার্য্য দুই ভাগে প্রকাশিত। একটী অবস্থাকে সমষ্টি, আর একটী অবস্থাকে ব্যষ্টি কহে। ঐ সমষ্টি অবস্থাই জীবাবস্থা। এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয় ভূত গুণাদি নানা প্রকার জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ জীবভাবে অবস্থান করেন। ব্যষ্টি অবস্থায় উহারা জগৎভাবে অবস্থান করেন। এখনও পূর্ব্বোক্ত সমষ্টি ও ব্যষ্টি কোন কার্য্যও প্রকাশ হয় নাই। কেবল ঈশ্বর হইতে মূল কারণ সমূহের উৎপত্তি মাত্র।

জীবের আয়তন দেহ। জগতের আয়তন চৈতন্যের অংশাকর্ষণ। ঐ চৈতন্যাকর্ষণকে ধ্রুবপথ বা সৌরপথ কহে। কারণ চৈতন্যের উত্তাপাংশই সূর্য্য এবং হিমাংশই চন্দ্র। এক এক সূর্য্য নামক চৈতন্যাকর্ষণ পথে বহু বহু পৃথিবী গ্রহরূপে ঘূর্ণিত ও চালিত হয়। প্রত্যেক গ্রহের হিম দাতা চন্দ্রই কেবল ভিন্ন। সূর্য্য এক। এইরূপ এক একটী সূর্য্যের আকর্ষণে যতগুলি ভূত সমষ্টিভূত ও ব্যষ্টিভূত গ্রহপিণ্ড সংরক্ষিত হয়, তাহাকে এক একটী বিশ্ব বা জগৎ কহে। এইরূপ অগণ্য জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছে, ইহা বিজ্ঞানে অনুমিত হইয়া থাকে।

এই জগৎ শক্তিই ঈশ্বরের বাসনা বুঝিতে, ঈশ্বরের শক্তিতে সকল উপাদান প্রস্তুত হইল, তাহাতে বাসনা সংযুক্ত না থাকিলে উপাদানাদি ঈশ্বরের

কাল, কর্ম্ম, ও স্বভাব ধর্ম্মের বশীভূত কি রূপে হইবে? তজ্জন্য ঈশ্বর জীব-ভাবে ছিলেন, এক্ষণে আপন স্বভাব জীবে অর্পণ করিলেন। জীব বাসনা নামক স্বভাব পাইয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মজাত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবমতে কারণ সমূহকে সমষ্টি-ভূত করিয়া আপনার জীবলীলার শরীর নির্ম্মাণ করিলেন।

ঐ শরীর ব্যতীত যে কারণ সমূহ অমিলিত হইয়া রহিল, তাহাকেই ব্যষ্টিভাগ কহে। উহাই পরে জগৎ রূপে প্রকাশিত হইবে। ঐ অমিল অবস্থায় চৈতন্যের উত্তাপাংশ সূর্য্যরূপে সকলের আকর্ষক হইয়া রহিলেন, হিমাংশ চন্দ্র এবং পঞ্চ ভূতাদি আপনাপন সূক্ষ্মতা ও লঘুতা এবং ব্যাবর্ত্তকতা মতে ভিন্ন হইয়া জীবকে পালন করিতে লাগিল।

"কাল কর্ম্ম স্বভাবস্থ জীব"। যিনি চৈতন্য প্রদান করেন, তিনিই জীব। ঈশ্বর-চৈতন্য যখন কাল কর্ম্ম ও স্বভাবের মধ্যস্থ হয়েন, তখনি তিনি জীব বা আত্মা নামে অবিহিত হয়েন। কারণ ঈশ্বর জীবভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার জগৎ-কার্য্য আপনার হৃদ্গত নিয়মানুসারে প্রকাশ করিবার জন্য নিজ শরীরস্থ কাল কর্ম্ম স্বভাবের মধ্যগত হইলেন। এই জীব ভাবটী ঈশ্বরের সচেতনাত্মক শক্তি। এই শক্তি কেবল ঈশ্বরে অবস্থিত থাকে। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে, কাহাতেও প্রতিবিম্বিত হয় না। এক্ষবার স্বভাববশে কারণ প্রকাশ হইল। তাহাতে কারণগত স্বভাবাদি কারণেই থাকিল। উহাদের ব্যবহার-কর্ত্তা না থাকিলে উহারা কোন নিয়মে কার্য্যে পরিণত হইল না। এই অকার্য্যকর অবস্থায় যখন কারণ সমূহ অবস্থান করে, তখনি তাহাদিগকে "অজীব" কহা যায়।

"বহুকাল সেই ঈশ্বর শক্তি মিশ্রিত কারণাবলী অকার্য্যকার ছিল, পরে ঈশ্বর কাল কর্ম্ম স্বভাবগত আত্মা রূপে আপন শক্তি দিয়া সকলকে সজীব করিলেন"।

এক্ষণে জীবত্ব মিশ্রিত হওয়াতে কারণ সমূহ আপন আপন কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। সকল কার্য্যই জীবের বাসনার অনুবর্ত্তী হইল। ইতি পূর্ব্বে কারণাবলীর যে ব্যষ্টিভাব ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইল না, এবং সেই ব্যষ্টি ভাব সংযুক্ত হইয়া, জীব সমষ্টি ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই স্থানে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে কারণ সমূহ কার্য্যপর হইল।

ঈশ্বর জীবভাবে স্বচৈতন্য শক্তিকে কাল কর্ম্ম স্বভাবের মধ্যস্থ করিয়া কারণ-রূপী শরীর মধ্যে থাকেন বলিয়া জীবকে পুরুষ কহে। সেই পুরুষ নামক

জীব কারণের মধ্যে কাল কর্ম্ম ও স্বভাব সহিত প্রবেশ করিয়া সকলকে সচেতন করিবামাত্র, তাঁহার ব্যাপ্তি সকল কারণেতেই হইল। সকল কারণে ব্যাপ্তি হওয়াতে কারণ সকল মিশ্রিত ভাব ত্যাগ করিয়া জীবের বাসনার ও কাল কর্ম্ম স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইল। যখন কারণাবস্থা জীব স্বভাবে নাশ হইয়া জীবময় হইল ; তখন তাহারা জীবের স্বভাবাদির মতে কোটী কোটী জীব রূপে, জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সকলেই জীবের সম্বন্ধে সম্বন্ধীভূত হইয়া জীবকে কর্ত্তা করিয়া, আপনারা জীবের বাসনার অনুযায়ী কার্য্য হইয়া পড়িল।

হস্ত, পদ, আনন, মস্তকাদি বলিতে মনুষ্যের ন্যায় যেন কেহ না বুঝেন। ক্রিয়া অনুসারে অঙ্গের নাম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় তেজ শরীরের যে যে অংশে ক্রিয়মান হয়, তাহার গুণভেদে হস্ত পদাদির নাম করণ হইয়াছে। হস্তে আকর্ষণ ক্রিয়া হয়। বৃক্ষের শাখাই হস্ত বলিয়া কল্পিত। ঐ শাখাদ্বারা প্রকৃতিক তেজ বৃক্ষ আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। আননে আহার করা যায়। বৃক্ষের রসগ্রাহী শিরাদি আনন এবং মূলই পদরূপে কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপে কোন জীবের প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় আছে, কাহারও নাই। কারণ কীট পতঙ্গাদির ইন্দ্রিয় প্রকাশ নাই ; কিন্তু ইন্দ্রিয় শক্তি উহাদের জীবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদেরা এই প্রকার আলোচনা করিয়া সকল জীব-দেহেই ইন্দ্রিয় প্রাণাদির অধিষ্ঠান স্থির করিয়াছেন।

মানবদেহ চতুর্দ্দশ অংশে প্রকাশ্যভাবে বিভক্ত। অপর জীবেরও চতুর্দ্দশ অংশ সম্ভব, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় প্রকাশ্য নহে। এই জন্য মনুষ্যের অবয়ব লইয়াই জীবের ব্যাপ্তির পরিমাণ হইতেছে। মনুষ্যের কটীদেশ হইতে দেহ দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; উরুদেশের পশ্চাৎ সূক্ষ্মাংশকে কটী কহে ; সম্মুখাংশকে জঘন কহে। এই কটী ও জঘনকে কেন্দ্র করিয়া কি মনুষ্য, কি বৃক্ষ-দেহ, সকলেরই পদ ও মস্তক ভাগের ক্রিয়া হইয়া থাকে। কটীদেশই দেহের আধার ; এই স্থানেই আধার পদ্মেরও স্থিতি। ঐ আধার পদ্ম হইতে দেহের ক্রিয়া বিভক্ত হইয়া নিম্নগামী ও উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। ঐ কটী হইতে সমস্ত পদতল একভাগে ভাজিত হইয়াছে, জঘন হইতে শিরোদেশাবধি অপর ভাগে ভাজিত হইয়াছে।

এই যে চতুর্দ্দশ অংশে জীব বিভক্ত হইলেন, ইহার মধ্যে সপ্তঊর্দ্ধতন ও অধঃ সপ্তলোক। ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য ও ব্রহ্ম এই সপ্তলোককে সপ্তসর্গ কহে। এই সপ্তঅংশে জীব ঈশ্বর চৈতন্য হইতে ক্রমে বিশুদ্ধভাবের বিকারী হইয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ সমূহও সপ্তভাগে অবস্থান্তরিত হইয়া অতি সূক্ষ্ম হইয়া ক্রমে যত স্থূল হইয়াছে, জীবের স্বভাবও তাহাদের সহিত তত স্থূল হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ঈশ্বরের সহিত কারণ শক্তি সকলের নিত্যাবস্থানাবস্থার নাম ব্রহ্মলোক।

ঈশ্বরের বাসনা দ্বারা সত্তের ক্ষোভক অবস্থার নাম সত্যলোক।

প্রধান অবস্থার নাম তপোলোক।

মহত্তত্ত্ব অবস্থার নাম মহর্লোক।

মহত্তত্ত্বের মধ্যে কালাদির মিলিতাবস্থায় ত্রিগুণের প্রকাশাবস্থার নাম জনলোক।

অহঙ্কারাবস্থার নাম স্বর্লোক।

মিশ্রিত অহঙ্কার ভূত ইন্দ্রিয়াদি কারণ প্রকাশাবস্থার নাম ভুবর্লোক।

কটীদেশের নাম অতল, উরুদেশের নাম বিতল, উভয় জানু দেশের নাম শুদ্ধ সুতল, তাঁহার উভয় জঙ্ঘাদেশের নাম তলাতল, গুল্ফ দেশের নাম মহাতল, পদের উপরিভাগ রসাতল, উভয় পদের তলদেশের নাম পাতাল। এইরূপে তিনি লোকময় হইয়াছেন। এই দেহে জীবাত্মা যেমন স্থূলরূপে আবরিত হইয়া সূক্ষ্মরূপে সকল ইন্দ্রিয়; রিপু ও বাসনাজাত উপভোগ মনের সাহায্যে ভোগ করিতেছেন, ঈশ্বরও তদ্রূপ মায়ার মধ্যগত হইয়া স্থূলভাবে জগৎ নামক আপন আবরণ আপনাতে প্রকাশ করিয়া কূর্ম্মাবয়বের ন্যায় থাকিয়া সূক্ষ্মরূপে সকল গুণজাত, কর্ম্মজাত, স্বভাব ও কালজাত বিভূতি উপভোগ করিতেছেন।

শিঃ। বাক্‌শক্তি কিরূপে জীবে প্রকাশ হইল ?

গুঃ। বহ্নিদেবের সূক্ষ্মকারণ নির্দ্দেশ হইলে কেবল ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না, অতএব ঈশ্বরের মুখরূপ কার্য্যের উৎপত্তি স্থান হইতে এই কার্য্যের সূক্ষ্মকারণ প্রকাশ হইয়া ক্রমে স্থূলভাবে জীবদেহে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বর বাক্‌শক্তি দিলেন; সেই বাক্‌শক্তি বাসনার অভিপ্রায় না

পাইলে কি প্রকাশ করিবে। সেই অভিপ্রায় সংযোজনার জন্য বাসনার সহিত স্বভাবের সংযোজনা করিতে হয়। স্বভাব মতে বাসনা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করে, মন তাহা বাক্যদ্বারা বিস্তার করেন। ঐ অভিপ্রায় বাচক শব্দটীর সূক্ষ্মাংশই ছন্দোরূপে শ্রুতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছন্দোমতে শব্দ সকল সজ্জিত হইয়া অভিপ্রায় প্রকাশক হইয়া থাকে। কোন একটী হৃদ্গতভাব প্রকাশ করিতে হইলে, স্বভাবের মতে বাসনাগত তেজ মনে প্রতিফলিত হইলে, মন তাহা ইন্দ্রিয় দেবতাগণকে প্রদান করেন। তবে ইন্দ্রিয় দেবতাগণ ইন্দ্রিয় সাহায্যে বাক্যে কথন, হস্তে গ্রহণ, পদে চলন, করিয়া থাকেন। যখন বাসনা মনকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, তখন তাহাকে সূক্ষ্ম চৈতন্যময় ভূতাংশের মধ্য দিয়া মনের গোচরিত হইতে হয়; কারণ মন সর্ব্বদেহব্যাপী, কিন্তু এক স্থানে ক্রিয়া-পর। যে অভিপ্রায় বা ভাব লইয়া বাগিন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাকে ছন্দ কহে। বেদ মধ্যে সেই জন্য বাক্য সকল ছন্দের মধ্যে গ্রথিত, এবং ঐ ছন্দ সকলের প্রকাশক শক্তিরূপী দেবতা এবং উদ্দেশ্যরূপী ঋষি সমষ্টি আছে। শ্রুতির অভি-প্রায়ই সেইজন্য ছন্দোরূপে এবং উদ্দেশ্য ঋষিরূপে জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে। অভিপ্রায় প্রকাশক শক্তিকে ছন্দঃ কহে। ঐ ছন্দঃ ঋষিভেদে সপ্তনামে গণিত। প্রথম গায়ত্রী, দ্বিতীয় অষ্টি, তৃতীয় অনুষ্টুপ, চতুর্থ বৃহতী, পঞ্চম পংক্তি, ষষ্ঠ ত্রিষ্টুপ, সপ্তম জগতী। এই সপ্ত ছন্দে ব্রহ্মের অভিপ্রায় অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বেদমধ্যে নিহিত আছে।

শিঃ। শব্দ নিত্য কি অনিত্য?

গুঃ। সংকল্প ভাবের দ্যোতক অন্তঃকরণ বৃত্তিজাত স্বরগ্রামের সংযোজক ইঙ্গিতকে শব্দ কহে। সেই শব্দ নিত্য, তাহাতে লয় বা ভ্রম নাই। সেই শব্দ সংযোজনীয় যে কল্পনা হইবে, তাহা ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু শব্দ কখনই অনিত্য হইতে পারে না। কারণ খ পুষ্প বলিলে খ শব্দের অর্থ শূন্য এবং পুষ্প শব্দও নিত্য বোধক, কিন্তু উভয়ে যে কল্পনা হইবে, সেই উদ্দেশ্য ভ্রমাত্মক, কেন ভ্রমাত্মক বোধ হইল? অসম্ভব অর্থে। আকাশে পুষ্প ফুটিতে পারে না, এইজন্য কল্পনার অনিত্যত্ব শব্দই বুঝাইয়া দিল। এই হেতু শব্দ কখনই অনিত্য হইতে পারে না।

শিঃ। কোন লোকে বাসনা পরিশুদ্ধ থাকে?

গুঃ। মায়া হইতে ঈশ্বর চৈতন্যে যে সকল লোক কল্পিত হইয়াছে, তাহাই ভূতল হইতে সপ্ত পাতালের কল্পনা। আর ঈশ্বরের বিভূতি চৈতন্যময় হইয়া যে অংশে রহিয়াছে, তাহাকেই স্বর্গাদি সপ্তলোক কহিয়া থাকে। এ সমস্তই কল্পনা। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই কেবল কর্ম্মফলের চরমস্থান বা আনন্দ ও নিরানন্দ। ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিলে সেই আনন্দের তারতম্যে যে সকল লোক কল্পিত হইয়াছে, সেই স্বর্গাদি আনন্দাংশ মাত্র; তাহাতে মায়ার অধিকার নাই, দুঃখের পীড়ন নাই। বাসনা এই লোকে পরিশুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ এই লোকে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিঃ। পরম পদ কাহাকে বলে?

গুঃ। সাধকেরা পরিত্রাণের ইচ্ছা করিলে ভক্তির সহিত ভগবানের যে পরমপদ তাহাই জ্ঞাত হইবেন। নির্গুণ অবস্থাকে ঈশ্বরের পরম পদ কহে। সেই পরম পদের পরিচয় কি? অজস্র সুখবিশোকময় ব্রহ্ম। অজস্র বলিতে নিত্য। সুখ বলিতে আনন্দ, বিশোক বলিতে জরা শোকাদি রহিত। ব্রহ্ম বলিতে অপরিমিত। ইহার একার্থ এই যথাঃ—নিত্যানন্দময় জরা মরণাদি রহিত অপরিমিত বস্তু।

শিঃ। ঈশ্বরকে নিত্যানন্দময় বলিয়া কি প্রকারে বোধগম্য হইবে?

গুঃ। সেই ঈশ্বর বিজ্ঞানের বিচারে শশ্বৎ প্রশান্ত বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। শশ্বৎ প্রশান্ত বলিতে সদাশান্তিময়। বিজ্ঞানালোচনায় জানা গিয়াছে, নির্গুণ ব্রহ্মের কোন ক্রিয়া নাই; তিনি আপনার শক্তি সকলকে জগৎ লীলায় ব্যাপ্ত রাখিয়া আপনি শান্তিময় হইয়া আছেন। ইহাতে তাঁহাকে সাধকে নিত্যানন্দময় বলিয়া জানিবে।

শিঃ। ঈশ্বরকে জরা মরণাদি রহিত বলিলেন কেন?

গুঃ। ত্রিগুণের ভেদে কাল দ্বারা জীবের বা জগতের যে অবস্থান্তর হয়, তাহাই জরা মরণাদি দুঃখ বলিয়া শ্রুতিতে প্রকাশ। ঈশ্বর ঐ জরাদি সংযুক্ত নহেন। তিনি অভয় স্বরূপ হইতেছেন। যাঁহার নিকটে দ্বিতীয় বস্তুর ভয় নাই, তিনিই অভয়। নির্গুণাবস্থায় ঈশ্বরে দ্বিতীয়ভাব বিজ্ঞানে লক্ষিত হয় না। এই জন্য ঈশ্বরকে বিজ্ঞানবিদেরা অভয়স্বরূপ কহেন। তিনি অভয় কিরূপে হইলেন? না—তাঁহাতে ভেদশূন্য সমভাব বর্ত্তমান আছে। সমভাব কি

প্রকারে বোধ হইবে—না—তিনি প্রতিবোধ মাত্র হইতেছেন। প্রতিবোধ বলিতে জ্ঞান। সকলের সূক্ষ্ম দর্শনকে জ্ঞান কহে। সকলের সূক্ষ্মই এক হইতেছে; এই ভবে বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরকে সূক্ষ্ম দর্শন বা সমভাবাপন্ন বা জ্ঞানময় কহিয়া থাকেন। তিনি স্বভাবাপন্ন কিরূপে হইলেন?—না—তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল হইতেছেন। কারণ ব্রহ্ম নির্গুণাবস্থায় কাম্যাদির কোভে বিকারিত হইয়া জগৎভাবাপন্ন হয়েন নাই। সেই ঈশ্বর হইতে যখন কার্য্যের প্রকাশ, তখন তিনি কার্য্যরূপী মনের প্রকাশ কর্ত্তা হইয়া কিরূপে নির্গুণ হইলেন? না—তিনি সদসৎরূপী। সদসৎ বলিতে কার্য্যের প্রকাশক হইয়াও সঙ্গশূন্য। এইভাবে যদি ঈশ্বর রহিলেন, তবে তাঁহাকে মায়াময় জীবের কি প্রকারে বোধ হইতে পারে? না—ঈশ্বর আত্মতত্ত্ব স্বরূপ হইতেছেন। মায়া মধ্যগত জীব নামধারী আত্মাই সেই ব্রহ্মের স্বভাব হইতেছে।" সাধকে বাসনার দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে পূর্ব্ব অবস্থাপন্ন ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই বোধ করিতে পারিয়া থাকে।

শিঃ। নির্গুণ ব্রহ্ম কি মায়ার অধীন?

গুঃ। রক্ষণ, হরণ পালন, উৎপাদন এই চারিটীই ক্রিয়া। ঐ চারি ক্রিয়ানুসারে ঈশ্বর শব্দটী বহুকারকবান্ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি, দেবতাদি, ভূতাদিরূপ জগতের কারকবান্ হইয়া থাকে। নির্গুণাবস্থায় ঈশ্বর শব্দটী ঐরূপ কারকবান্ হয় না। ঈশ্বরের সৎভাবে স্থিতির নির্দ্দেশ করিতে ব্রহ্মা বলিলেনঃ—"মায়া তাঁহার অভিমুখে বিলজ্জমানা হইয়া দূরে গমন করে।" সৃষ্টির ক্রিয়াদিতেই মায়ার প্রয়োজন। যখন ব্রহ্ম নির্গুণ, তখন মায়ারূপিণী প্রধানাশক্তিও দূরে গমন করে।

শিঃ। সগুণ ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ কি মায়া শ্রেষ্ঠ?

গুঃ। ঈশ্বর দুই স্বভাবাপন্ন হইয়া আছেন। একটী স্বভাবে তিনি নির্গুণ, অপরটীতে তিনি সগুণ। জগৎ পক্ষে বাসনাহীন অবস্থাকে নির্গুণ অবস্থা কহে।" আর জগৎপক্ষে সক্রিয় বাসনাযুক্ত অবস্থাকে সগুণাবস্থা কহে। এই নির্গুণ অবস্থা হইতে ঈশ্বরস্বভাব সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া সৃষ্টি কার্য্যের জন্ম সগুণ হইয়া পড়িয়াছেন। এই সগুণভাবে জগৎ সৃজিত, পালিত ও লীন হইতেছে। এই সৃজনাবস্থাকে কারণভাব কহে। পালনাবস্থাকে কার্য্যভাব কহে।

লীনাবস্থাকে লয় কহে। এই ত্রিভাবই ঈশ্বরের সগুণ মূর্ত্তির তিনটী অংশ। তাহার মধ্যে তিনটী স্বরূপে স্থিত, আর একটী মায়ামধ্যগত। স্বরূপে স্থিত অংশত্রয়কে বর, অভয় ও ক্ষেম কহে। আর মায়ামধ্যগত অংশকে সংসার বা প্রবৃত্তি কহে।

মায়া বলিতে এস্থলে স্বরূপশক্তি। ঈশ্বর বলিতে এস্থলে সগুণ ঈশ্বর। স্বরূপ শক্তিই সগুণ ঈশ্বরকে ক্রিয়াপর করিয়া ত্রিগুণ মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নাম ও মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। চৈতন্য আপনার স্বভাবকে মাত্র জ্ঞাত হইতে পারে, ইহাই বিজ্ঞানের নিয়ম। সগুণ ঈশ্বরের স্বভাব দ্বারা জগৎ প্রকাশ হইতেছে; তিনি জগৎপক্ষই জানিতে পারেন, মায়াপক্ষ জানিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। কারণ তিনি মায়ার দ্বারা চালিত হইতেছেন।

কার্য্য প্রকাশক মানসিক শক্তিকে বুদ্ধি কহে। স্বভাব বুদ্ধিশক্তির দ্বারা জীবকে কার্য্যপর করেন। ব্রহ্মার পক্ষে সৃজনাদি কার্য্য প্রকাশক শক্তিই বুদ্ধি; মহাদেব পক্ষে হ্রাসন বর্দ্ধন প্রভৃতি কার্য্য করণই বুদ্ধি। নারদাদি সপ্তর্ষ্যাদির পক্ষে চৈতন্য বিস্তারই বুদ্ধি।

বুদ্ধি যে দিকে লীন থাকিবে, তাহাতেই অহংতত্ত্ব বিস্তৃত হইয়া কর্ত্তব্য বোধ হইবে। ব্রহ্মা দেখিলেন তাঁহার স্বভাব যে শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে সৃষ্টিরূপেই কার্য্যপ্রকাশ হইতেছে। সেই সৃষ্টির অহংতত্ত্ব মতে তিনি স্বয়ং কর্ত্তা বোধ করিয়া সৃষ্টিপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতেছেন। এই জন্য জগৎ প্রকাশক শক্তির কোন প্রকার বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা এই স্বভাব দেখিয়া বোধ করিলেন, কোন উদ্দেশ্য না থাকিলে, তিনি সৃষ্টি বিষয়েই স্বভাব ধাবিত করিবেন কেন? সেই উদ্দেশ্য অদৃষ্টই মায়া বা স্বরূপ শক্তি।

কালকে পুরাণে মহাদেব কহে। মহাদেব ও ব্রহ্মার ন্যায় কোন শক্তির দ্বারা চৈতন্য ক্ষোভণ ক্ষমতায় নিযুক্ত হইয়াছে, তাহা আপনার স্বভাবে মাত্র জানিতে পারিতেছেন। এইজন্য মায়া নামে স্বরূপ শক্তির স্থিতি মাত্র পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা মায়াতীত নহেন বলিয়া মায়ার পরিণাম দর্শন করিতে পারেন না।

ব্রহ্মা, কাল ও ঋষ্যাদি হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি অর্থাৎ দেবতাগণের উদ্ভব। এই প্রমাণে ব্রহ্মাদি যখন মায়াতে বশীভূত হইয়া কার্য্যপর হইতেছেন, তখন ব্রহ্মাদি হইতে হীন দেবতাগণ কি প্রকারে সেই মায়া বুঝিতে পারিবেন

দেবতাদি বলিতে সকল জীবই বুঝাইল, কারণ ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারাই জীব-মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্মা কালাদি জগতের ও জীবের কারণ, তাঁহারাও যখন মায়ার অধীন তখন জীবের সূক্ষ্ম চৈতন্যাদি কি প্রকারে মায়ার প্রভুত্ব নির্ণয় করিতে পারিবে। তবে স্বভাব দেখিয়া স্বভাব প্রকাশক একটী মহাশক্তি আছে, ইহা অনুভব বোধ করা মাত্র।

শিঃ। ঈশ্বরকে তত্ত্ব বিচার দ্বারা কি বোধ করা যায় না?

গুঃ। জীব চৈতন্য আপনাপন সংকল্প দ্বারা অর্থাৎ মনের নিবৃত্তি বাচক গতি দ্বারা কারণ নির্ণয়কে তত্ত্ব কহে। কারণই যখন তত্ত্ব হইল, তখন তত্ত্বাতীত যে বস্তু, তাহা তত্ত্ব দ্বারা কি প্রকারে প্রমাণিত হইবে। তবে তত্ত্ব সকল যখন কোন শক্তি ও চৈতন্য হইতে প্রকাশ হইতেছে দেখা যাইতেছে, তখন তত্ত্বাতীত কোন সত্তা আছে যে তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই সত্তাই সর্ব্ব সত্তা অর্থাৎ নির্গুণ পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে।

তত্ত্ব ও তত্ত্বাতীত বস্তুর এই দুই অবস্থা। বিজ্ঞান দ্বারা যে ভাব প্রমাণ করা যায়, তাহাকে তত্ত্ব কহে। আর তদপেক্ষা সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ যাহা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, যাহা অনুভব মাত্র হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্মভাবকে তত্ত্বাতীত কহে। এই তত্ত্বাতীত অবস্থাও তত্ত্ব বলিতে হইবে। কারণ তত্ত্বাতীত বস্তুর অনুভব হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে।

মনের দুইটী অবস্থা এই মানব স্বভাবে বর্ত্তমান আছে। একটীর দ্বারা তত্ত্ববোধ হয়, তাহাকে সংকল্প কহে। অপরটীর দ্বারা তত্ত্ব হ্রাস হয়, তাহাকে বিকল্প কহে। এই সংকল্প অবস্থায় চিত্ত স্থির হইলে যে জ্ঞান শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাকে নিশ্চয়াত্মক কহে। এইভাবে মন উপস্থিত হইলেই ব্রহ্মতত্ত্বকে দর্পণে প্রতিবিম্ব দৃষ্টির ন্যায় দেখা যায়।

জ্ঞান শব্দের অর্থ তত্ত্ববোধ; তত্ত্ববোধ হইলে তত্ত্বাতীত বস্তুর অনুভব সহজেই হইয়া থাকে। যেমন অংকুর দেখিলে বৃক্ষের অনুভব হয় এবং অংকুর দেখিলে তাহার প্রকাশক তত্ত্বাতীত কারণের অনুভব হয়, তদ্রূপ যে ক্ষমতার দ্বারা তত্ত্বের ও তত্ত্বাতীতের প্রমাণ ও অনুভব হয়, তাহাকে জ্ঞান কহে।

সেই ভগবান্ "জ্ঞানময়" হইতেছেন। জ্ঞানময় বলিতে তত্ত্ব সকলে মণ্ডিত অথচ এত সূক্ষ্ম যে তাহার অতীতভাবে বর্ত্তমান। অর্থাৎ ঈশ্বর এমন

তাবে তত্ত্বের মধ্যগত যে তিনি নিশ্চয়াত্মক তত্ত্বের মধ্যগত এবং তাহার অতীত হইতেছেন।

ঈশ্বর "বিশুদ্ধ জ্ঞানময়।" বিশুদ্ধ বলিতে আকারহীন। আকার বলিতে এস্থলে বিষয়াকার বুঝিতে হইবে। কতকগুলি তত্ত্বের সম্মিলনে যেমন ঘটাদির আকার হয়; তাহাকে বিষয়াকার কহে। সেই বিষয়াকার ভাবে এই জগৎরূপী ঘট বর্ত্তমান আছে। ঈশ্বর এই ভাবেও স্বরূপে নাই। আকারের বিকার সম্ভাবনা। আকার ও বিকার যে, সূক্ষ্ম বস্তু হইতে প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই অবস্থাকে বিশুদ্ধ কহে। যদি তাঁহাকে কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রথমতঃ তাঁহাকে এই ভাবে জানিবেনঃ—তিনি জগদাদি বিকাররূপী নহেন, তত্ত্ব বা জ্ঞানরূপী নহেন, তিনি ঐ বিকার ও তত্ত্বের মধ্যগত নিশ্চয়াত্মক সূক্ষ্ম তত্ত্বরূপী হইয়া বিশুদ্ধ ও কেবল জ্ঞান বা তত্ত্বময় হইতেছেন।

"তিনি সকল বস্তুতে সম্যক্ প্রকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।" বস্তু বলিতে কারণাবলী। সম্যক্ প্রকারে বলিতে সন্দেহহীন হইয়া। বর্ত্তমান বলিতে বিরাজ করিতেছেন।

যেমন একটী বীজে বৃক্ষত্ব যথার্থই আছে, কিন্তু বোধ হয় না। তদ্রূপ জগতের কারণের মধ্য সূক্ষ্মকারণরূপে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন। কোন বস্তু চাক্ষুষ না দেখিয়া অপরাপর প্রমাণে সিদ্ধান্ত হইলে, তাহাকে "সন্দেহহীন কহে।" কারণের মধ্যগত তত্ত্বের দ্বারা মীমাংসা হয় না, এইজন্য ঈশ্বরের, সত্তাপক্ষে প্রমাণ ও অনুভবমতে সন্দেহহীন হইতে হয়।

শিঃ। নির্গুণ ও সগুণে প্রভেদ কি?

গুঃ। কোন নির্গুণ বস্তুর পরিচয় দেওয়া যায় না, কিন্তু প্রতি বস্তুতে সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব আছে, কেবল সগুণত্ব পরিচয় দ্বারা নির্গুণত্ব প্রমাণ হয় মাত্র।

যেমন একটী কমলা লেবু হস্তে লইয়া তাহাকে বিচার করিতে হইলে প্রথমে তাহার বর্ণ, পরে আঘ্রাণ, পরে তাহার আস্বাদন, পরে তাহার রসের ও বীজের উপকারিতা স্থির করিতে হয়। [illegible] বিচারে পাওয়া গেল, উহাই কমলালেবুর পক্ষে সগুণভাব। আর যে মহাসার হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই নির্গুণ। নির্গুণ বলিয়া তাকে না দেখা গেল, কিন্তু সগুণ পাওয়াতে নির্গুণ আছে,

তাহা প্রমাণ হইল এবং বোধ হইল। তেমনি ঈশ্বর পক্ষে জগৎ সগুণ এবং জগৎপক্ষের শ্রেষ্ঠ চৈতন্যময় কারণকে নির্গুণ কহে।

"তিনি নির্গুণ, সত্য, পূর্ণ, এবং আদি ও অন্তহীন হইতেছেন।" কার্য্যাবস্থা যতই সূক্ষ্ম হউক না, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম কারণাবস্থা লাভ হয়, ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে সূক্ষ্ম কারণাবস্থায় সত্তা মাত্র প্রমাণ হয়, অথচ কোন স্থূল প্রমাণ হয় না, তাহাকে নির্গুণ অবস্থা কহে। সেই নির্গুণ অবস্থাকে ব্রহ্ম সত্য কহিলেন, যাহা হইতে মিথ্যার প্রকাশ হইয়া তাহাকে আবরণ করিয়া আপনি বর্ত্তমান হয়, তাহাকে সত্য কহে। তত্ত্ব বিশ্বরূপী জগৎ লয় পথাধীন বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে মিথ্যা কহে। এই মিথ্যা জগৎ যে অনুকারণ হইতে প্রকাশ হইয়া তাহাকে অন্তরে রাখিয়া আপনিই সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, তাহাকেই সত্য কহে।

কোন একটী দ্রব্য কোন অংশে হীন থাকিলে তাহাকে অপূর্ণ কহে। এই বিশ্বরূপী পরিপূর্ণ কার্য্যাবস্থা যাঁহা হইতে প্রকাশিত, তিনি যে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাহার আর সন্দেহ কি?

আদি বলিতে জন্ম; অন্ত বলিতে মৃত্যু বা লয়। জন্ম শব্দের ভাব প্রকাশ। যে তত্ত্বাতীত তত্ত্ব হইতে সকলের প্রকাশ অর্থাৎ বিকার, তাহার বিকার অসম্ভব এইজন্য অজন্মা। এবং বিকারী বস্তু যাহাতে লয় পায়, তাঁহার লয় অসম্ভব, এই জন্য তিনি অন্ত বা মৃত্যুহীন।

বৃক্ষ যখন লয় পায়, তখন বীজ লয় পায় না। এই প্রমাণে সর্ব্বকারণরূপী ঈশ্বরের লয় নাই, ইহা অনুমানীয়।

নিত্য বলিতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। কি সৃজনকালে, কি প্রলয় কালে, সর্ব্বদাই তাঁহার সত্তা দৃষ্ট ও বিজ্ঞানে অনুমিত হইতেছে; এই হেতু তিনি নিত্য; তিনি নিত্য না হইলে পূর্ণ হইতে পারিতেন না। কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে কার্য্য-প্রকাশ অসম্ভব, এই জন্য সেই নির্গুণভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তাঁহা হইতে সগুণ ভাবরূপী কার্য্য প্রকাশ বোধ করিতে হইবে।

শিঃ। যাঁহার কার্য্যে জড়ভাব বা মিথ্যা প্রকাশ হয়, তাঁহাকে সত্য বলিব কিরূপে?

গুঃ। চৈতন্য শক্তিরূপী ব্রহ্ম চৈতন্যকে আকর্ষণ করিয়া [illegible]

ময় জগৎ প্রস্তুত করিতেছেন। যিনি সকল জড়ভাব আকর্ষণ করিয়া চৈতন্যে লীন করেন, তিনিই হরি। ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগৎ ব্যাপ্ত চৈতন্যভাব। সেইভাব যে পূর্ণ চৈতন্য হইতে প্রকাশিত, তিনিই হরি। ইহাতে ব্রহ্মভাব যে কেবলমাত্র হরি-পর, তাহা বুঝান হইল। হরি সত্য স্বরূপ। সত্যই চৈতন্য-জ্ঞাপক। যেমন সুখ ও দুঃখে সামান্য প্রভেদ, উহাদের বিলয়ে আনন্দ প্রকাশ হয়। এবং সেই আনন্দই উহাদের প্রকাশ কর্ত্তা। তদ্রূপ সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই হরি। সেই হরি হইতে যাহা প্রকাশিত, তাহাই ভাবাভাব বোধে মিথ্যা ও সত্য বলিয়া পরিচিত। যেমন একটী অঙ্গ বেদনাময় হইলে, বেদনার অধিকানুভবের নাম দুঃখ এবং সামান্যানুভবের নাম স্বস্তি বা সুখ, আর বেদনার মূলোচ্ছেদনের নাম আনন্দ। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে জীব আনন্দের স্বভাবাপন্ন, কোনপ্রকার ভৌতিক পীড়ায় আচ্ছন্ন হইয়া সুখও দুঃখের রূপান্তর হইয়া বেদনা অনুভব করাইতেছে। এই সংসার তদ্রূপ। ইহা একটী আনন্দের বিকার। সেই বিকারই সুখ ও দুঃখ। এই সুখও দুঃখের ন্যায় সত্য ও অসত্য। উদ্দেশ্যই সত্য আর উদ্দেশ্যের নাশই মিথ্যা। এক সত্যের রূপান্তরই মিথ্যা। ঐ সত্যই চৈতন্য; মিথ্যা জড়গামী চৈতন্য। সুখ ও দুঃখের ন্যায় ইহারা পরম চৈতন্য হইতে কার্য্যাবস্থায় অর্থাৎ জগৎ অবস্থায় ভিন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক ঈশ্বরে মিথ্যা নাই। কারণ তাঁহাতে কার্য্য নাই। ব্রহ্ম কার্য্য প্রকাশক। তিনি কার্য্যে অর্থাৎ জগতে পরিণত নহেন, এই জন্য তিনি জড়তা বা মিথ্যা নহেন। অগ্নি যেমন উত্তাপই প্রকাশ করিতে পারে, তদ্রূপ চৈতন্য বস্তু সত্যই প্রকাশ করিতে পারে।

শিঃ। ঈশ্বর কি বাহ্য নির্ণয়ে নির্ণীত হন না?

গুঃ। ঈশ্বর বাহ্য নির্ণয়ে নির্ণীত হইবার বস্তু নহে। ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্ণয়কে বাহ্য নির্ণয় কহে। চৈতন্য দ্বারা নির্ণয়কে অন্তর্নির্ণয় কহে। বাহ্য নির্ণয়ে স্থূল বোধ হয়। অন্তর্নির্ণয়ে লীন হওয়া যায়। যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বারা চৈতন্য সাধন হয়। তাহাতে তত্ত্ববোধ হয় মাত্র। ঈশ্বরে লীন না হইতে পারিলে ঈশ্বর নির্ণয় অনুভব হয় না। যোগে ঈশ্বরের অস্তিত্বরূপ তত্ত্ববোধ হয়, তাহাতে লীন হওনানন্দ ভোগ হয় না। বুদ্ধাদি তত্ত্ববাদী ছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের প্রচারিত উপদেশ সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের নির্ণায়ক নহে। তাহার কারণ

তত্ত্ববাদী হইয়া তত্ত্বাতীত না হইতে পারিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ব্রহ্মা তত্ত্ব-শক্তির কারণ স্বরূপ। তত্ত্ববাদিগণ তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া ব্রহ্মা নামক স্বভাব শক্তিকেই শ্রেষ্ঠ ভাবে। সেই তত্ত্বই ঈশ্বর হইতে প্রসূত, এই জন্য তাহারা মায়া মোহিত না হইয়া শুদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং তত্ত্ববোধ হইলে অতত্ত্বরূপী যে মায়া কুহক, তাহাতে পতিত হয় না। সাধনাই ভগবৎ-পরায়ণ।

শিঃ। সাধনা ভগবৎ-পরায়ণ কেন হইলেন?

গুঃ। বিজ্ঞানবিদেরা কহেন, আশ্রিত বস্তু মাত্রেই প্রায় আশ্রয়দাতার গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং অপরে সেই আশ্রিতের আশ্রয় লইলে, তাহাকেও পূর্ব্বাশ্রয়ের বশবর্ত্তী হইতে হয়। যেমন একটী বীজ মৃত্তিকার মধ্যে নিপতিত করিবার মাত্র, তাহার স্বভাবক্রমে সেই মৃত্তিকার রসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। সেই রসে তাহার অঙ্কুরাদি হইয়া তাহাকে মৃত্তিকাগত জন্মধর্ম্ম যথার্থই গ্রহণ করিতে হয়। মনুষ্যাদি অপরে যদি ঔষধার্থে সেই অঙ্কুরাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সেই অঙ্কুরগত মৃত্তিকার যে রসগুণ থাকে, সেই তিক্ত ও মিষ্টাদি গুণ মনুষ্যকেও লইতে হয়। তদ্রূপ সাধনা যদি ঈশ্বর ক্ষেত্রে না থাকিয়া ঈশ্বর রসময় না হয়; তবে তাহার কি সাধ্য যে সে ঈশ্বর পথে মনুষ্যকে লইয়া যায়।

সাধনা বিনা দেহে কোন ফলভোগ করিতে পারেন না। জীবের পঞ্চবর্ষ হইতে কর্ম্মের প্রতি জ্ঞান সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানাবস্থায় যে জীব পূর্ব্ব জন্ম পরিশুদ্ধতা হেতু সাধনার আশ্রয় পাইয়া থাকে। এ জন্মে জ্ঞান স্ফুরিত হইবার মাত্রই তাহার সৎকার্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে। কাহার সামান্য শিক্ষার আবশ্যক হয়, কাহার সিদ্ধ সাধনা অন্তরে নিহিত থাকা সত্বে একেবারে সংভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। কারণ সাধনা আজন্মই ঈশ্বরের তত্ত্বে নিমগ্ন থাকে।

শিঃ। অসংস্কৃত অবস্থা হইতে মনুষ্যত্বে জীব আসিয়া, পরমাত্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে কি না? কি উপায়ে তাহারা বোধ করিবে?

গুঃ। ঈশ্বর মনুষ্য দেহ মধ্যে পরমাত্মারূপে আবির্ভাব হয়েন, এমন নহে। মনুষ্যকে যাহাতে আত্মভাব দেখাইতে পারেন এবং জীব ও আপনি যে অভেদ ইহা বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য আপনি অকর্ম্মী হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপী যোগ, জ্ঞান, ও যজ্ঞাদিই কর্ম্ম এবং তিনি নির্গুণ বলিয়া স্বয়ং অকর্ম্মা হইতেছেন। এই প্রমাণে ভক্তেরা আত্মসত্তা অহঙ্কার ভুলিয়া চিত্ত নিয়োগ পূর্ব্বক প্রেমে উন্মত্ত হয়। বিজ্ঞানীরা তাঁহাকেই সোঽহং কহেন।

শিঃ। ঈশ্বর যদি জগৎ হন, তাহা হইলে জগতের লয় আছে, অতএব ঈশ্বরের নিত্যত্ব থাকে কি রূপে?

গুঃ। ঈশ্বর নির্গুণ। নির্গুণ বলিবার তাৎপর্য্য এই;—কোন একটী বস্তুর প্রকাশ ভাবকে গুণ কহে। মহত্তত্ত্ব হইতে জগতের যাবতীয় বস্তুকে বিজ্ঞানে বিচার করিলে গুণান্বিত দেখা যায়। সেই হেতু গুণ সকল স্বতঃই প্রকাশ রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরে যদি ঐ রূপ কোন প্রকার গুণ থাকিত, তাহা হইলে সেই গুণের ক্রিয়া জগতে প্রকাশ হইতই হইত। জীবাত্মা হইতে ভূত জগৎ পর্য্যন্ত যত কিছু দেখা যায়, সকলেই গুণ আছে অর্থাৎ প্রকাশ ক্ষমতা আছে; কিন্তু ঈশ্বরে নাই। চন্দ্রের গুণ হিম জ্যোতিঃ। পূর্ণিমায় কোন গৃহাভ্যন্তরে থাকিলেও সকলেই চন্দ্রকে ঐ জ্যোতিঃ অনুসারে অনুভব করিতে পারে এবং স্বতঃ দেখিতে পারে; কারণ গুণ মাত্রেই ইন্দ্রিয়ের ও তেজের গোচর হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর সেইরূপ কোন গুণান্বিত হইতেন, তাহা হইলে গুণের প্রকাশ দেখিয়া লোকে সেই নিয়ন্তার নিকট যাইতে পারিত। এই জন্য বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরকে নির্গুণ কহে।

শিঃ। ঈশ্বর যদি নির্গুণ হইলেন, তবে তাঁহার জগৎ কার্য্য কি প্রকারে প্রকাশিত হইবে?

গুঃ। "ঈশ্বর আপনার স্থিতি, সর্গ ও নিরোধাত্মক ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য মায়াস্থিত সত্ব, রজঃ, ও তমো নামক গুণকর্তৃক গৃহীত হয়েন"।

যখন জগৎ চৈতন্যময়, তখন ঈশ্বর যে চৈতন্যময়, তাহার আর সন্দেহ নাই। জগৎ যখন প্রকাশ হইতেছে আর নিরোধ হইতেছে, তখন ঈশ্বরে যে ঐ সকল শক্তি আছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে ঈশ্বর আছেন; প্রমাণিত হইল; প্রকাশ ও অপ্রকাশ বা নিরোধ নামক দুইটী কার্য্যও প্রমাণিত হইল, আর স্বভাবে স্থিত এবং ঐ জগৎ যে কোন একটী বস্তু তাহাও প্রমাণিত হইল। এই স্থানে সাংখ্যমতে—ঈশ্বর, জগতের উপাদানরূপী বস্তু এবং তাঁহার

স্থিতি, নিরোধ ও সর্গ (সৃজন) এই তিনটী কার্য্য প্রমাণিত হইল। কোন একটী কার্য্য প্রকাশিত হইলে,তাহার নিমিত্ত কারণ তন্মধ্য হইতে প্রমাণিত হয়। যখন কার্য্য হইয়াছে, তখন ইচ্ছা ভিন্ন কার্য্য হয় নাই। ইচ্ছাই নিমিত্ত কারণ।

এই কয়টী সূক্ষ্ম বিচার করিলে, ঈশ্বর, চৈতন্য, বস্তু তাহার দুইটী কার্য্য ও ইচ্ছা; এই ছয়টী মূল ফল লাভ হয়। কার্য্য দেখিলেই বিজ্ঞানে তাহার কারণ নির্ণীত হয়। প্রকাশ ও অপ্রকাশ এই দুই কার্য্যই এক শক্তি হইতে হইয়া থাকে। কারণ সূর্য্য আপনিই প্রকাশ হইলে সকল প্রকাশ হয়, আবার আবৃত হইলে আপনিই সকলে অপ্রকাশ হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ঈশ্বরের বাসনায় এমন একটী মাত্র শক্তির চালনা প্রমাণ হয় যে, তদ্বারা প্রকাশ ও অপ্রকাশ এই দুইটী ক্রিয়াই হইয়া থাকে। বিচার মতে ঋষিগণ ঈশ্বরের সত্তা পাইলেন, তাঁহার চৈতন্য শক্তি পাইলেন, তাঁহার প্রকাশ উপযোগী সদসদাত্মিকা শক্তি পাইলেন, তাঁহার প্রকাশক ও অপ্রকাশক ক্রিয়াময় কালনামক শক্তি পাইলেন, তাঁহার ইচ্ছাশক্তিও পাইলেন।

কোন একটী বস্তুর সত্তা থাকিলে তাহার কার্য্য প্রকাশ হয় না, কারণ গুণ না থাকিলে কি প্রকারে কার্য্যই বা প্রকাশ হইবে। প্রকাশের স্বভাবকে যখন গুণ কহে, তখন গুণ না থাকিলে সেই স্বভাব কার্য্যে কখনই পরিণত হইতে পারে না। যেমন একটী চনক দানার গুণ পুষ্টিকারক ও অঙ্কুরোৎপাদক। ঐ গুণই চনক বীজের স্বভাব। তবে স্বভাব ও গুণে যে অতি সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহা কোন উপায়ে গুণে পরিণত হয়। সেই কর্ম্মে বীজের পূর্ব্ব ভাব থাকে, আর স্বভাবে তাহা ভূত মধ্যে নিহিত থাকে এবং গুণদ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বেশ দেখা যাইতেছে যে গুণই চনকের পূর্ব্ব স্বভাব ও পূর্ব্ব কর্ম্মের প্রকাশ কর্ত্তা।

প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্ম্ম যখন ঈশ্বরের কালশক্তি এবং তাহার সজীবত্ব ধর্ম্ম যখন ঈশ্বরের চৈতন্যের, তখন ঐ দুই নিত্য বস্তুর সত্তা অপর কোন বস্তুর সহযোগেই বিকারীকৃত হইয়া গুণনামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রমাণে বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চধা নিত্যত্বকে কার্য্যপর বলিয়া নির্দ্দেশ করত জগতের প্রকাশ স্থির করিয়াছেন। এই চনকের উদাহরণে গুণদ্বারা

যখন উহারা ধর্ম্মস্বভাবের নিতান্ত প্রকাশিত হইতেছে, তখন গুণ কখন ঐ কয়টী নিত্য বস্তুর মধ্যে গণিত হইতে পারে না। কারণ যাহা নিত্য, তাহা বিকারিত বা পরস্পরে অমিলিত থাকে না।

ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি জগৎ প্রকাশ কার্য্য ইচ্ছা করিলে ঈশ্বরই জগতের উপাদানরূপা সদসদাত্মিকা শক্তিকে প্রকাশ করণের জন্য ঈশ্বরস্থ কালশক্তির মিলন করে। এই কাল সদসৎ ও ইচ্ছাশক্তিত্রয়ের মিলনে প্রধান নামে একটী মিলিত বস্তুর প্রকাশ হয়। ঐ প্রধানকে আপন শক্তি অনুসারে কার্য্য করাইতে আপনি চৈতন্য সম্মিলিত হন। এই চারি শক্তি সম্মিলিত হইলে যেরূপ শক্তি মিশ্রণ হয়, তাহাকে মায়া কহে। সদসৎ জগতের উপাদান। উহাকে লইয়া কাল প্রকাশ স্বভাব এবং চৈতন্য সজীবত্ব ও পালন স্বভাব সংযোগে মিলিত হইলেন। এই প্রকাশন্ ও পালন ক্ষমতার সহিত সদসতে সকলের সূক্ষ্ম সত্তারূপী বীজ স্বভাব রহিল।

ঐ সকল হইতে বীজের প্রকাশ ও অপ্রকাশ ক্ষমতা লাভ হওয়াতে বীজ ঐ দুইভাব আপনার শক্তি হইতে প্রকাশ করিতে পারিলেন এবং ঐ বীজের সহযোগে চৈতন্য সংযুক্ত থাকায় ঐ বীজ আপনাতে আপনার স্থিতি শক্তিও প্রকাশ করিতে পারিলেন।

ঐ বীজই মায়া। আর কাল জাত প্রকাশ অপ্রকাশ ক্ষমতা বীজে মিশ্রিত হইলে তাহাই রজঃ ও তমোগুণ এবং বীজ আপনার স্থিতি শক্তি চৈতন্য হইতে যে ক্ষমতায় লইলেন, তাহাই সত্ত্বগুণ বলিয়া বিজ্ঞানবিদেরা কহিলেন। এমতে মায়ার ত্রিগুণ প্রমাণ হইল। ঐ তিন গুণের ক্ষমতাই কাল ও চৈতন্যাকর্ষণ। যেমন একটী বীজ উর্ব্বরা ক্ষেত্রে পতিত হইলে আপনার গুণ দ্বারা আপনার পূর্ব্ব স্বভাবরূপী অদৃষ্ট আকার এবং কর্ম্ম ও তাহার পরিণাম প্রকাশ করিয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্ব সমিলনী স্থানকে উর্ব্বরা কহে। তবে বীজের তত্ত্বানুসারে নূন্যাধিক পঞ্চতত্ত্ব না মিলিত হইলে অঙ্কুর হয় না। মায়ার সক্রিয় তিন শক্তির নামই তিনটী গুণ। তমোগুণে মায়া প্রকাশ্যরূপের পরিবর্ত্তন করে; এবং জড়ভাব সম্পাদন করে। রজোগুণে মায়া আপনার স্বভাবকে প্রকাশ করে; এবং সত্ত্বগুণে কিছুকালের জন্য সেই স্বভাবকে সংরক্ষণ করে। ঈশ্বরের বাসনার ক্ষমতায় ঈশ্বরের অংশই তিনগুণে প্রবিষ্ট হইলে ঐ তিনগুণ

এমন কোন কর্ম্ম পাইবে যে তাহাতে প্রকাশ বিলয় স্থিতি সাধন করিবে।

জগৎ বলিতে বস্তু নহে। যাহা প্রকাশ হয় এবং বিলয় হইয়া স্বরূপে অবস্থান করে। প্রকাশ ও বিলয় বলিতে হইলেই কোন বস্তুর স া প্রকাশ পায়। সেই সত্তা পূর্ব্বোক্ত কোন শক্তিতে নাই। সেই সত্তাই ঈশ্বরের স্বতেজঃ। সেই স্বতেজঃ পাইয়া তাহাকে উপলক্ষ করিয়া ঐ গুণত্রয় জগৎ প্রকাশ করিতে লাগিল। ঐ স্বতেজকে আত্মা কহা যায়। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, ঈশ্বর যদিও সকলের কারণ বটে, কিন্তু তাঁহার স্বতঃ এমন শক্তি নাই যে প্রকাশিত হয়। সেই জন্য তাঁহার শক্তি সমূহ মায়াতে পারিণত হইলে তাঁহাতে যে তিনটী শক্তির প্রকাশ হয়, সেই ত্রিগুণ কর্ত্তৃক তিনি আকৃষ্ট হইয়া, আপনার স্থিতি, সর্গ, নিরোধ এই জগৎ কার্য্য করেন। অর্থাৎ সেই মায়া সংযুক্ত পুরুষকে লইয়া দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াশ্রয় গুণত্রয়, কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে আবদ্ধ করে।

শিঃ। ঈশ্বরকে মায়া সংযুক্ত পুরুষ বলিলেন কেন?

গুঃ। মায়া যাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মায়া ঈশ্বরকে আপন গর্ভে ধারণ করিয়া আপনার স্বভাব শক্তি তাঁহাতে আরোপ করিলে গর্ভস্থ ঐশিক তেজ ত্রিগুণময় হইয়া যায়। ঐ ত্রিগুণময় ঈশ্বরাংশকে মায়া-সংযুক্ত পুরুষ কহে। এইগুণ সংযুক্ত পুরুষই জীব বা আত্মা।

যেমন আপনিই সমুদ্রাংশ বায়ুর আঘাতে তরঙ্গে এবং হিম তেজের আকর্ষণে স্রোতে পরিণত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ঈশ্বরত্বে রহিলেন, অথচ তাঁহার আপনার বাসনাজাত অপরাপর শক্তি সম্মিলিত মায়া তাঁহার অংশকে লইয়া ক্রিয়াপর হইল। ঈশ্বর স্বতঃ অবস্থিত। জীব মায়ার মধ্যস্থ ঈশ্বর। ক্রিয়াপর শক্তি মণ্ডিত আপনাংশে ঈশ্বর জীব হইলেন এবং এই জীবলীলার অপরাপর কার্য্য-সম্পাদনের জন্য আপনি স্বতন্ত্র রহিলেন। ঈশ্বরই জীব হইলেন সত্য, কিন্তু মায়ার স্বভাবে যে ঈশ্বরাংশ জীবত্বে পরিণত হইল, তাহা আর আপনার প্রকাশক ও অভিন্ন ঈশ্বর দর্শন করিতে পারিল না।

শিঃ। জীব কেন ঈশ্বর দেখিতে পায় না?

গুঃ। "গুণত্রয় সংযুক্ত হইয়া লিঙ্গভাব ধারণ করাতে সকলের অলক্ষিত

গতি হইয়াছেন।" সপ্তদশ অবয়বকে লিঙ্গভাব কহে। পঞ্চতন্মাত্রা অর্থাৎ ভূতের সূক্ষ্মাংশ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধি ইহারাই সপ্তদশ অবয়ব বলিয়া বেদান্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ঈশ্বর আত্মারূপে সকল বস্তুর নিয়োজক হইয়া যখন সকলের ফল ক্রিয়া জ্ঞাত হইবার জন্য জীবরূপে পরিণত হয়েন, তখন সেই জীব সত্তা যে সূক্ষ্মাংশ সংযুক্ত মায়াতে লিপ্ত থাকিয়া আবরণ প্রকাশ করে, সেই মায়াযুক্ত সপ্তদশ সূক্ষ্মাংশ সংযুক্ত দেহকে লিঙ্গভাব কহে। মায়াতে আত্মারূপে ঈশ্বর গুণত্রয়ে সংযোজিত হইলে, মায়া অহং-ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। অহংশব্দের অর্থ সত্তা বা সজীবত্ব। ঐ অহংকার সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে বৈকারিক বা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নামে বিখ্যাত হয়। তমোগুণের সহিত যে অহংকারের মিশ্রণ, তাহাকে তামসিক অহঙ্কার কহে। এই তামসিক অহঙ্কার হইতে ভূতাংশের প্রকাশ হয়। অহঙ্কারের যে অংশ রজোগুণের সহিত মিশ্রিত হইল, তাহা রাজসিক অহঙ্কার নামে প্রকাশ হইল। এই রাজসিক অহংকার হইতে ভূতাদিতে সজীবত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে। অহঙ্কারের যে অংশ সত্ব গুণের সহিত মিশ্রিত হইল, তাহাকে সাত্বিক অহঙ্কার কহে। ঐ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয় দেবতার প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ অহঙ্কারই সত্বা বা জীবাত্মা অর্থাৎ সকলের নিয়োজন কর্ত্তা, এবং সকলের মধ্যগত থাকিয়া ফলাফল ভোগ করিতেছেন। উনিই জীব বলিয়া বিজ্ঞানে আলোচিত হয়েন। এই অহঙ্কারের সহিত ইন্দ্রিয়াদির যে সমন্বয় হইল, ইহাই লিঙ্গভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ঈশ্বরের অপরাপর সকল স্বভাব অর্থাৎ চৈতন্য কালাদি হইতে অহংরূপী সত্তাভাব ভিন্ন। জীবের স্বভাব কেবল স্বাধীন বৃত্তি বা বাসনা। জীব আপন স্বভাব বাসনাকে লইয়া অপরাপর মিশ্রিত ঐশিক শক্তির মধ্যগত হওয়াতে ঈশ্বরের সহিত এক সম্বন্ধীভূত রহিলেন মাত্র, কিন্তু জীবের ঈশ্বর দর্শনের ক্ষমতা রহিল না। কারণ জীবের স্বভাব মায়ার মধ্যগত রহিল। এই প্রমাণে ঈশ্বর পূর্ণরূপে জীবের অলক্ষ্য গতি হইয়াছেন। স্বভাবের পরিণামকে গতি কহে। জীবের কেবল বাসনা ও সত্তা স্বভাব আছে। ঈশ্বরের কাল, চৈতন্য, সত্তা প্রভৃতি পাঁচটী নিত্য স্বভাব আছে।' জীব আপন স্বভাব মতে ঈশ্বরের পূর্ণস্বভাব পাইতে পারেন না এবং অপর পদার্থের ন্যায় তাঁহাকে

দেখিতে পারেন না, তবে অপর শক্তি সমূহের সহযোগ থাকায় কেবল ঈশ্বরানুভব হয় মাত্র, এবং অপর শক্তির লয়ের সহিত আপনার লয় হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের জগৎপ্রকাশক অবস্থার মধ্যে যে ভাব জীবাবস্থায় পরিণত না হইয়া জীব-প্রকাশক ভাবে অবিস্থিত থাকে, তাহাকেই প্রকৃতি বা ব্রহ্মা কহে। এইভাবে ঈশ্বর রূপান্তরিত হইয়াছেন বলিয়া পূর্ব্ববৎ পূর্ণাংশ স্বভাব বিহনে, প্রকৃতি পূর্ণাংশস্বভাব সংযুক্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পারেন না।

শিঃ। ঈশ্বর যে সকল জীবের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, তাহা কিরূপে বুঝিব?

গুঃ। একটী মশাকে ধরিয়া সামান্য আঘাত করিলে সে আপনার যাতনাতে চীৎকার করিয়া থাকে। ঐ চীৎকার কেন করিয়া থাকে? আপনার ক্লেশের উপশমার্থে। অবশ্য কোন আশ্রয়দাতার আশ্রয় ভিন্ন ঐ ক্লেশ উপশম হইবার যো নাই। বিজ্ঞানবিদেরা বালকের রোদন এবং বাক্‌শক্তি ও জ্ঞানশক্তিহীন জীবের আত্মরক্ষণার্থ চীৎকারাদি দেখিয়া অনুভব করিয়াছেন যে, উহারা ঐ সময়ে চীৎকার ও ক্রন্দন দ্বারা অপর কোন অভয়দাতার আশ্রয় চাহিয়া আপনার অভাব ও ক্লেশ মিঠাইতে চাহিতেছে। যখন তাঁহারা উহা স্থির করিলেন, তখন দেখিলেন, বালক ও অপরাপর সমস্ত জীবাদিই পরস্পর পরস্পর হইতে শঙ্কা করিয়া থাকে; কিন্তু উহাদের মধ্যে আত্মপর অহংকারেরও সম্ভাবনা নাই, তবে কাহাকে উহারা আশ্রয়দাতা ভাবিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে? না—আপনাপন আত্মসত্তাকে। সেই আত্মসত্তাই ঈশ্বররূপে উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ জীবভাবাপন্ন আত্মসত্তাই সকল জীবের জীবত্বের হেতু হইতেছে। যখন মানব হইতে ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত আপন চৈতন্যবলে একজনের আশ্রয় চাহিয়া থাকে, তখন সেই আশ্রয়দাতা যে সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, তাহার আর সন্দেহ কি?

জ্ঞানীতে এইটী বুঝিয়া দেখিলেন যেঃ—পরস্পরের দুঃখ ও আনন্দ বোধক একটী অন্তঃকরণ বৃত্তি মানবে রহিয়াছে! সে বৃত্তিটীর দ্বারা মানবে সকল জীবভাবের দুঃখ ও আনন্দবোধ করিয়া দয়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক স্বভাবধর্ম্মে দুঃখে কাতর ও আনন্দে হৃষ্ট হইয়া জগতে জগৎকর্ত্তার সত্তা বোধ করিয়া প্রেমে মুগ্ধ হইয়া থাকে। সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তির নামই ভক্তি। বৈধর্ম্মরূপী হিংসা

দ্বেষাদি পরিত্যাগে জীবে স্বধর্ম্মানুসারে ভক্তিময় হইয়া সর্ব্বজীবে ঈশ্বরের সত্তার সহযোগে তাহাদের দুঃখে কাতর ও আনন্দে আনন্দিত হইয়া লীলাময়ের লীলাতে প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে।

শিঃ। ইহ জগতে আনন্দিত কে?

গুঃ। যাহারা মূঢ়তম, তাহারা এক প্রকার আনন্দিত এবং যাহাদের বুদ্ধি একেবারে প্রকৃতিভেদ করিয়া ঈশ্বরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহারাই সর্ব্বতোভাবে আনন্দিত বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ উভয় অবস্থার মধ্যবর্ত্তী যাহারা থাকে, তাহাদেরই সংসারাদি নানা ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে।

মূঢ়তম বলিতে সারাসার বিবেক রহিত। অর্থাৎ যাহারা কি ধর্ম্ম বন্ধন, কি সমাজ বন্ধন, কি বিষয় চিন্তা কোন প্রকার বন্ধনেই আবদ্ধ নহে। পশুদের ন্যায় জন্ম মাত্র লাভ করিয়া স্বভাবের অনুবর্ত্তী আহার নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, মৈথুনাদি স্বাভাবিক বৃত্তির চরিতার্থ করে। তাহারা এক প্রকার সুখী। কারণ তাহারা আত্মার উন্নতি বা অধোগতির ভাবনা প্রাপ্ত হয় নাই। সৎ অসৎ কর্ম্মবোধ করিতে পারে নাই। রিপু প্রভৃতিতে আক্রান্ত নহে, আশারও অনুবর্ত্তী নহে। অতএব বৃক্ষাদির ফলাদি, নদীর বারি প্রভৃতি আহার ও উপযুক্ত সময়ে রতি ত্যাগাদি করিয়া থাকে এবং ঐহিক বা পরলৌকিক কোন চিন্তাতেই চিন্তিত হয় না। যাহার চিন্তা নাই, অন্তরে যাহার ভয় নাই, তাহার সুখের অভাব কি? ইহাদের সংশয় কোন ক্রমেই উপস্থিত হইতে পারে না। যাহাদের বুদ্ধি কোন বিষয়ে পরিণত হয় নাই; তাহারা বুদ্ধির চালনায় অক্ষম। বুদ্ধি ভ্রমে পতিত হইলেই সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহাদের বুদ্ধির চালনা নাই, তাহাদের সংশয়ও নাই। আর সংশয় কাহার নাই? যাহাদের বুদ্ধি একেবারে ঈশ্বরে লীন হইয়াছে। কৃতনিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। তবে সংশয় কাহাদের হয়? না, যাহার বুদ্ধির চালনা অর্থাৎ সাধনা করিতেছে। মূঢ় জনের ন্যায় জ্ঞানপ্রভা শূন্য নহে, অথচ বিজ্ঞানময়ও নহে, এমন সাধক অবস্থায় সংশয়রূপী ক্লেশ হয়। সংশয় একটী সাধারণ ক্লেশ নয়, কারণ জানিতেছি যে ঈশ্বর জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই; কিন্তু তৎসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না, ইহাপেক্ষা আর কি কষ্ট হইতে পারে।

ইহাতে এই বুঝাইল যে, যাহারা সিদ্ধ তাহারা সুখী এবং যাহারা ঘোর মূঢ় তাহারা সুখী। সাধকেরাই সংশয়ান্বিত বুঝিতে হইবে।

জগতে যতগুলি অনাত্ম ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি সুখ দুঃখাদি দেখিতে পাওয়া যায় বা ভাগ্যে উপস্থিত হইতে দেখা যায়, সে সমস্তের জন্য ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়, কারণ তাহারা অনাত্ম ধর্ম্ম। জীব হইয়া জীব ধর্ম্মকে অর্থাৎ জ্ঞান চৈতন্যাদিকে ত্যাগ করা যায় না; এতদ্ব্যতীত সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা যায়। সেই নিয়মে ধৈর্য্য দ্বারা বিপদকে, উপদেশ দ্বারা সম্পদকে, শান্তি দ্বারা দুঃখকে, পবিত্রতার দ্বারা পাপকে এবং যোগবল দ্বারা আহারাদি পঞ্চ স্বভাবকে নাশ করিতে হয়। এই ভাবে জীবন অতিবাহিত করিলেই, জ্ঞানের জ্ঞানময় সংসার লীলা হইল বুঝিতে হইবে।

শিঃ। "দৈব কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত"—এই দৈব কি?

গুঃ। দৈব বলিতে দেবসম্বন্ধীয়। দেব বলিতে দিব অর্থাৎ স্বাভাবিক বা কৃত কর্ম্মফল সমূহ যে স্থানে থাকে, সেই স্থানসংযুক্ত শক্তিকে দেব কহে। কর্ম্মফল দ্বিবিধ; স্বাভাবিক ও কৃত। মানবে স্বাধীন বৃত্তির অনুসারে যে অবিদ্যা বা বিদ্যাগত কর্ম্ম করিয়া বাসনার সংস্কার বা মালিন্য করে, তাহাকে কৃত কর্ম্মের ফল কহে। আর প্রাকৃতিক নিয়মে গ্রহাদির আকর্ষণে বা কালমাহাত্ম্যে যে সকল অনিয়ম জীব ভাগ্যে ঘটে, তাহাকেই স্বাভাবিক কর্ম্মফল কহে। এই উভয়বিধ কর্ম্ম ফল বাসনার সহিত যে কালাংশে সংগৃহীত হয় তাহাকে দৈব কহে। সেইরূপ দৈব দ্বিবিধ; দৈব সম্ভূত ও অসুর সম্বন্ধীয়। সুকর্ম্ম ফলময় পরিণাম যাহা কালের দ্বারা জীব অদৃষ্টে সংঘটিত হয়, তাহাকে দেবসম্ভূত দৈব কহে। আর গ্রহাদির আকর্ষণ বা নৈসর্গিক পরিণাম বা জীব বৃত্তির হেতু যে কর্ম্মজাত কুফল জীবভাগ্যে প্রকাশিত হয়, তাহাকেই অসুরসম্ভূত দৈব কহে।

ঐ দৈব দুই উপায়ে জীবের ভাগ্যে ক্রিয়মান হয়। একভাবে পূর্ব্বজন্মজাত কর্ম্মমতে, আর একভাবে ইহজাত কর্ম্মমতে। এই উভয়াত্মক কর্ম্মমতে জীবাদৃষ্টে দৈব প্রকাশ হইয়া জীবকে বদ্ধ ও মুক্ত করে। এ স্থলে যে দৈবের দ্বারা জীবে বদ্ধ হয়, তাহাই উল্লেখ করা হইতেছে।

জীবে অধর্ম্মশীল হইলে তবে দুঃখ পাইয়া থাকে এবং ঈশ্বর সেই দুঃখ

নাশ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন।

এই দুঃখকে বিজ্ঞানে ক্লেশ কহে। জীবের আন্তরিক অভাবকে ক্লেশ কহে। জীব যদি আত্মস্বভাবে থাকে, তাহা হইলেই পরম আনন্দিত থাকে। সেই আনন্দ জ্ঞানশক্তির দ্বারা অন্তঃকরণে ক্রিয়মান হইলে জীব মুক্ত থাকে। দৈব অর্থাৎ জীবের দুষ্কৃতি আপনার প্রভাবে জ্ঞান নাশ করিবার জন্য বাসনার সহিত মিশ্রিত হইয়া জ্ঞানকে জড়ভাবাপন্ন করতঃ আপনি সক্রিয় হইয়া মেঘ-রূপে জ্ঞানসূর্য্যকে আবরণ করতঃ অন্তঃকরণ অধিকার করে। অন্তঃকরণের অভিপ্রায় মতে জীব কর্ম্মী। অন্তঃকরণ দুষ্কৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীবকে তাহার দাসত্ব করিতে হয়। সেই দুষ্কৃতি হইতে জীব পূর্ব্ব স্বভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একপ্রকার মহা স্বভাবে পতিত হয়। সেই অভাবটীই দুঃখ বা ক্লেশ। সেই অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বহু সাধনায় আপনাকে কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞানপর করিয়া অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করে; তাহাতেই যে আনন্দের ছায়া দেখিয়া জীব কর্ম্ম করে, সেই মহানন্দকে ক্লেশের শুভ অংশ বা সুখ কহে। আর যখন জ্ঞান একেবারে আবরিত থাকে, তাহাকে দুঃখ কহে। এই সুখ ও দুঃখ ঘাতাঘাতের জন্য জীবাত্মাকে ক্লান্ত হইয়া কখন সুখের আশ্রয়ের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়, কখন দৈবমতে মোহে পতিত হইয়া পুনরায় দুঃখে আসিতে হয়। এই সুখ ও দুঃখ উভয়ই ক্লেশ বা দুঃখমূলক। এই দুঃখ নাশ করিবার জন্য যে আনন্দশক্তি সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞান মধ্যে বিচরণ করেন, তাহাকেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ কহে। কারণ দুষ্কৃতিকে ত্যাগ করিয়া সহজেই কুদৈবকে নাশ করত লোকে মঙ্গলময় সুদৈবের অধীন হইয়া আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। ইহাই দৈব ও দুঃখের ভাব বুঝিতে হইবে।

শিঃ। পার্থিব সম্ভোগ নিত্য কি অনিত্য এবং এই সম্ভোগ হইতে আনন্দ পাওয়া যায় কি না?

গুঃ। মায়া মোহাদিকে ঈশ্বরের পার্থিব ঐশ্বর্য্য কহে। পার্থিব বলিতে অসৎ বা অনিত্য। ঐ অনিত্য ঐশ্বর্য্য পাইয়া মানবগণ একেবারে উন্মত্ত হইয়া নিত্যবস্তুরূপী হরিকে প্রত্যক্ষ করিতে বা অনুভব করিতে চাহে না। ইহার ভাব এই যে:—লোকে পার্থিব ঐশ্বর্য্যরূপী ধনমদ, কামমদ, ভোগমদরূপী

অনিত্য ভাবে আশু ফল দেখিয়া সহজে আকৃষ্ট হইয়া তাহাপেক্ষা যে কোন নিত্য আনন্দ আছে এবং সেই আনন্দের যে নিত্য সত্তা আছে, তাহা স্থির করিতে পারে না। এটী মহাযোগের কথা। সাংখ্য শাস্ত্রকার এই পার্থিব সম্ভোগকে দুঃখের কারণ কহিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদীগণ এই সকলকে কেন অনিত্য কহিয়াছেন তাহা বলিতেছি। নিত্য ও অনিত্য এক বস্তুর অন্যতর ভাব বুঝিতে হইবে। যেমন আলোক নিত্য এবং অন্ধকার ঐ নিত্য বস্তুর সত্ত্বাংশ লইয়া প্রকাশ, কিন্তু তাহাতে সত্তা মাত্র নাই। তদ্রূপ স্ত্রীসম্ভোগ, বিষয়ভোগ, স্নেহ মমতাদি এক মাত্র নিত্য আনন্দ হইতে প্রকাশ বটে, কিন্তু তাহাদের নিজ সত্তা নাই।

যাহার আশ্রয় লইয়া অনিত্যকে দূর করা যায়, তাহাই নিত্য এবং যাহাতে মুগ্ধ হইলে আর জীবের হ্রাসাধিক্য ভোগাশা থাকে না তাহাই নিত্য। লোকে সুচারু আহার করুণ, পরক্ষণেই আহারের ইচ্ছা হইবে এবং তৎসহযোগে ভোগের বৃদ্ধি হইবে। ঐ বৃদ্ধি ভাবের সহিত অন্তঃকরণ আশার পরিণাম না দেখিয়া কত দুঃখ পাইবে। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যাহার সত্তার স্থির নাই, অনুভবে ইন্দ্রিয় মুগ্ধ মাত্র হওয়াতে ইচ্ছার বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাকে নিত্য কি উপায়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল দুঃখের অতীত যে আনন্দ আছে, তাহার হ্রাসাধিক্য নাই। তাহার ছায়া মাত্র ঐ সকল সম্ভোগাদি দুঃখে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া লোকে উহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

এ সকল পরমার্থ যোগের বিষয় লিপি কৌশলে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, তবে সামান্য ভাবে বুঝাইবার জন্য বলিতেছি। যতক্ষণ জীবের চিত্তবৃত্তির স্থির না হয়, ততক্ষণ জীবে দুঃখের হ্রাস বোধ করিতে পারে না। লোকে কামিনী সম্ভোগ কেন করে? না—তাহাতে একপ্রকার অলৌকিক সুখের আবির্ভাব হয়। যদি তৎকালে চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভাব জীবে থাকে, তখন সে ঐ সুখ অনুভব করিতে পারে না। যে সুখের আশায় লোকে কামমুগ্ধ হয়, সেই চিত্তনিরোধক সুখটী আনন্দের ছায়া মাত্র। এই জন্য বিজ্ঞানবাদীরা কহেন যে আনন্দের ছায়া বলিয়া ক্ষণপরে উহার তিরোভাব হয়, কিন্তু উহা যদি নিত্যাবস্থা হইত, তাহা হইলে সমভাবে থাকিত এবং তাহাতে জীবের দুঃখ প্রকাশ হইত না।

এই সকল ভাবকেই পার্থিব ঐশ্বর্য্য কহে, এই ঐশ্বর্য্যে জীব সহজে আকৃষ্ট হইয়া তন্মধ্যগত নিত্য সত্তারূপী ঈশ্বরের উপলব্ধি করিতে পারে না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন :—ঐশিক সত্তা ঐরূপ অনিত্যের মধ্যে কেন থাকেন, এবং জীবকে কি তিনি সাবধান করিতে পারেন না? তাহার উত্তরে বিজ্ঞানীরা কহেন যে :—সকল জীবাপেক্ষা মনুষ্যে একটী স্বাধীন বৃত্তির আবির্ভাব আছে। সেইটীতে মনুষ্য স্বভাব অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে। যে ঈশ্বর করুণা সঞ্চার করিয়া মানবকে এমন স্বাধীন করিয়াছেন; তদপেক্ষা তাঁহার আর কি দেয় আছে। সেই স্বভাবের স্বাধীনতাই বিজ্ঞান-বৃত্তি, তদ্দ্বারা জীবে প্রত্যেক অবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিত্যানিত্য বোধ করিতে পারে। তবে যে সকলে পারে না, সেটী কেবল তাহাদের পূর্ব্বজন্ম-জনিত অজ্ঞানতায় বুঝিতে হইবে। এইরূপে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অনিত্যে জীবে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিতে না পারায় ভ্রান্ত হইয়া অনিত্যেই মুগ্ধ হইতেছে।

শিঃ। বৈষম্য পথ কি রূপ?

গুঃ। মানব জন্মটাই কেবল ঈশ্বরপথে ধাবিত হইবার জন্য জীবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানবশ্রেণী ভগবৎ অনুভব শূন্য হইয়া দেহকেই আত্মা ভাবিয়া ঐহিক সুখের অনুসারী হইয়া কেবলমাত্র কাম্য কর্ম্মের উন্নতি সূচক নিবৃত্তি ও কাম্যকর্ম্মের অবনতি সূচক প্রবৃত্তিতে ধাবমান হয়, তাহাদেরই পাষণ্ড কহে। ঐ পাষণ্ডগণ যে যুক্তিতে নির্ভর করিয়া আপনাদের জ্ঞানকে চরিতার্থ করে, তাহাকেই বৈষম্যপথ বলে। শমতা যাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই ধর্ম্ম মার্গকে বৈষম্যপথ কহে। এই বৈষম্য পথানুবর্ত্তীগণের মধ্যে যাহারা দেহের ও কাম্য কর্ম্মের উন্নতির জন্য লৌকিক সৎবৃত্তিতে ধাবিত হয়, শাস্ত্রে তাহাদের বৌদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ পাষণ্ড বা ভগবৎ-ভক্তিহীন কহে। যাহারা ইন্দ্রিয় সুখে নিরত হইয়া দুঃখ ও সুখকে স্বভাব জ্ঞান দ্বারা রিপু আদিতে আক্রান্ত হইয়া ভগবৎ-ভক্তিশূন্য হইয়া থাকে, তাহাদের পাপী পাষণ্ড কহে।

প্রথম শ্রেণীর বৈষম্য ধর্ম্মাবলম্বী পাষণ্ডীগণের কর্ত্তব্য অতি পরিশুদ্ধ হওয়াতে এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস হওয়াতে অদৃষ্ট অনেকাংশে পরিশুদ্ধ হইয়া জন্ম জন্মান্তরে ভগবৎ-ভক্তি লাভ করিতে পারে, এই জন্য শাস্ত্রে তাহাদিগকে পাপীদের মধ্যে পুণ্যবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পাপ হইতে বুদ্ধিকে এইরূপে শুদ্ধ প্রবৃত্তি-

পর করিবার জন্য যে নিয়ন্তা প্রকাশ হইয়াছিলেন, সেই অসীম করুণাময় ধার্ম্মিক জনের সাত্ত্বিক বৃত্তিপর দেখিয়া শাস্ত্রে তাঁহাকে ভগবানের—পাপনাশী বুদ্ধাবতার বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

এই পাপী ও বুদ্ধগণকে পাষণ্ড কহে এবং তাহাদের প্রবৃত্তিগত ধর্ম্মকে বৈধর্ম্যপথ কহে। বৈষম্য পথেও শুদ্ধাচার প্রকাশিত আছে।

শিঃ। তপ শব্দের উৎপত্তি কি রূপ?

গুঃ। ঈশ্বরের নির্গুণ স্বভাব হইতে যখন সগুণ স্বভাব প্রকাশ হইল; তখন তাঁহার সৃষ্টি তেজ কারণাবলীকে কার্য্যোন্মুখী করিতে চেষ্টা করিল। হিম ও উত্তাপই তেজ। সংশক্তিই কারণ বা কারণ-বারি। মিশ্রিত ও তরলাবস্থা প্রলয়ান্তেও বিশ্বপ্রকাশ কালে কারণ শক্তি থাকেন বলিয়া, কবিগণ ঐ অবস্থাকে বারি বা সাগর বলিয়া থাকেন। সৃষ্টিতেজ ও কারণ রহিল। সেই সৃষ্টিতেজ যাহাতে কারণকে লইয়া কার্য্যপর করিতে পারে, সেই স্বাভাবিক ক্ষমতীকেই ব্রহ্মার তপস্যা বলিয়া পুরাণে কল্পিত। চৈতন্য প্রবেশ না হইলে কার্য্য প্রকাশ হইবার যো নাই, এই জন্য কার্য্যোপযোগী হইতে সৃষ্টি শক্তির বিলম্ব হইয়াছিল। যেমন এক কটাহ দুগ্ধে উত্তাপ দিলে, উত্তাপ চৈতন্য দুগ্ধের স্নিগ্ধ চৈতন্যকে গ্রাস না করিলে উহাকে আপন বলে আনিয়া শুষ্ক স্বভাবে লইতে পারে না; তদ্রূপ সৃষ্টিশক্তি চৈতন্য মিশ্রণ বিহনে কার্য্য অভিব্যক্ত করিতে পারেন না। চৈতন্য প্রবেশ করিলে কারণ পীড়িত হইয়া পরস্পর আলোড়নে প্রথম যে শব্দ হয়, তাহাকেই কবিরা স্পর্শের ষোড়শ (ত) ও একবিংশ (প) বর্ণ সংযোগী তপ শব্দ কহেন। তপ বলিতে অন্তর্গত ভাবের তাপন। এই অন্তর্গত ভাব পীড়িত করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা বিজ্ঞানে প্রাপ্ত হইয়া মায়াময় জীব মায়াকে নাশ করিয়া সেই বিজ্ঞান জাত হইবার জন্য আপনাপন অন্তর তাপিত করিয়া বিজ্ঞান বুদ্ধি তাপিত করিয়া লয়েন। তপস্যার বিধিতে চৈতন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বুঝিতে হইবে।

শিঃ। ব্রহ্মা সেই তপ শব্দ শুনিয়া কি রূপ তপস্যা করিলেন?

গুঃ। ব্রহ্মা অখিল লোক প্রকাশক তপ করিলেন। ঐ লৌকিক তপস্বীর বেশ সাজাইবার জন্য বায়ু ও মন এবং ইন্দ্রিয় রোধ কথা কহিলেন মাত্র, সেটী প্রকৃত ভাব নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মা তপ এই শব্দে কোথাও কিছু না দেখিতে

পাইয়া, নিগুর্ণ ব্রহ্মের আদেশ ভাবিলেন। কোথাও কিছু না দেখিবার ভাব এই যে ঈশ্বরের আর কোন শক্তি তখনো প্রকাশ হয় নাই। অপর শক্তি যতক্ষণ না ব্রহ্মাতে প্রকাশ হইবে, ততক্ষণ তিনি সৃষ্টির জন্ত তাপিত হইলে পুনর্ব্বার ঈশ্বর অপর সগুণ ভাব তাঁহাতে প্রকাশ করিবেন।

শিঃ। ঈশ্বর ব্রহ্মাকে তপোরত দেখিয়া কিরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন?

গুঃ। ভগবান্ তাঁহাকে আপনার অবস্থানীয় বৈকুণ্ঠলোক দেখাইলেন। যেখানে বিকারভাব একেবারে কুণ্ঠিত হয়, তাহাকে বৈকুণ্ঠ কহে। তথায় রজঃ, তমঃ বা সত্ত্বের বিকার নাই। কালের বিক্রম নাই এবং মায়ার প্রকাশ নাই। সগুণ অবস্থাই ত্রিগুণভাবাপন্ন। কালের বিক্রমই প্রলয়। মায়া বলিতে সৃষ্টির বিধান।

সেই সকল বিকার ভাবাপন্ন বস্তু যথায় নাই এমন যে স্থান, তাহাকে বৈকুণ্ঠ কহে। সেই বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান আর নাই, তথায় ক্লেশাদি কিছুই নাই, তথায় রিপুপ্রাবল্য নাই। আত্মজ্ঞানীগণেরই সেই স্থানে বাস করিতে পারেন। এই শ্রেষ্ঠ স্থান বুঝিতে:—সগুণহীন ব্রহ্মাবস্থা বুঝিতে হইবে। রিপুপ্রাবল্য বলিতে মায়া। আত্মজ্ঞানী বলিতে তত্ত্ববেত্তা।

সেই তত্ত্ববেত্তাগণের মূর্ত্তি চতুর্ব্বাহুযুক্ত। চারিটী দিকে সমভাবে অবস্থিত হওয়ায় অর্থাৎ সমদর্শন হওনের রূপকই চতুর্ব্বাহুযুক্ত বুঝিতে হইবে। আর আর অলঙ্কারাদি ও বর্ণাদি কেবল প্রশান্ত অবস্থার চিহ্নমাত্র বুঝিতে হইবে। ইহার গূঢ়ভাব এই যে যাঁহারা ভগবানের নির্গুণাবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সমদর্শন ও ভুবনমোহন অন্তঃকরণের গঠন সম্পন্ন এবং সুরাসুর পূজিত হইয়াছেন। সুরাসুর বলিতে ইন্দ্রিয় ও রিপু। উহাদের স্বভাব হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করাকে মুক্তাবস্থা বা বৈকুণ্ঠ বাসাবস্থা কহে। এই বৈকুণ্ঠ বাসের অর্থাৎ মুক্তির যে রূপ বর্ণনা করা হইল, তাহা ইহ জীবনে হইলে জীবন্মুক্ত কহে। আর দেহান্তে ঘটিলে আত্মার ঐ ভাবাপন্ন হওন বুঝায়।

শিঃ। ব্রহ্মা সেই নির্গুণ ঈশ্বরকে কি ভাবে দেখিলেন?

গুঃ। বিদ্যা মহাবিদ্যাদি মায়ার সাত্ত্বিকী শক্তি সমূহ। ঐ শক্তি সমূহ স্বতঃ নির্গুণ ঈশ্বর হইতে সগুণময়ী হইয়া মায়া নাম ধারণ করিয়াছেন। মহাত্মা বলিতে চৈতন্যময় পুরুষ শক্তি। বিমান বলিতে আধার। আধারের সহিত

চৈতন্য পুরুষ শক্তি (যাহার দ্বারা পরে কাল চৈতন্যময় অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইবে) তাঁহারা সেই নির্গুণাবস্থায়, নিকটে আকাশ যেমন সবিদ্যুৎমেঘে শোভিত থাকে, তদ্রূপ শোভিত আছেন।

যথায় লক্ষ্মী নানাবিধ বিভূতি লইয়া সেই উরুগায়ের পাদ পূজা করিতেছেন। বহুরূপে যাঁর লীলা গীত হয়, তাঁহাকে উরুগায় কহে। সেই লীলাধারের পাদ অর্থাৎ অংশ সমূহে লক্ষ্মী অর্থাৎ মহাবিদ্যা সেবা করিতেছেন। বিদ্যারূপিণী লক্ষ্মী যিনি সরস্বতী বলিয়া প্রকাশিতা, তিনি সুস্বরে তাঁহার লীলা গান করিতেছেন। প্রকৃতির উৎপাদনই তাঁহার সেবা এবং প্রকৃতির শোভাই তাঁহার লীলাগান বুঝিতে হইবে। এই অবস্থাপন্ন নির্গুণ ব্রহ্ম ভক্তগণের আরাধ্য।

ঐ রূপ অবস্থা হইতে নানা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া ভগবান্ কাহাতেও আসক্ত না হইয়াই সেই নিজধাম যে বৈকুণ্ঠ, তথায় অবস্থান করিতেছেন। ইহার ভাবে এই বুঝা গেল, ঈশ্বর ব্রহ্মাকে সগুণ দেখাইয়া ও আপনি যে নির্গুণ-ভাবে ব্রহ্মা হইতে অতীত আছেন, ইহাই ব্রহ্মা দেখিলেন।

শিঃ। ঈশ্বর ব্রহ্মাকে কিরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন?

গুঃ। তপস্যাই ভগবানের শক্তি। বেদ মধ্যে তপস্যাকে জ্ঞানময় কহে। সেই জ্ঞানই ঐশিক শক্তিরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। উহাই ঈশ্বর বোধ করাইয়া দেয়। ঐ জ্ঞানই চৈতন্য। জ্ঞানেতে সৃষ্টি সংহার ও পালন হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্টিসংহার পালনকারিণী চৈতন্যশক্তি তাহাই স্রষ্টারূপী ব্রহ্মাকে কর্ম্মে বিমোহিত দেখিয়াছিলেন। কর্ম্ম বিমোহিত বলিতে স্বভাব বা সৃষ্টি প্রকাশ হীন। চৈতন্য না মিশিলে কর্ম্ম প্রকাশ হয় না। সেই চৈতন্যপ্রকাশই পুরাণে বিষ্ণুর তপোদান বলিয়া কল্পিত বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মণ! অনুভবসিদ্ধ ও পরম গোপনীয় ভক্তিসংযুক্ত মমবোধক জ্ঞান এবং তাহার সাধনা বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমি যে রূপী, আমি যে অবস্থাপন্ন, আমি যে ভাবে গুণ কর্ম্মাদি প্রকাশ করিয়া থাকি; আমার অনুগ্রহে তুমি সেই সমস্ত জ্ঞাত হও। হে ব্রহ্মণ! যখন স্থূল সূক্ষ্ম ও তাহাদের কারণাদি কিছুরই প্রকাশ ছিল না; তখন আমিই ছিলাম; পরে যাহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ হইল, তাহাও আমি হইতেছি; পরে যাহাতে এই বিশ্বের প্রলয় হইবে, তাহাও আমি হইতেছি জানিবে।

শিঃ। মায়া যখন লোককে ভুলাইয়া ভ্রমে পতিত করায়, তখন মায়া কিরূপে ঈশ্বরবিভূতি বা ঈশ্বরশক্তি হইতে পারে?

গুঃ। প্রকাশ যেমন সত্য বস্তু এবং তাহার অপ্রকাশই অন্ধকার; ইহাতে লোকে অন্ধকারকে যে পদার্থ বলিয়া বোধ করে, সে কেবল ঐ প্রকাশরূপী সত্য বস্তুর সত্তা থাকা প্রযুক্ত, নিজে অন্ধকারের কোন সত্তা নাই; তদ্রূপ এই জগতে সৎ বস্তুর আশ্রিত হইয়া যে মিথ্যাশক্তি সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় তাহাকেই মায়া কহে। লোকে যেমন তত্ত্ববোধ হইলে অন্ধকারকে সৎ বস্তু বলিয়া বোধ করে না অথচ প্রকাশ স্বভাব হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ সত্যতত্ত্ব না বুঝিয়া ঐ সত্যবস্তুর স্বভাব প্রকাশিত নিত্যবস্তুকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করে মাত্র। এইটী মায়া বলিয়া জানিও, এ বিচার বিজ্ঞান শোধ্য।

শিঃ। প্রকাশ হইতে মিথ্যাভূত অন্ধকার যেরূপ উৎপত্তি, মায়াও তদ্রূপ মিথ্যা। ইহাতে এই জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে আলোক তত্ত্ববোধ হইলে যেমন অন্ধকারকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়; তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রকাশ তত্ত্ব কৈ?

গুঃ। মহাভূত সমষ্টিতে যেমন জগৎ ও জীব হইয়াছে অর্থাৎ জীব ও জীবের কারণ হইয়া সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে, ঈশ্বরও তদ্রূপ সকলের মধ্যে কার্য্যরূপে এবং সকলের বাহিরে কারণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহার বৈজ্ঞানিক ভাব এইঃ—ঈশ্বরই সকলের আত্মা। সেই ঈশ্বর হইতেই পঞ্চভূতাদির বিকার হইয়াছে। ঐ পঞ্চ ভূতাদি যে সূক্ষ্মকারণ হইতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও আত্মা। সেই আত্মাই সত্য এবং ঈশ্বর, আর সকল তাঁহার বিকার বা মিথ্যা। সেই মিথ্যাটী মায়া। সেই মায়ায় লোকে মুগ্ধ হয় কি রূপ? তাহার দৃষ্টান্ত এইঃ—যেমন একটী শিশুকে দেখিয়া পিতা মাতা মুগ্ধ হয়। ঐ শিশুর হাসিতে, অঙ্গ শোভায় পিতা মাতা আনন্দিত ও ঐ শিশুর মৃত্যুতে পিতা মাতা একেবারে শোকান্বিত হয়। এই আনন্দ ও শোকই একত্রে মিশিয়া মোহনামে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। প্রথমে শিশুটীকে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উহাতে ঈশ্বর জীবরূপে আছেন এবং সেই ঈশ্বরের বিকারে উহার দেহ হইয়াছে। ঐ দেহ স্বভাবে উহা হাসিতেছে নাচিতেছে। এক্ষণে তত্ত্ববিদ্ পিতা যদি উহার জীবন রক্ষা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া লালন পালন করেন, তাহা হইলে তিনি শিশুর অনিত্যরূপে, মধুর শব্দে, স্নেহরসে, মনোহর গঠনে ভুলিবেন না, কেবল জীবটী পালন

সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ভাবিয়া, রূপাদিতে অনাসক্ত হইয়া থাকিতেন। স্নেহাদিরূপী মিথ্যাবস্তু তাঁহাকে জড়ীভূত করিতে পারিত না। কিন্তু তত্ত্ব বোধ না হইলে শিশুর জীবন রক্ষা বোধ হউক না হউক তাহার গঠনের স্নেহেই পিতা মাতা ভুলিয়া সেই গঠনের বিলয়ে ক্রন্দনে উন্মত্ত হয়। সৎরূপী আত্মার বিকারায় প্রকাশ ভুতাদি হইতে প্রকাশিত, যে অনিত্য রূপাদি তাহাতে লোকে মুগ্ধ হয় বলিয়া এস্থলে মায়ারূপী মিথ্যা বস্তু জগতে আছে প্রমাণিত হইল, এবং তাহাতে যাহারা মুগ্ধ হয়, তাহারা ভ্রমে পতিত থাকে তাহাও প্রমাণ হইল এবং ইহাতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয় যে মায়াদ্বারা লোকে মুগ্ধ হয়, কিন্তু লোকে আপন স্বভাবে তাহাতে মুগ্ধ থাকে। অতএব আত্মাই দেহের প্রধান কারণ তাহা না হইলে কিছুই সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না; সেই আত্মবোধ হইলে কাহারো মিথ্যাভূত রূপাদি সম্পন্ন সৃষ্টিতে মুগ্ধ হইতে হয় না।

শিঃ। ব্রহ্মতত্ত্বরূপী লক্ষণ কয় প্রকার?

গুঃ। দশ প্রকার যথা:—কারণ সৃষ্টিকেই বিসর্গ কহে। বৈকুণ্ঠ বিজয় বলিতে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। সেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিই জীবের পক্ষে স্থান অর্থাৎ আধার বা স্থিতি। ঈশ্বর যে চৈতন্যোদয়রূপে জীবের প্রতি কৃপা করেন, তাহাই পোষণ বা পালন। প্রত্যেক যুগান্তরে ঈশ্বর হইতে জীব যে ভাবে স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেই স্বভাবকেই ধর্ম্ম কহে। ঐ জীব ধর্ম্ম প্রকাশক কালকে মন্বন্তর কহে। অদৃষ্ট বা বাসনামতে স্বভাবের পরিণাম কে অর্থাৎ কর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি বিধানকে উতি কহে। প্রলয়কে নিরোধ কহে। মায়াত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে (নির্গুণভাবে) অবস্থানের নাম মুক্তি। এক ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ ব্যাপ্তিই আশ্রয় হইতেছে।

শিঃ। কাল দ্বারা কিরূপে লয় হয়?

গুঃ। কালদ্বারা এই জগৎ পালিত, বর্দ্ধিত ও হৃত হইয়া থাকে। সেই কাল শক্তির দ্বারা মায়া মধ্যগত সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোনামক গুণত্রয় ক্রিয়াপর হইয়া এই ভুত প্রপঞ্চের সহিত এই জীব প্রপঞ্চের কারণ প্রকাশ করে। সেই সত্ত্বগুণ দ্বারা ঐশিকচৈতন্য আকর্ষিত হইলে কাল দ্বারা তাহাই ক্ষুব্ধ হইয়া জগৎকে চৈতন্যময় করিয়া ফেলে। ক্রমে সেই সত্ত্বাংশ রজো ও তমোগুণে মিলিত হইলে সত্ত্বের পূর্ণ সত্তা লোপ হইয়া যায়। যেমন সরোবরের

মধ্যস্থলে একবার মাত্র হস্ত দিয়া জল আলোড়ন করিলে তাহা হইতে এক প্রকার গোলক তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। ক্রমে সেই তরঙ্গের গোল রেখা ক্ষুদ্র আয়তন হইতে বৃহত্ত্বে ব্যাপ্ত হইয়া সরোবরের সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া লয় হইয়া যায়। হস্তের শক্তি সরোবরের তরঙ্গ উৎপাদক জলীয়াংশ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া চক্ররেখা উৎপন্ন করে, সেইটাই তরঙ্গপক্ষে মুখ্যাংশ বুঝিতে হইবে। সেই মুখ্য অথচ ক্ষুদ্র অংশকে আশ্রয় করিয়া পেষণ ক্রমে যেমন বৃহৎ তরঙ্গরেখা উৎপন্ন হইলে, তাহাতে প্রথমোৎপন্ন মুখ্য রেখার লয় হয়, সেই লয়ের সহিত হস্তদ্বারা আলোড়িত তৎকালীন তরঙ্গ পক্ষের কারণ শক্তিরও লয় হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর কাল দ্বারা ক্ষুব্ধ সত্ত্বগুণের আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া মানব চৈতন্যে আত্মবিম্ব প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরের আবির্ভাব অবস্থা। ক্রমে সেই চৈতন্য যেমন বিজ্ঞান অবস্থা হইতে মায়ামধ্যগত হইয়া স্থূলভাবে রিপু প্রভৃতি অজ্ঞানময়ত্বে পরিণত হয়, সত্ত্বগুণেরও তৎসহযোগে লয় হয়। সত্ত্বের লয়ের সহিত তৎপ্রকাশক কারণশক্তি স্বরূপ ঐশিক আবির্ভাবরূপী বিজ্ঞান চৈতন্যেরও লয় হইয়া থাকে। এ সমস্ত কালকৃত গুণ বুঝিতে হইবে।

কাল দ্বারা জগতের অভাব প্রতিক্ষণেই পূরণ হইতেছে। সেই পূরণাংশ জগৎ পক্ষে মহাকারণাংশ হইতে কাল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই পুরাণে কহে যে যখন ধর্ম্মাংশ ক্রমে স্থূল হইয়া অধর্ম্মময় হইয়া যায়, তখন মানব চৈতন্য একেবারে হীনদীপ্তিমান হইয়া যায়। সেই সময়ে কালই আবার সূক্ষ্ম কারণ প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় ঈশ্বরের সত্তাকে আকর্ষণ করত কারণ মধ্যগত করিয়া থাকে। ঐ কারণই সত্ত্বগুণ:—ঈশ্বরের সত্তাই পরমাত্মা বা বিজ্ঞান চৈতন্য।

শিঃ। জীব দেহের কয় প্রকার অবস্থা?

গুঃ। তিন প্রকার যথা:—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক। জীবকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু জীবের তিনটী অবস্থা প্রত্যক্ষ হওয়াতে তিনি যে অলক্ষিতভাবে বর্ত্তমান আছেন, তাহার প্রমাণ হয়। এই দেহের তিনটী অবস্থায় একটী সর্ব্বকর্ত্তা প্রমাণ হয়। সেই কর্ত্তার সকল কর্ম্মে মক্তি

হয়, তাহাতেই চক্ষু কর্ণাদি হস্তপদাদি ক্রিয়মাণ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সেইটীই আধ্যাত্মিক অবস্থা। ঐ চক্ষু কর্ণাদিকে ক্রিয়মাণ করিতেও বিভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব বিচারে পাওয়া যায়; কারণ জীবন সত্বেও অনেকে পঙ্গু, কাণ ইত্যাদি হইয়া থাকে। ঐ শক্তির অস্তিত্বের নাম আধিদৈবিকাংশ। পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃতাংশ ও শক্তি অংশ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত অর্থাৎ বিভিন্নভাবে ক্রিয়মাণ যে অংশের সাহায্যে প্রকাশ পায়, তাহাই আধিভৌতিক অর্থাৎ ভূত সম্মিলনাংশ বুঝিতে হইবে। এই তিনটী অবস্থাই সেই একমাত্র জীবের উপাধি। অর্থাৎ যে পরম জ্যোতির দ্বারা ঐ তিনটী দৈহিক ভাব সজীব হইয়া দেহরূপে বর্ত্তমান হয়,তাহাকেই জীব কহে।

শিঃ। ঐ তিনটী স্বভাব যখন ভিন্ন চৈতন্যাংশ হইতে প্রকাশ, তখন উহার মধ্যে জীব বলিয়া কোন বস্তু থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

গুঃ। যদি ঐ তিনটী অবস্থা স্ব স্ব স্বভাবে এই দেহ যাত্রা করিত, তাহা হইলে একের অভাবে অপরের প্রকাশ কেন লোপ হইবে? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি যদি থাকে, কিন্তু ভৌতিক দেহ না থাকে, তবে দেহের গঠন অসম্ভব; আর ইন্দ্রির শক্তিও ভৌতিকদেহে থাকিলেও, যদি শবাকার দেহ হয়, পরম জ্যোতিঃরূপী জীব না থাকে, তবে উহাদের প্রকাশ কৈ হয়, ইহাতে স্থির প্রমাণ যে জীবরূপী ভোক্তা আছে। আর সেই ভোক্তা পরমাত্মার আশ্রয়ে আশ্রিত। সেই পরমাত্মা অনুভব করিতে হইলে ঐ তিন অবস্থা যে অবস্থা হইতে প্রকাশ হইয়াছে সেই অবস্থার ভাবনা করিতে হয়; তাহাই পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতি প্রভৃতিতে কহে।

শিঃ। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই তিন ভাব ও এই জগৎ এবং জীব কিরূপে সেই ঈশ্বর হইতে প্রকাশ হইয়াছে?

গুঃ। সেই বিরাট্ পুরুষ যখন কারণাণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন, তখন তিনি স্বয়ং আপনার আধারস্থান ইচ্ছা করিয়া পরিশুদ্ধ অপ্ সৃজন করিলেন। কারণাণ্ড বলিতে পঞ্চভূত সূক্ষ্মাংশ, অহংকারাংশ, ও মহত্ত্বাংশ এই সপ্তাবরণ বেষ্টিত কারণময় জগৎ, তাহাতে যেমন ঈশ্বর সগুণভাবে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন ঐ কারণাংশ কার্য্যতে পরিণত হইতে সকলে মিলিত হইয়া গেল। সেই মিলিত অংশকে অপ বা তত্ত্ব কহে। ইনিই সর্ব্বপ্রবিষ্ট আত্মা। ভূতমধ্যে

ভূতাত্মা, জীবমধ্যে জীবাত্মা, এবং মহত্তত্ত্বের মধ্যে কারণাত্মা নামে ত্রিপদ বিষ্ণু বা সহস্র মস্তক হস্ত পদবান্ বলিয়া পুরাণে ও বিজ্ঞানে কল্পিত।

সেই ভগবান্ যখন আমি বহু হইব বলিয়া যোগশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তিনি নিজ হিরণ্ময় বীর্য্যকে মায়ার দ্বারা তিনভাগে বিভাগ করিলেন। সেই ত্রিধা বীর্য্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক নামে বিখ্যাত। হিরণ্ময় বীর্য্য বলিতে কারণময় তত্ত্ব। মায়া বলিতে এস্থলে বাসনা শক্তি। আমি বহু হইব এই বাসনারূপী মায়ার দ্বারা ঈশ্বর কারণতত্ত্বকে ত্রিধা করিলেন। ঐ ত্রিধাই আধ্যাত্মিকাদি নামে কথিত।

কারণ-মধ্যগত ঈশ্বরের শরীরে যে আকাশ ছিল; তন্মধ্যে ঈশ্বর কার্য্য ব্যাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে ওজঃ, সহঃ, বল প্রকাশ হইল; এবং উহাদের সূত্রাত্মা প্রাণের প্রকাশ হইল। "আকাশ বলিতে ব্যবধান"। কোন ব্যবধান না প্রকাশ করিলে কার্য্য কি উপায়ে হইতে পারে। ঐ শূন্য নামক ব্যবধান তাঁহার শরীর মধ্যস্থ বলা হইয়াছে। ঐ ব্যবধানে কার্য্যশক্তি ও তন্নিয়োজক শক্তি প্রকাশ হইল। ঐ তিনটী কার্য্য শক্তির মধ্যে ওজঃ হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, ইনিই আধিদৈবিক। সহঃ হইতে মন শক্তি; ইনিই আধ্যাত্মিক। বল হইতে দেহশক্তি অর্থাৎ ভূত-সংলগ্নশক্তি, ইনিই আধি-ভৌতিক নামে কল্পিত। ঐ ত্রিশক্তি সংযোজক ও করণক একটী সূক্ষ্মতম প্রধান শক্তি আছে, তাহাকে প্রাণ কহে। এই প্রাণই জীবশক্তি। ইহাতে জীব ও জীবের উপাধিরূপী ত্রিভাব প্রমাণ হইল বুঝিতে হইবে।

সকল জন্তুতেই অর্থাৎ জীবদেহেতেই প্রাণ চেষ্টাযুক্ত হইলেই ইন্দ্রিয়াদি চেষ্টাযুক্ত হয় এবং প্রভুগণের অনুবর্ত্তী যেমন ভৃত্যগণ, তদ্রূপ প্রাণ চেষ্টাহীন হইলে ইন্দ্রিয়াদিও চেষ্টাহীন হইয়া থাকে।

শিঃ। জীবদেহে ইন্দ্রিয়াদি কিরূপে আবির্ভাব হইল?

গুঃ। প্রাণ অন্তরে চালিত হইলেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রকাশ, এবং সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের পানীয় পান ও আহারীয় আহারার্থে প্রথমে মুখের আবির্ভাব হয়।

সেই মুখ হইতে তালুর প্রকাশ হয়। রসনা নামক ইন্দ্রিয় তথায় উৎ-পাদিত হয়; সেই তালুতে নানাবিধ রসের উৎপত্তি জিহ্বার বোধ হইয়া থাকে।

জীব কথা কহিতে ইচ্ছা হইলে মুখ মধ্যে অগ্নি প্রকাশ হয়, সেই তেজ হইতে বাক্য প্রকাশ হয়। ঐ তেজ ভালু প্রকাশ্য রসে চিরকালই নিরুদ্ধ থাকিয়া প্রকাশ পায়।

জীব বায়ু চালন করিতে ইচ্ছা করিলে নাসিকা নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়, তিনি আঘ্রাণ করিতে ইচ্ছা করিলে বায়ুই তথায় গন্ধ বহন করে।

জীব যখন প্রকাশ শূন্য আপনার দেহকে প্রকাশ রূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন উভয় চক্ষের প্রকাশ হয়। তাহার মধ্যে যে জ্যোতিশক্তি আছে, তাহাই সর্ব্ব রূপের আকার গ্রহণ করে।

আত্মার ঋষিগণকৃত শব্দ (বেদ) বোধ করিতে ইচ্ছা হইলে কর্ণ প্রকাশ হয়। তাহাতে দিগ্‌বোধক শ্রোত্রশক্তি আবির্ভূত হইয়া শব্দ বেদে গ্রহণ করিয়া থাকে।

কোন বস্তুর মৃদুত্ব, কাঠিন্য, লঘুত্ব ও গুরুত্ব এবং উষ্ণ শীতলতা অনুভব করিবার জন্য জীবের অঙ্গে ত্বকের প্রকাশ হয়। সেই ত্বকে লোম সমূহ থাকে এবং তাহার অন্তরে ও বাহিরে বায়ু ব্যাপ্ত থাকায় বায়ুর স্পর্শ গুণত্ব প্রাপ্ত হয়।

জীবের নানা কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হইলে হস্ত নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়; তাহাতে আদান প্রদানাদির আশ্রয়ীভূত বল নামক শক্তি অবস্থান করে।

সেই জীব অভিষ্ট কামনা পরিপূরণার্থে গতির ইচ্ছা করিলে পাদ অংশ প্রকাশ হয়। সেই পদে স্বয়ং হরি অর্থাৎ যজ্ঞশক্তি বর্ত্তমান থাকেন। তদ্দ্বারা মনুষ্যগণে যজ্ঞাদি কর্ম্ম আহরণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। এই পদ ইন্দ্রিয় প্রকাশক ভাবটী কিঞ্চিৎ গূঢ়, তজ্জন্য ব্যাখ্যার আবশ্যক। জীব আপন বাসনার দ্বারা ভোগযন্ত্ররূপী ইন্দ্রিয়াদি আপন ইচ্ছাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ইন্দ্রিয়াদিই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিভাবে প্রতি জীবদেহে প্রকাশিত আছে। যখন জীব অভিষ্ট কামনার গতি ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ইষ্টস্থানে গমন বা ব্রহ্ম সন্দর্শন সমস্তই সেই গতি নামক গমনরূপিণী আকর্ষণী শক্তির দ্বারা হইয়া থাকে। এই গতিই যোগমার্গে অলক্ষ্যভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে। এই গতির দ্বারা ব্রহ্মগতি লাভ করাইবার জন্য যজ্ঞরূপী ব্রহ্মসাধন কর্ম্মের সাধন সমগ্র আহরণ করিয়া থাকেন। এই গতি জীব

বাসনার মধ্যে ব্রহ্মপথ ধাবিত হয় বলিয়া বিষ্ণু যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিরূপে ইহাতে অবস্থিত আছেন। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াদিতে অপরাপর শক্তি আছে।

সেইজীব; অপত্য উৎপাদন আনন্দানুভব এবং স্বর্গাদি লাভ বাসনা করিলে শিশ্ন প্রকাশ হয়। তন্মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ জনিত সুখ ও পূর্ব্বোক্ত অপত্যাদির প্রকাশক উপস্থ নামক শক্তির প্রকাশ হয়।

শরীরগত অসারাংশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে জীবের গুদেন্দ্রিয় প্রকাশ হয়। তাহাতে পায়ুশক্তি প্রকাশ হয়। ঐ গুদ ও পায়ুর অধিষ্ঠাতা শক্তি স্বরূপ মিত্র শক্তি তথায় অবস্থান করে।

সেই জীবের দেহান্তর গমনের সুবিধার জন্য নাভিদ্বারে অপান শক্তির প্রকাশ আছে, তাহা হইতে এক দেহ সম্বন্ধ হইতে সম্বন্ধ পৃথক্‌কারী মৃত্যুর প্রকাশ হইয়া থাকে।

সেই জীবের অন্নপানাদি কার্য্যের জন্য কুক্ষি ও তন্মধ্যগত অন্ত্র এবং নাড়ির প্রকাশ হয়। নদী ও সমুদ্রেই তাহাদের শক্তি এবং উহাদের দ্বারা তুষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। উদরের আধার স্থানকে কুক্ষি কহে। আহারাদি গৃহীত যে যন্ত্রের দ্বারা হয়, তাহাকে অন্ত্র কহে এবং পানাদি যে যন্ত্র দ্বারা গৃহীত হয় তাহাকে নাড়ী কহে। নদী বলিতে স্রোতময়ী শক্তি। সাগর বলিতে অসীম রস শক্তি। অন্নাদিতে স্রোতের প্রয়োজন হয়, এই জন্য অন্ত্রের শক্তিকে বিজ্ঞানে নদী কহে। এবং অসীম রসপানীয় দ্বারা আহৃত হয় এইজন্য নাড়ীর শক্তিকে সাগর কহে। উদর চেষ্টা পূরণ হইলেই তুষ্টি হয়। রসের পবিত্র পরিণামকে পুষ্টি কহে।

মায়াযুক্ত আত্মার অর্থাৎ জীবের চিন্তা করিতে হইলে হৃদয় প্রকাশ হয়; তথায় মনরূপী যন্ত্রশক্তির প্রকাশ হয় এবং সংকল্পাত্মক কামনাই তথাকার অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে।

ত্বক্, চর্ম্ম (সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবের ভেদমাত্র), মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি; এই সপ্ত ধাতু, ভূমি, জল ও তেজোময় হইতেছে; আর প্রাণ শক্তিটী ব্যোম, বায়ু ও বারিময় হইতেছে। অর্থাৎ দেহের সপ্তধাতু, এবং প্রাণ সমস্তই পঞ্চভূতময় হইতেছে।

ইন্দ্রিয় সমূহও গুণ সমূহের অধীন হইতেছে, গুণ সমূহও ভূতাদি হইতে প্রকাশ। (গুণ বলিতে শব্দাদি পঞ্চ মাত্রা) ভূত সমূহ অহংকার হইতে প্রকাশ হইয়াছে। এই সকলের অর্থাৎ অহংকারের বিকারেই মন ও বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে মনই সকল বিকারের সূক্ষ্মতম স্বরূপ আর বুদ্ধিই ভূতাদি তত্ত্ব বোধক বিজ্ঞানরূপিণী হইতেছে; এই জন্য সকলের সূক্ষ্মাবস্থা মন এবং বুদ্ধি। মনের দ্বারা স্থূল অনুভব করা যায় এবং বুদ্ধি দ্বারা তাহার বিচার করা যায়।

এই যে মহী হইতে পঞ্চভূত, অহংকার, মহতত্ত্ব এবং প্রধান এই অষ্ট আবরণ; ইহাই ভগবানের স্থূলরূপ হইতেছে।

স্থূল দেহের কারণ স্বরূপ যে সেই সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহা অব্যক্ত; বর্ণ আকারাদি হীন; উৎপত্তি স্থিতি হীন; নিত্য এবং বাক্য মনে অগোচর হইতেছে।

আমি যে তোমাকে ভগবানের উভয় রূপের কথা বলিলাম, ইহারাও মায়ার দ্বারা কল্পিত অর্থাৎ মায়া সহযোগে প্রকাশিত করে, মায়া ত্যাগ করিলে ঈশ্বর উপলব্ধি হওয়া দুরূহ। এই জন্য পণ্ডিতগণ উহাদের নিত্য বা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

শিঃ। এই জীবের মধ্যে কেহ দ্বিপদ, কেহ চতুষ্পদ এবং তাহারা ভিন্নভাব ধারণ করে কেন?

গুঃ। মায়ার দ্বারা ঈশ্বর আপনাতে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবের আবির্ভাব করিলেন। ঈশ্বরেচ্ছার রূপান্তরই মায়া; ঐ মায়াতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রকাশ হয়। ঈশ্বর ঐ তিন উপাদান তিন গুণের আকর্ষণে মায়া হইতে পাইয়া তাহাতে সংলিপ্ত হইলে তাহাদের ঈশ্বর মিলনে যে প্রকার পরিণত হইল, সেই পরিণতির বিভিন্নতাই কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব নামে বিজ্ঞানে বিখ্যাত হইল।

মায়া জাত গুণ হইতে জীব, আবরণ সূচক ছয়টী দ্রব্য পাইলেন। ক্রিয়া প্রকাশরূপী জ্ঞান পাইলেন এবং আপনার বাসনা পালনের জন্য ক্রিয়ারূপী ইন্দ্রিয় পাইলেন। কোন্ ভাবে সেই জীব অবস্থিত হন বা কোন্ ভাবেই দ্রব্যাদির পরিণতি হয়, ইহা আলোচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানে বুঝিয়া দেখিলে জীবের সহিত আরও তিনটী নিত্য ঐশিক শক্তি জীবের স্বভাবে মিশ্রিত রহি-

য়াছে দেখা যায়। ঐ তিনটীর মধ্যে একটীতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে ক্রিয়াপর করিয়া মিশ্রিত করিতেছে। তাহাই কাল নামে অবস্থিত, তদ্দ্বারা বর্দ্ধন হ্রাস ইত্যাদি প্রকাশ হয়। অপরটী অদৃষ্টভাব। অদৃষ্ট বলিতে ঈশ্বরের রূপগ্রাহিণী তেজ। ঐ তেজই বাসনাকে বশীভূত করিয়া রাখে। ঐ অদৃষ্টকে কর্ম্ম কহে। সেই অদৃষ্টবশতঃ কোন জীব গো, কোন জীব মনুষ্যদেহ বা ছাগরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। তৃতীয় নিত্য তেজটীকে স্বভাব কহে। ইহা দ্বারা জীবের বাসনার পরিণতি হয়। অশ্বের স্বভাবে অশ্বের বাসনা চালিত হয়। মনুষ্যের স্বভাবে মনুষ্য বাসনা চালিত হয়। ঐ অদৃষ্ট বা কর্ম্মদ্বারা জীব নামে মায়ী ঈশ্বর নানাভাবে রূপান্তরিত হইলেন। কাল দ্বারা গুণের ক্ষোভণে সেই রূপ প্রকাশ হইল, এবং স্বভাবে জীবের বাসনাকে অদৃষ্টানুসারে পরিচালিত করিল। ইহাতেই মনুষ্য-মধ্যগত আত্মা এবং গো-মধ্যগত আত্মা এত ভিন্ন ভাব ধারণ করে।

শিঃ। ঈশ্বরের স্বকর্ম্মক অবস্থা কাহাকে বলে ?

গুঃ। পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের স্বকর্ম্মক অবস্থাকেই ভাল বলেন। ঈশ্বরই ব্রহ্মাদিরূপ ধারণ করিয়া প্রাণিগণের রূপ-গুণ-কর্ম্মাদি বিবেচনায় বাচক বা নির্দ্দেশভাবে নাম ও বাচ্য বা বোধক ভাবে রূপ কর্ম্মাদি সৃজন করিয়াছেন মাত্র। তিনি মায়াতে পতিত হইয়া সকর্ম্মক (জীবাদি) হইয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি অকর্ম্মক ও পরমেশ্বর হইতেছেন।

(সেই ভগবান্ গুণ রূপাদি ভেদে বাচ্য বাচক বিবেচনায় নিম্নলিখিত সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন) সেই ভগবান্-প্রজাপতি, মনু, দেব, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, গুহ্যক, কিন্নর, অপ্সর, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, মনুষ্য, মাতৃগণ, রক্ষ, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু বৃক্ষ, গিরি সরীসৃপ প্রভৃতিকে বাচ্য বাচক ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন দ্বিবিধ (স্থাবর জঙ্গম) ও চতুর্ব্বিধ (জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ) জল স্থলআকাশবাসী জীবগণকেও তিনি ঐ বাচ্য বাচক ভাবে সৃজন করিয়াছেন।

শিঃ। জীব জন্ম মধ্যে শ্রেষ্ঠ জন্ম কাহাকে বলা যায় ?

গুঃ। যাহার আজীবন সংকল্পই মঙ্গলময়, তাহাকেই সাধু কহে। যে কেহ জীব বলিতে জরায়ুজাদি সকলেই। জন্ম বলিতে মায়া মধ্যগত হওন। মায়া মধ্যগত হইয়া যে শক্তি ঈশ্বরনিষ্ঠ থাকে, অর্থাৎ কাম্য বর্জ্জিত হইয়া কারণনিষ্ঠ হয়; তাহাদেরই জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম। ঈশ্বরানুগত সাধনা ভিন্ন জীবের আর কোন শক্তিই ঈশ্বরের ভাবোদ্দীপন করিতে পারে না। সেই সাধনাটী কেবল মানবে আছে, এই জন্য উক্ত মানবের জন্মকে শ্রেষ্ঠ জন্ম বলা যায়। কারণ ঐ অবস্থায় তাহারা ভগবানের লীলা সমুদায় অনুভব করিয়া ঈশ্বরপর হইয়া থাকে, অতএব দুঃখ ও সুখের অধিকারী না হইয়া জ্ঞানের অধিকারী হয়।

শিঃ। জীবগণের কর্ম্মগতি কয় প্রকার?

গুঃ। ঐ জীবগণের মধ্যে কুশল, অকুশল ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মগতি বর্ত্তমান আছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমো এই ত্রিগুণ হইতেই ঐ ত্রিবিধ গতি লাভ করিয়া কেহ সত্ত্বাধিক্যে দেবতা স্বরূপ হয়, কেহ রজোগুণাধিক্যে মনুষ্য হয়, (ইহারাই মিশ্র বা মধ্যমাবস্থায়) কেহ বা তমোগুণাধিক্যে নারকী অর্থাৎ তির্য্যকাদি যোনিগত হইয়া অকুশল (মধ্যম) অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে।

ঐ উত্তম অধম ও মধ্যম জীবগণের মধ্যে প্রত্যেকেতেই ত্রিবিধ গতি বর্ত্তমান আছে, তাহারা অপরের স্বভাব লইয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

সেই জগদীশ্বর ব্রহ্মাদি রূপে পূর্ব্বভাবে তির্য্যক দেবতাদি সৃজন করিয়া ধর্ম্মরূপে তাহাদের পালন করিতেছেন। এবং রুদ্রভাবে কালাগ্নি দ্বারা আপনা হইতে উদ্ভূত এই জগৎকে অনিল যেমন মেঘাবলীকে উড়াইয়া দেয়, তদ্রূপ সংহার করিবেন।

যে ভাবে ঈশ্বরকে সগুণভাবে বর্ণনা করা হইল; পণ্ডিতগণে কেবল এই ভাবে ঈশ্বরকে দেখেন না। (কারণ মায়া পরিত্যাগ করিলে) সেই ভগবান এই জগতের জন্মাদি কর্ম্মে আবদ্ধ থাকেন না। মায়ার সংযোগ জন্যই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব পণ্ডিতগণে প্রমাণ করেন। সেটী কেবল তাঁহাকে অকর্ম্মা জানাইতে, কারণ মায়া ত্যাগে তাঁহার যখন কর্ম্ম অসম্ভব, তখন তিনি বিশুদ্ধ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় হইতেছেন।

শিঃ। ঈশ্বরের সৃষ্টি এমন যে সংসার তাহা কষ্টের স্থান হয় কেন?

গুঃ। পৃথিবী বলিতে সংসার। জীবাত্মার স্বরূপ লীলার্থ ক্রিয়া ভূমিকে

সংসার কহে। ভূমি বলিতে ভূতগত আধার—মৃত্তিকা নহে। ধর্ম্মাক্রান্ত সংসার হইলে জীব স্বচ্ছন্দে আত্মলীলা করিয়া সংসারকে পালন করেন। উহাতে অধর্ম্ম প্রচার হইলে জীব নিয়তই অধর্ম্ম প্লাবনে প্লাবিত হইয়া দুঃখাক্রান্ত হইয়া থাকে। ঐ দুঃখে ও রিপুতেজে ভৌতিক, মানসিক সকল প্রকার তত্ত্বের ক্লেশ হয়; তাহাতে জীবের লীলাকরণ কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। অতএব জীবের লীলা লইয়াই সংসারের স্থিতি। তাহার হ্রাস বা বিপরীত ভাব উপস্থিত হইলে সংসারও কষ্টের স্থান হইয়া উঠে।

শিঃ। সংসার জড় কি চৈতন্যময়; উহাতে অধর্ম্ম বা ধর্ম্ম প্রকাশ কে করে?

গুঃ। প্রাকৃতিক মানব লীলার্থ, সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহের সমাবেশকে সংসার কহে। প্রাকৃতিক তত্ত্ব সমূহ চৈতন্যের সমাবেশ মতে এক এক ভাগে বৃক্ষ ও জীব জাতিকে উৎপন্ন করে। যে উপায়ে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সে উপায়ে জীব উৎপন্ন হয় না। জীব যে উপায়ে উৎপন্ন হয়, বৃক্ষাদি সে উপায়ে উৎপন্ন হয় না। ঐ বৃক্ষাদি আবার বিভিন্ন জাতিমতে যাহারা যে স্বভাবাপন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির হিমোষ্ণত্ব, উর্ব্বর মরুত্ব হেতু এক জাতি বৃক্ষ অপর জাতির উৎপাদন স্থানে জন্মাইতে পারে না।

সেইরূপ মানবগণ যে প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম চৈতন্যাংশকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাকেই সংসার কহে। ঈশ্বরের কাল শক্তিই জীবত্ব ও জগতত্ত্ব প্রকাশ করেন। মানব পক্ষে কালই প্রকাশ ও পালন কর্ত্তা হইতেছেন। ঐ চৈতন্যাংশ মহাব্রহ্মাণ্ড গত চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও ভূতাদির সত্ত্বায় পালিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। কালমতে যখন ঐ গ্রহাদির গতির ও তদ্গত তেজের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তৎসহ সংসারেরও তেজের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ হ্রাস ও পূর্ণ বা বৃদ্ধিভাব দ্বারাই এই সংসার ক্রিয়াপর হইতেছে। ঐ হ্রাস ভাব দ্বারা চৈতন্যগত জ্ঞানাদির হ্রাস হয়; জ্ঞানাদির হ্রাসে জীবপক্ষে অজ্ঞান বাসনাকে পাপময় করে, সেই পাপ বাসনাই সকল জীবকে পাপপর করতঃ জগতে অধর্ম্ম বিস্তার করে। ঐ হ্রাস বৃদ্ধির রূপকই কালের পক্ষে যুগান্তর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিই ঐ পূর্ণাংশের হ্রাস ও পূর্ণভাব জ্ঞাপক কালমান হইতেছে। ঐ হ্রাসাবস্থায় মানবের জন্যই শাস্ত্রবিধি, ঈশ্বরনির্দ্দেশ প্রভৃতি লৌকিক

ও অলৌকিক ক্রিয়ায় স্থির হইয়াছে। ঐ কালের হ্রাসভাবে অধর্ম্মের অর্থাৎ অজ্ঞানাদির আধিক্য হওয়ায় সংসারের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়, তাহাতেই জীবগত গুণ সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জীবকে নিস্তার করণার্থ জীবের সত্তার আকর্ষণ করে। এই প্রাকৃতিক নিয়মেই ঈশ্বর যুগধর্ম্ম মতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শিঃ। অধর্ম্ম ও ধর্ম্মে প্রভেদ কি?

গুঃ। ধর্ম্মচির নিত্যত্ব দেখাইয়া জীবকে শান্ত রাখিয়া ভোগ অপবর্গ সাধনে তৎপর হয়। ছায়ার দ্বারা যেমন সূর্য্য আচ্ছাদিত ক্ষণেকের জন্য হয়; অধর্ম্মও তদ্রূপ জীবের জ্ঞানসূর্য্যকে আচ্ছাদন মাত্র রাখিয়া আপনি জীবহৃদয়ে কর্ত্তৃত্ব করে; কাল সহকারে যখন ঐ সূর্য্যরূপী জ্ঞানাগ্নি জীবের হৃদয়ে সুখ দুঃখ হিল্লোলমতে প্রকাশ পায়, তখন অধর্ম্মছায়া অন্তর্হিত হইয়া যায়। অধর্ম্ম আপনা হইতেই আপনি নাশ প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্ম আপনা হইতেই ঈশ্বরত্ব জগতে প্রকাশ করে। এইজন্য অনিত্য বাচক অধর্ম্মকে যে জীব আশ্রয় করে, কাল সহকারে সংসারে তাহার বিনাশ সাধন হইয়া থাকে।

শিঃ। জীবদেহে কি উপায়ে অধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকে বিনাশে উদ্যত হয়?

গুঃ। জীব কর্ম্মফল ভোগী। কর্ম্মফলই মনোরাজ্যের শোভা। রাজ্য বলিতে প্রকৃতভাবে দেহরাজ্য বা প্রজ্ঞা বুদ্ধি জীবের মনোরাজ্য। ধর্ম্ম দুই প্রকার,—শিক্ষিত ও স্বভাবজ। ঈশ্বর হইতে অদৃষ্ট লাভ করিয়া সকল জীবই স্বভাবজ কর্ম্ম করিয়া আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মনোরাজ্যের বিচারে ঐ স্বাভাবিক কর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি বিবেচনায় যে বিকারী স্বভাব প্রতি জীবে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই শিক্ষিত কার্য্য কহে। এই উভয়াত্মক কর্ম্ম হইতে বাসনা যে অনুরাগ মণ্ডিত হইয়া সংসারে ক্রিয়া করে, সেই অনুরাগকে কর্ম্মফল কহে। ঐ অনুরাগটী প্রকৃত স্বভাব ও শিক্ষিত স্বভাব হইতে উদ্ভূত হইয়া নূতন সজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া প্রথমে চিত্তকে আক্রমণ করে, পরে বুদ্ধিকে আক্রমণ করে, পরে আমিত্বরূপী অহংকারকে গ্রাস করে, পরে মনকে অধিকার করিয়া জীবকে আত্মবশে আনয়ন করতঃ পাপময় করিয়া ফেলে।

শিঃ। জীবের মতি যখন অধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তখন তাহাকে ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া উচিত কি না ?

গুঃ। তখন তাহাকে ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া বৃথা। কারণ অধর্ম্মমতি জীবকে একেবারে আচ্ছন্ন করাতে ধর্ম্মভাব তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। ক্রমে ধর্ম্মভাব তাড়িত হইয়া প্রস্থান করে; যাইবার কালে আসন্ন বিপদ্ পাতের চিহ্ন জানাইয়া যায়। কারণ জীব ভোক্তা মাত্র। হৃদয়ে সুখ বা দুঃখ যে কোন অবস্থার প্রকাশ হোক না, জীব ভোগ করেন মাত্র, কাহাতেও আসক্ত নহেন। কিন্তু হৃদয়ের অধীন। হৃদয় বলিতে মন। হৃদয় অর্থাৎ মন যতই কলুষিত হউক না কেন, উহা সত্ত্বগুণাত্মক বলিয়া উহার উত্তম সাধন বোধক বুদ্ধি নাশ হয় না। কিন্তু মন অধর্ম্মাক্রান্ত বিধায়ে বুদ্ধির সে অবস্থায় কোন ক্ষমতা থাকে না।

শিঃ। ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি জীবকে পাপাক্রান্ত দেখিয়া, পাপাংশ হইতে নির্গমন পূর্ব্বক কোথায় অবস্থান করেন ?

গুঃ। মনের উত্তমাধম বোধক ক্রিয়া চৈতন্যকে বুদ্ধি কহে। তন্মধ্যে উত্তমকৃত নিশ্চয়াত্মক অংশকে ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি কহে। এই তেজ দ্বারা জীবের পরিত্রাণ হয়। এই তেজই জীবকে সংসার যাতনা হইতে সতত নিস্তার রাখে। মায়া এই তেজকে আক্রমণ করিতে পারে না। জীবের বাসনাই মুগ্ধ হয়। জীব তাহা ভোগ করেন মাত্র। যখন সেই বাসনা অধর্ম্মে মুগ্ধ হয়, তখন ঐ তেজ ধর্ম্মাংশে প্রস্থান করেন।

যেমন মেঘ হইতে বারি রাশি প্রকাশ হইয়া সরিৎ, সরোবর, জলাশয়, প্রভৃতিতে পরিণত হয়; পরে বর্ষা নাশ হইলে উত্তাপের সহযোগে পুনরায় ঐ বারি মেঘে পরিণত হয়; তদ্রূপ সংসারের সর্ব্বত্রই বুদ্ধির তেজ মনোরাজ্যের সহিত বিচরণ করে। ঘটাদি গৃহীত জলাংশবৎ জীবের দেহ ভোগের সহিত উহা খণ্ডে খণ্ডে জীবের ভোগগৃহে জীবের প্রয়োজন মতে প্রবেশ করে; আবার জীব উহা ব্যবহার না করিলে উহা মহা মনোরাজ্যে প্রবেশ করে। যেমন রাজসিক অহংকার জাত ইন্দ্রিয়াদি এবং তামসিক অহংকার জাত ভূতাদি জগদ্ব্যাপ্ত থাকিয়া প্রত্যেক জীবের ভোগ গৃহে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তেমনি সাত্ত্বিক অহংকার জাত মনোরাজ্যও এই বিশ্বে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই

সাত্বিকী মনোরাজ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান। এই কথা বেদাদিতে সর্ব্বত্রই বিখ্যাত। ঐ মনোরাজ্যে ভগবান্ আত্মবোধক হইয়া চৈতন্যময়রূপে অবস্থান করিতেছেন ; ঐ মনোরাজ্যই জীবের চৈতন্য দাতা ভোগও প্রদাতা বুঝিতে হইবে। প্রকৃত মনোরাজ্যে পাপের লেশ নাই, তথায় জীবের শান্তিগৃহ, শান্তিময় বিশ্রাম স্থান, বিহারস্থান (কুঞ্জ) পুণ্যময় কর্ম্ম বাসনা বিরাজ করিতেছে, সর্ব্বদাই একমাত্র ঈশ্বরের পরম করুণাময় অস্তিত্ব শোভিত রহিয়াছে। এমন মনোহর স্থানে ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি প্রবেশ করিলেন। এই অবস্থাকেই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা কহে।

শিঃ। অসতের উৎপত্তি কেন হয় ?

গুঃ। কোন একটী বস্তুর পূর্ণভাব প্রকাশ হইলেই তাহার হ্রাস ভাব তৎসঙ্গেই প্রকাশ পায়। আলোক ছিল, তাই অন্ধকারের প্রকাশ আছে। উষ্ণত্ব ছিল, তাই হিমত্ব প্রকাশ আছে। তদ্রূপ ঈশ্বরের অনুভব সত্তারূপী ধর্ম্ম আছে, সেই জন্যই তাহার অসৎ স্বরূপ অধর্ম্ম রহিয়াছে। এই যে অসৎ ভাবোৎপাদন ইহা মানবের পূর্ব্ব স্বভাবের প্রকাশ মাত্র বুঝিতে হইবে। মনুষ্য চৈতন্যময় যোনি বুঝিতে হইবে। যে জীবভাব পশ্বাদি হইতে সমাগত হইয়া কর্ম্ম ফলে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার স্বভাব পূর্ব্ব জন্মগত কর্ম্মানুসারে পশু ভাবেই থাকিতে ইচ্ছা করে। ঐ মনুষ্য হইয়া পশুভাবে আগমনই বিধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। অতএব মানব পক্ষে ধর্ম্মের লোপ হেতু অধর্ম্মের প্রকাশ হইয়া থাকে। এজন্য অধর্ম্মের প্রকৃত সত্তা নাই বুঝিতে হইবে।

শিঃ। যোনি কাহাকে বলে ?

গুঃ। এমন স্থান বা আকর যথায় দুই বা ততোধিক সৎপদার্থ মিলিত হইয়া কার্য্যত্ব প্রকাশ করে তাহাকে যোনি কহে।

নানাবিধ ধর্ম্মপন্থা যে স্থানে বা আশ্রয়ে মিশ্রিত হইয়া জগতে জীবের পরিত্রাণ কার্য্য প্রকাশ হয়, তাহাকে বা সেই আশ্রয় স্থানকে ধর্ম্মযোনি কহে। সেই ধর্ম্মযোনি কে ? না—ভগবান্ জনার্দ্দন। জন্ অর্থাৎ অবিদ্যাজাত অধর্ম্ম প্রাবল্যকে যিনি হ্রাস বা নাশ করেন ; তিনিই জনার্দ্দন।

শিঃ। কি জন্য মনুষ্য পশুত্ব লাভ করিয়া থাকে ?

গুঃ। এস্থলে মনই জীবের রাজা। মনের মোহাগারই সংসার। জনন

ভূমিকে পৃথিবী কহে। অজ্ঞান জনিত রিপুগণই মনের প্রবল সেনা। মন কেন পাপী হয়?—না—"উহা ত্রিমদে উন্মত্ত", বিদ্যামদ, ধনমদ, এবং আত্মার ভরণাদি মদ, এই ত্রিবিধমদ দ্বারা মনুষ্য পশুত্ব লাভ করিয়া থাকে। অহং-কারাত্মক বিদ্যাকে বিদ্যামদ কহে, অর্থাৎ শিক্ষায় পরম তত্ত্ব ভুলিয়া নাস্তিক ভাবাবলম্বন করে। বিষয়াকৃষ্টাবস্থাকে ধনমদ কহে। আমার আমার বলিয়া অযথা বিলাপকে আত্মীয় ভরণমদ কহে। এই ত্রিবিধ মদই অধর্ম্মের কারণ। বিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন যে:—যে জীবাত্মা পশুযোনি হইতে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়, সে মনুষত্বে পশুত্ব অপেক্ষা আপাততঃ উন্নত কতকগুলি অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায। হয়তো তাহাকে পশুত্বে নিতান্ত অজ্ঞান থাকিতে হইয়াছিল, মনুষ্যত্বে কিছু অশুদ্ধ জ্ঞানালোকরূপী অশুদ্ধ বিদ্যা পাইয়া ভুলিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব জানিতে বিরত হইতে হইল। হয়তো তাহাকে পূর্ব্ব জন্মে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইতে হইত, ধনোপায় দ্বারা সেই আপাততঃ শান্তি পাইয়া তদপেক্ষা নিত্যের সত্তাকে ভুলিতে হইল। হয়তো তাহাকে একা থাকিয়া বিহার করিতে হইত, মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় ছিল না, মনুষ্যত্বে আত্মীয়াদি পাইয়া সে দুঃখ দূর হইল ভাবিয়া তাহাকেই প্রধান ভাবিতে হইল। বিজ্ঞানবাদীরা কহেন যে অন্তরে যদি অভাব জ্ঞাপক কোন শক্তি জীবের সহিত না থাকিবে, তবে কেন দরিদ্র কিছু ধন পাইলে আপাততঃ সন্তুষ্ট হইবে। ক্ষুধিতে ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে, কামী কাম শান্ত করিতে কেন চেষ্টা করিবে; এমন কি লতা বল্লীই বা কেন আপন আশ্রয়রূপী সহকার অন্বেষণে রত হইবে। সেই অভাব দ্বারাই জীবে কেহ অসারে মুগ্ধ হয় এবং কেহ সারে সারময় হইয়া থাকে। সেই অভাবটী পূর্ণাবস্থার তিরোভাব মাত্র। অর্থাৎ জীবাত্মা কি চায়? সেই পূর্ণতারূপী ঈশ্বরের সত্তাই প্রার্থনা করে। সেই সত্তার তিরো-ভাবই অভাবরূপে জীব বাসনায় থাকাতে তাহা সচেতন ভাবে পালিত হইতেছে। ঐ তিরোভাবটী যদি না থাকিত তাহা হইলে জড় ও চৈতন্যে কিছু প্রভেদ থাকিত না। এবং ঈশ্বরের নিজ যোগে জীব ও কর্ম্মরূপে লীলা হইত না।

ঈশ্বর জীবকে মনুষ্যত্বে আনিয়া তাহাতে আপনার তিরোভাব অবস্থায় আবির্ভাব করেন, তাহাতে পরা পরাঙ্মুখী হইলেই মানবে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সেই আবির্ভাব সংযোগই মোক্ষ।

শিঃ। মনুষ্য ব্যতীত অপর জীবের তিরোভাব জনিত কষ্ট কেন হয় না?

গুঃ। পরং ব্রহ্ম নির্গুণ এবং অজ হইতেছেন, তাঁহার লীলার্থেই এই জরায়ুজ স্বেদজাদি জীব ভাব ব্রহ্মাণ্ডে রহিয়াছে। মনুষ্য ব্যতীত প্রত্যেক জীব ভাবেই তাঁহার তিরোভাব হেতু যে অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাই ভ্রান্তিরূপে সকল জীবকে আচ্ছন্ন করে। মনুষ্য ব্যতীত অপর জীব ভাবে আপন তিরোভাবেরই ঈশ্বরের ইচ্ছা, সে জন্য উহাদের তিরোভাব জনিত কষ্ট হয় না। কেবল এক অভাব শক্তির দ্বারা পরস্পর উন্নতি জ্ঞাপক শক্তি মাত্র তাহারা লাভ করিয়া থাকে। জীবত্ব ক্রমে মনুষ্যত্বে পরিণত হইলে ঈশ্বর ইহাতে স্বরূপে আবির্ভাব হইয়া জীবের পূর্ব্বোক্ত অভাব মোচন করেন। অর্থাৎ আপন লীলার শান্তি করেন।

শিঃ। দেহ বিনাশে কি আত্মার বিনাশ হয়?

গুঃ। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে গুণধর্ম্ম তাঁহার সগুণত্ব প্রকাশ করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিলে ঐ সগুণ ভাবরূপী পরমাত্মা আত্মমায়ারূপী কল্পনার মধ্যে আত্মবিম্ব দিয়া পদার্থগত আত্মা নাম ধারণ করিলেন। সেই আত্মার প্রভাবেই সকল জীব প্রকাশ হইয়াছে। ঐ জীবাংশ ব্রহ্মাংশ হওয়াতে উহা চিরনির্লেপ। কামনা উহাকে যেরূপে রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে, উহা তাহাতেই রঞ্জিত হইতেছে। ঐ রঞ্জিত অবস্থায় জীবাত্মার সত্তার হীনত্ব উপস্থিত হওয়াতে উহার সত্বরূপী আত্মা পুনরায় উহার সংস্কার করিয়া ব্রহ্মের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন। আত্মার সত্তা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মা পর্য্যন্ত অবিনাশী, উহাদের তেজক্রমে জড়ভূত ইহ জগৎ হইয়াছে। উহাদের বিনাশ হইলে ক্ষণে ক্ষণে জগতের বিনাশ হইত।

শিঃ। ঈশ্বর সকল শুভ ফল দাতা তাহা কিরূপে বুঝিব?

গুঃ। কর্ম্মের দ্বারা জীব পরিণামে যে ভাব লাভ করেন, তাহাকে ফল কহে। সেইভাব দ্বিবিধ। শুভ ও অশুভ। জীবাত্মা প্রসন্ন হইলে সেই ফলকে শুভ ফল কহে। জীবাত্মা অপ্রসন্ন হইলে তাহাকে অশুভ ফল কহে। শুভ হইতে সুখের উৎপত্তি এবং অশুভ হইতে অসুখ বা দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ শুভ ফলের দাতা ঈশ্বর; অশুভ ফলের দাতা মোহ বা মায়াজাত স্বভাব। কারণ সেই ঈশ্বর হইতেই জীব স্বভাব বিহিত কর্ম্মের প্রকাশ ইহাই

প্রসিদ্ধ। ভাব স্বভাব বলিতে (ভগবানের স্বভাব)। শ্রীধর স্বামী ভাব শব্দে মহদাদি ও ব্রহ্মনিষ্ঠা এই দুইটী অর্থ দিয়াছেন। বিজ্ঞানে কহে যাহার মিলনে; বা যাহা হইতে কোন স্বভাবের প্রকাশ হয়, সেই তাহার কর্ত্তা বা দাতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মনিষ্ঠগণ ব্রহ্মকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া যে সকল কার্য্য জগতে প্রকাশ করেন, সে সমস্তই সত্য ও শম দমাদি শ্রেষ্ঠ গুণ বা ফলরূপে জগতে বর্ত্তমান। এই জন্য ব্রহ্ম এ স্থানে শমাদি সদগুণের প্রকাশক হইলেন। মহদাদি অবস্থাকে স্বর্গ কহে। ঐ অবস্থা সমূহ ঈশ্বর হইতে বিকারিত হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বর স্বর্গাদির দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ বলিতে বৈদিক বিজ্ঞানে স্থিরীকৃত। ইহাতেই ঈশ্বর শুভ ফলের দাতা প্রমাণ হইলেন।

শিঃ। জীবের মৃত্যু হইলে শুভাশুভ ফল ভোগ করে কে?

গুঃ। অজ পুরুষরূপী যে আত্মা, তাহাই স্বধাতু অর্থাৎ ভূতাদি (আত্মা হইতে স্থূলরূপী ভূতাদির প্রকাশ বলিয়া ভূতাদিকে ব্রহ্ম আত্মার ধাতু কহিলেন) সংযোগে দেহ নির্ম্মাণ করে। কালে এই অহংকার সংপর্কীয় দেহ নাশ হইলে দেহকর্ত্তা আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত শূন্যরূপে বর্ত্তমান থাকে। সেই কর্ত্তাই জন্ম মৃত্যু রহিত ও সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট। তিনিই, ফলভোগ কর্ত্তা হইতেছেন। ইহাতে বৈদিক বিজ্ঞানবিদেরা বাসনার শুদ্ধে উত্তম জন্ম ও অশুদ্ধে অধম জন্ম স্থির করিয়াছেন।

শিঃ। মানবমাত্রেই কি বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী?

গুঃ। সত্ব, রজঃ, তমোগুণী মানবের মধ্যে সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কেহ কেহ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার চৈতন্য প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্তির অভিলাষী হয়। কেহ বা জ্ঞানাহরণের চেষ্টামাত্র করিয়া থাকে। কেহ বা কেবল কর্ম্মপর হইয়া থাকে।

মুক্তি বা স্বর্গাভিলাষী মানব শ্রেণীকে সত্বগুণী কহে। জ্ঞান আহরণার্থ উদ্যোগী মানব শ্রেণীকে রজোগুণী কহে। আর কেবল কর্ম্মপর মানবগণকে তমোগুণী কহে। এই ত্রিবিধ মানব শ্রেণীই বৈদিক কর্ম্মের অধিকারী এবং বেদ ইহাদের জন্যই শাস্ত্র জ্ঞান প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই ত্রিবিধ জাতির মধ্যে সকলেরই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে। তাহারা সেই ক্ষমতা পাইয়াও ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতগত ও সর্ব্বদুঃখহরণ

কর্ত্তা বলিয়া আপনাদিগের হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে পান না; তাহার কারণ এই :—সাগর মধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে যেমন মীনগণ স্বজাতীয় কোন মীন বলিয়া ভাবে; তদ্রূপ কাল মাহাত্ম্যে ঐ ত্রিজাতীয় মানবগণ তাঁহাকে আপনাদের আত্মা অর্থাৎ জনন কর্ত্তা বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ যে সংসার পীড়া-জাত দুঃখ দূর করিবার জন্য সকলের সমীপে রহিয়াছেন তাহা জানিতে পারে না।

শিঃ। বাসনাকে কি জন্য পরিশুদ্ধ করিতে হয় এবং বাসনাকে পরিশুদ্ধ করিবার উপায় কি ?

গুঃ। দৈব কর্ত্তৃক যাহাদের মতি নষ্ট ও ইন্দ্রিয়াদি বিমুখ হয়, তাহারা ঈশ্বর জ্ঞান পথে ধাবিত হয় না। মায়াযুক্ত বা কর্ম্মফলযুক্ত কালের সক্রিয় অবস্থাকে দৈব কহে। ঐ দৈব কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকল অবস্থার জীবেতেই প্রকাশিত হইয়া স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। দৈবের দ্বারা বাসনা জীবকে কর্ম্ম পথে ধাবিত করে। জ্ঞানদ্বারা বাসনা জীবকে কর্ম্মবোধ করাইয়া বিজ্ঞান পথে ধাবিত করে। জ্ঞানটীকে প্রকাশ করিতে হইলেও বাসনার পরিশুদ্ধি চাই। বাসনাকে পরিশুদ্ধ করিলে কর্ম্মকে পরিশুদ্ধ করা চাই। যেমন একজন শোকযুক্ত হইলে তাহাতে মোহাদির আধিক্য যত প্রকাশ হইবে ততই সেই অনিত্য বস্তুতে আসক্তির জন্য শোকান্বিত জীবের স্মৃতি ও ও মন ভ্রম ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উন্মত্ত বা বিকল্প অবস্থা ধারণ করে। ইহাতে ইহা বুঝাইল যে :—লোকের কর্ম্মের ফল দ্বারা মন আপ্লুত হইয়া মোহাদির মিলনে বাসনার তেজ একেবারে অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। বাসনার চালনাতেই ইন্দ্রিয়াদি চালিত। বাসনা শোকে জড় হইল বলিয়া কর্ম্মশক্তি-রূপী ইন্দ্রিয় বিকলভাব ধারণ করিয়া জীবকে পীড়া দিতে লাগিল।

কিন্তু যদি ঐ শোকযুক্ত জীবের বাসনাকে শোকদ্বারা মুগ্ধ না করিয়া জ্ঞান-জ্যোতিঃ দ্বারা শুদ্ধ করা যাইত তাহা হইলে বাসনা পরিশুদ্ধ হইত, মোহনাশে বাসনা জ্ঞানময় হইয়া শোককে মিথ্যা ভাবিয়া ইন্দ্রিয়শক্তি সকলকে জ্ঞান পথে ধাবিত করিত। তাঁহাতে আত্মার দুঃখ কোন মতেই হইত না।

এক্ষণে কালদ্বারা সংগৃহীত মায়াগত প্রলোভন অর্থাৎ সংসারার্থ শক্তির অনেক ছিদ্র রহিয়াছে, বাসনা সেই ছিদ্র সমূহের মধ্যে এমন ফল সমূহের দ্বারা

যদি আকৃষ্ট হয় যে, যাহার দ্বারা মতি নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ সেই মতির সংযোগে বাসনা কলুষিত হয় এবং জীব সেই বাসনামত কার্য্যে দুঃখ বোধ করে। সেই মতিময় হইলে আর জ্ঞান প্রকাশ হয় না। জ্ঞান প্রকাশ না হওয়াতে সেই কলুষিত বাসনার দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মন চালিত হইয়া বিমুখী হয় অর্থাৎ ঈশ্বর পথে বা বিজ্ঞান চর্চ্চাতে বা জীবের উন্নতির বিষয়ে ধাবিত হয় না। ঐ অবস্থায় বাসনা কোন কার্য্যে ইন্দ্রিয়াদিকে রত করে? না, বাসনা প্রথমতঃ সুখের আশা করিয়া কামের বা রতিক্রিয়া ও রিপুর আধিক্য সেবায় রত হয়। ঐ উভয় অবস্থাতেই লেশ মাত্র সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা বহ্নিতে কর্পূর স্থিতির ন্যায় ক্ষণমাত্র স্থায়ী, অর্থাৎ লব-প্রমাণ সময়স্থায়ী। সেই লবমাত্র সামান্য সুখের আশায় মোহিত হইয়া বাসনামতে ইন্দ্রিয়শক্তির আচ্ছাদনে জীব দীন অর্থাৎ দুঃখিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শক্তিহীনে পীড়ায় ও নানা বিপদে জীব কাতর হয়।

মন সংকল্পহীন কখনই নহেন। এই অবস্থায় মন লোভেতে পতিত হয়। অর্থাৎ ক্রমাগত বিপদে পতিত হইতে হইতে বাসনা স্বার্থের বশবর্ত্তী হয়। লোভের সংকল্প ব্যতীত স্বার্থ প্রকাশ হয় না; সেইজন্য মনের সংকল্পটী লোভে অভিভূত থাকে। লোভ এমনি ভাব যে উহা একভাবে থাকে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই হ্রাস বর্দ্ধনাত্মক অবস্থার জন্য উহা মনকে সর্ব্বদা ব্যস্ত করে। সেই অশান্তির জন্য সহজেই মন অকুশল অবস্থায় থাকিয়া ভ্রমাচ্ছন্ন সর্ব্বদা থাকে।

এইরূপ ঘটনার দ্বারা বুঝাযায় যে বাসনা ও বাসনাকে চালিত করিবার জন্য কোন উপাদান সমন্বিত শক্তি আছে। উপাদানকেই কর্ম্মমতি কহে। কালই কর্ম্মমতি লইয়া বাসনাকে সক্রিয় করতঃ জীবকে সকর্ম্মক করিয়া ফেলেন বুঝিতে হইবে। কর্ম্মমতিটী মায়াধর্ম্ম। বিস্ময় অর্থাৎ নব সমাগম বা নব স্বভাব দর্শন ও শিক্ষা মতে বিস্ময় হইতেই মতি প্রকাশ হয়। সেই মতিকে লইয়া বাসনা ইন্দ্রিয়কার্য্য করায়। মতি বা কর্ম্মফল পরিশুদ্ধ হইলে তবে বাসনা পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য ঋষিগণে জ্ঞান দ্বারা জীবকে শিক্ষিত করিয়া বাসনাকে পরিশুদ্ধ করিতে কহিয়াছেন। (শিক্ষাটী দাসত্ব করিবার জন্য নহে। এটী ঈশ্বর পথে পহুঁছাইবার দ্বার স্বরূপ।)

শিঃ। জীব সাধর্ম্মের অতিক্রম করিলে কিরূপ অবস্থায় পতিত হয়?

গুঃ। জীব সাধর্ম্মের অতিক্রম করিলে ত্রিবিধ পীড়ার দ্বারা সতত পীড়িত হইয়া থাকে। ঐজন্য ধর্ম্মটী ত্রিবিধরূপে পরিপূর্ণ। ভগবান্ কপীলদেব জীবের ঐজন্য ধর্ম্মজনিত ত্রিবিধ দুঃখ নাশ করিবার জন্যই বিজ্ঞান ধর্ম্মকে বা ঈশ্বরের জ্ঞানকে ও জীবের শান্তির উপায়কে উপদেশরূপ সংখ্যশাস্ত্রে প্রণয়ন করিয়া জগতে পরিত্রাণের উপায় করিয়া গিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ স্বাভাবিক পীড়া কলুষিত বাসনাময় জীবকে আক্রমণ করিয়া ভ্রান্ত করিয়াছে। আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যে স্বভাব ধর্ম্ম প্রকাশ হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক স্বভাব কহে। যে পীড়া উহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক পীড়া কহে। দৈবকে অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে সকল পীড়া প্রকাশ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক পীড়া কহে। ভূত সমূহের চৈতন্য সংশ্রব হেতু যে স্বাভাবিক রিপুগত পীড়া প্রকাশ হয়, তাহাকে আধিভৌতিক পীড়া কহে। ঐ ত্রিবিধ পীড়ার মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা, ও বায়ু পিত্ত কফাদির বৈলক্ষণ্য আত্মাসম্বন্ধীয় স্বাভাবিক পীড়া। শৈত্য গ্রীষ্ম বর্ষা, অতিব্যাতা ইত্যাদি ঋতুগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তনাত্মক পীড়াকে দৈব সম্বন্ধীয় পীড়া কহে। কামশক্তি, ক্রোধোন্মত্ততা প্রভৃতিকে ভূত সংশ্রব সম্বন্ধীয় পীড়া কহে।

ক্ষুধা তৃষ্ণাদিকে পীড়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যথাঃ—স্বাভাবিক বল আহরণার্থে শরীর মাত্র হইতে যে অভাব প্রকাশ হয়, তন্মধ্যে আহারীয়ার্থ আশাংক ক্ষুধা কহে। পানীয়ার্থ আশাকে তৃষ্ণা কহে। ঐ আহারীয় ও পানীয় অভাব বোধক তেজ দ্বারা শরীর যন্ত্র সতত পীড়িত হইয়া থাকে। ঐ পীড়াকে শান্ত করিবার জন্যই জ্ঞানময় জীবে নানা উপায় অবধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ মন্দকর্ম্ম বা শুভকর্ম্ম করিয়া বাসনাকে শুভাশুভময় করিয়া থাকে। এস্থলে মন্দমতি মানবগণের উদাহরণ দেখান হইতেছে বলিয়া বলা যাইতেছে যেঃ—এ সংসারে ক্ষুধা তৃষ্ণা, বায়ু পিত্তাদির ও শীত গ্রীষ্মাদি কাম ক্রোধাদিরূপী স্বাভাবিক পীড়াদ্বারা জীবকে সতত আক্রান্ত থাকিতে হইতেছে। এই স্বাভাবিক পীড়ার অতীতে আরো দুঃখ কর্ম্মমতে ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব এই সকল দুঃখ হইতে যখন সাংসারিক কোন উপায় দ্বারা শান্তিলাভ

হয় না দেখা যাইতেছে তখন শান্তির উপায় কি? না একমাত্র সেই তত্ত্ব-জ্ঞানময় ভক্তিযুক্ত ঈশ্বর বোধ করণ।

যে সকল জ্ঞানময় জীবে জ্ঞান স্বভাবে জ্ঞান পাইয়া তত্ত্বজ্ঞানময় না হয়, তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ঐসকল স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক পীড়ায় পীড়িত হইতে হয়।

কারণ মায়াগত পাড়ার শান্তি করিতে না পারিলে কোন মতেই বাসনা পরিশুদ্ধি হইবে না। বাসনার শুদ্ধি না হইলে ইন্দ্রিয়াদি সৎপথে ধাবিত হইবে না। মনেন্দ্রিয়াদি সৎপথগামী না হইলে কোন ক্রমেই জীবের দুঃখ নাশ হইবে না। অতএব এক ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত জীবের দুঃখ নাশ অনিবার্য্য বলিতে হইবে।

শিঃ। লোক কেন সংসার দুঃখ ভোগ করে?

গুঃ। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মায়াটী এমন একটী তেজ যে যদ্দ্বারা বাসনা কর্ম্মী হইয়া থাকে। বাসনা কি দেখিয়া কর্ম্ম করিবে? এটী বলিবার তাৎপর্য্য এই যেঃ—দেহস্থ সকল অংশই আপনাপন স্বভাবে কার্য্য করে। সেই স্বভাবকেই সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি কহে। সেই ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহ বাসনার দ্বারা চালিত হয়। বাসনা মায়া বা বিস্ময় দ্বারা স্বভাব সূত্রে চালিত হইয়া থাকে। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া দেহের কার্য্য করিয়া থাকে।

এক্ষণে এই যে কয়েকটী ইন্দ্রিয় বাসনাদির চালনাদির কথা কহিলাম, এ সকলের তেজচৈতন্য এবং যাহার স্বভাবে সকলে কর্ম্মময় হইবে সেই স্বভাবকে কর্ম্মবীজ কহে। এবং জীবাত্মাই সকলের সত্তা অর্থাৎ সংগ্রহ কর্ত্তা বুঝিতে হইবে। জীবাত্মা থাকাতে কর্ম্মবীজ যেরূপ হইবে, বাসনা সেই পথে ধাবিত হইবে, ইন্দ্রিয়াদি সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিবে। জীবাত্মার স্বভাবকে চৈতন্য কহে। ঐ চৈতন্য ও জীবাত্মা ব্যতীত যে কর্ম্মবীজ হইতে যে দেহের অস্তিত্ব দেখান হইল, তাহা কেবল মায়া নামক তেজ ও ভূতাদি নামক উপকরণ দ্বারা সৃজিত হইয়া জীবের উদ্দেশ্য সাধিত করিতেছে।

জীবের সহিত ঐ সকল ইন্দ্রিয় মন বাসনা ও কর্ম্মবীজের সংযোগীভূত অবস্থাকে সংসার কহে। ঐ সংসার সংসর্গ মতে জীবে কর্ম্মময় হইয়া স্বয়ং যে

ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ তাহা ভাবিতে পারে না। তাহা না ভাবিয়া মায়া ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া তাহার সহিত অভিমানী অর্থাৎ আমিই কর্ম্মী হইয়া পড়ে। সেই কর্ম্মী হওয়াতে তাহার জ্ঞানের প্রভাব হ্রাসবৃদ্ধি মতে সে সদসৎ শিক্ষার পথে ধাবিত হইয়া সর্ব্বদাই নানা প্রকার মায়াধর্ম্মে স্বভাবকে পরিণত করত রিপুপর হইয়া মনকে কলুষিত করে।

এই যে সংসৃতি বা সংসার, এই সংসারটী কেবল জীবের সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে; উহা মায়ার তেজেই সৃজিত হইয়াছে। জীবের সহিত উহাদের ভোগমাত্র সম্বন্ধ। অতএব উহারা মিথ্যা। সেই মিথ্যাতে আসক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে যে সকল শোক, মোহ, কাম ক্রোধাদি যন্ত্রনা জীবকে ভোগ করিতে হয় তাহা ব্যর্থ।

ঐসকল যে ব্যর্থ এ জ্ঞান কখন হইবে? না, যখন আত্মা হইতে মায়াবলে গঠিত ইন্দ্রিয় সংসৃতিকে মিথ্যাবোধ হইবে?

শিঃ। মায়াকে ঈশ্বর দ্যোতক অর্থাৎ প্রকাশক কিম্বা তিনি আছেন এই ভাবোদ্দীপনকারী কেন কহা যায়?

গুঃ। যে সংসারজননী শক্তির দ্বারা ঈশ্বরের আবির্ভাব অলক্ষিত হইয়া থাকে তাহাকে মায়া বলে। সেই মায়াকে দেবমায়া বলে। দেব শব্দের দুইটী অর্থ, একটী দ্যোতক আর একটী ঈশ্বর। কোন কোন বাদীগণ কহেন যে এই ঐশিক চৈতন্যের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষীভূত করণক একটী শক্তি আছে, তদ্দ্বারা জগতে জীবগণ সুখ ও দুঃখে বিচলিত হইয়া আনন্দের অন্বেষণ করিয়া থাকে। মায়ামধ্যগত জীব মায়াজাত মোহে থাকিয়া ঐশিক সত্তারূপী আনন্দের অন্বেষণ করিয়া সেই আনন্দপথে ধাবিত হয় বলিয়া মায়াকে ঈশ্বর দ্যোতক বা প্রকাশক কিম্বা তিনি আছেন এই ভাবোদ্দীপনকারী কহা যায়।

অপর বাদীগণ কহেন যে; ঈশ্বর আপনি জগৎ ও জীবভাবে লীলা করিবার জন্য একটী শক্তির দ্বারা আত্মভাব গোপন করিয়া থাকেন। এই শক্তিকে মায়া কহে, যেমন সারথিহীন অশ্বের গতি হয়; মায়া বশীভূত জীব ও তদ্রূপ মায়ার দ্বারা আত্মসারথিরূপী ঈশ্বরকে অপ্রত্যক্ষ করিয়া সুখ ও দুঃখরূপী অস্থির গতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিণামে পরম শান্তিময় আনন্দের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। বিরহ না হইলে মিলনের সুখ বোধ হয় না, এই জন্য ঈশ্বর জীবকে

আত্ম বিরহ দ্বারা, আমি আছি ইহা জানাইয়া মোক্ষাদিরূপী মিলনে চির সুখী করেন। ঐ মায়ার এমন উত্তম ক্ষমতা সত্ত্বে জীবে রাজস ক্ষমতায় পতিত হয়।

শিঃ। জীবে রাজস স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরকে কিভাবে ভাবনা করে?

গুঃ। রাজস স্বভাবাপন্ন হইলে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া ভাবে। সমজাতীয় হিতৈষীকে বন্ধু কহে। ঈশ্বর বিরাটভাবে এই জীব ও জগৎ সৃজন করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য স্বরূপ ইহার রক্ষণাদি করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের হিতসাধন করা, অতএব তজ্জন্য উপাসন বা কর্ম্মদ্বারা ভক্তিযোগ সহকারে বিজ্ঞান আহরণ করিবার প্রয়োজন কি? সুখী বা দুঃখী যাহাই হই না কেন, সকলি তাঁহার অভিপ্রায়; তিনি যে অবস্থায় রাখুন না কেন; আমাদের হিতসাধন করিবেনই করিবেঁন, এইরূপ বিশ্বাসের নাম রাজস স্বভাব।

ইহাতে ভক্তিশূন্য ও প্রত্যক্ষভাবের শূন্যতাহীন বশতঃ আনন্দলাভ হয় না বলিয়া বিজ্ঞানী ভক্তগণ এই অবস্থার নিন্দা করেন।

শিঃ। ঈশ্বর দ্বেষ কাহাকে বলে?

গুঃ। জীব যে ভাবে সংসারের হিতেচ্ছায় রত হয়, তাহাকে শান্তভাব কহে। তাহার বিপরীত ভাবকে অশান্ত বা অসাধুভাব কহে। জীবত্ব ঐসকল ভাবে মণ্ডিত হইয়া আত্ম সত্তাকে আবৃত করিতে চেষ্টা করে। কারণ কেহ মন্দ কর্ম্ম করিতেছে কিন্তু ঐ বিম্বভাবরূপী লুপ্ত বিবেক তাহা করণার্থ বাধা দিতেছে। রিপু বা ধর্ম্মপর জীব তাহাতে উন্মত্ত হইয়া মন্দকেই শ্রেষ্ঠ ভাবিয়াছে; অতএব বিবেকের বাধা না মানিয়া বিবেককে নাশ করতঃ জীবত্বের অহিত কার্য্যে নিরত হইতেছে। এই অসাধু ভাবই ভক্তগণের পক্ষে ঈশ্বর দ্বেষ বুঝিতে হইবে।

শিঃ। ঈশ্বরকে দয়ালু কেন বলা হয়?

গুঃ। জীব বৃত্তির ত্রিতাপ বা দুঃখ নাশ করণক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম দয়া। আত্মস্বভাব হইতে সেই শক্তি স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া জীবের ত্রিতাপ নাশ করে বলিয়া বা আত্মসাক্ষাতে ঐ ত্রিতাপ নাশ হয় বলিয়া, বৈদিক বিজ্ঞান ঈশ্বরকে দয়ালু বলেন। যিনি আত্মপর বোধহীন, সর্ব্বদাই সমভাবে সকলকে রাখেন, এবং কাহাকেও অনাদর করেন না; অধিকন্তু যিনি অসৎকে সতে আনয়ন

করেন, তাঁহাপেক্ষা আর দয়ার আধার কে হইতে পারে? অর্থাৎ তিনি পরিত্রাণ কর্ত্তা।

শিঃ। পরিত্রাণ কাহাকে কহে?

গুঃ। সংসার বলিতেঃ—যুগধর্ম্ম বৈপরিত্যে চৈতন্যের হ্রাস ভাবে দুঃখ ও সুখ দ্বারা অদৃষ্টের উন্নতি ও অবনতি যে প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা হয়; তাহাকেই সংসার কহে। দুঃখ ও সুখ দ্বারা যে উন্নতি ও অবনতি হয়, তাহা দ্বারাই জীবের উত্তমাধম জন্ম হইয়া থাকে। জীব এই পৃথিবীতে থাকিয়া দুঃখ ও সুখ হইতে অতীত হইলেই সংসার অবস্থা হইতে অতীত হইয়া আর প্রবৃত্তি-গত জন্ম লাভ করে না। আনন্দময় ভাবে থাকে। ঐ আনন্দময় অবস্থা সংসারে প্রকাশ দুর্ল্লভ, এই জন্য বিজ্ঞানবাদীরা কহেন; ঈশ্বরানন্দ যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহাদের সংসারে প্রকাশ হইতে হয় না; জীব না হইয়া সেই মুক্ত অবস্থা ঈশ্বরের ব্যাপ্তিতে অর্থাৎ আত্মাতে মিশ্রিত থাকে। যেমন সপ্ন অবস্থায় দেহের সংবন্ধ বোধ হয় না, অথচ জীব সমস্ত অনুভব করিয়া থাকে; তদ্রূপ মুক্তজনে নিজ চৈতন্য অনুভব করেন মাত্র, লীলা করেন না। ইহাকেই পরিত্রাণ কহে।

শিঃ। আত্মার দর্শন লাভ কি রূপে হইতে পারে?

গুঃ। বিজ্ঞানবাদীরা কহেন উপমান, প্রমাণ, অনুমান, ও শব্দ এই চারিটী উপায় দ্বারা এবং জহৎ, অজহৎ, জহৎ স্বার্থ ও তটস্থ এই চারিটী লক্ষণ দ্বারা একটী বিষয়কে বুদ্ধি স্থির করিতে পারে। প্রত্যেক দৃষ্ট বস্তুর এক একটী কারণ আছে, তন্মধ্যে সেই কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ঐ চারিটী ন্যায় ও চারিটী লক্ষণের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কারণ দুই প্রকার; একটী অলক্ষ্য, একটী লক্ষিত। ঐ লক্ষিত কারণকে প্রমাণাদির দ্বারা স্থির করিতে হয়। আর অলক্ষিত কারণকে উপমানাদি উপায় দ্বারা স্থির করিতে হয়। সূক্ষ্ম ও নিত্য কারণ সমূহই অলক্ষ্য। কারণ শব্দাদি পঞ্চ তত্ত্বের দ্বারা যাহা গৃহীত হইতে পারে, তাহাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হইতে পারে। পঞ্চ তত্ত্বকেও যখন স্থূল বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন তাহাপেক্ষা যে সূক্ষ্মভাব তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মন ও বুদ্ধির দ্বারাই অলক্ষিত কারণ উপলব্ধিত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর বা আত্মাই সকল সূক্ষ্ম কারণের অপেক্ষা অলক্ষিত। তাহাকে মন ও বুদ্ধি ব্যতীত অপর কোন উপায়েই দেখা যায় না। যে উপায় দ্বারা মন বাসনার নিয়মের দাস হইয়া তাহার আজ্ঞা পালন করেন, তাহাকেই মনের সংকল্পাবস্থা বা সাধনাবস্থা কহে। ঐ সাধনা দ্বিবিধা, সংকল্পাত্মক ও বিকল্পাত্মক, বিকল্পাত্মক সাধনার দ্বারা পার্থিব ইন্দ্রিয় ও রিপু গ্রাহ্য বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। উহাকে বিকল্প বলে কেন ?—না—পার্থিব ও রিপুগত বিষয় উপভোগে চিত্ত স্থির থাকে না, বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। একজনের সামান্ত ক্রোধ হইলে সে কখন সেইভাবে ক্রোধকে রাখিতে পারে না, এবং তাহাতে দেহের অনিষ্ট করে। একজনের সামান্ত ক্ষুধা পাইলে পরে তদুপযুক্ত আহারে, তাহা নিবৃত্ত হয় না, পরক্ষণেই সে অধিক খাইয়া ভোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার ভীষণ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এক জনের সামান্ত মৈথুনেচ্ছা হইলে, সে সামান্ত সম্ভোগে বিরত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর তাহার সম্ভোগেচ্ছা প্রবল হইয়া তাহাকে নানা পীড়ায় পীড়িত করে। এই প্রকার পার্থিব বিষয়ে সাধনা করিলে তাহাতে জীবের উন্নতি হয় না বলিয়া বিজ্ঞানবাদীরা কহেন, ইহা সাধনার বিপরীত ভাব অর্থাৎ বিকল্প। মন এ অবস্থায় বিপরীত পথে ধাবিত হইয়া থাকে।

সংকল্পাত্মক সাধনার দ্বারা জ্ঞান বিস্ফারিত হয়। ঐ জ্ঞান দ্বারা জীবের হিতাহিত বোধ হইয়া বিজ্ঞান ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা মানব আপনার অন্তরনিহিত পুরুষার্থের অভিলাষী হইয়া থাকে। কারণ সংসারের দুঃখ হইতে অতিক্রান্ত হওয়া ও বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করা মানবের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম।

ঐ সংকল্প ভাব দ্বারা ও উপমান উপায় দ্বারা মানব বুদ্ধি আত্মাকে বিচার করিতে পারেন, এবং মন তাঁহাকে অনুমান উপায় দ্বারা অনুভব করিতে পারেন। সে সাধনা দ্বারা এই অনুমান ও উপমান মনেতে ও বুদ্ধিতে উপস্থিত করে, সেটী অবশ্যই ঈশ্বরনিষ্ঠ বা তাহার নিতান্ত সন্নিহিত; তাহা না হইলে সে কিরূপে অদৃষ্ট বস্তুর অনুমান ও উপমান মনোবুদ্ধিতে আনিতেছে। সূর্য্য উষাকালের অলক্ষিত আছেন বলিয়া আলোক প্রকাশ হইয়া থাকে। যে উপায় দ্বারা বুদ্ধি এটী স্থির

করিলেন এবং মন বুদ্ধিতে পারিলেন, সেইটী আলোক দর্শন পক্ষে ও সূর্য্যের অলক্ষস্থিতি প্রকাশ করণ পক্ষে সাধনা বুঝিতে হইবে। ঐ শক্তিটি বাসনার সহযোগে বিজ্ঞান শক্তির সহিত সূর্য্যাদির ভাবনা করিয়া সিদ্ধভাব প্রাপ্ত হইলে, তবে বুদ্ধিতে ও মনেতে পূর্ব্বোক্ত ভাবের উদয় হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। এই নিয়মে সাধনা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইল। কারণ স্থষ্টির প্রথম হইতে বর্ত্তমান কালাবধি সেই অলক্ষিত কারণরূপী আত্মার দর্শনাদির প্রথা যখন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; তখন এই প্রচলিত জ্ঞান-গ্রাহ্য শব্দটী কখন মিথ্যা হইতে পারে না। যাহাকে বিচার করিয়া লক্ষণা ও ন্যায়োপায়াদির দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারা যায় না তাহাই মিথ্যা। যেমন খ-পুষ্প মিথ্যা, কিন্তু বারি মধ্যগত অগ্নিস্থিতি মিথ্যা নহে। আত্মা শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে; বিনা সাধনায় তাহা অনুভূত হইতে পারে না। তজ্জন্য অবিশ্বাসী ও অসাধুর পক্ষে আত্ম বিষয়টী কল্পনা বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বল্প সাধনা করিলেই মানবের ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে। সাধনাই ঈশ্বর-দর্শনাত্মক স্বভাব শক্তি বুঝিতে হইবে।

শিঃ। ঈশ্বর জ্ঞান সাধনার মধ্যগত হইবার কারণ কি?

গুঃ। ঈশ্বরের যে জিহীর্ষু ইচ্ছা এটী কেবল যুগ সংস্কার মাত্র। ভবিষ্যতে জগতে জীব প্রকাশ হইবে; তখন তাহারা কি উপায়ে সংস্কৃত হইবে। অধিকন্তু আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞান ব্যতীত যখন জীবের নিস্তার নাই, তখন সেই জ্ঞান কাহার স্বভাব মধ্যগত রাখা যায়। ঈশ্বর এইটা চিন্তা করিয়া দেখিলেন। সাধনা নামক সংকল্প বৃত্তিই আত্মজ্ঞানপর হইলেই মৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইবে।

শিঃ। সাধনাতে যখন ঈশ্বর স্বভাব রহিয়াছে, তখন কেন সে ব্যক্তি সতত আনন্দিত নহে?

গুঃ। জীবই নিজ স্বভাব দ্বারা কয়েকটী ঐশিক শক্তি অর্থাৎ পরমাত্ম প্রসূত আত্মরক্ষণ শক্তিরূপী মনাদি, জ্ঞানাদি, ইন্দ্রিয়াদিকে ক্রিয়াপর করেন। উহাদের মধ্যে জীবের পক্ষে সকলেই অক্রিয়। জীব ক্রিয়াময় না হইলে উহারা সক্রিয় হইতে পারে না। এই জন্য সাধনা বলিলেন;—যখন জীব আমার দ্বারা ঈশ্বরানন্দ ভোগ করিতে চেষ্টা করে তখনই আমি আনন্দিত হই। যখন জীব মোহাদি দুঃখ ভোগ করিতে চেষ্টা করে তখন আমিও দুঃখ ভোগ করি।

শিঃ। ঈশ্বর জ্ঞান কোন সময়ে সাধনা ধারণ করিবে ?

গুঃ। বিজ্ঞানবাদীরা কহেন:—প্রত্যহ যে সূর্য্যতাপে দগ্ধ হয়, তাহার ক্রমে উত্তাপ সহ্য হইয়া যায়; আর সে উত্তাপের মহিমা জানে না। মনুষ্য অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীব। ইহাদের সম্মুখে সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইলে, আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষিত হইলে, ঐ জ্ঞানে যে কি উপকার, তাহা তাহারা ক্রমে বিস্মৃত হয়। এই ভ্রমটী জীবের স্বভাব ধর্ম্ম। এই ভ্রমটী জীবে না থাকিলে জীব ও ঈশ্বর এক হইত। জীবন্মুক্ত অবস্থা হইলে ঐ ভ্রম নাশ হইয়া যায়। যেমন মরুভূমী বিহারী পথিক জলের কষ্টে একমনে একপ্রাণে জলাশয়ের অন্বেষণ করে, তদ্রূপ মুক্তির অনুসারী মানব সংসার মরুতে ক্লিষ্ট হইয়া আত্মজ্ঞান সরসীর আশ্রয় ভিক্ষা করিলে সেই কষ্টলব্ধ ধনের মহিমা বুঝিতে পারে। আনন্দ প্রদান করাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য।

শিঃ। ঈশ্বরকে অমোঘ বাঞ্ছিত কেন কহে ?

গুঃ। যে উপায়টীর কোন ঘটনার দ্বারা বা ব্যাঘাত দ্বারা কোনই পরিবর্ত্তন হয় না তাহাকে অমোঘ কহে। ইচ্ছা শক্তির কার্য্য প্রকাশক ভাবকে বাঞ্ছা কহে। ঈশ্বর জগতের পক্ষে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আদি হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত এক নিয়মে অতিবাহিত হইতেছে, এইজন্য ঈশ্বরকে অমোঘবাঞ্ছিত কহে।

শিঃ। জীবন্মুক্ত লোক কতকাল জীবন ধারণ করিতে পারে ?

গুঃ। জীব বিষয়পর হইলে সুখ দুঃখাদি চক্রে পতিত হয়। সেই ভোগে পতিত হইলে; অনুগ্রাহক ঈশ্বরের হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয়। কারণ মানব জীবন কেবল মুক্তির জন্যই সৃজিত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যের বিপরীতভাব ধারণ করিলেই মানবের উপরে মুক্তি দাতা ঈশ্বর ক্ষুব্ধ হয়েন। কারণ অপর কোন জীব ভাবের স্বাধীন বৃত্তি নাই। ঈশ্বর ক্ষুব্ধ হইলে, অর্থাৎ জীবাংশ পাপ পথে ধাবিত হইলেই ঈশ্বর কষ্ট পাইয়া থাকেন। এই ভাবটী বোধ হওয়া অতিশয় দুরূহ। তবে বিজ্ঞানে এই পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে। যেমন সংপূর্ণ দেহের মধ্যে অঙ্গের একটী স্থান তাহার অংশ। তদ্রূপ বিরাট্‌রূপী ঈশ্বর বা আত্মার পক্ষে জীবাত্মাও একটী অংশ। যেমন দেহের প্রাণাদির কোন অংশ পীড়িত হইলে সমস্ত দেহকে ভোগ করিতে হয় এবং সেই পীড়া শান্ত করিতে দেহের অপরাংশ

চেষ্টা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবাত্মা প্রাকৃতিক নিয়মে বিপরীত পথে পতিত হইয়া পাপী হইলে মহাপাপজন্য কষ্ট ভোগ করে ; বিষয়পরতা বা মোহাদিতে পতিত হইলে তৎগুণময় হইয়া পতিত থাকে, তাহাতে আত্মার স্রোত উপস্থিত হয়। তজ্জন্য আত্মাই জীবের সংস্কার ব্রহ্মনিয়মানুসারে করিয়া থাকেন। কাল সংস্করণ করণাত্মক শক্তি মাত্র। জীব জগতের যে অংশ নিত্য বিশুদ্ধ তাহার লয় হয় না। কারণ সে সংস্কৃত উপায়ের বশবর্ত্তী হয় না। এই জন্য জীবন্মুক্ত লোকে কল্পান্ত অবধি জীবন ধারণ করিতে পারে। তাহারা ইচ্ছা-মৃত্যু হয়, কালকৃত পথের অনুসারী হয় না। এমন কি ভৌতিক দেহকে পুরাতন বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া ইহ জন্মেই নব শরীর ধারণ করিতে পারে।

শিঃ। তপস্যাতে অতপ্ত ও বিতৃপ্ত ভাব কি রূপ ?

গুঃ। পরিতাপিত না হওয়াকে অতপ্ত কহে। অবিচলিত ভাবে তপস্যা করিতে করিতে যখন মানব শান্তি প্রাপ্ত হইবে এবং দুঃখ জন্য পরিতাপিত না হইবে, তাহাকেই অতপ্ত ভাব কহে। সাংখ্যের মতে ত্রিবিধ দুঃখ নাশ করণই পুরুষার্থের বা তপস্যার উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবারক উপায়কে তপস্যা কহে ; তাহার ক্রিয়াকে সাধনা কহে।

ঐ দুঃখই জীবের পক্ষে তাপ বা মোহের কারণ। রিপু ও প্রাণের ক্রিয়াকে অর্থাৎ কামাদি ও ক্ষুধা তৃষ্ণাকে আধ্যাত্মিক তাপ কহে। বায়ু, পিত্ত, কফগত পীড়া বা বৈলক্ষণ্যকে আধিভৌতিক তাপ কহে। মায়া, মোহ ও আকস্মিক বিপদ প্রভৃতিকে আধিদৈবিক তাপ কহে। এই ত্রিবিধ তাপ দ্বারা মানবে সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পরমার্থ ভুলিয়া উহাদের আপাততঃ নিবৃত্তি যাহাতে হয় তাহার অনুসরণ করিয়া সুখ ও দুঃখের ভাগী হয়। ঐ সুখ ও দুঃখের বশবর্ত্তী হইলে জীবে আর ঐ ত্রিতাপের একান্ত দুঃখের নিবৃত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে না। একান্ত নিবৃত্তি না হওয়াতে তাহাদের ক্রমে কাল সহকারে ঐ ত্রিতাপ বৃদ্ধি হইয়া একেবারে অধর্ম্মপর করিয়া ফেলে ; ঐ ত্রিতাপের একান্ত অর্থাৎ একেবারে নিবৃত্তি করণকেই "অতপ্ত তপস্যা" কহে। অর্থাৎ সাধনের দ্বারা যে মানবেরা একেবারে ত্রিতাপ শূন্য হইয়াছেন, তাঁহারাই পরিশুদ্ধ হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন। অঙ্গারস্থ অগ্নিতে পরিণত হইলে যেমন তাহাকে অঙ্গার কহে না, এবং অঙ্গার অগ্নির উত্তাপের সম তাপিত হইলে যেমন সে অগ্নি

কর্তৃক আপনিই আকর্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ত্রিতাপ হীন হইলে মানবে পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। সেই পরিশুদ্ধি হইলে আত্মার পরিশুদ্ধি স্বরূপ ঈশ্বরানন্দ আপনিই ভোগ করিয়া থাকে।

যাঁহারা বিতৃপ্ত দর্শনোৎসুখী হইয়াছেন তাঁহারাও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তৃপ্তির পরিণাম যাহাতে না হয়, তাহাকে বিতৃপ্তি কহে। মীমাংসা-সংযুক্ত বিচারকে দর্শন কহে। এই জগৎ লীলা বিচার করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যে একেবারে আশ্চর্য্যযুক্ত হইয়া ইচ্ছাকে ক্রমাগত তৃপ্তিময় ভিন্ন তৃপ্তির শেষ অর্থাৎ বিরাগান্বিত করেন নাই, তাঁহারাই সেই প্রেমময় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই দুই অবস্থাই বিজ্ঞান সংযুক্ত ভক্তির প্রকরণে গঠিত বুঝিতে হইবে।

শিঃ। ঈশ্বর কি লুপ্ত থাকেন; যে সাধনা ভিন্ন তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না?

গুঃ। ঈশ্বর সতঃই সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান আছেন, তিনি লোক' অর্থাৎ জগতের লোচন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ হইয়া আছেন, যেমন পরিশুদ্ধ পাত্র ভিন্ন কোন সত্তার বিম্ব প্রতিফলিত হয় না,' তেমনি ঈশ্বরের বিম্ব স্বরূপ আত্মা পরিশুদ্ধ চিত্ত ভিন্ন দৃষ্ট হয় না।

শিঃ। ঈশ্বরের বিম্ব স্বরূপ আত্মা বলিবার তাৎপর্য্য কি?

গুঃ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক মূর্ত্তির সমগ্র ভাগ কখনই ক্ষুদ্র জীবে দেখিতে পারে না। তবে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ সূর্য্যের বিম্ব যেমন পাত্রগত বারিতে বিম্বিত হইয়া আত্মসত্তা প্রদর্শন করে; ঈশ্বরের আত্মারূপী বিম্ব সত্তাও তদ্রূপ পরিশুদ্ধ জীবের হৃদয়ে বিম্বিত হইয়া দেখা দেন। এইজন্য ঈশ্বর সমকরুণাময় ও সম ব্যাপ্ত থাকিলেও ঐ ত্রিবিধ গুণমণ্ডিত মানবে তাঁহাকে দেখিতে, বা তৎপ্রেমানন্দ ভোগ করিতে পারে না। যাঁহারা সাধনা বলে চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহারাই সেই শুদ্ধ চিত্তের আকর্ষণ দ্বারা ভগবানের বিম্ব অর্থাৎ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

শিঃ। ঈশ্বরের বিম্ব ধারণ বা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি?

গুঃ। ঈশ্বর আপনার যোগমায়ার বল দেখাইবার জন্যই আত্মবিম্ব প্রকাশ করেন। যে শক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সগুণাবস্থা কারণাবস্থা হইতে জীবাবস্থায় সংযুক্ত

হইয়া থাকে, তাহাকে যোগমায়া কহে। এই যোগমায়াটী মহা চৈতন্যময়ী শক্তি, ইহাই ঈশ্বরের লীলাকরণীয় বাসনার বল বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরকে জীব-লীলার্ণ আকর্ষণ করিবার পূর্ব্বে নির্গুণ ভগবান্ হইতে যে বাসনার আবির্ভাব হইয়া জগৎ ও জীবকে ঈশ্বরসত্তার সহিত ক্রিয়াপর করে, তাহাকেই চিৎ শক্তি বা যোগমায়া কহে। এই যোগমায়ার ক্ষমতায় ঈশ্বরত্ব হইতে জীবত্বের সৃষ্টি হইল।

• শিঃ। যোগমায়ার ক্ষমতায় যদি জীবত্বের সৃষ্টিই হইল এবং জীবত্ব যদি ঈশ্বরের সত্তাই হইল, তবে আবার সে বল দেখিবার শক্তি কার আছে?

• গুঃ। জীবত্ব তো মায়ার দ্বারা হইল, সেই লীলার অনুভব কে করে? সেইজন্য ঈশ্বর সেই মায়ার তেজ হইতে এমন একটী জ্ঞাতৃত্ব শক্তির প্রকাশ করিয়া এমন এক শ্রেণীর জীবগণকে প্রদান করিলেন, যে তাহারা যেন তাঁহার মায়ার বীর্য্য দেখিতে বা বুঝিতে পারে। সেই শক্তিটীকেই বিজ্ঞান শক্তি কহে। যোগমায়ার বীর্য্য দেখাইবার শক্তির সহিত ঈশ্বর আপনার বিম্বকে ইহ জগতে মর্ত্ত্যলীলায় উপযোগী করিলেন। এই উপযোগী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীব মাত্রেই মর্ত্ত্যলীলায় আবদ্ধ, কিন্তু তাহারা যেন লীলা বোধের অর্থাৎ যোগ-মায়া বল দর্শনের উপযুক্ত হইতে পারে। মানবই এই উপযুক্ত জীব বুঝিতে হইবে।

শিঃ। মানব জীব লীলায় সেই বিম্বের প্রয়োজন কি, এবং তদ্দর্শনেই বা ফল কি?

•. গুঃ। সেই বিম্ব মানব জীবত্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যত ভূষণ আছে তাহার ভূষণ অর্থাৎ শোভা স্বরূপ হইতেছে। মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভূষণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—ভূষণ বলিতে মনোমত সজ্জা। অপর জীবের অঙ্গে যে উপায়ে ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ হস্ত পদাদি সজ্জিত আছে, তাহা ঈশ্বর জ্ঞান পক্ষে অকার্য্যপর। কেবল মনুষ্যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মধ্যে হস্তাদি ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, ইহারাই ঈশ্বর জ্ঞান পক্ষে কার্য্যকর। অতএব জীবের পক্ষে মানবদেহ ও তজ্জাত ইন্দ্রিয়াদি মনোমত সজ্জা অর্থাৎ ভূষণ। কিন্তু যে বিম্ব দ্বারা মানবদেহ গঠিত হইয়াছে, তাহা না হইলে তো এই সকল ইন্দ্রিয়াদি ভূষণ মানবে প্রাপ্ত

হইতে বা ক্রিয়াপর করিতে পারিত না, এই জন্য আত্মা বা ঈশ্বরের বিম্বকে ভক্তগণ অঙ্গের ভূষণের ভূষণ বলিয়া বর্ণনা করেন।

সেই বিম্ব দ্রষ্টার পক্ষে কি ফল প্রদান করে, তাহাই সৌভাগ্য ও ঋদ্ধির পরমপদ স্বরূপ হইতেছে। ভাগ্যের উত্তমাবস্থাকে সৌভাগ্য কহে। কর্ম্ম বা জীবাদৃষ্টকে ভাগ্য কহে। সেই অদৃষ্টের উত্তমাবস্থই মোক্ষ বা ঈশ্বরের ব্রাহ্মচর্য্য ও দাস্যাদিভাব বুঝিতে হইবে। ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি করণক ক্ষমতাকে ঋদ্ধি কহে। ইহার প্রকৃত ভাব এই যথা:—সেই বিম্বে মোক্ষাদি প্রাপক ও ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণ ক্ষমতা আছে। মানবে সেই বিম্ব পাইয়া ঐ সকল ফলের অধিকারী হইতে পারে।

সেই বিম্ব এতদূর অনির্ব্বচনীয় যে যাঁহারা ঈশ্বর সৃষ্টির মত্তা পর্য্যালোচনা করিয়া বিজ্ঞানময় হইয়াছেন, তাঁহারাও আত্মার (বিম্বের) প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যতই বিচার করেন, তাঁহার প্রভাবের শেষ করিতে পারেন না। ভক্তগণ এবংবিধ বিম্বকে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হয়েন।

শিঃ। ঈশ্বর প্রভাব বিচার করিতে হইলে লোকে ভিন্নমতাবলম্বী হয় কেন?

গুঃ। শ্রুতিতে আছে ঈশ্বর দয়ার আকর। ত্রিবিধ গুণ জাত যত জীব মানব রূপে জগতে দৃষ্ট হয়, সকলকে একবার তিনি দেখা দেন। অর্থাৎ আমি আছি, এই ভাব নিজ বিম্বজাত মানবকে দেখাইয়া দেন। সেই সময়ে যাঁহারা সত্ত্বগুণী, তাঁহারা তাঁহাতে লয় হইতে চেষ্টা করেন। এটী ঐশিক নিয়ম। যেমন জ্যোনাকী আলোক দেখিলেই তাহাতে আকর্ষিত হইয়া থাকে। যেমন হরিণ বংশীধ্বনিতে আকর্ষিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ সত্ত্বগুণের ক্ষমতাই ঈশ্বর-বিজ্ঞানবিদ্ হইয়া তাহাতে লয় হয়। সেই স্বাভাবিক ভাবে সত্ত্বগুণীগণও তাহাতে লয় হন। রজোগুণীগণ তাহাতে লয় হইতে চেষ্টা মাত্র করে। আর তমোগুণীগণ স্বপ্নবৎ মিথ্যা ভাবিয়া তাঁহাকে অনিত্য এই ভাব ভাবনা করে। কারণ তমোগুণী স্বভাব তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। এই অবস্থা হইতে জীব ত্রিবিধ ক্রিয়াপর হইয়া দেবমায়া বলে সকলেই ভিন্নমতাবলম্বী হইয়া অনৈক্য হইয়া যায়।

শিঃ। ঈশ্বর যে নির্লিপ্ত হইয়া জীবভুক্ত হওত সকল লীলা করিতেছেন, তাহা কিরূপে বুঝা যায় ?

গুঃ। কামাদি সমস্ত রিপুই জীবগণের জীবন বৃত্তি স্বরূপ। তাহাদের সত্তা বিনা এই জীবদেহ শববৎ হইয়া থাকে। এই জন্য আত্মজ্ঞান সেই রিপু সকলকে আপন পথে লইয়া আপনার প্রভাব দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এটী স্বাভাবিক শক্তি। একত্রে দশজন মানব রাখিয়া তাহাদের ক্রিয়া বিচার করিলে, সচ্ছন্দেই উপলব্ধি হইবে যে, যে মানবের অন্তর যত পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার রিপুগণ ততই দয়া দানাদি ধর্ম্মে ব্যাপ্ত হইয়া ভক্তিকে আশ্রয় করতঃ জীবকে ঈশ্বরপর করিয়েছে। আবার যাহার অন্তর যত মলিন হইয়া আছে, সে ততই মন্দ কর্ম্মে রতি হেতু নানা দুক্রিয়ায় রত হইতেছে। ঐ দুক্রিয়ায় যাহারা রত হয়,তাহারা যখন অতীব ভীষণ হইয়া উঠে,তখনি এক প্রকার অলৌকিক শক্তি তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের চৈতন্যের উদয় করিয়া দেয়। ভক্তমাল গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে এবং সংসারে নিত্য নিত্য অনেকের চরিত্রে তাহা লক্ষিত হইতেছে। সকলের ঐ ভাবনা হইবার হেতু এই যেঃ—যে জীবের বাসনা যত অপরিশুদ্ধ, তাহার পরিশুদ্ধতায় ততকাল আবশ্যক করে। এক জন্মে না হয় পরজন্মে হইয়া থাকে। ভক্তগণ এই বিচারে দেখিয়াছেন, এই সকল অলৌকিক কাণ্ড কোন নৌসর্গিক ক্ষমতা ভিন্ন প্রকাশ হইবার যো নাই। যদি কেহ বলেন যে তাহা জড় জগতের স্বভাব। জড় জগতের পর্য্যালোচনায় তাহা পাওয়া যায় না। চৈতন্য জগতের অর্থাৎ বুদ্ধি মন চিত্তাদির পর্য্যা- লোচনায়ও তাহা পাওয়া যায় না, তবে এমন নিত্য সত্তা কি আছে, যাহা হইতে সমস্ত শাসন প্রকাশ হইতেছে, তাহাই ঈশ্বরের প্রভাব। তাহা ঈশ্বরের বিম্ব অর্থাৎ আত্মা হইতে স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই প্রকাশ স্বভাব এতদূর শান্ত যে বিপরীত ব্যবহারী শত্রুগণকে করুণা করিয়া মুক্ত অর্থাৎ বিপথ গমন হইতে বিরত করিয়া থাকেন।

অপ্রকাশ অগ্নি যেমন গুণক্রিয়াস্বতে কাষ্ঠের মধ্যগত থাকেন, ক্রিয়ামাত্রেই প্রকাশ হইয়া কার্য্যপর হয়েন। তেমনি ঈশ্বরের সত্তা মহত্তত্ত্ব মধ্যগত থাকেন। জগৎ ও জীবের সুক্ষ্ম কারণাবস্থাকে মহত্তত্বাবস্থা কহে। ঐরূপ স্বভাবের বিপরীতকার্য্য আরম্ভ হইলে তাঁহার জগৎপালন কর্ত্তব্য রক্ষণ হেতু তিনি

আপনিই সর্ব্বজীবে আত্মভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইসকল উপায়ের বিশেষরূপে আলোচনা করিলে পরে ঈশ্বর যে বিম্বিত হইয়া সকল লীলা করিতেছেন তাহা বুঝা যায়।

শিঃ। ঈশ্বর যখন প্রাণীভাব ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে নিরূপণ করা যায় না কেন?

গুঃ। ঈশ্বর আপনাকে ভোক্তারূপী আত্মাতে পরিণত করিয়া তাহার বাসনা পরিপূরক শক্তিরূপী দৈবকে এই দিক্ বায়ু প্রভৃতি দেবতারূপে এবং তাহার বাসনার অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ম্মরূপে রূপান্তরিত করিলেন। সেই ঈশ্বর কেবল যে প্রাণীভাব ধারণ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি বিশ্ব ও প্রাণীরূপী হইবার জন্য যোগমায়া বল ধারণ করিয়াছেন। কাল, চৈতন্য ও সুপ্তকারণ শক্তির মিশ্রণাবস্থাকে যোগমায়া কহে। উহাদের আকর্ষণে ঈশ্বরের সগুণভাব আকর্ষিত হইলে বিরাটভাব প্রকাশিত হয়। ঐ বিরাটভাবে জীব ও জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই ভাবাপন্ন ঈশ্বরকে নিরূপণ করা অর্থাৎ তাঁহার লীলাগত সকল ভাব ব্যক্ত করা অতি দুরূহ; এমন কি অনুভব করাও যোগীর সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। ভক্তে জ্ঞানবলে যতই তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডময় বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে, ততই অনন্তলীলাময় দেখিয়া লীলা নিরূপণ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরপর হইবে। কিন্তু নিরূপণ বা লীলার সীমা করিতে পারিবে না।

শিঃ। ঈশ্বর নির্গুণ এবং তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই; তখন তিনি কাহার দ্বারা গুণপর হইলেন?

গুঃ। ব্রহ্মের কাল নামক শক্তি ব্রহ্মকে সগুণ করিবার জন্য যে চৈতন্য-মিশ্রিত ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাকেই যোগমায়া কহে। ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতা প্রকাশক শক্তি অর্থাৎ যাহার অভ্যন্তরে নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণত্ব রক্ষিত হইয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি ক্রিয়াপ্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকে যোগমায়া কহে।

এই যোগমায়ার ঈশ্বর সংস্পর্শণ বিষয় বোধগম্য হওয়া সাধারণ বুদ্ধিতে অতিশয় দুষ্কর। তবে নৈয়ায়িকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা

অপরাপর দার্শনিকগণের অপেক্ষা স্থূল। এই স্থূল বোধ হইলে সাংখ্য বা মীমাংসকগণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধিবাদী বা ন্যায়বাদীরা কহেন; যে জগতে যে কোন বস্তুর প্রকাশ প্রাক্ অভাব ভিন্ন হয় না। লৌকিকে যখন কোন একটী বস্তু প্রয়োজন হইলে, সেই প্রয়োজন বোধক অন্তঃকরণ বৃত্তির অনুসারে কর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন অলৌকিক তাহা ঘটিতেছে। কারণ লৌকিকের সত্তাই অলৌকিক হইতেছে। যেমন একটী ভাণ্ড প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সাধারণের হৃদয়ে এমন একটী অভাব বোধক শক্তির উদয় হইয়াছিল, সেই অভাব বোধই ভাণ্ডের কার্য্যের ন্যায় পরে প্রকাশ হইল। সেই অভাব বোধক শক্তিটী দ্বারাই জীবে যেমন ক্রিয়াপর। ঈশ্বরও তদ্রূপ ক্রিয়াপর। সেই শক্তির দ্বারা ঈশ্বর মূল স্বভাব হইতে গুণময় হয়েন বলিয়া এবং সেই শক্তির সহযোগে ঈশ্বরের লীলার পরিমাণ হয় বলিয়া সেই শক্তিকে পুরাণে যোগমায়া কহে। বিজ্ঞানে চিৎশক্তি কহে।

ঐ অভাব জ্ঞাপকশক্তিটী যাহার যেরূপ স্বভাব তাহার সেই স্বভাবের অনুগামী হইয়া তাহাকে ক্রিয়াপর করে। নির্গুণময় ব্রহ্মের অর্থাৎ মূল চৈতন্য কারণের স্বভাবই ব্রহ্মাণ্ড লীলা করণ। সেইজন্য ব্রহ্মের সেই স্বভাব মধ্যগত লুপ্ত প্রায় চিৎশক্তিরূপী কালশক্তি পর ব্রহ্মকে সক্রিয় করত সগুণ করিয়া থাকেন। কালশক্তির প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে জগতে লৌকিক লীলার মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা বিচার করণ কষ্টকর হইলেও প্রত্যক্ষ। এইকাল ও চিৎশক্তি নির্গুণের স্বভাবে নিহিত আছে। এবং তাঁহার ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছা না হইলে প্রাক্ অভাব প্রকাশ হইত না। ইচ্ছাটী স্বভাবের মধ্যগত। এই সমস্ত শক্তি মূল অবস্থায় অক্রিয় থাকা হেতু তিনি ব্রহ্ম নাম ধারণ করিয়াছেন।

শিঃ। ব্রহ্ম যে এক এবং তাঁহা হইতে যে সকলের প্রকাশ তাহা কিরূপে বুঝিব ?

গুঃ। এই যে একরূপে ব্রহ্মের স্থিতি উপলব্ধি করা অতিশয় বিজ্ঞানসাধ্য। লৌকিক বুদ্ধিতে তাহা স্থির করা যায় না, যদি কেহ যোগাবলম্বন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার দেহসঙ্গত বৃত্তি যদি মহাভূতাংশের সহিত নিত্য

সমাবিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়, তবেই তিনি সংমাত্র ব্রহ্ম যে এক ভিন্ন দুই নাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে সামান্ত অনুভবের জন্ত সাধ্যমত প্রকাশ করণ উচিত বিধায়ে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিজ্ঞানবাদীরা কহেন জগতের আদি হইতে অন্তের মধ্যে যত কিছু কার্য্য সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমানে সৃষ্ট হইতেছে; ইহারা সকলেই এক একটী নিয়মে আবদ্ধ রহিয়াছে। কার্য্য দ্বিবিধ—লুপ্ত চৈতন্ত ও অলুপ্ত চৈতন্ত। শুষ্ক কাষ্ঠাদি ও বিকারিত অস্থি, জীবহীন মুক্তা প্রবালাদি সমস্তকে লুপ্ত চৈতন্ত কার্য্য বা বিষয় কহে, আর পঞ্চ মহাভূত হইতে জীবাদি সমস্তই অলুপ্ত চৈতন্ত বিষয় বলিতে হইবে। এপর্য্যন্ত বিজ্ঞান শক্তির দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে অলুপ্ত চৈতন্ত শক্তির বিকারে পরিত্যক্ত যে ভূতাংশ বস্তু যে ভাবে অবস্থিত হয়, তাহাকেই লুপ্ত চৈতন্তময় বস্তু কহে। উহারা কখন স্বতঃ উৎপন্ন হয় না। এই নিয়মে দেখা যায় যে একমাত্র চৈতন্তশক্তি প্রবিষ্ট না হইলে কোন বিষয়ই প্রকাশ হয় না। সেই চৈতন্তশক্তি একটী সত্তার আশ্রয়ে থাকে। সত্তাটীকে সংরক্ষণ করাই চৈতন্তের উদ্দেশ্য। সত্তাটী একটী অদৃষ্টকে আশ্রয় করে। অদৃষ্ট একটী ক্রিয়াপর শক্তিকে আশ্রয় করে। ইহাকেই কাল কহে।

জগতে দেখা যায় অণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকল প্রাকৃতিক বস্তুতেই একটী সত্তা আছে, সত্তার পালন হেতু একটী চৈতন্তশক্তি আছে। সত্তাটী যে ভাবে পরিণত হইবে এমন একটী অদৃষ্টের আশ্রয়ও আছে এবং সেই অদৃষ্ট সত্তার মধ্যে আত্মগুণ প্রতিফলিত করিতে যাহাতে পারেন, এমন একটী কালশক্তি আছে।

এই চারিটী পদার্থের মধ্যে সকলেই এক একটী নিয়মে কার্য্য করিতেছে। আবার দেখা যায় যে এ চারিটী শক্তির মধ্যে একটী নাশ হইলে অপরটী থাকে না। ইহাতে যদিও চারিটী বিহনে আর কোনটীর সজীবত্ব থাকে না। তথাপি চৈতন্তটীই ঐ তিনটী শক্তির নিয়মের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সকলকে সজীব রাখে। চৈতন্তেরও যখন একটী কর্ম্মকরণ শক্তি রহিয়াছে; তখন তাহাতে একটী মূল স্বভাব আছে। সেই স্বভাবটীতে চৈতন্তের সহিত অপর তিনটীর ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে বিশেষ বিচার করিয়া যোগীগণ দেখিয়াছেন যে ঐ

স্বভাবের অধীনে যখন জগৎ ও জীব প্রকাশক চারিটী শক্তিই ক্রিয়াপর, তখন উহার কোন নিয়ন্তা আছে। এটী বেশ দেখা যায় যে নিয়ন্তা না থাকিলে কোন সত্তা কখন স্বভাবে পরিণত হইতে পারে না। সেই নিয়ন্তাই ; নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। সেই নিয়ন্তা যে কতদূর ব্যাপ্ত তাহার সীমা নাই। কারণ তাঁহার শক্তি সকলের কার্য্যভাগই জগৎ। এই নিয়মে অতি সামান্য ভাবে ব্রহ্ম যে এক এবং তাঁহা হইতেই যে সকলের প্রকাশ ইহা প্রমাণিত হইল।

শিঃ। ব্রহ্মই এক ছিলেন কিন্তু জগৎ যে ছিল না অর্থাৎ কি ভূতাদি, কি প্রাণাদি কিছুই ছিল না, তাহা কিরূপে বুঝিব ?

গুঃ। ব্রহ্মই এক ছিলেন, দ্রষ্টা দৃশ্যাদি কিছুই ছিল না। এক্ষণে জগতের অপ্রকাশ ও ব্রহ্মের নিত্যত্ব বলা যাইতেছে। যোগীগণ স্থির করিয়াছেন, যে কোন কার্য্য এক একটী স্বভাবের অন্তর্গত। এবং কার্য্যের লয় আছে, কারণের লয় নাই। ভূতাদি, গ্রহাদি, প্রাণ্যাদি সমস্তই জগতের উপাদান ; অর্থাৎ ইহা লইয়াই যখন জগত,তখন উহাদের লয়েই জগতের লয় স্থির অবশ্যই হইতেছে। প্রলয় চারি প্রকার। মহাপ্রলয়, প্রাকৃতিকপ্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয় ও নিত্যপ্রলয়। এইপ্রলয় গুলিও ঐ চারিটী শক্তির চারিপ্রকার বিকারে ঘটিয়া থাকে। ঐ চারিটী শক্তির যখন অত্যন্ত বিকার হয়, তখন মহা-প্রলয় হয়। যখন বিকার ভাবাপন্ন হয়, তখন প্রাকৃতিক প্রলয় হয়। যখন কিঞ্চিৎ বিকার হয়,তখন নৈমিত্তিক প্রলয় বা যুগ পরিবর্ত্তন হয়। যখন কালদ্বারা বিকারিত হয়, তখন নিত্য প্রলয়। এই চারিটী প্রলয় যে ঘটিতে পারে ; এবং প্রতি বস্তুতে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত করা হইয়াছে।

বিজ্ঞানবাদীরা প্রতি বায়ুতে ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, প্রলয় সৃজন ও পালন এই ত্রিভাব রহিয়াছে ; নচেৎ উহারা কার ক্ষমতা বা তেজের অনুসারী হইয়া জগতে প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্ম যে স্বভাবে স্থিতি করিয়াছিলেন, সেই স্থিতি এই প্রলয়াদি ত্রিভাবাপন্ন। ঐ ত্রিভাবা-পন্ন অবস্থাকে সক্রিয় করণার্থ চারিটী শক্তি প্রস্তুত রহিয়াছে। যখন চারিটী শক্তির ও স্বভাবের সংযোগে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হইয়াছে তখন, ঐ

কারণশক্তি গুলির পরে এই কার্য্য প্রকাশ হইয়াছে, ইহা কোন বিজ্ঞানবাদী না স্বীকার করিবেন। কিন্তু এটী অনুভব হওয়া বিনা যোগ সাধনায় হয় না, তবে বুদ্ধিকে ঈশ্বর নিরত বা তত্ত্বজ্ঞান নিরত করিলে কেবল যুক্তিমাত্র সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

ঐ স্বভাবটী ও শক্তিগণ ব্রহ্মে অগ্রে আবির্ভাব হয়; পরে উহারা এই জগৎ কার্য্যে প্রকাশ হয়, এই সিদ্ধান্ত যখন হইল, তখন সৃষ্টির অগ্রে স্রষ্টা ইহা নিশ্চিতই হইল। সৃষ্টির অগ্রে ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি যখন একভাবে ছিলেন তখন কার্য্যাদি প্রকাশ হয় নাই, অতএব দ্রষ্টা দৃশ্যাদি ছিল না। পরে তিনিই আপন প্রভাবে সমস্ত প্রস্তুত করিলেন বলিয়া আপনি সকলের আত্মা ও পালন কর্ত্তা স্বরূপ হইয়াছেন।

শিঃ। যখন জগৎরূপী কার্য্য প্রকাশ হয় নাই, তখন তিনি একমাত্র হইয়া কিরূপে ছিলেন?

গুঃ। সেই অবস্থায় তিনি বিজ্ঞানবাদীগণ দ্বারা এক-রাট্ ব্রহ্ম বলিয়া অবিহিত হয়েন। সেই একরাট্ ব্রহ্ম কিরূপে ছিলেন? না,—তিনি অসুপ্তদৃক ছিলেন। দৃক বলিতে চিৎশক্তি বা চৈতন্য। ক্রিয়াপর অবস্থাকে অসুপ্ত কহে। চৈতন্য কখন অক্রিয়াপর থাকেন না। তিনি সততই আপন তেজে প্রকাশমান। এই চিৎশক্তিটী ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের তেজ। ব্রহ্ম কার্য্যহীন অবস্থায় ও জড় ভাবাপন্ন না হইয়া, তেজোময় অর্থাৎ চৈতন্যময় ছিলেন। এটী বলিবার তাৎপর্য্য এই যেঃ—যেমন জীব আপনার সকল শক্তির সহিত নিদ্রিত হইলেও তাহার চৈতন্য জাগ্রত থাকে। সেই চৈতন্য আ্যার কাল সহকারে জীবকে জড়ত্ব হইতে ক্রিয়াপর করিবার জন্য জাগ্রত করিয়া থাকে। বিজ্ঞানে বিশেষ আলোচনায় দেখা যায় যে চৈতন্যক্ষমতার দ্বারা যখন প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই সজীবিত রহিয়াছে, তখন তাহার জড় ভাবাপন্ন হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরের তেজের জড়ত্ব ক্ষমতা দেখিয়াই তত্ত্বজ্ঞেরা সেই শক্তির নাম চৈতন্য রাখিয়াছেন।

শিঃ। ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা কেন হইল?

গুঃ। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে স্বভাবের সংকল্প থাকিলে, সেই সংকল্প, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্বভাব হইতেই একটী অভাবের আবশ্যক হয়। সেই অভাবকে পরিপূর্ণ করিতেই কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মের

স্বভাবই সিসৃক্ষাদি করণ। যখন ব্রহ্ম আপন চৈতন্য তেজ দ্বারা বোধ করিতে পারিলেন যে তাঁহার স্বভাবে কোন অভাব রহিয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন যে আমি দ্রষ্টা হইয়া কোন অপর দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি না কেন।

ঐ অভাব উদয় হওয়াতেই সেই অভাব পূর্ণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ হইল, ইচ্ছা প্রকাশ হওয়াতে তিনি দেখিলেন যে তাঁহাতেই তাঁহার পক্ষে দৃশ্য প্রকাশ শক্তি সমূহ সুপ্ত রহিয়াছে। স্বভাবের ক্ষমতাই এই যে অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করেন। ব্রহ্মপক্ষে অন্তর্নিহিত ভাব কি? না—আমি দ্রষ্টা। ইহার ভাব এই যথাঃ—দৃশ্য প্রস্তুত করণানন্তর তাহাকে দর্শন করাই ব্রহ্মের স্বভাব। যোগীগণ ইহা কেন বলিলেন না এই যে বিশ্ব ইহার দ্বারা তিনি কোন উপকার প্রার্থনা করেন না। এই কার্য্যের দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন সাধন হয় না, তবে ইহা তাঁহার পক্ষে কিরূপ? না দৃশ্যের ন্যায়। লোকে যেমন চিত্রাদি করণ ক্ষমতা সত্ত্বে চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা দর্শন করিয়া আত্মক্ষমতার চরিতার্থতা লাভ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও আপন স্বভাবদ্বারা দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য প্রকাশানন্তর, সেই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার তেজের লীলামাত্র দর্শন করিয়া চরিতার্থ হয়েন। এই সম্বন্ধে ঈশ্বরের নির্গুণ অবস্থার সহিত এই জগদবস্থার দ্রষ্টা ও দৃশ্য সম্বন্ধ হইতেছে।

এই দৃশ্য বাচক অভাব তাঁহার অনুমিত হওয়াতে তাহা পূরণের উপায়ও তাঁহাতে আছে, ইহা বুঝাইবার জন্যই তত্ত্বজ্ঞেরা কহেন যে সৃষ্টি করণাত্মক উপায়রূপী শক্তিসমূহও তাহাতে ছিল। কি ভাবে ছিল? না—সুপ্ত প্রায়। যেমন বালকের অন্তরে আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুনাত্মক স্বভাবটী অনেকাংশে সুপ্ত প্রায় থাকে, ক্রমে কালবশে যতই বালকের চৈতন্যের অধিকার হয়, ততই ঐ সমস্ত প্রকাশ হইয়া থাকে। তদ্রূপ ব্রহ্মাবস্থায় সিসৃক্ষাদি শক্তি লুপ্ত বা সুপ্ত প্রায় ছিল। ইহাই অনুমান। এই বিষয় রচনার দ্বারা সম্যক্ প্রকারে বোধ করাওন অসম্ভব। কারণ বিজ্ঞানবুদ্ধি না হইলে বুঝিতে পারা দুঃসাধ্য।

শিঃ। ঈশ্বরের নির্গুণ অবস্থার সহিত এই জগদবস্থার দ্রষ্টা ও দৃশ্য সম্বন্ধ থাকা, কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

গুঃ। দৃষ্টি শক্তি না থাকিলে দ্রষ্টা হওয়া অসম্ভব, আর দৃশ্য না থাকিলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা প্রকাশেরও অসম্ভব। এই তিনটী অবস্থাকে সম্ভবপর

করিতে পারিলে ; তবে নির্গুণত্ব বোধ হইবে এবং তবে ঈশ্বরের সত্তা বোধ হইবে।

জগতের সহিত ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের অপর কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল চিত্রকর যেমন আপন ক্ষমতা প্রকাশের জন্য সেই ক্ষমতাকে চিত্রে পরিণত করেন ; তদ্রূপ ব্রহ্মের পক্ষে জগৎ সৃজন। চিত্র যেমন চিত্রকরের পক্ষে দৃশ্যমাত্র, জগৎও ঈশ্বরপক্ষে তদ্রূপ দৃশ্য মাত্র। চিত্রকরের নিজের এমন একটী ক্ষমতা আছে, যাহার পরিণামে চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। সেই ক্ষমতাটাই যখন চিত্রের কারণ, তখন সেই ক্ষমতাই চিত্রপক্ষে দৃষ্টি। সংকল্পের অনুভব করণাত্মক তেজকে দৃষ্টি কহে। মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সংকল্প কহে। সেই সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে যে শক্তির আবশ্যক হয়, তাহাকে দৃষ্টি কহে। যেমন ঘট গঠন কুম্ভকারের সংকল্প; সেইভাবটী প্রকাশিত হইলেই তাহার পক্ষে দৃশ্য হইল, আর যে ক্ষমতার দ্বারা কুম্ভকার সংকল্পের অনুসারে গঠিতে গঠিতে নিজ সংকল্পের অনুসারী হইল কি না স্থির করিল, তাহাকেই দৃষ্টি কহে। এই ভাবে ঈশ্বরপক্ষে জগৎ নির্ম্মাণাত্মক স্বভাবই সংকল্প, আর সেই সংকল্পের কার্য্যে পরিণত করণককেই দৃষ্টিশক্তি কহে। এই দৃষ্টি শক্তি প্রাণীতে যদি না প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে কেহ কোন প্রকারে আপন সংকল্প সূচক অভাব মোচন করিতে পারিত না। এই শক্তিকে চৈতন্য কহে। শক্তি মাত্রেরই স্বভাব থাকা উচিত, নচেৎ কোন্ তেজে তাহা ক্রিয়াপর হইবে। ঈশ্বরের চিৎশক্তিতে কি ছিল ? না সদসৎ ছিল। সৎ বলিতে দৃশ্য আর অসৎ অদৃশ্য। সংকল্পের পরিণামকে দৃশ্য কহে। আর সংকল্পের অভাবকে অদৃশ্য কহে। অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই শক্তিতে সংকল্প প্রকাশ যথার্থ হইল কি না তাহার স্থির করণক (দৃশ্য) ও সংকল্পটী কি ; এই অভাব বোধক গুণদ্বয় আছে। এই দুইটী স্বভাব বা গুণ থাকাতেই ঈশ্বর তাহার সংযোগে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে মায়া কহে। যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্মকে পরিমাণ করা যায়, তাহাকে মায়া কহে। কোন একটী বস্তুর স্বভাব ও গুণাদি বোধ হইলেই তাহার সত্তার পরিমাণ অনুভূত হইয়া থাকে, এই নিয়মে ঐ চৈতন্যশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের সংকল্প বোধ হইয়া থাকে বলিয়া, যোগীগণ ঐ শক্তিকে মায়া কহেন।

শিঃ। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিবার মানসে কিভাবে অবস্থান্তরিত বা ক্রিয়াপর হইলেন?

গুঃ। ব্রহ্ম আপনার স্বভাবকে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়া যে ভাবে অবস্থান্তরিত হইলেন, সেই বর্ত্তমান ক্রিয়োন্মুখ ভাবকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কহা যায়।* এই অবস্থায় ঈশ্বর কিরূপ? না, কেবল চিৎশক্তিময়। ব্রহ্মাবস্থায় ঈশ্বর চিৎ শক্তিকে অপরাপর স্বভাবের সহিত একত্র অথচ জাগ্রত বোধ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় অপরাপর স্বভাব ও শক্তিকে আপনাতে পৃথক্ করিয়া যে অংশ দ্বারা কার্য্যোন্মুখ হইবেন, সেই অংশে চিৎশক্তিময় হইলেন।

* চিৎশক্তির দ্বারাই সৃষ্টি অর্থাৎ কার্য্য করণাত্মক ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। এইজন্য ব্রহ্ম সিসৃক্ষাবাচক অভাব মোচন করিবার জন্য সংকল্পাদি স্বভাবাদি প্রকাশক চৈতন্যময় হইলেন। ঈশ্বর বীর্য্যাভাবাপন্ন হইলে; তাঁহাতে অবস্থা প্রকাশ হইলে সে অবস্থায় তিনিই চৈতন্যের অনুগত বা মধ্যগত হইলেন। চৈতন্যকে আবরণ করাতে তাঁহার নাম পুরুষ হইল। আপনার ব্রহ্মভাব হইতে সেই অবস্থান্তর হইল বলিয়া তাঁহার আত্মভূত পুরুষ নাম হইল। এই আত্মভূত পুরুষ অবস্থাকে পরমাত্মা হইতে হীনাবস্থা বা সক্রিয়াবস্থা কহে; কেহ বা ইহাকেই আত্মা কহেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক শক্তি সমূহ ব্রহ্মে অলুপ্ত ছিল। যখন ঈশ্বর চেতনপর হইলেন তখনই তাঁহার অন্তরস্থ সংকল্প ও স্বভাব জাগ্রত হইল। অর্থাৎ যে উপায়ে তাহা দৃশ্যরূপে পরিণত হইবে সেই উপায় বিধানাত্মক সুপ্ত শক্তি সমস্ত চৈতন্যের ক্রিয় হেতু ক্রিয়া হইল।

ঐ সুপ্ত শক্তি কি?—না—গুণময়ী কাল বৃত্তি। কোনি একটী স্বভাবকে কোন নিয়মে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি সংকল্পের অনুসারী করিতে হয়। সেই সংকল্প গুলিই পরিণত অবস্থার কারণ মাত্র বুঝিতে হইবে। জগৎ ঈশ্বরের স্বভাব; ইহার প্রকাশ্য অবস্থার কারণ গুলিই ঈশ্বরের সংকল্প। সেই কারণ সমূহ যে শক্তির দ্বারা নির্গুণ অবস্থায় ধৃত ছিল, তাহাকেই কাল কহে। কারণ সমূহ যে শক্তির দ্বারা নিয়মিত রূপে কলিত অর্থাৎ সংগৃহীত হয় তাহা-কেই কাল কহে। চৈতন্য স্বকীয় রূপী জগৎকে প্রকাশ ইচ্ছা করিলে যেরূপে

ব্রহ্মাণ্ড হইবে তাহার কারণাত্মক সংকল্পময় কাল শক্তিকে সক্রিয় অর্থাৎ আপনার অনুযায়ী করিলেন।

জগৎ প্রকাশক সত্তাকে বা সূক্ষ্ম কারণকে গুণ কহে। সূক্ষ্ম কারণ বা সংকল্প সমস্ত কাল শক্তিতে থাকে বলিয়া গুণময়ী কাল বৃত্তি বলা হইল। সেই কাল বৃত্তি চৈতন্যের অনুসারী হইল বলিয়া কাল বৃত্তিময় আত্মমায়া বলা হইল।

ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে প্রথমে চৈতন্যের মধ্যে থাকিয়া ক্রিয়োন্মুখ হইলেন। পরে ক্রিয়ার সংকল্প তাহাতে যোগ করিয়া আপনার স্বভাব তাহাতে আধান করিবার জন্য পুরুষরূপী অর্থাৎ আত্মারূপী হইলেন। এই পুরুষরূপে অর্থাৎ কাল ও চৈতন্যময়ী প্রকৃতির মধ্যগত হইয়া আপনার স্বভাব তাহাতে প্রদান করিলেন। এই প্রভাবকে বীর্য্য কহে।

ব্রহ্মের স্বভাবই জগৎ করণ। কোন একটী বস্তু প্রস্তুত করিতে হইলে মনের সংকল্প, মনের ক্ষমতা ও বস্তু বিষয়ক উপাদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে; নচেৎ কখনই একটী বস্তু প্রকাশ হইতে পারে না। জগৎকে যখন একটী বস্তু বলা হইতেছে, তখন জগৎ কর্ত্তাকেও এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে হইয়াছে। এই অবস্থাটী লিপি চাতুর্য্যে প্রকাশ করা বা আত্মজ্ঞানবিহীনকে বুঝান অতিশয় কঠিন; তবে সাধ্যমত ব্যাখ্যা করিলাম।

শিঃ। ঈশ্বরে বাসনা থাকা কিরূপে সম্ভব?

গুঃ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চৈতন্য চির জাগ্রত। সেই জন্য ব্রহ্ম চির জাগ্রত। চির জাগ্রত থাকা সত্বে তাঁহার বাসনা সেই চৈতন্য দ্বারা পালিত। স্বয়ং চৈতন্যও সেই বাসনা দ্বারা পালিত। বাসনা থাকিলেই সংকল্প ও স্বভাব এবং উভয় প্রকাশক অদৃষ্ট শক্তির সত্তা থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মে এ সমস্তই লুপ্ত ছিল। ইহার স্থির কি? না—এপর্য্যন্ত সকল বস্তুরই পূর্ব্ব লক্ষণ আছে; পূর্ব্ব লক্ষণ না থাকিলে কারণ প্রকাশ হয় না। ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া যোগীগণ ঐরূপ পূর্ব্ব লক্ষণ স্থির করিয়াছেন।

ঐ পূর্ব্ব লক্ষণ সমূহ এক প্রকার অব্যক্ত ভাবে থাকে, কার্য্য প্রকাশ হইলে তাহারা কার্য্যদ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র। যেমন কোন একটী রোগ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ ও কার্য্যগত ক্রিয়া স্থির করিলে রোগের কারণ জানা

যায় ; তদ্রূপ সকল বস্তুরই কার্য্যগত ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়ার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া কারণের স্থির হইয়া থাকে। জগতের পক্ষে মায়াই কর্ম্ম শক্তি। কালাদি সংগ্রহ শক্তি। আর ঈশ্বরের বাসনাই কর্ম্মী এবং ঈশ্বরের স্বভাব ও সংকল্পই উপাদান। এই সকলের সংযোগে যে অবস্থা প্রকাশ হয়, তাহাই দৃশ্যরূপী কার্য্যের কারণাবস্থা।

শিঃ। ঈশ্বর আত্মা মধ্যগত কেন হইলেন ?

গুঃ। চিৎ শক্তিতে সংকল্প ও স্বভাব নিহিত থাকা হেতু তাহা অব্যক্ত, এই জন্য মায়াকে অব্যক্ত বলা হইল। চৈতন্যের স্বভাবই কালের পেষণে ও স্বভাব সংকল্পের অনুসারে রূপান্তরিত বা ক্রিয়াপর হয়। ঐ লক্ষণ সমূহ একত্র হইলে একটী অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহা জ্ঞানে বোধ হয়, কিন্তু বুদ্ধিতে বিচার করা যায় না। সেই অবস্থায় ঈশ্বর কিরূপ হইলেন ?—না—বিজ্ঞানাত্মা ও তমোনাশ-কারী। ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা বোধক শক্তিকে বিজ্ঞানাত্ম কহে। ইহার তাৎপর্য্য এই :—কোন একটী ক্রিয়া প্রকাশ হইবার জন্য সংকল্পাদি সক্রিয় হইলে স্বভাব-কে তদনুযায়ী হইতে হয় ; তাহাকেই ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা বোধক কহে। যেমন কুম্ভকার চক্রে মৃত্তিকা স্থাপন করতঃ ঘূর্ণ্য যষ্টি দ্বারা চক্রখানিকে ঘুরাইলেই তৎ সংযোগে আপনার ঘট-গঠনাত্মক সংকল্প ও নিয়মাত্মিক স্বভাবকে মৃত্তিকা ও চক্রপর করিয়া থাকে ; তদ্রূপ চৈতন্যের ও কালের পীড়নে ব্রহ্ম সংকল্প ক্রিয়াপর হইলে সেই সংকল্প যে স্বভাবাপন্ন হইবে তাহাই অদৃষ্ট বোধক হইলে ঈশ্বরকে তন্মধ্যে থাকিতে হইতেছে, নচেৎ কর্ত্তা না থাকিলে কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। এই বিজ্ঞানাত্মক ভাবকেই আত্মা বা সর্ব্বান্তঃপ্রবিষ্ট ভাব কহে।

তমোনাশকারী বলিতে :—লুপ্ত অবস্থাকে তমো কহে। সক্রিয় অবস্থা ঈশ্বর স্বভাব দ্বারা প্রকাশ হয় বলিয়া ঈশ্বর আত্মা অবস্থায় তমোনাশকারী হইয়াছেন।

এই অবস্থাপন্ন হইয়া কি নিয়মাবলম্বন করিতেছেন ?—না—আত্ম দেহস্থ লুপ্ত বিশ্বকে প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। আত্ম বলিতে এস্থলে স্বভাব। যাহার অন্তরে কার্য্য প্রকাশক অদৃষ্ট বা বীজ থাকে তাহাকে স্বভাব কহে। সেই বীজ কি ?—না—লুপ্ত প্রায় বিশ্ব। বিশ্ব বলিতে সমষ্টি বাচক (প্রাণ্যাদি) ও ব্যষ্টি বাচক (ভূতাদি) ব্রহ্মাণ্ডাবস্থা প্রকাশ আরম্ভ করিলেন।

শিঃ। ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ আরম্ভ করিয়া কি কি অবস্থাপন্ন হইলেন?

গুঃ। ঈশ্বর আপনার শক্তি সমূহ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশার্থ যে অংশে শক্তিময় হইলেন; সেই অবস্থাকে অংশ-গুণ-কালাধীন কহে। ঈশ্বরের মায়াগত অবস্থাকে আত্মা কহে। সেই আত্মাই অংশাদির অধীন হইল।

ঈশ্বর যখন চৈতন্য দ্বারা আমি দ্রষ্টা ভাবিলেন তখন দৃশ্যের অভাব ভাবিয়াছিলেন। সেই দৃশ্যের অভাব নাশ করিবার জন্য আপনার শক্তি সমূহকে যখন ক্রিয়াপর করত এই অবস্থায় উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আপনার সক্রিয় ভাগকে দৃশ্যরূপে আপনিই দেখিলেন। দৃশ্য বস্তুকে দেখিতে পাইয়া আপনার যে বিশ্ব সৃজনাত্মক বাসনা ছিল তাহার অনুসারী করিয়া চৈতন্যাদিকে ক্রিয়াপর করিলেন; সেই বাসনার অনুসারী হওয়াতে ঐ অংশগুণ কালাধীন আত্মা বিশ্ব-প্রকাশক কারণাদির রূপে রূপান্তরিত হইল।

বোধ হয় অনেকেই এই রূপান্তর ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন না। অনায়াসে বোধ হওয়া সুকঠিন। তবে সামান্য প্রমাণে বাধ্য হইলাম।

বাসনাই ব্রহ্ম হইতে এই জীব পর্য্যন্ত সমানভাবে ক্রিয়াপর। জীবের বাসনা সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ভয় ক্রোধ, মৈথুন, আহার, নিদ্রা যে কোন স্বভাব দ্বারা আকর্ষিত হইবে অর্থাৎ দৃশ্যরূপে প্রতিফলিত হইবে। উহা জীবের অপর সকল শক্তিকেই তৎক্ষণাৎ সেই দৃশ্যের অনুসারী করিবার জন্য রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিবে। দুঃখী যে হয় তাহার দেহের গঠন ও মনের চৈতন্যের সকল তেজরই দুঃখ বোধক রূপান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই নিয়মে ব্রহ্ম যেমন দৃশ্য দেখিলেন অমনি সেই দৃশ্যকে আপনার বাসনার অনুযায়ী করিবার জন্য রূপান্তরিত করিলেন। বাসনাতে বিশ্বের বীজ প্রতিফলিত ছিল, এই জন্য ঐ আত্মা বাচক দৃশ্যও বিশ্ব সৃজনের কারণাত্মক হইয়া রূপান্তরিত হইল। এই স্থূল হইতে জগতের সূক্ষ্ম কারণ প্রকাশ হইল।

শিঃ। জগতের সূক্ষ্ম কারণ কিরূপে প্রকাশ হইল?

গুঃ। ব্রহ্মাণ্ডের যে পূর্ব্ব অবস্থাকে মহত্তত্ত্বাবস্থা কহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। এক্ষণে অহংতত্ত্বাবস্থা প্রকাশ হইতেছে। তৎবোধক সূক্ষ্ম ভাবকে তত্ত্ব কহে। তৎ বলিতে কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বা জীব বা কার্য্যগত বস্তু। যাহার দ্বারা জাগতিক সকল অবস্থার সূক্ষ্ম বোধ হয় তাহাকে তত্ত্ব কহে।

অহং শব্দের অর্থ আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর, কিম্বা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম যখন দেখিলেন আপনাতে সৎ অর্থাৎ দৃষ্টিভাব রহিয়াছে তখন দৃশ্য অর্থাৎ ঐ সৎ ভাবের কার্য্য প্রকাশ আবশ্যক। সেই অভাব বোধ হইলে তবে তিনি আপন চৈতন্য শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হইয়া প্রধানাবস্থায় নীত হইলেন। পরে কাল দ্বারা সংক্ষোভিত হইয়া মহত্তত্ত্বাবস্থায় পরিণত হইলেন। পূর্ব্বের যে অভাব সংযোগে তিনি ক্রিয় হইলেন, সেই অভাব এইস্থলে সূক্ষ্মরূপে পূর্ণ হইল অর্থাৎ তিনি অহংতত্ত্ব হইলেন। অহং বলিতে আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের দৃষ্টিভূত বিশ্ব। আর তত্ত্ব বলিতে কার্য্য বা দৃশ্যের সূক্ষ্মাবস্থা। অর্থাৎ ঈশ্বর যে জগৎকে দৃশ্য করিয়া স্বয়ং দ্রষ্টা হইবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহার সূক্ষ্ম সূচনা এই অহংকার অবস্থার কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল। কেন হইল?—না— তিনি এই অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে কার্য্য কারণ ও কর্ত্তাত্মা হইলেন। আমি দ্রষ্টা এই ভাবই কর্ত্তা। যাহা দেখিব তাহার সত্তাই কারণ; আর যে উপাদানে সেই দৃশ্য রঞ্জিত হইবে তাহাই কার্য্য।

ঈশ্বর এই ত্রিভাবাপন্ন হইলে অহংকার নাম ধারণ করিলেন, কিন্তু কি উপায়ে ঐ ত্রিভাবাপন্ন হইলেন? ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সেই ব্রহ্মাবস্থাতে দৃশ্য প্রস্তুত করণার্থ শক্তি সমূহ সুপ্ত ছিল। চৈতন্য দ্বারা কাল শক্তি তাহাদের ক্ষুভিত অর্থাৎ সক্রিয় করিতে লাগিল। ঐ সক্রিয় ভাবে ঐ সুপ্ত দৃশ্য অর্থাৎ জগতের সূক্ষ্ম অবস্থা জাগ্রত অর্থাৎ ঈশ্বরের বাসনাপর হইলে ত্রিবিধ হইল। সেই ত্রিবিধ সুপ্ত শক্তিকে ত্রিগুণ কহে। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই তিনটী ত্রিগুণ। সৎ অর্থাৎ দৃষ্টি ক্ষমতা আছে কিম্বা ঈশ্বরের বাসনাযুক্ত কেবল চৈতন্যময়ী অবস্থাকে দ্রষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ ঐ শক্তি বা গুণ দ্বারা আত্মা জগৎ অনুভব করিতেছে। কার্য্য বা জগৎ বা দৃশ্য চৈতন্যের যে অংশের দ্বারা প্রকাশ হইতেছে; তাহাকে রজোগুণ বা রজোশক্তি কহে। তমোগুণ দ্বারা উহাদের উপাদান প্রকাশ হইতেছে। অর্থাৎ ঐ দৃশ্য যে উপাদানের পরিবর্ত্তনে প্রকাশ হয়, তাহাকে তমোগুণ কহে। যে অসৎ অর্থাৎ উপাদান অবস্থাকে লইয়া এই দৃশ্যরূপী এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে; সেই উপাদান একভাবে থাকিলে,কালের প্রভাব অপ্রকাশ হয়। কারণ কাল দ্বারাই লুপ্ত অবস্থা প্রকাশ পায়। কোন একটী বস্তু প্রকাশ আরম্ভ হইলেই তাহায় স্বভাবতঃ পরিণাম হইবেই হইবে। নচেৎ ঈশ্বরের

বাসনার ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। এই ক্রিয়াতে ত্রিগুণের বিকার হয় মাত্র। চৈতন্য শক্তি, কাল শক্তি এবং ঈশ্বরের বাসনা এই ত্রিভাবই দৃষ্টিভান। ইহারা যখন লুপ্ত দৃশ্যকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তখন ঐ ত্রিভাবই ঐ লুপ্ত অবস্থায় প্রতিফলিত হইয়া লুপ্ত অবস্থাকে আপনাপন গুণাপন্ন করিয়া থাকে। এইজন্য লুপ্ত দৃশ্যের ত্রিবিধ প্রকাশ অবস্থাকে ত্রিগুণ কহে। ঐ লুপ্ত অবস্থাকে অসৎ কহে। চৈতন্য শক্তি অসতে প্রতিভাত হইলে সত্বগুণ হয়, আর ঈশ্বরের বাসনা শক্তি অসতে প্রতিভাত হইলে রজোগুণ হয়। কাল শক্তি ঐ অসতে প্রতিভাত হইলে তমোগুণ হয়।

ঐ ত্রিবিধ গুণের সহিত ঈশ্বর চৈতন্য, কাল, ও বাসনা এই ত্রিবিধ শক্তি সংযুক্ত করিলে যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকেই অহংকারাবস্থা কহে। অহংকারাবস্থায় চৈতন্য রূপান্তরিত হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে কর্ত্তৃত্বা-বস্থা কহে। বাসনা যে অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তাহাকে কারণা-বস্থা কহে। আর কাল রূপান্তরিত হইলে তাহাকে কার্য্যাবস্থা কহে। এই তিন অবস্থার সহিত ঐ তিনগুণ সংযুক্ত হইলে কর্ত্তৃত্ব হইতে সাত্বিক বা বৈকারিক; কারণ হইতে রজো বা তৈজস; কার্য্যত্ব হইতে তামস এই ত্রিবিধ অহংভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে এই ত্রিবিধ ভাবই অতি সূক্ষ্ম ভাব। এতদ্ব্যতীত অপর ভাব নাই। ঐ ত্রিবিধ ভাব হইতে সাত্বিক ভাব মনোরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম কারণ হয়। রাজসিক ভাবে ইন্দ্রিয়রূপে এবং তাম-সিক ভাবে ভূতরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যে সৎ অবস্থায় সকল বস্তুর অনুভূত হয়, তাহাকেই মন কহে। এই মনই পরমাত্মার দৃষ্টি। মন বলিতে এখনো জীবগত নহে। ব্রহ্মাণ্ডের কারণগত; কারণ ইহার পরে জগৎ প্রকাশ হইবে। এই মনাবস্থা ব্রহ্মাণ্ডগত আত্মা অবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকে, যেমন পঞ্চ ভূতাদি ভূত তত্ত্বের মধ্যে থাকে। আত্মতত্ত্বের সহিত মন অবস্থান করে। সেই মন অনুভব করিবার জন্য আত্মার স্বভাবেতেই আপন দৈবশক্তি প্রকাশ করিয়া রাখেন। সেই দৈব শক্তিকে দেবতা বা যে শক্তি সমূহের দ্বারা অর্থ্যাভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বা দেহের কার্য্যগত অবস্থার কি ঘটিতেছে তাহার সার অনুভব হয়, তাহাতেই আত্মা স্বীয় বাসনার দ্বারা তৎক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন।

শিঃ। মনাবস্থা ব্রহ্মাণ্ডগত আত্মা অবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার অবস্থান কোথায়, তাহাতো দৃষ্টি গোচর হয় না?

গুঃ। বিজ্ঞানবিদেরা বিশেষরূপে যোগবলে দেখিয়াছেন যে, যে বস্তু যে বস্তুতে থাকে তাহাই অপর দ্বারা গৃহীত হয়। আমাদের দেহের বাহ্যাংশে পঞ্চ ভূতের মধ্যে বায়ু হইতে পৃথি এই চারিটী ভূত অনুভব হয় বলিয়া মুখ্যরূপে ব্রহ্মাণ্ডেও ঐ চারিটী ভূত সংস্থাপন অনুভব করিতে পারি। চক্ষু রূপ গ্রহণ করে বলিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্ন্যাদির রূপ দেখি। ত্বক্ স্পর্শশক্তিময় হওয়াতে তদ্দ্বারা উষ্ণত্ব, শৈত্য এবং বায়ুাদির সত্তা উপলব্ধি করি, আর রসাদি পৃথ্যাদি পূর্ব্বোক্ত মাত্রা গুণময় হওয়াতে স্বচ্ছন্দে অনুভব করিয়া থাকি। শূন্যাদি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে অনুভব করিতে কষ্ট হয়। আপনাতেই যখন আত্মার অনুভব দুঃসাধ্য, তখন ব্রহ্মাণ্ডগত আত্মার অনুভব কিরূপে হইবে। জীবদেহ মধ্যে যে অনুভব সিদ্ধি লাভ করিবে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে বোধ করিতে পারিবে। এই জন্য অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির প্রয়োজন, স্বভাবকে ব্রহ্মাণ্ডপর না করিলে ব্রহ্মাণ্ড বোধ হওয়া অসম্ভব। তথাপি আমি সাধ্যমত ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার অবস্থান দেখাইতেছি।

ইতিপূর্ব্বে অহংতত্ত্ব প্রমাণ কালে বলিয়াছি ঈশ্বর সুপ্ত শক্তি সমূহকে ক্রিয় করিয়া তৎসহযোগে অহংকারাবস্থা হইলেন। ঈশ্বরের সৎভাবই আত্মা। তাহাই কর্ত্তৃত্ব, কারণত্ব, ও কার্য্যস্বরূপে পরিণত। ঐ ত্রিভাবই একত্রীভূত অবস্থায় জগৎ। ঈশ্বর বিরাটরূপে আত্মাভাবে ব্রহ্মাণ্ডে সৎ উপায়ে রূপান্তরিত হইলে তাঁহার কর্ত্তৃত্বের প্রকাশ হওয়া চাই। সেই কর্ত্তৃত্বই মন অর্থাৎ ব্রহ্ম দৃষ্টি। ঐ মন জড় জগতে সূর্য্য ও চন্দ্রের সত্তারূপে বিরাজিত। চন্দ্র ও সূর্য্যের সত্তা হইতে ঐ যে দুই প্রকৃতিগত প্রত্যক্ষ গ্রহ বস্তুর আবির্ভাব তাহাতে এমন গুণ আছে যাহার দ্বারা সর্ব্বত্র চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। চন্দ্রের দ্বারা সেই চৈতন্য প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সূর্য্য দ্বারা তাহা আকর্ষিত হইয়া জগতের কার্য্যগত ক্রিয়ত্বে আরোপিত হইয়া থাকে। ঐ চন্দ্র ও সূর্য্য কেন ঐরূপ হইল বা উহাদের প্রত্যক্ষ অবস্থাটী কি তাহা জ্যোতিষের গ্রহ বর্ণনা স্থলে দ্রষ্টব্য। এই মাত্র ভাবনা উচিত যে উহাদের বিহনে জগৎ প্রকাশ হইতে পারে না, উহাদের বিকারে জগৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

ঐ চন্দ্র ও সূর্য্যগত সত্ত্বা যাহাকে ব্রহ্মাণ্ডগত মন বলিলাম; তাহাকেই ঈশ্বরের দৃষ্টি কহে, তন্মধ্যেই আত্মা ভাবে ঈশ্বর অবস্থিত। চন্দ্র ও সূর্য্য সত্তার ঈশ্বর বিরাটরূপে অবস্থিত হইলেই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই অবস্থিত ইহা কে না বুঝিবেন। এই জন্য ব্রহ্মকে সূর্য্যরূপে কল্পনা করত সূর্য্যকে গায়ত্রী মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আত্মা ও মনের অবস্থানের আভাষ দিলাম, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ পাঠক না হইলে এই ভাব উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব।

শিঃ। দৃশ্য জগতের সূক্ষ্ম কারণ কিরূপে প্রকাশ হইয়াছে?

গুঃ। তৈজস অহংকার হইতে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান ও কর্ম্মময় ইন্দ্রিয় সমূহ প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের বা সুপ্ত অবস্থার সহিত যখন চৈতন্যের সহযোগে ঈশ্বরের বাসনা শক্তি মিলিত হয়, সেই অবস্থাকে তৈজস বা রাজসিক অহংকার কহে। সেই অবস্থা হইতে ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞান ও কর্ম্মময় ইন্দ্রিয় প্রকাশ হইয়া থাকে। এমন একটী ভাব যাহার দ্বারা কর্ত্তার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় তাহাকে ইন্দ্রিয় কহে। এস্থলে ব্রহ্মাণ্ডপক্ষে যে ভাব দ্বারা ঈশ্বর আপন বাসনা শক্তিকে দৃশ্য গঠনের জন্য অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন তাহাকেই ইন্দ্রিয় কহে। সেই ইন্দ্রিয় ভাব দ্বিবিধ, একটী কর্ম্মময়, অপরটী জ্ঞানময়। অদৃষ্টকে কর্ম্ম কহে। যে উপায়ে এ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইবে সেই গঠনের ঈশ্বর বাসনাগত ভাবকে কর্ম্ম কহে। ঐ কর্ম্মময় ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের ভূতাদির সংস্থাপক কার্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহার যে দৃশ্যরূপে জগৎ কারণাত্মক কিম্বা জীব ও ব্রহ্মাণ্ড করণাত্মক বাসনা তাহারই স্বভাব প্রকাশ হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেখানে যে ভাবের পদার্থটী প্রয়োজনীয় তাহা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা মন অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তি; কার্য্যভাবে অনুভব করিয়া কর্ম্মের সুশৃংখলা স্থাপন করেন৹ তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। আত্মা চৈতন্য শক্তির দ্বারা অনুভব করেন। তৈজস অহংকার দ্বারা ঈশ্বর কার্য্যরূপী দৃশ্যে অনুভব করণাত্মক শক্তির আবির্ভাব করেন বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টি কার্য্য প্রমাণিত ও দৃশ্য জগতের সূক্ষ্ম কারণ ও চৈতন্য ব্যাপ্তি প্রমাণ করা হইল।

শিঃ। ভূত সমূহের সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ কিরূপে হইয়াছে?

গুঃ। তামস অহঙ্কার হইতে ভূত সমূহের সূক্ষ্মভাব প্রকাশ হইয়াছে।

প্রাণী সমূহে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবের পরিবর্ত্তনাত্মক উপাদানকে ভূত কহে। সেই স্থূল ভাগের সূক্ষ্ম কারণাবলীই ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে দৃশ্য বাচক উপাদান। ইতিপূর্ব্বে দৃষ্টি বাচক উপাদান প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে দৃশ্য বাচক উপাদান প্রকাশ বর্ণিত হইতেছে। কাল সংযোগে যে অসৎভাগ চৈতন্ত দ্বারা ক্রিয় হয় তাহা-কেই তামস অহঙ্কার কহে। ঈশ্বরের বাসনাতে জগৎ পক্ষে যে সকল অদৃষ্ট ভাব অর্থাৎ কি উপাদানে ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত হইবে, কি উপায়ে তাহা বর্দ্ধিত ও ক্ষয়ীভূত হইবে, এই স্বভাবাত্মক অদৃষ্ট উপাদান থাকাতে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া চৈতন্তের সাহায্যে যে শক্তি অসতের অর্থাৎ দৃশ্য প্রস্তুত হওনাত্মক সুপ্ত পদার্থের মধ্যগত হয়েন তাহাকে কাল কহে। সেই কাল শক্তির ও অসত্বের মিশ্রণ অবস্থাই তামস অহংকার। কালেতে জগতের অর্থাৎ দৃশ্যের সূক্ষ্ম উপাদানাদি রূপী অদৃষ্ট সংযুক্ত ছিল বলিয়া এক্ষণে অসতের আকর্ষণে তাহা প্রকাশ হইল। সেই প্রথম প্রকাশ অবস্থা অতি সূক্ষ্ম কারণময় সর্ব্ব ব্যাপ্ত আছে। সেই অবস্থাই ব্রহ্মাণ্ড গঠনীভূত অবস্থার পূর্ব্বভাব এইজন্ত তাহাদের নাম ভূত সূক্ষ্ম ভাগ বলা হয়।

ঐ ভূত সূক্ষ্ম ভাগ আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ বোধকরূপে আকাশ অর্থাৎ সর্ব্ব ব্যাপ্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। এই বোধক বা জগতের সূক্ষ্ম অবস্থাই দৃশ্য আর মনেন্দ্রিয়াদি দৃষ্টি শক্তি এবং ঈশ্বর আত্মারূপে সর্ব্ব দ্রষ্টা হইলেন। কোন একটী অবস্থার মধ্যগত না হইলে সংভাব থাকিতে পারে না, সেইজন্ত দৃশ্যের অর্থাৎ আকাশের মধ্যেই দ্রষ্টার সংস্থান প্রমাণ হওয়াতে আকাশকে :—শ্রুতি এবং পুরাণে ঈশ্বরের বোধক আবরণ বলা হইয়াছে।

যেমন সামান্ত দৃশ্য দেখিতে হইলে মনেন্দ্রিয়ের সহিত আত্মাকে তন্মধ্যগত হইতে হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর ও আত্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম অবস্থারূপী শূন্তের দ্বারা আবরিত হইয়া আছেন; এইজন্ত আকাশকে আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ শরীর বা আবরণ কিম্বা বোধক বলা হইল।

কালাংশ বলিতে ঈশ্বর—বাসনা-গত অদৃষ্ট প্রকাশাদি। মায়াংশ বলিতে চৈতন্তরূপী মনেন্দ্রিয়াদি। এই উভয় অংশের সংযোগ হওয়াতে এবং উহারা ঈশ্বরের দৃষ্টি শক্তি হওয়াতে যে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম উপাদানরূপী শূন্ত প্রকাশ হইল, তাহা আত্মারূপী ভগবান কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইল।

সেই শূন্যের মাত্রাগুণ শব্দ। অর্থাৎ যে সূক্ষ্মগুণ বোধ হওয়াতে জীবের পক্ষে শূন্য বোধ হয় তাহাকেই শব্দ কহে। ভূতাদির, স্বভাবের ও মনেন্দ্রিয়ের শক্তি সমূহ সমাবিষ্ট হইয়া একটী বোধক ভাবের প্রকাশ করে; তাহাকেই শব্দ কহে। যেমন "হস্তী" এই শব্দটী উচ্চারণ হইবার মাত্রে বক্তার পক্ষে প্রথমে মনাদির দ্বারা একটী কল্পনার স্থির করিতে হয়, পরে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অর্থাৎ বাসনাদির দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করিতে হয় এবং ভূতাদির অর্থাৎ বায়ুাদির দ্বারা তাহাকে বোধকরূপে পরিণত করিতে হয়; তবে "হস্তী" ভাবটী প্রকাশ পায় ও অপরের বোধক হয়। এইরূপ বোধক ভাবকে শব্দ বলা হয় বলিয়া; বায়ুকে যে ভাব বোধ করায় তাহার নিতান্ত রহিয়াছে। সেই বোধক ভাবটী বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ মীমাংসা করিয়া দেখিয়াছেন স্পর্শাদি কিছুতেই নাই। এবং তাহাই সকলের প্রকাশক। আকাশরূপী ভূত সূক্ষ্মের বোধক ভাব সক্রিয় হইয়া অর্থাৎ আপনার অন্তরস্থ সূক্ষ্ম অবস্থাকে স্থূল করণার্থ স্পর্শমাত্রাত্মক বায়ুর প্রকাশ করিয়া থাকে। শীতোষ্ণাদি, গুরু, লঘুত্বাদি বাচক অবস্থাকে স্পর্শ কহে। ঐ বাচক অবস্থা একমাত্র গুণ শব্দ অর্থাৎ বোধক অবস্থা না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডে কেহই বোধ করিতে পারিত না। সূক্ষ্ম কারণাবলী কিঞ্চিন্মাত্র স্থূল হইলে তাহার এক প্রকার গতি হয় অর্থাৎ কালাদির ক্ষোভণে চৈতন্যাদির কার্য্যত্বে আরোপণে, শূন্য আপনার বোধক ক্ষমতার সহিত, স্পর্শ ক্ষমতাময় এক পদার্থের প্রকাশ করেন, তাহা প্রবাহিত হয় বলিয়া তাহার নাম বায়ু।

ঐ শব্দাদি মাত্রাগুণ উহাতে প্রকাশ হইবার কারণ এই যে:—ঈশ্বর যখন দ্রষ্টা তখন দৃশ্যরূপী জগতকে যে সূক্ষ্ম কারণ দ্বারা দেখেন সেই সূক্ষ্ম কারণাবলীর বোধক মাত্রাকে শব্দ কহে, তদ্দ্বারা ঈশ্বর দৃশ্যরূপী জগৎ কার্য্য বোধ করেন, জীবগত আত্মাও সেই নিয়মে কার্য্যাদি ও স্বরাদি বোধ করেন বুঝিতে হইবে। জগতে যত কিছু কার্য্য এপর্য্যন্ত বোধ হইয়াছে তন্মধ্যে স্পর্শ শক্তি অপেক্ষা প্রথম বোধক আর কেহ নাই। কারণ স্থূল ভাগাপেক্ষা সূক্ষ্মভাগ সর্ব্বাগ্রে বোধক এবং সকল সূক্ষ্মাবস্থার মধ্যে বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। এইজন্য বায়ু-বীর্য্যাংশকে এবং তাহার গুণকে শূন্যাবস্থা হইতে প্রথম প্রকাশ বলিয়া নির্ণীত করা হইয়াছে। চৈতন্যের আকর্ষণ ও বিস্ফারণ ক্ষমতা শূন্যে থাকাতে বায়ুতে

তাহা প্রবিষ্ট হইল। বায়ু আকর্ষণ ও বিস্ফারণাদি ক্ষমতার দ্বারা প্রবাহিত হইল।

আকাশের বোধক ভাব আর বায়ুর স্পর্শভাব এই দুই ভাব সংযুক্ত হইয়া আত্মাকে একপ্রকার বিম্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাকে রূপ কহে। তেজের প্রতিফলন অবস্থায় যে প্রতিভাতি প্রকাশ হয় তাহাকে রূপ কহে। সেই প্রতিফলন অবস্থার দ্বারা তেজ আছে তাহা শব্দ ও স্পর্শাদি গুণদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। এবং তেজটী কোন প্রকার ক্রিয়াহীনত্ব অবস্থায় প্রকাশ হয় না। সেইজন্ত বিজ্ঞানে স্থির হইয়াছে যে বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণ ও বিকর্ষণাদি দ্বারা সক্রিয়। সেই সক্রিয়ভাব হইতে ও মূলের সূক্ষ্মাংশ হইতে তেজ প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ তেজকে রূপদ্বারা ঈশ্বর বোধ করেন। কেন বোধ করেন—না—বাসনাদির সংযোগ তাহাতে আছে বলিয়া।

বায়ুর আকর্ষণাদি ও তেজের উষ্ণত্বাদি দ্বারা এক প্রকার সূক্ষ্মকারণাবলীর দ্রবীভাব অর্থাৎ মিশ্রিকরণ ভাব হয়। সেই মিশ্রিত অবস্থা বোধ হইবার জন্ত শব্দস্পর্শাদি ও রূপাদি সংযুক্ত এক প্রকার তেজ জ্ঞাপক আস্বাদ তাহাতে থাকে, সেই আস্বাদ প্রকাশক মিশ্র অবস্থাকে রস কহে। আর মিশ্রীভূত পদার্থকে অম্বু বা জল কহে। ঐ জল তিক্তাদি রস বিশিষ্ট ও শূন্যাদি সকল ভূতাংশের ও মূল কারণাবলীর মিশ্রণাবস্থা বুঝিতে হইবে।

তেজের দ্রবীকরণ শক্তি থাকাতে তেজ হইতে বারিরূপের প্রকাশ বলা হইল। ঐ রসাদিকে ইন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঐ দ্রব্যত্বের ও তেজের পরস্পর বায়ুসংঘটনাত্মক ক্রিয়া ও মূল কারণ সহযোগে একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পৃথ্বি বা মৃত্তিকা কহে। ঐ মৃত্তিকার বোধক গুণ গন্ধ। রসাদি তিক্তাদি ভেদে এবং শূন্যাদির সত্তাভেদে তেজের ক্রিয়ামতে একপ্রকার বিকারভাব হয়, তাহাতে একপ্রকার সূক্ষ্ম বায়বীয় তেজের প্রকাশ হয়, তাহাকে গন্ধ কহে। মৃদু কঠোরাদি মতে গন্ধের নানাপ্রকার বৃত্তি আছে। ঐ গন্ধদ্বারা ঈশ্বর পৃথ্বিত্ব বোধ করেন।

এইতো জগতে ভূত প্রপঞ্চ ও তাহাদের শব্দাদি যে সকল গুণ চৈতন্তের সহিত মিলিত থাকাতে ঈশ্বর বোধ করেণ তাহা বলা হইল। কাল ও মায়াংশ সংযোগ থাকাতে ভূতরূপী জগতের কারণাবলী ঈশ্বরের দৃষ্ট হইল। ভূত

বলিতে সকলে যেন পদার্থ বলিয়া বোধ না করেন। ভূতাদির যে কারণাবস্থা বলা হইল, ইহাতে এখনো জড়ত্বের আরোপ হয় নাই। এই পাঁচটীই সৃষ্টির পক্ষে মূল কারণ। এই কারণ সমূহ কার্য্যে পরিণত হইলে নানাভাগে ভাগিত হইয়া থাকে। এবং উহাদের অন্তরে বহু জড় পদার্থের অবস্থিতি হয়।

নভঃ আদি পাঁচটী ভূত, তন্মধ্যে যাহারা অগ্রে প্রকাশ হইয়াছে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ, পরবর্ত্তী সমূহ পরস্পর পরস্পরাপেক্ষা কনিষ্ঠ। যেমন আকাশ অপেক্ষা বায়ু কনিষ্ঠ। বায়ু অপেক্ষা অগ্নি কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ হইলেই তাহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ সকলের গুণ সমূহের অধিকারী হইতে হয়। অর্থাৎ পৃথি পঞ্চম ভূত, উহার আপন গুণ গন্ধ; উহার শ্রেষ্ঠ জলাদি আর চারিটী থাকা সত্বে উহাতে উহাদের চারিটী গুণ সংযুক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতগণের কারণের সহিত পরবর্ত্তী ভূতের সংযোগ থাকা সত্বে তাহাদেরও তদ্গুণত্ব লাভ করিতে হইয়া থাকে। ঈশ্বর চৈতন্যের সহযোগে ঐ সকল গুণকে অনুভব করেন, অর্থাৎ সকলেই তাঁহার অনুভবের অন্তর্গত।

শিঃ। ভূত প্রপঞ্চই কি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছিল?

গুঃ। আত্ম স্বভাব জাত শক্তিত্রয় হইতে সৃষ্ট হওয়াতে ভূত সমূহে ঐ শক্তিত্রয়যুক্ত গুণ থাকা সম্ভব হইয়েছে। ব্রহ্মের সগুণভাবকে আত্মা কহে। ঈশ্বরের বাসনায় যে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, পালন, ও হরণাত্মক ত্রিবিধ প্রাক্ অভাব ছিল; সেই অভাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে ঈশ্বর চৈতন্যাদির আকর্ষণে সগুণ হইলেন। কারণ ক্রিয়া প্রকাশক শক্তিকে চৈতন্যশক্তি কহে। ব্রহ্মের যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহাই আত্মার স্বভাবরূপী হইল। কারণ বীজের গুণভাগই বৃক্ষের স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে। কালশক্তির দ্বারা ব্রহ্মেতে কার্য্যপ্রকাশ অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি ছিল; সেই সৃষ্টি প্রকাশ ভাবকে রজোগুণ কহে। আত্মার পক্ষে ঐ রজোগুণ রজোস্বভাব রূপে পরিণত হইয়া ঈশ্বরের বাসনামতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রথমে ভূতাদির সৃষ্টি করিল। চৈতন্যশক্তি ব্রহ্মে ছিল, তাহা দ্বারা কার্য্য প্রকাশ বা পরিণত হয়। সেই শক্তিকে সত্বগুণ কহে। তদ্দ্বারা ঐশিক ভাব সংরক্ষিত থাকাতে বাসনা কার্য্যপর হইয়া থাকে। ঐ শক্তি আত্মাতে প্রবেশ হইবার মাত্র আত্মা সত্বস্বভাবময় হইল। ব্রহ্মতে যে অসৎ অর্থাৎ কারণময় সুপ্ত শক্তি ছিল; তাহাই কাল ও চৈতন্যের পেষনে আত্মার

আবরণ অর্থাৎ তমোগুণরূপী হইল। আত্মা কারণাবলীর দ্বারা আবৃত হয়েন বলিয়া তাহাকে তমোস্বভাব কহে।

ঐ ত্রিবিধ স্বভাবে আত্মা এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া লীলা করেন। ঐ ত্রিবিধ স্বভাব কারণ মধ্যগত হইয়া ঐশিক প্রধানা শক্তি বাসনা সংযুক্ত হইলেই এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যতক্ষণ বাসনা ঐ স্বভাবগণ মধ্যবর্ত্তী না থাকে, ততক্ষণ ঐ স্বভাব হইতে যে সমস্ত কার্য্য প্রকাশ হয়, তাহা বিযুক্ত থাকে। পরস্পরের সংযোগ হয় না। যেমন কর্দ্দম, চক্র, যষ্টির মধ্যে শক্তি কুম্ভকারের ইচ্ছা সক্রিয় না হইলে কর্দ্দমাদির কোন সাধ্য নাই যে ঘটাদি প্রস্তুত করণার্থ প্রযুক্ত হইতে পারে। তদ্রূপ ঈশ্বরের বাসনা বিহনে ভূতাদিরও শক্তি সমূহের কোন সাধ্য নাই যে ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করে। ভূত সমূহ আপন স্বভাবে আপনাপন স্বভাবের আকর স্বরূপ ঐশিক চৈতন্যকে সদা সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতে লাগিল।

শিঃ। এই ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যগত জীব কি কি উপায়ে সৃষ্ট হয়?

গুঃ। ঈশ্বরের তেজে ভূতাদির সৃষ্ট হয়; ভূত সমূহ আত্মার আবরণরূপী হইলে এই ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যগত জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে। জীব হইতে হইলেই, আত্মাকে ঘটমধ্যগত বারির ন্যায় উপাধিযুক্ত হইতে হইবে। এবং ভূত ও ঈশ্বর সংমিশ্রণে সজীবত্বরূপী ঈশ্বর স্বভাব এবং সত্ত্বাদিগুণরূপী ভূত স্বভাব তাহাদের লাভ করিতে হইবে। অর্থাৎ যে স্বভাব জাত যে যে কার্য্য সেই কার্য্য সেই স্বভাবপন্ন হইলেই শুভ ফল ও কর্ত্তব্য সাধন করা হইয়া থাকে। জীবগণ ও ব্রহ্মাণ্ড উভয় স্বভাবপন্ন হইলেও এমন নৈসর্গিক শক্তির আবশ্যক হইয়া থাকে, যে যাহার দ্বারা জীব ভূতকে ও ঈশ্বরকে কর্ত্তব্য দেখাইতে পারে। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, মৈথুনাদি জীবের ভূতগত স্বভাব, এবং জীবত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব ঐশিক স্বভাব। ঐ উভয় স্বভাব জীবদেহে যাহাতে স্থাপিত হয়; তাহার কৌশলকেই জীবিকা রূপে কল্পিত করা হইয়াছে। শ্বাসাদির শক্তি ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি সমস্তই ভৌতিক স্বভাব প্রকাশের উপায়। এবং মন ও বাসনাদি ঐশিক স্বভাব প্রকাশের উপায়। ঐ উভয় উপায়াবলী এবং যে স্থলে ঐ উপায়াবলী ক্রিয়াপর হইবে বিশেষতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড কি উপায়ে প্রত্যক্ষ হইবে বা প্রস্তুত

হইবে, তাহাই স্থির করিবার জন্য ভৌতিক প্রকৃতি আপনিই কর্ত্তব্য প্রকাশ আরম্ভ করেন।

শিঃ। তত্ত্ব কাহাকে বলে এবং কয় প্রকার?

গুঃ। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঃ—মহত্তত্ত্ব অগ্রে প্রকাশ হইয়াছে, তদন্তে অহঙ্কার; অহঙ্কার হইতে মন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ শব্দাদি তন্মাত্র। এবং পঞ্চ ভূত প্রকাশ হইল। ইহারা সর্ব্ব সমেত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইল। যে পদার্থের অমিশ্রভাবে স্থিতি আছে; এবং উৎপত্তি বিনাশ বা আবির্ভাব তিরোভাব আছে; সেই সূক্ষ্ম পদ বোধক পদার্থকে তত্ত্ব কহে। বিজ্ঞানবিদেরা বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঃ—মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত অবধি সকলেরই মূলাংশ অমিশ্র এবং সকলেই পরস্পর আবির্ভাব তিরোভাব লীলাময়।

আর্য্যবাদীরা কহেন যে জগতের মধ্যগত ভূতাদি সর্ব্বদাই প্রকৃতির আকর্ষণে ক্রিয়ার্থে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া বিকার ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে; এইজন্য অমিশ্র ও বিশুদ্ধ ভূতভাগ পৃথিবীর সন্নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

চন্দ্র সূর্য্য মণ্ডল সন্নিহিত বায়ু বা বারি পরীক্ষা করিলে তাহা বিশেষ উপলব্ধীভূত হইতে পারিবে। কারণ একের তেজের সহিত অপরের তেজের সাম্য হইলে তবে মিশ্রণ ঘটিতে পারে। যেমন, জল অপেক্ষা তৈল লঘু শক্তিমান্ বলিয়া জলোপরে অমিশ্রভাবে তৈল স্থাপিত হয়। তদ্রূপ পরস্পর শক্তির অসাম্য প্রযুক্ত এই জগৎ ও জীব সংরক্ষিত হইতেছে। জগতের মধ্যে জীব সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। জীবাপেক্ষা পৃথ্বী লঘু। পৃথ্বী অপেক্ষা বারি লঘু। বারি অপেক্ষা তেজ লঘু। গুরু বস্তুকে আকর্ষণ করিবার জন্য অমিশ্র লঘু বস্তুর আধিক্যের প্রয়োজন হয়, নচেৎ গুরুত্ব লঘুত্বকে সমীভূত করিয়া মহাগুরু হইয়া উঠে। এই সমস্ত বিশদ বিচার করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন জীব অপেক্ষা পৃথ্বীর বিস্তার অধিক, পৃথ্বী অপেক্ষা বারির বিস্তার অধিক। এবং অধিক হইয়াও তাহাদের মধ্যে জীব ও জগৎ (বিকারিত ভূভাংশ) ভিন্ন সমুদায়ই অমিশ্র ভাবাপন্ন। কারণ মিশ্রণ ভাব থাকিলে গুরু অংশ লঘু শক্তিকে আপনাতে প্রবেশ করাইয়া মহাগুরু হইতে পারে। এই প্রকারে অমিশ্রণ গুণ ও তিরোভাব আবির্ভাব গুণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডগত কারণাবলীকে তত্ত্ব কহে।

শিষ্য। আপনি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদের গুণভাগ নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু প্রকৃতির সহিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিলেন না কেন? এবং প্রকৃতি যে পরে মিশ্রিত হইয়াছে তাহারই বা প্রমাণ কি?

গুঃ। বিজ্ঞানে বিশেষ বিবেচনায় জানা যায় যে স্বভাবে অদ্যাপি যত কিছু কার্য্য প্রকাশ হইয়াছে, অগ্রে তাহার উপকরণ সংগৃহীত হইয়া পরে তন্মধ্যে সংকল্পের প্রকাশ হয়। যেমন একটী বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে রস ও পৃথ্বীতে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করিলে অগ্রে বীজ অঙ্কুর প্রকাশক উপকরণ বা উপায় চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ রসে বীজটী স্ফীত হয়, পরে তাহার আবরণ দ্বিখণ্ড হয়। পরে তেজ যোগে অঙ্কুরের প্রাক্‌ভাগ (শির বা মূল) প্রকাশ হইলে তদন্তে অঙ্কুর প্রকাশ হইয়া থাকে। তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে অগ্রে জীব ও জগৎগত উপাদান রূপে ঐ ত্রিয়োবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ হইলে পরে তত্ত্বের গুণভাগ প্রকাশ করণার্থ ঈশ্বর বাসনাযুক্ত কালশক্তি তাহাতে প্রবেশ করিল। এই কর্ম্ম প্রয়োজিকা কালরূপিণী শক্তিকে মহা প্রকৃতি কহে। অর্থাৎ জীব বা জগৎ যে উপায়ে ঐ তত্ত্ব সমূহের গুণে প্রকাশ হইবে তাহার স্বভাব ঐ শক্তিতে আছে বলিয়া উহাকে জীব ও জগতের স্বভাব বা প্রকৃতি কহে। এই প্রকৃতিকে লইয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব গণনা হইল। এই তত্ত্ব সমূহ একণে পরস্পর গুণভাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু অমিশ্রণ গুণে কাহারো সহিত মিলিল না, কারণ মিশ্রকরণাত্মক কর্ম্মশক্তি না থাকিলে কে সকলকে কার্য্যপর করিবে। সেইটী স্বতঃ ঈশ্বরের বাসনা শক্তি। সেই শক্তিকে ঈশ্বর কর্ম্ম করাইবার জন্য তাহাতে আহ্বান করিলেন। সেই শক্তি ঈশ্বরের বিম্ব অর্থাৎ আত্মাকে পুরুষরূপে লইয়া ঐ তত্ত্ব সমূহকে কার্য্যপর করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঈশ্বরের স্বকীয় শক্তির লয় নাই বলিয়া উহাকে তত্ত্ব বলা হইল না। যাহাতে ঈশ্বরের বাসনাগত ও পূর্ব্ব প্রলয়গত কারণ সমূহ সংগৃহীত অর্থাৎ কলিত থাকে তাহাকে কাল শক্তি কহে। কালকে দেবী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতনকারিণী। অর্থাৎ গুণপ্রকাশকারিণী। ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে যে সমূহ গুণ ছিল তাহা ঐ শক্তি প্রকৃতিরূপিণী হইয়া প্রকাশ ও হ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম কালী দেবী হইল।

শিঃ। ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইল ?

গুঃ। ঈশ্বর স্বশক্তি তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া কি করিলেন ?—না—সেই গুণ ভাগকে কার্য্যে পরিণত করিবার; সেই গুণের মধ্যে জীবের বা জগতের যে প্রকার লুপ্ত অদৃষ্ট রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার—জন্য তত্ত্ব সমূহের একত্রে সংযোজন করিলেন।

ত্রয়োবিংশতিগণ ঈশ্বরের স্বরূপের দ্বারা সক্রিয় ও অদৃষ্ট প্রকাশের উপায় প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বিকাশক গুণ জন্মাইয়া একত্রে সংযোজন করিলেন। অর্থাৎ ঐশিক স্বভাবে উহাদের গুণ সমূহ একত্রে যোগ হইল। যোগ হইলে এক প্রকার রূপের বা শরীরের প্রকাশ হইল। তাহাকে অধিপুরুষ বা বৈরাজ দেহ কহে। ঈশ্বর তত্ত্ব সমূহের মধ্যগত হইলেন বলিয়া এইস্থলে ঈশ্বরকে পুরুষ বলা হইল। পুরুষকে বেষ্টন বা অধিকার করিয়া ঐ গুণ সমূহ একটী আবরণরূপী হইল বলিয়া উহারা অধিপুরুষরূপী বিরাটের শরীররূপী হইল।

ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত অদৃষ্ট বিধাতা ও চৈতন্যাদি সকল শক্তির অধিষ্ঠাতা আত্মারূপ ব্রহ্মবিম্বকে তত্ত্বমধ্যগত সগুণ ঈশ্বরের বিরাট (অর্থাৎ বিশেষরূপে রাজিত) রূপ কহে। এই সর্ব্ব ব্যাপ্তি ভাব হইতে মিশ্রিত জগৎ ও জীব ভাব পরে প্রকাশ।

প্রকৃতির সম্মিলনে ঐ ত্রয়োবিংশতিগণ ঈশ্বরকে অর্থাৎ অদৃষ্ট বিধাতা বাসনাযুক্ত আত্মাকে আপন আপন মিশ্রিত গুণরূপী আবরণের মধ্যে পাইয়া প্রকৃতির ও ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারা সক্রিয় হইয়া ঐ আবরণকে এক প্রকার নূতন অবস্থার অবস্থান্তরিত করিল। সেই অবস্থাকেই ব্রহ্মাণ্ড কোষ কহে। সেই অণ্ডকোষটী কিরূপ ?—না—তাহাতেই পরে বিশ্ব ও জীব সৃজিত হইয়া স্থিত হইবে।

বিরাটরূপী ঈশ্বর ত্রয়োবিংশতিগণসম্ভূত মাত্রা সমূহের সংযোগে যে হিরণ্ময়* অণ্ডকোষ বা ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত হইল; তাহার অন্তরস্থ তরল ভাগের অর্থাৎ সর্ব্ব কারণের মিশ্রিত ভাগের মধ্যে তত কাল বাস করিলেন, যাবৎ সেই প্রকৃতি বা কালশক্তি জীব ও জগৎরূপে ঐ জলরূপী কারণ ও আবরণরূপী মাত্রাকে পরিণত

* হিরণ্য বলিতে সূক্ষ্ম কারণ। এস্থলে তত্ত্বসমূহের মিশ্রিত মাত্রা ভাগ বা গুণ ভাগ।

না করিবে। কাহার সহিত ঈশ্বর রহিলেন?—না—জীব ও জগতের অদৃষ্টের সহিত অর্থাৎ কিরূপে; কতরূপে জীব বা কি প্রকার জগৎ বা জীবাত্মা প্রস্তুত হইবে তাহার বিধাতৃ গুণ ভাগ লইয়া রহিলেন।

শিঃ। জীব সৃষ্টি কিরূপে হইল?

গুঃ। প্রকৃতি দ্বারা কারণ সমূহের পরস্পর গুণ প্রকাশ ও ঐশিক শক্তিতে সংযোগ হইতে হইতে এমন একটী অবস্থা উপস্থিত হইল, যেন জগৎ ও জীব প্রকাশ হইতে পারে; সেই অবস্থায় ঈশ্বর আপনার স্বভাবকে অর্থাৎ আপনার শক্তিগত জীব ও জগৎ প্রকাশক স্বভাবকে; প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্যামী জীবাত্মা বা চৈতন্যবিধাতা শক্তিরূপে এক ভাগে ভাজিত করিলেন। জীবের পক্ষে কর্ম্মকারক, কর্ম্ম প্রয়োজন বোধক প্রাণরূপে স্বভাবের অপরাংশকে দশভাগে ভাজিত করিলেন। এবং এই ক্রিয়া ও চৈতন্য সংযোগ ভোগ করিবার জন্য স্বভাবের অপরাংশ হইতে তিন অংশময় ভোগ দেহ প্রস্তুত করিলেন।

ঐ দশ প্রাণের মধ্যে নাগাদি পঞ্চ প্রাণ শরীরের বাহ্য দ্বারে থাকিয়া শরীর-কে সৃজন করে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু শরীরের মধ্যে থাকিয়া শরীর রক্ষা করে। এই দশ প্রাণের পরিচয় যোগশাস্ত্রে জ্ঞাতব্য। শরীরের তিন অংশের নাম অধ্যাত্ম—অর্থাৎ জীবাত্মা যে অংশে থাকেন। অধিদৈব অর্থাৎ মনাদি যে অংশে থাকেন। অধিভূত অর্থাৎ ভৌতিকাংশ যে ভাগে থাকে। স্বভাবতঃ এই ত্রিভাগীয় শরীরকে ভোগস্থল কহে। কারণ ভূতাদিতে কালধর্ম্মাদির সম্ভোগ হয়। মানস দেহে অনুভবাত্মক সমস্ত ক্রিয়া উপভোগ হয়। জীবাত্মময়ে কিম্বা ইন্দ্রিয়শক্তিযুক্ত অংশে ক্রিয়া দ্বারা চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বর জগতের আত্মা বা জীবাত্মারূপে নিজ স্বভাবকে একভাগে বিভক্ত করিলেন। আত্মার ক্রিয়া প্রকাশ সম্পাদনের জন্য জীব ভাব সংরক্ষণের জন্য দশ প্রাণরূপে বিভক্ত করিলেন। ঐ সংরক্ষণ ও জীব ভাব যে অংশের দ্বারা সর্ব্ব কর্ত্তব্য উপভোগ করেন, সেই ভোগাংশকে অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ শরীর কহে। এই ভাবে ঈশ্বর জীব কারণরূপী হইলেন।

ঈশ্বরের যে স্বভাবের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে প্রাণাদি, আত্মা, ও দেহাদি প্রস্তুত হইল, সেই অংশ সকল প্রাণীত্বের হেতু বা জীবত্ব হইতেছে। অর্থাৎ ঐ অংশ বিশিষ্ট মাত্রেই প্রাণী নামে অবিহিত হইল।

এই আদিভূত আত্মা তত্ত্ব সম্ভূত মাত্রার যে অংশে প্রাণীস্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন, সেই অংশকে জগৎ অর্থাৎ ভূত সংযুক্ত প্রাণীগণের আবাস বা জগৎ কহা যায়।

শিঃ। ভগবান্ অণ্ডমধ্যগত হইয়া কালমতে বিরাটরূপ ধারণ করিয়া প্রাণ রূপে দশধা, জীবাত্মা অর্থাৎ অন্তকরণরূপে একধা ও শরীর ত্রয়াংশরূপে ত্রিধা হইলেন ; ইহা কি কোন তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায় ?

গুঃ। মহদাদিগণেরা সৃষ্ট হইয়া আপনাপন চৈতন্য স্বভাব বশে সর্ব্ব কারণ-রূপী ঈশ্বরকে জগৎ ও জীবার্থে আকর্ষণ করিতেছিলেন। ঈশ্বর সেই আক-র্ষণটীকে বোধ করিয়া অর্থাৎ আত্ম চৈতন্যে তাহা অনুভব করিয়া তাহাদের কামণা পূর্ণ করিবার জন্য বিরাটরূপী হইলেন। দশ প্রাণরূপী সংস্কার দ্বারা বিষ্ণুরূপে এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছেন। অন্তঃকরণরূপী জীবাত্মা দ্বারা লীলা অনুভব করিতেছেন। এবং শরীরগত অংশত্রয় দ্বারা বাহ্য জগতের উপাদান ভোগ করিতেছেন। এই যে বিরাট অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি ঈশ্বর ভাব আপনিই আপনাতে আলোচনা করিয়া প্রস্তুত করিলেন। কারণ বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষ দেখা গিয়াছে ঐ সকল প্রাণাদির শক্তি সমভাবে জগতে ও জীবে ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু কোন তত্ত্বের মধ্যে নাই। উহারা তত্ত্ব সমূহকে সংযুক্ত মাত্র করিয়া লীলা করিতেছে।

শিঃ। জীব ঈশ্বর দ্বারা সংযোজিত হইয়া কিরূপে সজ্জিত হইল ?

গুঃ। ঈশ্বর বিরাটাংশ হইতে জীবরূপী হইতে প্রস্তুত হইয়া তত্ত্বগ্রামকে একত্রীভূত করিবার জন্য দশ প্রাণ রূপ আপনার স্বভাবের একাংশ হইতে প্রকাশ করিলেন। সেই তত্ত্বগ্রাম কিরূপে কোন অংশে থাকিয়া আত্মার কিরূপ আকার হইবে, তাহার জন্য তাহাকে আধ্যাত্মাদিভেদে তিন ভাগে ব্যবস্থিত করিলেন। এবং ঐ তত্ত্বগ্রামের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এই দৃশ্য ও প্রাকৃতিক ঘটনা ভোগ করিবার জন্য অন্তঃকরণ-রূপে একধা হইলেন।

জীবের এই প্রাণ, মন ও ভূতাদিরূপী তত্ত্বময় আবরণ সমস্তের কারণগত তেজ সেই ঐশিক চৈতন্য বা ইচ্ছা। কারণ প্রকৃতি হইতে এমন কোন ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায় না যে যাহার দ্বারা ভূতাদি তত্ত্ব হইতে জীবের দেহের মাংসাদি মনাদি ও অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপে ভোক্তা ও ভোগ গৃহ ও ভোজ্য প্রস্তুত করিবার পরে ঈশ্বর কি উপায়ে, জীবরূপে সমস্ত ভোগ করিতেছেন তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে।

আত্মা প্রথমে দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময় হেতু মনোভাব প্রকাশ করেন, সেই অন্তঃকরণ ভাব তেজ দ্বারা প্রকাশিত হইবার জন্য শরীরে বদনরূপী ছিদ্রের প্রকাশ হইল। সেই স্থান ভিন্ন অন্তঃকরণের বাচ্য অভিপ্রায় প্রকাশ সহজে হইবার জন্য স্বতঃ তেজ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন। কারণ শক্তি না হইলে বাচ্য ভাব প্রকাশ হইবার যো নাই। সেই শক্তির ক্ষমতায় জীবে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। বাক্য বলিতে যে কোন ভাবের বোধ্য অন্তঃকরণের প্রকাশ্য আভাষ। কারণ শব্দ বা বোধক ভাব না হইলে ঐ বাক্যভাব অপরের শ্রুত হইতে পারে না। বোধক হইবার জন্য বায়ুর আবশ্যক, নচেৎ আঘাত মাত্রা স্পর্শ হইবার আর কোন শক্তি নাই। তেজ না হইলে বায়ু আকর্ষিত হয় না, বায়ু না হইলে তেজ ব্যাপ্তি হয় না; শব্দ বা বোধকরূপী শূন্য না হইলে আঘাতজাত স্বরের কি অভিপ্রায় বোধ হইবার যো নাই। একা তেজের সাহায্যেই অপরাপর ভূতেরা বাক্যরূপী হইয়া সেই ঈশ্বরের বাসনা সেবা করিতেছে। অতএব বাক্য ক্রিয়ায় ভূতরূপী দেবগণ, একভাবে ঈশ্বর দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া জীবের সেবা করিতে লাগিল।

এইরূপে বদনের মধ্যে রস গ্রহণার্থ একটী স্থানের আবির্ভাব হইল; তাহাকে তালু কহে। তালু বদনের মধ্যে এমন একটী স্থান যাহার দ্বারা রসগত তেজের আস্বাদন হইয়া থাকে। সেই তালু প্রকাশ হইলে বরুণ অর্থাৎ জলরূপী দেবতা তথায় অধিষ্ঠিত হইলেন। কারণ রস না হইলে রস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আর কাহারো নাই। তেজে তেজ গ্রহণ করিতে পারে; বায়ুতে বায়ু গ্রহণ করিতে পারে। তদ্রূপ রসেই রস গ্রহণ করিয়া থাকে। জলময় বরুণ দেবতা তালুতে অধিষ্ঠিত হইলে, তাহার ক্রিয়া প্রকাশের জন্য একটী ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ হইল; তাহাকে জিহ্বা কহে। জিহ্বার ক্ষমতায় রসযুক্ত বস্তু গ্রহণ করণ ও আস্বাদন করা হয়। জিহ্বার সহিত তালুর ঐক্য থাকাতে সতত জিহ্বার রস থাকে, সেই রস দ্বারা জিহ্বা অপরের রস গ্রহণ করিয়া কটু তিক্তাদি অনুভব করেন। তেজের তারতম্যগত রসই কোন অংশে মিষ্ট কোন অংশে তিক্ত হইয়া থাকে। তেজ হইতে জলের জন্ম; এবং তালুতে তেজ বোধক শক্তি-

রূপী বরুণ শক্তি আছে বলিয়া জিহ্বার দ্বারা রসাদি বোধ হইয়া থাকে। কটু, তিক্তাদি বোধ করণাত্মক ক্ষমতা একমাত্র অন্তঃকরণের আছে, তদ্দ্বারা জীবাত্মা বোধ করিতেছেন।

ঐ রূপ পৃথিবীগত তেজকে অর্থাৎ গন্ধকে অনুভব করিবার জন্য জীবাত্মার বা বিরাটরূপী ঈশ্বরের তত্ত্বগঠিত দেহে এমন একটী স্থানের আবির্ভাব হইল, তাহাকে নাসা কহে। নাসা একটী দ্বার মাত্র; উহার অন্তরে ঘ্রাণবোধ করিবার জন্য একটী শক্তি আছে, তাহাকে অশ্বিনীকুমার দেবতা কহে। তেজ ও বায়ু মিশ্রিত এমন দুইটী অনুভবাত্মক স্থান নাসিকার মধ্যে আছে, তাহাকে যুগল অশ্বিনীকুমার কহে। উহারা বায়ুর একটী অংশ। ঐ শক্তির দ্বারা জীবাত্মা গন্ধরূপী তত্ত্বকে অনুভব করিয়া থাকেন।

ঐ রূপে অন্তঃকরণ বৃত্তির রূপ দেখিতে ইচ্ছা হইলে চক্ষু নামক অংশ দেহমধ্য প্রকাশিত হইল। সেই চক্ষুতে আদিত্যরূপে তেজশক্তি অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই তেজ দ্বারা অপর তেজ আকৃষ্ট হওয়াতে অক্ষি মধ্যে একটী রূপগ্রাহী প্রতিফলন শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার দ্বারা জীবে রূপ দর্শন করে। জড় জগতের সমস্ত দৃশ্যের বর্ণই রূপ বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানবিদেরা দেখিয়াছেন, যে চক্ষের তেজে ও বাহ্য জগৎগত জ্যোতির ঐক্য হইলে যে ভাগে জ্যোতি নাই, সেই ভাগে, চক্ষু হইতে একটী প্রতিফলিত আভা পতিত হইয়া থাকে। সেই আভা দ্বারা রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেখিবার যে শক্তি তাহাকে আদিত্য বা ত্বষ্টা বা অর্ক কহে। ঐ শক্তিটীর দ্বারা দৃশ্য গৃহীত হইলে জীব রূপ অনুভব করে।

গুরুত্ব ও লঘুত্ব বা উষ্ণশীতত্ব বোধককে স্পর্শ কহে। ঈশ্বর জীবাত্মারূপে স্পর্শন বোধরূপী ভোগ ইচ্ছা করিলে স্পর্শ শক্তি বোধক চর্ম্মরূপে আবরণ তত্ত্বময় শরীরে প্রকাশ হয়। সেই চর্ম্ম দ্বারা যাহাতে জীবাত্মা স্পর্শ অনুভব করিতে পারেন, এই জন্য বায়ুরূপে ভূত দেবতা তাঁহার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ঐ বায়ুর সহিত অন্তঃকরণের প্রাণরূপী স্বভাবের সংমিশ্রণ থাকা প্রযুক্ত আত্মা তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। এক বায়ু অশ্বিনীকুমার রূপে ও স্পর্শাত্মক অনিলরূপে ঈশ্বরেচ্ছায় রূপান্তরিত হইলেন।

সেই বিভুর শ্রবণের বাসনায় বর্ণ প্রকাশ হইলে তাহাতে দিক্‌শক্তি

অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের প্রকাশ করিলেন। তদ্দ্বারা জীবের শব্দ (বোধক) জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। শব্দের সীমা বোধককে দিক্‌শক্তি কহে। এই ব্রহ্মাণ্ড মহত্তত্ত্বাদি হইতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব প্রত্যেক অমিশ্র থাকিয়া চৈতন্যের আকর্ষণে এক প্রকার আকর্ষিত হইয়া ক্রমে নিম্ন ও উচ্চ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ বোধ বাচক অংশকে দিক্‌ কহে। যেমন একজনের অলক্ষ্যে অদূরে উভয় কাষ্ঠে আঘাত করিতে উভয় বস্তুর গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে একটী আঘাতগত ক্রিয়া হইল। সেই ক্রিয়াটী স্বরে পরিণত হইয়া বায়ুর সাহায্যে প্রবাহিত ও শূন্যের সাহায্যে বোধ হইতে হইতে যখন ঐ দূরস্থিত লোকের বোধক হইল। তখন সেই আঘাতগত স্বরটী শব্দরূপে বাচ্য হইল এবং ঐ শব্দ অর্থাৎ বোধ—কি বিষয়গত—ইহা স্থির করিবার জন্য স্বরের সীমা বোধ করিতে হয়। অর্থাৎ কোথা হইতে শব্দ উপস্থিত হইল তাহা জানিতে অন্তঃকরণ বৃত্তি ধাবিত হয়। ঐ যে শব্দবোধক শক্তিচয় স্থান নির্দ্দেশের জন্য ব্রহ্মাণ্ডে ও জীবে রহিয়াছে, তাহাকে দিক্‌ দেবতা কহে। ঐ দেবতার দ্বারা শব্দ বোধ হইবার জন্য উহা জীবাত্মার ইচ্ছানুসারে কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই জন্য জীবে ঘাত প্রতিঘাত স্বর হইতে শব্দ সিদ্ধি বা গোচর করেন।

বস্তু অনুভব করিবার জন্য ত্বচ প্রকাশ হইল, তাহাতে ওষধী নামক দেবতাগণ অধিষ্ঠিত হইলে লোম নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হইল, তদ্দ্বারা জীবে কণ্ডু অনুভব করেন। চর্ম্মের উপরিভাগস্থ অংশকে অর্থাৎ যাহা লোম সংযুক্ত ও সূক্ষ্ম, সেই চর্ম্মভাগকেই ত্বচ কহে। সেই ত্বচের দ্বারা কণ্ডু উপলব্ধ হয়। গুরুত্ব বা লঘুত্বহীন ও উষ্ণ শৈত্যহীন অতি সূক্ষ্ম বোধককে কণ্ডু কহে। ঐ কণ্ডু লোমোপরি মৃদু সাধনে ও ত্বচগত অন্তরস্থ রসাবির্ভাব হওনে প্রকাশ হইয়া থাকে। শরীরের মধ্যে ব্যান বায়ুর দ্বারা চর্ম্মগত সূক্ষ্ম শিরা সমূহ হইতে এক একটী ছিদ্র অসার বায়ু নির্গমনের জন্য দেহের উপরিভাগে আছে। সেই ছিদ্রের আবরণরূপে লোমরূপী কেশশ্রেণী ত্বকের উপরি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কণ্ডুকার্য্য প্রকাশ রূপে আছে। ঐ অসার আকর্ষণ ও সূক্ষ্ম দোষানুভবাত্মক ওষধী শক্তিগণ ত্বকের অন্তরে নিহিত আছে। ওষধী শক্তির দ্বারা অমৃত গ্রহণ ও অসার ত্যাগ হয় বলিয়া লোমকূপগত শক্তিকে ওষধী বলা

হইল। শুদ্ধ বায়ুাদিকে অমৃত কহে,লোমকূপ দ্বারা তাহা গৃহীত হইয়া থাকে। বা আকর্ষণ বা প্রসারণ উভয় ক্রিয়াতেই প্রকাশ হয় বলিয়া ঐ ক্রিয়াকে বস্ত্র কহে। জীবে লোম ইন্দ্রিয় ও ত্বচগত ওষধী শক্তির দ্বারা একমাত্র বায়ুর গুণে বা রূপান্তরে বস্ত্র বোধ করিয়া থাকে।

যে শক্তির দ্বারা মহত্তত্ত্বরূপী তত্ত্বসমষ্টি রূপে সূক্ষ্মাংশ বীর্য্য প্রতিপালিত হয়, তাহাকে প্রকৃতি বা প্রজাপতি কহে। ঐ বীর্য্য প্রকাশ করণাত্মক আনন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিলে মেঢ় বলিয়া লিঙ্গদ্বার নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হইল। সেই ইন্দ্রিয় দ্বারের সাহায্যে রেত গৃহীত ও নিঃসৃত কালে যাহাতে আনন্দ লাভ হয় এমত বোধক একটী শক্তি অধিষ্ঠিত থাকে। উহাকে প্রজা-পতি বা মহত্তত্ত্বাংশ কহে। ঐ শক্তি দ্বারা বীর্য্য নিক্ষেপকালীন আনন্দভোগ হইয়া থাকে। যাহার ঐ শক্তি নাই তাহাকে ক্লীব কহে। জীবাত্মারূপী ঈশ্বরের ইচ্ছায় মহত্তত্ত্বরূপী দেবতা বা তত্ত্বাংশ ঐ স্থানে প্রজাপতি রূপে রূপা-ন্তরিত হইলেন।

জীর্ণ বিকারাংশ ত্যাগ করণকে বিসর্গ ক্রিয়া কহে। অর্থাৎ বিষ্ঠাত্যাগ। ঈশ্বরের জীবদেহ মধ্যে অসারাংশ বহিষ্করণাত্মক দ্বারের প্রয়োজন হইলে গুহ্যদ্বারের প্রকাশ হইল। সেই দ্বারের ক্রিয়া নিয়মিত অতিবাহিত করিবার জন্য মিত্রনামক তেজোশক্তি অধিষ্ঠিত হইলে; সেই তেজ মিশ্রিত ক্রিয়াশক্তির স্থানকে পায়ুনামক ইন্দ্রিয় কহে। জীব তদ্দ্বারা বিষ্ঠাদি ত্যাগ করেন।

দান অর্থাৎ স্বার্থত্যাগ এবং গ্রহণ অর্থাৎ স্বার্থগ্রহণ ঐ উভয় বৃত্তির দ্বারা কি আহারীয়, কি অপর বিষয়াত্মক সমস্ত ক্রিয়াই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সমস্ত ক্রিয়ার উপাধিই দান ও গ্রহণ, এইজন্য জীবিকা নির্ব্বাহার্থ উপায়বিধান-কারী শক্তিরূপী ইন্দ্র অর্থাৎ কর্ম্মাত্মক জ্ঞান, এই কর্ম্মাত্মক ইন্দ্রিয় মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকাতেই এই হস্তবাচক শরীরাংশ সক্রিয় হইয়া থাকে।

পরে বিরাটরূপী ঈশ্বর বা আত্মা গমন ইচ্ছা করিলে পদরূপী শরীরাংশের প্রকাশ হয় এবং বিষ্ণুরূপী পালনাত্মক তেজ তাহাতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হয়। অন্তঃকরণে জীব গমনেচ্ছা করিলে বিষ্ণুশক্তির সাহায্যে পদ গমন করিয়া থাকে। সেই শক্তি আছে বলিয়া তাহার দ্বারা জীবে পদে গমন করিয়া থাকে।

অনেকে মনে করিতে পারেন হস্তপদাদি যে ভাবে বর্ণিত হইল ইহাতে

কেবল মানব বুঝান হইতেছে; এ বর্ণনার উদ্দেশ্য তাহা নহে। প্রাণীমাত্রেরই ইন্দ্রিয় বৃত্তি, মনোবৃত্তি, ভূতবৃত্তি আছে, তন্মধ্যে যে প্রাণীতে যে ইন্দ্রিয়ই সক্রিয় হউক না, সেই ইন্দ্রিয়েরই পূর্ব্ব বর্ণিত শক্তি ও পূর্ব্ব বর্ণিত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেমন হস্তী শুণ্ডের দ্বারা বস্তু গ্রহণ করে, গবাদি মুখ দ্বারা আহারীয় গ্রহণ করে; ঐ মুখ ও শুণ্ডই হস্তরূপী ইন্দ্রিয় শক্তিরূপে উহাতে সক্রিয় বুঝিতে হইবে। হস্ত পদাদি সংজ্ঞামাত্র। ক্রিয়াবোধক হইলেই উপলব্ধির সুবিধা হইবে ইহাই বিজ্ঞান বিধি হইতেছে।

সেই বিভুর মনন ইচ্ছায় হৃদয় প্রকাশ হইলে মনোরূপী অংশের সহিত চন্দ্রনামক দেবতা তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়েন; তদ্দারা জীবে সংকল্পাদি করিয়া থাকেন। তেজের প্রতিফলন অবস্থাকে চন্দ্র কহে। ঐ শক্তির দ্বারা বিশ্বের ক্রিয়া প্রকাশ হয়। জীবপক্ষে স্বভাবগত ও অভাবগত ক্রিয়া সেই মাত্রাত্মক শক্তির দ্বারাই প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ শক্তি হৃদয়ে অর্থাৎ অন্তঃকরণের সন্নিহিত বা বেষ্টিত প্রদেশে অবস্থান করিয়া মনের আবির্ভাব করে। ঐ মন দ্বারা জীবে সংকল্পাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে। আপনাপন স্বভাবগত ক্রিয়াকে সংকল্প কহে। ঐ সংকল্প দ্বারা সকল ইন্দ্রিয় সক্রিয় হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল তাহার মধ্যে চন্দ্রাংশ অর্থাৎ মনোরূপী দেবতা জীবের পক্ষে এইরূপে রূপান্তরিত হইলেন।

সেই বিভুর অহঙ্কার প্রকাশ হইলে তাহাতে অভিমানরূপী রুদ্র (অর্থাৎ তমোগুণ) অধিষ্ঠিত হইলেন; তদ্দারা ঈশ্বরেচ্ছায় জীবে কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তব্য বোধ করিয়া থাকে। মনে কোন একটী সংকল্প উপস্থিত হইলে; তাহাকে কর্ম্মে পরিণত করিতে অন্তরে যে একটী অহংভাবের উদয় হয়, তাহাকে অহঙ্কার কহে। আমি এই-কর্ম্ম করিতেছি, আমা ভিন্ন এ কর্ম্ম করণের অন্যহেতু থাকুক বা না থাকুক; ইহাতে আমার অধিকার আছে, এই অহংবাচক ভাবকেই অহঙ্কার কহে। স্বভাব অদৃষ্টরূপী কর্ম্মকে সক্রিয় করিয়া তাহাতে ঐ অহঙ্কার যে শক্তির দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া কর্ম্মবোধ করে তাহাকে অভিমান কহে; অভিমান তমোগুণ বা রুদ্র নামে দেবতা। ইহাও সেই তত্ত্বাংশগত একটী দেবতা বুঝিতে হইবে। ঐ অভিমান দ্বারা জীবের বাসনা, পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ত্তব্য বলিতে কর্তৃত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাহা করিতে

হইবে। মনে সংকল্প উদয় হইলে অহঙ্কার দ্বারা তাহাকে করণীয় বলিয়া অভিমান যোগে বোধ হইলে তবে কোন একটী মন্ত্র বা সংস্কার্য্য সংসারে প্রকাশ পায় বুঝিতে হইবে।

সেই ভগবানের সত্বভাব উপস্থিত হইলে তাহাকে সক্রিয় হইবার জন্য ভগবান্ ব্রহ্মা চৈতন্যাংশের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন; তাহার সাহায্যে চৈতন্যময় বুদ্ধিগত বিজ্ঞান জীবে উপভোগ করে। বাসনার এবং মনের সংকল্প যে ভাবে সক্রিয় হইলে অভিলষিত অনুষ্ঠানের পূরণ হয় তাহাকে স্থির বা সত্বভাব কহে। ঐ ভাব যে শক্তির সাহায্যে জীবে বোধ করেন তাহাকে চৈতন্যগত ব্রহ্মা "বা মহত্তত্ব কহে"। লৌকিকে বা শরীরাংশে তাহাকে বুদ্ধি কহে। তদ্দ্বারা জীবে এইরূপ কার্য্য উচিত এই বিজ্ঞান বোধ করিয়া থাকেন। এই বুদ্ধির শক্তিকে মহত্তত্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—ঈশ্বর যখন মহত্তত্ব প্রস্তুত করিলে জগৎ কিরূপ হইবে তাহার সংকল্প তাহাতে আধান অর্থাৎ পরিণামের ভাব তাহাতে আধান করিয়াছিলেন। বুদ্ধিতে যখন পরিণাম বোধ হইয়া থাকে তখন উহা যে সেই মহত্তত্বরূপী তত্ত্বাংশ দ্বারা স্ফুট তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর এই জগৎপক্ষে তিনটী আবরণে আবৃত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। একটী আবরণের নাম প্রাণ। তাহারা দশবিধ উপায় অবলোকন করিয়া জীবকে বেষ্টন করিয়া আছে। নাগ, দেবদত্ত ধনঞ্জয়, কূর্ম্ম ও কৃকর এই পঞ্চ প্রাণের দ্বারায় গীরণ, উচ্চারণ, শ্বাস, চক্ষুরুন্মীলন, ও শ্রবণাদি হইয়া থাকে। পরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রকাশ; শরীরের তেজাদির সমাধান, উদ্গীরণ ও সর্ব্বশরীরে রক্ত সঞ্চালন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অর্থ বলিতেঃ—হস্তাদি অবয়ব ও উহাদের কার্য্যভাব অর্থাৎ হস্তের গ্রহণাত্মক অবস্থা। যেমন হস্ত ভিন্ন পদের গ্রহণাত্মক শক্তি নাই। ইহা একটী আবরণ স্বরূপ। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি লইয়া জীবের দুইটী আবরণ হইল। তৃতীয় আবরণটীর নাম ইন্দ্রিয়শক্তি। অর্থাৎ যে চৈতন্যশক্তি ইন্দ্রিয়াদির মধ্যগত হইয়া বাসনার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। এই যে তিনটী আবরণ, ইহাতেই দেহের সমস্তই বর্ণনা করা হইল। কারণ হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় ও তাহাদের শক্তি সঞ্চারক শিরা স্নায়ু অস্থ্যাদি বর্ণনা

করা হইল। ইন্দ্রিয়াদি বলিতে এক প্রকার ভৌতিক আবরণ। শক্তি বলিতে চৈতন্যগত আবরণ, প্রাণাদি বলিতে স্বাভাবিক আবরণ। এই ত্রিবিধ আবরণে আবৃত হইয়া ঈশ্বর জীবরূপী হইয়া আছেন।

শিঃ। ঈশ্বর কোন শক্তির দ্বারায় জগৎ ও জীবরূপী হয়েন ও আপন স্বরূপে লীন হয়েন?

গুঃ। ঈশ্বর যখন অজ্ঞানাবরণে আবৃত হয়েন নাই, তাঁহার বাসনার ক্রিয়া নাই। প্রবৃত্তি না থাকিলে কেহ কখন সক্রিয় হইতে পারে না। এক্ষণ যিনি পূর্ণ সৎস্বরূপ তাঁহাকেও যে শক্তির দ্বারা জগৎ ও জীবরূপে পরিণত ও অন্তে স্বরূপে লীন হইতে হইতেছে তাঁহাকেই মায়া কহে। প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধি অনুভূত হইয়া থাকে। জগৎ ও জীব যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে এবং ইহাদের কারণ যখন ঈশ্বর বলিয়া শ্রুতি হইতে সকল শাস্ত্রে প্রমাণ করিয়াছেন, তখন ঈশ্বর যে শক্তিতে জগৎ বা জীবরূপে পরিণত ও প্রলয়ে স্বরূপে স্থিত হয়েন এই পরিবর্ত্তনাত্মক প্রবৃত্তিটী বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই শক্তিকে মায়া কহে। ইহাই বিরাটরূপী হওনের কথা বলা হইল, পরে জীবভাবের কথা বলিতেছি।

সেই ঈশ্বরই আবার মায়া সংযোগে ত্রিগুণ মধ্যগত হইয়া প্রবৃত্তি পাইয়া আবদ্ধও হইয়া থাকেন। এই আবদ্ধাবস্থাকে জীবভাব কহে। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ও অহংকারাদি বাচক জীবাবস্থাই জীবের পক্ষে ত্রিগুণ বাচক বন্ধনের কারণ। অতএব এইসকল প্রত্যক্ষ অবস্থান্তর দেখিয়া এই অবস্থাগুলি যে কল্পনামাত্র তাহাও বুঝিতে পারা যায়। তখন ঈশ্বর ইন্দ্রজালময় কোন শক্তিতে যে সম্বন্ধীভূত আছেন ইহা প্রমাণ হইল।

মায়াকে তর্কে বুঝিবার উপায় নাই। কারণ নিত্যসিদ্ধ বস্তু তর্কে প্রমাণ হয় না। বিরোধ স্বভাব না থাকিলে সন্দেহ উপস্থিত হয় না। সন্দেহ না হইলে তর্ক উপস্থিত হয় না। মূলে যদি পরিশুদ্ধ ও স্বয়ং জ্ঞানময় না হইলে মায়া উপলব্ধিভূত হইতে পারে না। তখন তর্করূপী সন্দেহাবস্থায় তাঁহার প্রমাণ কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে। প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষ সকল সিদ্ধ বস্তু জ্ঞানময় যুক্তির দ্বারা অনুভব হইতে পারে। তর্কটী বুদ্ধির ক্রিয়া। লৌকিক ভাবে অনুমান তর্কদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, স্বাভাবিক সিদ্ধ বস্তু যুক্তিদ্বারা

উপলব্ধি মাত্র হয়, কিন্তু বিজ্ঞান ভাব ভিন্ন আপনাতে অনুভব হয় না জানিবে।

শিঃ। যখন ঈশ্বর ও জীব পূর্ণত্ব ও অংশত্ব ভেদে এক, তখন ঈশ্বর ও জীবে প্রভেদ কি?

গুঃ। ঈশ্বর ও জীব সমভাবাপন্ন, উভয়ে অকলুষিত জ্ঞানময়, চৈতন্যময় অর্থাৎ ঈশ্বর পক্ষে যাহা বর্ত্তমান, জীবেতেও তাহাই বর্ত্তমান, কিন্তু জীবে ও ঈশ্বরের এই প্রভেদ যে ঈশ্বর পূর্ণত্বহেতু মায়ার দ্বারা আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়েন মাত্র, জীব মায়াগত ত্রিগুণের অর্থাৎ ভোগাদির সাক্ষী স্বরূপ হইয়া আবদ্ধ থাকেন। ঐ কর্ত্তৃত্বাদিগুণে জীব স্বতঃ আসক্ত নহেন; আবদ্ধ বা সাক্ষী মাত্র। সে কিরূপ? যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নের ক্ষমতায় ভ্রম মাত্রে স্বাত্মমস্তকচ্ছেদনাদিকে সত্য বলিয়া অনুভব করে; কিন্তু বাস্তবিক তাহার শিরচ্ছেদন হয় নাই। তদ্রূপ মায়ার দ্বারা এই কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কারাদিতে জীব সাক্ষীমাত্র হইয়া অনুভব করেন; এই অনুভবে তাঁহাতে একটী ভ্রমাত্মক স্বভাবের আবির্ভাব হয়, সেই স্বভাব বশতঃ জীবের আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ "সোহহং" ভাবের হ্রাস হয় মাত্র। যেমন রঙ্গীন কাচের মধ্যে চক্ষু রাখিলে আপনাকে রঞ্জিত বিষয়ের দ্রষ্টা বলিয়া অনুভব হয়। তদ্রূপ মায়ার দ্বারা ঈশ্বরাংশ কর্ত্তৃত্বাদি উপাধি মাত্র প্রাপ্ত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন।

শিঃ। জীবকে তর্কের দ্বারা পরীক্ষা করিলে কেন ঈশ্বরবৎ বলিয়া অনুভব হয় না?

গুঃ। যেমন জলের কম্পিত গুণ মধ্যগত চন্দ্র বিম্ব পতিত থাকিলে তীরস্থিত দ্রষ্টা বিম্বকে কম্পিত দেখে, কিন্তু আকাশের চন্দ্রকে কম্পিত দেখে না, তদ্রূপ তর্ক বুদ্ধিতে গ্রাহ্য বিষয় গৃহীত ও পরীক্ষিত হয় বলিয়া আত্মার মায়াগত উপাধিকে ভেদ করিতে না পারিয়া জীবকে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি গুণময় বলিয়া স্বীকার করে এবং জীবের সত্তা ঈশ্বরকে উপাধিশূন্য চন্দ্রবৎ পরিশুদ্ধ বলিয়া বোধ করে। কিন্তু বস্তুতঃ কম্পনাদি গুণ জলের, চন্দ্রের নহে।

এই প্রমাণে জীবত্বের একত্ব স্থাপন একভাবে দেখান হইল। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপ্ত ও স্বরূপ শক্তিমান্ বলিয়া সকলেই আকাশগত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া অনুভব সহজেই করিতে পারেন, কিন্তু জীবকে পারেন না;

তাহার কারণ এই যে জীব অতি ক্ষুদ্র তাহা লীলার্থে মায়াগত উপাধি বিশিষ্ট হইয়া কর্ত্তৃত্বাদিগুণে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। যদি কেহ বলেন যে ঐ কর্ত্তৃত্বাদিগুণ জীবাত্মাতে বর্ত্তমান আছে? সেই সন্দেহ নিরারণার্থ বলা হইতেছে যে চন্দ্রের বিম্বের উপরে জল কম্পনাদি অনুভূত হয়; অর্থাৎ এক অবস্থার উপরে অবস্থান্তর উপস্থিত না হইলে অবস্থা বোধ হয় না। ঐ কর্ত্তৃত্বাদি যদি আত্মার থাকিত, তাহা হইলে নামান্তর বা কার্য্যান্তর হইবার উপায় নাই। যেমন জগৎ যদি কৃষ্ণবর্ণময় হইত তাহা হইলে উহাকে কৃষ্ণত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণ বলিয়া একটী বর্ণ আছে কে অনুভব করিতে পারিত। শ্বেতাদি আছে বলিয়া বর্ণের নানাবিধ অবস্থান্তর বোধগম্য হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ নির্দ্দেশ করা যায়। তদ্রূপ জীবের পক্ষে কর্ত্তৃত্বাদি গুণ যদি একা সেই জীবাত্মায় থাকিত তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বাদির ভেদ বোধ হইত না, কারণ ভেদাবস্থা না থাকিলে ভেদানুভব হয় না। সুখ, দুঃখ, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এ সমস্ত ভেদ বাচক অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। নচেৎ যেখানে সুখ নাই সেখানে দুঃখ বলিয়া কাহারো বোধ হয় না। যেখানে ভোগ নাই সেখানে কর্ত্তৃত্ব বোধ হয় না। তদ্রূপ আত্মার সজীবত্ব শক্তিতে ঐ সমস্ত আবরণ পতিত হওয়ায় তাহারা সজীবত্বের উপরে গুণান্তর বলিয়া সাধিত হইয়া থাকে। যখন গুণান্তর সাধিত হইতেছে তখন উহাদের প্রকাশ শক্তি আছে। সেই শক্তির দ্বারা ঐ সজীবত্বরূপী জীবাত্মা সাক্ষীস্বরূপ হইয়াছেন; কারণ জন্মমরণাদিই সজীবত্বে স্বভাব; উহারা না প্রকাশ হইলে সুখাদি বা ভোগাদি কখনই প্রকাশ হয় না। এই প্রমাণে জন্ম ও মরণ ধর্ম্মা আত্মাতে সজীবত্ব ব্যতীত অনাত্মধর্ম্মরূপী ঐ কর্ত্তৃত্বাদি একা মায়ার দ্বারা সংযুক্ত হয় মাত্র। উহাদের দ্বারা আত্মার বন্ধ মাত্র হয়; বিকার হয় না।

আত্মাতেও ঈশ্বরগত অসঙ্গ বা সদা নির্ম্মুক্ত ভাব বর্ত্তমান আছে। সাধনার দ্বারা যদি জীবের বাসনাকে নিবৃত্তিধর্ম্মপর করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি সংযোগ করা যায় এবং সেই ভক্তির সিদ্ধি যদি তাহাতে হয় তাহা হইলে অবশ্যই জীবের ঐ সুখ দুঃখাদি ও কর্ত্তৃত্বাদি অবস্থা থাকে না। জীব তখন দেহী ধর্ম্মী হইয়া ও সদামুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে ঐ সুখাদি যদি আত্ম ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে তাঁহা কখনই পরিত্যক্ত হইত না।

অতএব জীব অসঙ্গ স্বভাবাপন্ন বটেন, কিন্তু মায়াদ্বারা আবৃত থাকায়

সহজে যে ভাবের প্রকাশ হয় না, কর্ত্তৃস্বরূপ মনকে নিবৃত্তিপর অর্থাৎ আসক্তি-হীন করিয়া ভগবানে ভক্তি সদা স্থাপন করিলে জীব দেহধারী হইয়াও অসঙ্গ হইতে পারেন।

শিঃ। ঈশ্বর অদ্বিতীয় কিন্তু জীবে কি ঈশ্বরের ন্যায় অদ্বিতীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন?

গুঃ। ঈশ্বর অদ্বিতীয় অর্থাৎ অপর সংযোগে কর্ম্মী নহেন। জীবেও সেই অদ্বিতীয়ত্ব বর্ত্তমান আছে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তি সহকারে পবিত্র হইলে জীব অসঙ্গ হইতে পারেন। ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহ যতক্ষণ বিষয়পর থাকে ততক্ষণ কার সাধ্য অকর্ম্মা হইতে পারে। অদ্বিতীয় বলিতে আপনাতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে আপনার স্থিতি, আপনা ভিন্ন অপর বস্তুর আশ্রয়ে কর্ম্মীভাবে স্থিতি নহে। ঐ অদ্বিতীয় ভাবে জীবকে থাকিতে হইলে নিষ্কাম হইতে হয়। ইন্দ্রিয়াদি বিষয়াসক্ত থাকিলে তাহাদের শক্তির তেজে মনাদি সমস্ত সক্রিয় থাকে। জীবকে অদ্বিতীয় হইতে হইলে ঐ শক্তি সমূহ হইতে অতীত হইতে হয়। এইটাই শক্তির কার্য্য। শক্তি থাকিতে কার্য্য প্রকাশ কিরূপে নিবারিত হইবে। তাহার প্রমাণ এইঃ—দেহী নিদ্রিত হইলে যেমন তাহার ইন্দ্রিয়াদি আত্মাতে প্রযুক্ত হয়। কাল দ্বারা নিদ্রা তিরোহিত হইলে ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় হইয়া থাকে।

জীবভাবে মনেন্দ্রিয়াদি নিরত হওনকে নিদ্রা কহে। উহা একপ্রকার লয়। শক্তি সমূহ সক্রিয় হইলে ঐ লয় আবার প্রকাশরূপী হইয়া থাকে। ঐ শক্তি সমূহ যদি ঈশ্বরে লীন করা যায় তাহা হইলে জীবের স্বরূপ লাভ হইয়া থাকে। কারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও বিকার এই সকল কার্য্যে জীব সংসারী ও মায়াযুক্ত। ঐ সকল হইতে যদি ইন্দ্রিয়কে ঈশ্বরের আশ্রয়ে রাখা যায় তাহা হইলে অবশ্যই জীব আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারে। যেমন নিদ্রিত অবস্থায় আত্মা বিষয়হীন হইয়া থাকে।

শিঃ। মহত্তত্ত্বাদি হইতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের প্রলয় বা পরিণাম কয় প্রকার?

গুঃ। মহতত্ত্ব হইতে ভূত তন্মাত্রাবধি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া এই জগৎ ও জীবের স্থূলরূপ প্রকাশ করিতেছেন ইহাই শ্রুতিগত বিজ্ঞান নির্দ্দেশ

হইয়েছে। কারণ তত্ত্বসংক্রান্ত পদার্থ মাত্রেই পরিণামশীল ও পরস্পর ভিন্ন ভাবাপন্ন বুঝিতে হয়। ঐ পরিণাম দ্বিবিধ ; প্রথম পরিণামকে পরিবর্ত্তনাত্মক কহে। দ্বিতীয় পরিণামকে—প্রতি কারণ লয়গত পরিবর্ত্তন কহে। দূষিত ভূতাংশের শোধনাত্মক অর্থাৎ প্রাণী ও স্থূল ভূতাদি বিকারিত হইয়া সূক্ষ্মভাবাপন্ন হওনাত্মক পরিণামকে পরিবর্ত্তনাত্মক পরিণাম কহে। যেমন সূর্য্যের বিষুব-রেখার সমীপবর্ত্তী সাগরগত জলরাশি উত্তাপময়ে তরল ও শৈত্য বিহীনাদি নানা দোষে দূষিত হইয়া আপনাপন আকর্ষণ মতে সূর্য্য ও চন্দ্রের কেন্দ্রা-ভিমুখে যাইয়া শৈত্যাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; পুনরায় বিষুবস্থলে আসিয়া জীব ও জগতের ব্যবহার্য্য ও দূষিত হইয়া ঐরূপ পরিবর্ত্তনে গমন করে। এই রূপে বায়ু, বারি, পৃথ্বী প্রভৃতি স্থূল ও তত্ত্বাংশের অবস্থা শোধক পরিণাম ও পচ্যমান প্রাণী দেহাদির কিম্বা দহ্যমান জীব দেহাদি হইতে ভূত বা তত্ত্ব সমূহের পরিণামকে পরিবর্ত্তনাত্মক পরিণাম কহে।

এতদ্ভিন্ন কারণগত লয়াত্মক পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন উত্তাপ সহযোগে বারি তেজ মিশ্রিত, তেজ বায়ুতে—মিশ্রিত হইয়া যায়। বৃক্ষ বীজে পরিণত ; জন্ম মৃত্যুতে পরিণত হইয়া যায়। এই সকল পরিণামকে কারণগত অর্থাৎ যে পদার্থের যে অবস্থাটী কারণ ; সেই কারণটীরও যে অবস্থা কারণ ; পরস্পর পরস্পরে লয় হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ পরিণাম ভেদে প্রলয় অর্থাৎ কার্য্য প্রকাশ ক্ষমতা—বিহীনত্ব—অবস্থাকে চারিভাবে বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছে। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত, ও মহান্ এই চারি প্রকারে—জগতে প্রলয় প্রকাশ আছে।

ঐ চারি প্রকার লয়, তত্ত্ব সমূহের পরিবর্ত্তনাত্মক স্বভাব হইতে প্রকাশ হয়। পদার্থগত পরিণামশীল পরস্পর ভিন্ন ও কারণময় স্থূল ভাগকে পদার্থ কহে এবং তাহাদের সক্রিয় করণাত্মক অতিসূক্ষ্ম চৈতন্যময়ী নানাবস্থাপন্না অবস্থা ভেদকে শক্তি কহে। তত্ত্বসমূহের পরিণাম আছে, শক্তি সমূহের পরিণাম নাই। সেই শক্তি সমূহ প্রলয়ে লয় না হইয়া প্রলয়ান্তে ঈশ্বরের সহিত অবস্থান করেন। শক্তি সমূহই স্বভাব ও চৈতন্যকর্ত্রী। যদি উহাদের লয় থাকিত তাহা হইলে জগৎ ও জীব জড়তাপন্ন হইয়া যাইত, জড়ের লয় হইত না। কারণ চৈতন্য বস্তুর আবরণরূপী স্থূল ভাগই জড়। জড়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে উহারা

সজীব ও সক্রিয় হইয়া লীলা করিতে পারে। এক সজীবক ও সংযোজক বিয়োগরূপী কালচৈতন্যের সাহায্যে জড়ভাব গঠিত, বর্দ্ধিত এবং পরিচালিত হইয়া অন্তে সেই স্বভাবের বৈপরীত্যে লয়ের অনুগামী হইয়া থাকে। এইরূপে নানা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে কাল চৈতন্যাদি মায়া প্রকাশিকা শক্তি সমূহ প্রলয়ে ঈশ্বরে অবস্থান করেন। তাঁহাদের কার্য্যরূপী জড় স্বভাবীয় জগৎ ও জীব বিকারিত হইয়া লয় হইয়া থাকে। ঐ যে শক্তি সমূহের অবস্থান উহা-দেরই পুরাণে ঈশ্বরের শয়ানকালীন সেবক কহে। নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে—শয়ান কহে। প্রলয়ে ক্রিয়ানাশ হইল বলিয়া স্বশক্তির সহিত ঈশ্বর শয়ান রহিলেন অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইলেন ইহাই পুরাণের অভিপ্রায়।

শিঃ। কোন তেজ বা স্বভাব হইতে জীবের জীবত্ব অর্থাৎ জ্ঞানাদি মনাদি ও ভূতাদির মিলন ও বিলয় প্রকাশ হইয়া থাকে ?

গুঃ। বিজ্ঞানবিদেরা অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে ঈশ্বরের পালন গুণ নির্ণয় করিয়া তাহাকে চারি অবস্থাপন্ন বলিয়া ভেদ করিয়াছেন। ঐ চারিটীর মধ্যে একটী জ্ঞান বা মনরূপে জীবভাবে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ জীব ও জগৎ পালন করেন। আর একটী চৈতন্য বা চিত্তরূপে অবস্থান করেন। আর একটী বুদ্ধি বা স্বভাব রূপে অবস্থান করেন। আর একটী পরিবর্ত্তন বা অহঙ্কাররূপে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু বিধাতৃ অবস্থারূপে অবস্থান করেন। জীবপক্ষে ঐ চারিটী অবস্থাকে মন বা জ্ঞান, চিত্ত বা চৈতন্যের প্রতিফলন অবস্থা; বুদ্ধিও জন্ম মরণাত্মক এই চারি ভাবীয় পরিণাম কহে। মন বলিতে অনুভবশক্তি; তাহাই জ্ঞানের পরিচায়ক। চিত্ত বলিতে চৈতন্যের অর্থাৎ স্মৃত্যাদির ধারক; তাহাই চৈতন্যের পরিচায়ক। বুদ্ধি বলিতে আপনাপন স্বভাবের ক্রিয়াশক্তি; তাহাই স্বভাবের পরিচায়ক। অহঙ্কার বলিতে আমি সৎ অর্থাৎ আমা হইতেই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব হইতেছে। ইহাই—আত্মার পরিচায়ক।

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ঐ চারিটী ঐশিক অবস্থাকে; জ্ঞান বা স্বভাবের নিয়ন্তা; চৈতন্য বা স্বভাবের আধার; ঐশিক বাসনার স্বভাব এবং আবির্ভাব ও তিরো-ভাবীয় সত্তা বা অহঙ্কার কহে।

এই বিশ্বের প্রকাশ ও নিরোধক ঐশিক তেজকে সংকর্ষণ বা অহঙ্কার কহে। ঐ অবস্থা আবির্ভাব বা বাসনাপন্ন হইলে জগতের সৃষ্টি হয়; এবং

বাসনাহীন হইলে প্রলয় হইয়া থাকে। সেই—আত্মরূপী সৃজনপ্রলয়কারী অহংশক্তিরূপী সংকর্ষণ রূপই জগতের নিয়ন্তা এবং জীবের নিয়ন্তা। এই স্বভাব হইতেই জীবের জীবত্ব অর্থাৎ জ্ঞানাদি মনাদি ও ভূতাদির মিলন ও বিলয় প্রকাশ হইয়া থাকে।

শিঃ। জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাব এই দুইটী অবস্থান্তরের ভেদ কিরূপ?

গুঃ। আবির্ভাব তিরোভাবটী স্থূল ও সূক্ষ্মের অবস্থা ভেদমাত্র, বস্তুগত ভেদ নহে জানিবে। সংহার না হইলে যখন প্রকাশ অসম্ভব, তখন লয় বা অবস্থান্তর না থাকিলে, কখনই প্রকাশ বলিয়া গণনা হয় না; তখন ঐ উভয়াবস্থাই যে এক তাহা কে না স্বীকার করিবে। স্বকার্য্যমতে প্রলয়াপন্ন ঐশিক ভাব ও সৃষ্টিগত ঐশিক ভাব অর্থাৎ ঈশ্বর এক কেবল কার্য্যভেদে অবস্থাভেদাপন্ন হয়েন মাত্র।

শিঃ। এই বিশ্বের একেবারে সংহার আছে কি না?

গুঃ। আর্য্যবিজ্ঞানবিদেরা বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে একটী বস্তু সমভাবে থাকিলে তাহার বৃদ্ধি বা রূপান্তর বা তাহাতে কোন প্রকার ক্রিয়াই সম্ভব হয় না। যদি এক জাতীয় একটী বৃক্ষ মাত্র আদিতে সৃষ্টি হইত; আর তাহার কোন প্রকার রূপান্তর না হইত তাহা হইলে কখনই সেই জাতীয় বৃক্ষ জগতে প্রকাশ থাকিতে পারিত না। একটী মনুষ্য বা একটী প্রাণী যদি সৃষ্টির আদিতে সৃষ্ট হইত, আর তাহার লয় বা রূপান্তর না হইত, তাহা হইলে কোন ক্রমেই জগতে একজাতীয় প্রাণীর ক্রমশঃ প্রকাশ হইত না। রূপান্তরই বিস্তারের প্রধান উপায়।

ইহার দৃষ্টান্ত এই, যেমন একটী সর্ষপ গুল্ম—তাহার আদি ভাবরূপী সর্ষপ বীজ হইতে জন্মিয়া ক্রমে ঋতুমতে যেমন শাখা প্রশাখাদিতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল; অমনি যে যে বীজরূপী কারণ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইরূপ কারণ শত শত প্রকাশ করিল। এইরূপে জগতের সকল বস্তুর প্রকাশই কারণ সমূহের বর্দ্ধনের জন্য বুঝিতে হইবে। ইহাতে ইহা প্রমাণ হইল যে প্রকাশ ভাবটী বা জন্মটী আর কিছুই নহে, অদৃষ্ট বা কারণের বর্দ্ধন হেতু। জগতের কার্য্যপ্রণালী যখন এইরূপ হইতেছে, তখন ঐ ব্রহ্মাণ্ড যে ঐ নিয়মে সামান্য

অবস্থা হইতে কারণাবলীর পরস্পর বর্দ্ধন দ্বারা বৃহত্ত্ব ও নানাকার্য্যত্ব আরোপিত হইয়া আসিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে এক অবস্থার হ্রাসে কোটী কোটী তদ্রূপ বিস্তীর্ণ অবস্থা প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই প্রকাশ অবস্থাকেই জন্ম কহে। হ্রাস অবস্থাকে মৃত্যু কহে। এইভাবে কারণ সমূহের লয়ে যেমন কারণ সমূহের বহুত্ব প্রকাশ সিদ্ধ হইল, যদি লয় না থাকিত তাহা হইলে কখনই এক হইতে কারণের বহুত্ব বিস্তার অসম্ভব হইত। তদ্রূপ জগতের এইরূপ ভূত বিস্তার ও কারণ বিস্তার লয় ভিন্ন কখনই স্থির হইতে পারে না। ইহাতো কার্য্যগত প্রমাণ।

পুনশ্চ দেখা যায় যে, কোন কার্য্য দেখিলেই তাহার আদি হইয়া গিয়াছে ইহা বুঝা যায়। আদি ধরিতে হইলে তাহার অন্তও সেই আদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন একটী অঙ্কুর বৃক্ষের আদিভাব, কিন্তু অঙ্কুরের বীজরূপী পূর্ব্বভাব না থাকিলে কখনও অঙ্কুর সিদ্ধ হইত না। কারণের পূর্ব্ব ভাবকেই কার্য্যের অন্তভাব কহে। ইহাতে জগতের শিশুভাব বা প্রাকৃভাব থাকা সত্ত্বে সেই আদি অবশ্য কোন অবস্থা হইতে প্রকাশ হইয়াছে বলিতে হইবে। সেই কারণের প্রাকৃভাবকে কার্য্যের অন্তভাব কহে। কারণ জগৎ যখন সেই প্রাকৃভাব হইতে আরম্ভ হইল তখন জগতের অন্তিম অবস্থা তাহাতে আবদ্ধ ছিল বুঝিতে হইবে। এইরূপে আদি ও অন্ত দ্বারা জন্ম ও মৃত্যু এবং সৃজন ও প্রলয় প্রমাণিত হইয়াছে।

শিঃ। ঈশ্বর প্রলয়কালে শক্তি সমূহের ক্রিয়া ব্যতীত নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ কর্ম্ম-কর্ত্তাহীন ভাবে অবস্থিত ছিলেন, তাহা কিরূপে অনুভব হইতে পারে?

গুঃ। এই জগতটী ঈশ্বরের শক্তি সমষ্টি মাত্র। যেমন একটী যোদ্ধা যুদ্ধ-কালে আপনার শক্তির নানা কৌশল একত্র করিয়া সমর করে, পরে সমরান্তে আত্মশক্তিকে আপনাতেই লুপ্ত রাখে, তদ্রূপ ঈশ্বর জগৎরূপী কর্ত্তব্যটী আপনার শক্তি সমূহকে নিজ বাসনার দ্বারা নানাভাবে রূপান্তরিত করিয়া প্রমাণ করিয়া-ছেন বুঝিতে হইবে। তাঁহার বাসনার বিরামে ঐ শক্তি সমূহ সমস্তই তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। লীন হওয়াটী কেবল লীলা বিস্তারের জন্য বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর যে আধারে আত্ম সত্তা রক্ষা করেন সেই আধার-স্বভাবকে পুরুষ কহে এবং সেই আধার ও কার্য্য এই উভয়ের সম্বন্ধ কারক অবস্থাকে শক্তি কহে।

ঐ আধার না থাকিলে ঈশ্বর সত্তা শক্তি সমূহকে নিয়মিত কার্য্যপর করিতে অক্ষম হয়েন। আধার ভিন্ন জগতের কোন কোন বস্তু স্বভাবে একভাবে অবস্থান করিতে পারে না। ফল পক্ষে ত্বক। বীজ পক্ষে আবর্ত্তন। জীব পক্ষে প্রাণাদি বায়ুই আধার স্বরূপ। যেমন ফলের ত্বক্‌ ও প্রাণীর প্রাণাদি বায়ু নষ্ট করিলে কার্য্য প্রকাশক সকল শক্তির হ্রাস হয় অর্থাৎ উহারা অকার্য্য হইয়া যায় এবং ঐ ত্বকাদি আধার যেমন ফলাদি হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, তদ্রূপ ঈশ্বর জগৎ কার্য্যার্থ যত শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, উহাদের সকলকেই আপন আধারের অধীনে রাখিয়াছেন। নচেৎ কোন কার্য্যই লীন হইতে পারিত না। ঈশ্বরপক্ষে আধারকে কাল কহে। ঐ কাল দ্বারা মায়াগত সকল শক্তিই ধৃত হইয়া থাকে; এবং ঈশ্বরের সত্তা ঐ আবরণের অন্তর্গত থাকে। যেমন প্রাণীর প্রাণ জীবনের ও জীবিকার সীমা প্রদান করে; যেমন ত্বক ফলের পালনকারী, তদ্রূপ ঐ কাল সকল শক্তির ও সংস্থিত জগতের প্রকাশক, বর্দ্ধক ও নিরোধক বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের সত্তা উহার দ্বারা কর্ষিত হইয়া শক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে এবং ঐশিক বাসনামতে সত্তার প্রকাশ লোপ হইয়া প্রলয় হইতেছে। জগতের তত্ত্ব সংগ্রহকারী বলিয়া ঐ ঈশ্বর প্রভাবকে কাল কহে। শক্তির সংযোগে জগদাদি কার্য্যে রত হয়েন বলিয়া উহাকে পুংভাবাপন্ন বলা যায়। মায়ার ত্রিগুণ উহাতে সংযুক্ত হইলে উহাই সত্ত্বগুণময়ে বিষ্ণু এবং রজোগুণময়ে ব্রহ্মা, ও তমোগুণময় মহাদেব নামে কল্পিত হয়েন।

সৃষ্টির আরম্ভকালে গুণের সম্মিলন। প্রলয়কালে গুণহীন হইয়া একভাবে সেই সত্তারূপী পূর্ণব্রহ্ম ভাবকে ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া তাহাকে ঈশ্বরের বিরামস্থান রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই অবস্থায় ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়ভাবে যে রূপে সকল শক্তির সহিত প্রসুপ্ত হয়েন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বুঝিতে হইবে।

শিঃ। প্রলয়কালে ঈশ্বর কাহার আশ্রয়ে থাকেন?

গুঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি এবং অন্ত দ্বিবিধ। একটা কার্য্যগত আর একটা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিতে এমন একটা সময় যখন জগৎ বা জগতের কোন সূক্ষ্ম কারণ ছিল না। কেবল একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন। অর্থাৎ

ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্যাদির ও প্রলয়াদির প্রকাশ ছিল না। সেই অবস্থাকে অনাদি অবস্থা কহে; বা ব্রহ্মাবস্থা কহে। কার্য্য হইবার জন্য যখন তাহার পরিবর্ত্তন প্রকাশ হয়; পরিবর্ত্তনের অবস্থা মতে ব্রহ্মেতে আদি ও অন্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই আদি ও অন্ত অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়; এটী একটী প্রকাশ্য অবস্থার উপরে ঘটিয়া থাকে। সেই অবস্থার অতীত অর্থাৎ যখন একমাত্র কর্ত্তার স্থিতি তখন তাহাকে অনাদি, অনন্ত প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম অনুভাবীয় অবস্থার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। অনুভব ভিন্ন জ্ঞান দ্বারা আর কোন উপায়ে প্রকাশ হইবার যো নাই। সেই মূল অবস্থাকেই ব্রহ্মাবস্থা কহে। সেই অকর্ম্মী অবস্থা হইতে জগৎরূপী কার্য্যপ্রকাশ হইয়াছে; এবং প্রকাশান্তে ইহার পরিবর্ত্তন মতে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারার্থ ও কারণ সমূহের অবস্থান্তর করণার্থ যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহাকে আদি ও অন্ত কিম্বা সৃষ্টি ও প্রলয় কহা যায়। এই কার্য্যগত পরিবর্ত্তনকারী ঐশিক সত্তাকে সংকর্ষণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রলয়টী বিশ্বের শেস নহে এবং সৃষ্টিই বিশ্বের সর্ব্বাদি নহে, ইহারা অবস্থান্তর মাত্র বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থান্তর কি?—না—ঈশ্বর যখন সংকর্ষণ মূর্ত্তিময় হয়েন অর্থাৎ প্রলয়রূপী অবস্থান্তর হয়, তখন সলিলরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী থাকে; কার্য্যগত অপ্রকাশ্য অগ্নির ন্যায় সংকর্ষণরূপী ঈশ্বরাবস্থা ঐ তত্ত্বাবলীর অর্থাৎ তত্ত্ব সলিলের মধ্যে থাকেন।

ইহাতে এই বুঝান হইল যেমন বীজরূপে তৃণাদির অবস্থান্তর হইলে তৃণাদির সত্তা যেমন তাহার অন্তরে থাকে। তদ্রূপ জগতের সূক্ষ্ম উপাদানরূপী সলিল মধ্যে জগতের সত্তারূপী ঈশ্বর জগৎ প্রকাশক কালাগ্নিকাদি শক্তির সহিত অবস্থিত রহিলেন। কি অবস্থায় রহিলেন?—না—আপনার অধিষ্ঠানে; অর্থাৎ কারণ সলিলের মধ্যে বটে, কিন্তু কাহার আশ্রয়ে নহে। আপনারই কাল অর্থাৎ সর্পরূপী অধিষ্ঠানে। এটী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সৎ বস্তু কারণরূপী অসৎ বস্তুতে মিলিত কথনই হইতে পারে না।

জগতের সূক্ষ্ম কারণরূপে কোন কোন বস্তু সংকর্ষণরূপী ঈশ্বরের অন্তরে প্রলয়কালে থাকে,– সূক্ষ্ম ভূতাবস্থাকে ও কালাগ্নিকাদি শক্তিকে ঈশ্বর অন্তরে রাখিলেন। ভূত বলিতে প্রাণী জগৎ। তাহার সূক্ষ্মভাগ বলিতে মনোবুদ্ধ্যাদি

রূপী লিঙ্গ শরীর। কালাত্মিকাদি শক্তি বলিতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সমূহের প্রকাশক উপায়াদি। এই উভয়বিধ ভাব লইয়া জগতের সূক্ষ্মভাবের সহিত সংকর্ষণাবস্থার স্থিতি প্রকাশ হইল। ইহাতে কেবল পরিবর্ত্তন মাত্র প্রকাশ হইল বুঝিতে হইবে। এই প্রলয় দ্বারা বিশ্বের বিস্তারাদি নানাপ্রকার অবস্থার প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

শিঃ। ঈশ্বর প্রলয় কালে কারণ বারিতে যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি?

গুঃ। নিষ্ক্রিয় ভাবকে নিদ্রা কহে। ঐ সময়ে শক্তি ও জীবাদৃষ্টাদি তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় করে বলিয়া তাঁহার নিদ্রাকে যোগনিদ্রা কহে। ঐ অবস্থাকে নিদ্রা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—ইহ জগতে অবস্থান্তর বুঝাইতে জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এই তিন প্রকার অবস্থা প্রকাশ পায়। তন্মধ্যে স্বপ্নটী ভ্রমাত্মক। জাগ্রৎ ও নিদ্রা দুইটী নিত্য। সক্রিয় চৈতন্যময় অবস্থাকে জাগ্রৎ কহে। নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় অবস্থাকে নিদ্রা কহে। এই অবস্থার পরে পুনরায় সক্রিয় চৈতন্যের আবির্ভাব হয় বলিয়া ইহাকে মৃত্যু না বলিয়া নৈমিত্তিক প্রলয় বা নিদ্রা কহে। অর্থাৎ এই অবস্থার পরে পুনরায় সৃষ্টি হইতে পারে বুঝিতে হইবে। এই প্রলয় ভাবটীও পুনরায় সৃষ্টি বিস্তারের কারণ মাত্র, তজ্জন্য এই ভাবটীকে ঈশ্বর পক্ষে সুষুপ্তি বলিয়া কল্পিত করা হইয়াছে এবং সেই সময়ে তাঁহার সকল সক্রিয় শক্তি তাঁহাতে সংযুক্ত থাকে বলিয়া তাহাকে যোগ-নিদ্রিত কহা যায়।

শিঃ। প্রলয়ের পর পুনরায় জগৎ প্রকাশ হয় তাহা কি রূপে অনুমান হইতে পারে?

গুঃ। জগতের ও জীবের সমস্ত সূক্ষ্ম বীজভাব কাল দ্বারা সংগৃহীত হইয়া প্রলয়াবস্থায় ঈশ্বরে লীন থাকে, পুনরায় জগৎ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইলে যে কার্য্যে যে উপাদান জীবভাবের প্রয়োজন হয়, কাল তাহা দান করিয়া থাকেন। এইটী অনুমান এইরূপে হয় যথা:—বিজ্ঞানবিদেরা বলেন:—প্রাণীগত ও জগদ্গত যে সকল তত্ত্ব যে স্বভাবাক্রান্ত হইবে; কাল তাহাতে তদ্রূপ জীব ভাব প্রদান করিয়া তত্ত্ব সমূহ সক্রিয় করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ এই যথা:—একটী প্রাণীর বা বৃক্ষ শরীর মৃত বা বিকারিত হইয়া পূর্ব্ব স্বভাব হইতে

চ্যুত হইলে; তন্মধ্যগত তত্ত্ব সমূহকে আশ্রয় করিয়া কোটী কোটী কীট ও পতঙ্গাদির জীবত্বের সঞ্চার হইয়া থাকে। সেই সমস্ত জীবত্বের অদৃষ্ট স্বভাবাদি ও চৈতন্যাদি ইতিপূর্ব্বে ঐ প্রাণ্যাদির শরীরে ছিল না, কারণ বিজ্ঞানে বিশেষ বিচারে দেখা যায় যে, যে বস্তু যে স্বভাবাপন্ন তাহার অংশ হইতে সেই স্বভাবাপন্নের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্ব স্বভাব নাশ হইলে পশ্বাদির ভৌতিকাংশ তত্ত্বরূপে সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয়। কাল দ্বারা যে তত্ত্ব যে স্বভাবের বা অদৃষ্ট ধারণের উপযুক্ত সে তাহা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণী লীলা করিয়া থাকে। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে বিভিন্ন অদৃষ্টাদি ও স্বভাবাদি লইয়া এমন একটী নৈসর্গিক ভাব ভুবনে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি সতত আত্ম কর্ম্ম সাধন করিতেছেন। কোন তত্ত্বকে অনুপযোগী করিয়া ত্যাগ করিতেছেন না। সেই নৈসর্গিক শক্তিকে অদৃষ্টের ও আত্মার আধাররূপিণী কাল শক্তি কহে। ঐ শক্তির দ্বারা উহারা আদি কাল হইতে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

শিঃ। প্রলয়ের পর জগৎ প্রকাশ কি রূপে হয়?

গুঃ। প্রলয়টী কেবল সৃষ্টি বিস্তারের উপায় মাত্র। সৃষ্টি তৎ প্রকাশ মাত্র। এই প্রলয় ও সৃষ্টির অতীত যে আদি অবস্থা তাহাই অদৃষ্ট বা কারণাবস্থা। তাহাকেই ঈশ্বরের বাসনাগত স্বভাব কহে। সৃষ্টি মধ্যে যত কিছু প্রাণ্যাদি নামীয় মহাভূতরূপী কারণ প্রকাশিত হয়, সমস্তই সেই—অদৃষ্ট বা ঈশ্বর স্বভাব হইতে প্রকাশিত হয়। সেই স্বভাবটীর বিলয় নাই। তাহাকেই আশ্রয় করিয়াই তত্ত্ব সমূহ পুনরায় লীলাময় হইয়া এই জগৎ ও জীবত্বে পরিণত হইয়া থাকে।

সেই অদৃষ্টাদিই তত্ত্ব সমূহের ক্রিয়া ও কারণ স্থূল হইতেছে। তাহাদের সমষ্টিকে সূক্ষ্মতত্ত্ব ভাগ বলিয়া বিজ্ঞানে কথিত হইয়া থাকে। ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্ব ভাগ ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত ও চৈতন্যাদির সংস্পর্শন ব্যতীত কোন মতেই সক্রিয় হইতে পারে না। এই জন্য বেদাদিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন; তবে সৃষ্টি হইল; ঈশ্বর ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন তবে প্রলয় হইল; কথিত হইয়াছে। সংকর্ষণ অর্থাৎ সর্ব্ব সূক্ষ্ম তত্ত্বাদির ও শক্তি সমূহের সংগ্রাহক অবস্থারূপী ভগবান্, সংগৃহীত তত্ত্বাবলী ও শক্তি সমূহকে কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলেন।

ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্বের পরিচয়ে বলা হইয়াছে উহা সৃষ্টিগত সমস্ত অদৃষ্টের সমষ্টি মাত্র। অদৃষ্টকেই কর্ম্ম কহে ;—কাল সেই কর্ম্ম সমূহকে আবৃত করিয়া অর্থাৎ আপন আশ্রয়ে রাখিয়া প্রয়োজন অনুসারে কার্য্যেতে প্রদান করেন। এক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় উহা হইতে কার্য্য প্রকাশ হইবে বলিয়া কাল আত্ম ধর্ম্ম অর্থাৎ সক্রিয় করণার্থ রজোগুণ উহাতে অর্পণ করিলেন।

রজোগুণ প্রাপ্তি মাত্রে কালগত শক্তি ঐ ঈশ্বর স্বভাবকে তাহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিবার জন্য ধাবিত করিতে লাগিল। প্রথমে সেই ঈশ্বর-স্বভাব কালের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পদ্মকোষ রূপে প্রকাশিত হইলেন।

পদ্মকোষ ঃ—যাহার অন্তরে সৃষ্টিগত—সমস্ত—সূক্ষ্ম তত্ত্ব ব্যাপ্ত আছে, এমন অবস্থাকে পদ্মকোষ কহে। অর্থাৎ ঐ অবস্থা হইতে সৃষ্টির যাহা কিছু প্রলয়ে লীন উপাদান তাহা প্রকাশ হইবে বলিয়া তাহাকে তত্ত্বাধার বা পুরাণে ঐ অবস্থাকে পদ্মকোষ বলা হইয়াছে।

কালের দ্বারা ঐ অবস্থা প্রকাশ হইলে তাঁহার নাম হইল ঃ—আত্মযোনি বা স্বয়ম্ভু (আত্মা হইতে জাত যিনি তিনিই আত্মযোনি), আত্মা এস্থলে বিষ্ণু বা সংকর্ষণরূপী সগুণান্বিতা ব্রহ্মাবস্থা।

সেই আত্মযোনি কিভাবে রহিলেন ?—না—সূর্য্য যেমন আপন প্রভাবে সর্ব্বত্রে প্রকাশিত থাকিয়া আত্মা সত্ত্বা বর্ত্তমান রাখেন তদ্রূপ সেই আত্মযোনি —বিশাল বিস্তীর্ণ প্রলয় সলিলেই সর্ব্বাংশে আত্ম তেজ বিদ্যোতিত করিয়া মধ্যস্থলে প্রকাশ হইয়া—বসিলেন। প্রলয় সলিল বলিতে লুপ্ত ও বিকারিত তত্ত্ব সমূহের মিশ্রণাবস্থা। সেই লুপ্ত ক্রিয়া তত্ত্ব সমূহকে সক্রিয় করিয়া ঈশ্বর স্বভাবরূপী আত্মযোনি কালের আশ্রয়ে এই বিশ্ব রচনা করিবেন বলিয়া প্রলয় সলিলের উপরে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া আত্মপ্রভাব প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ তত্ত্ব সমূহকে আপন আপন স্বভাব দান করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিজ্ঞানবিদেরা কহেন যে কার্য্যই কারণ হইতে পারে এবং কারণই কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু উহাদের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব কাহারো থাকিবে না। কিন্তু বিশ্বমধ্যে কার্য্য মাত্রেতেই কর্ত্তৃত্ব দেখা যাইতেছে ; তখন আদি হইতে ইহাতে এমন একটী কর্ত্তৃত্ব সংযুক্ত আছে যিনি স্বভাবাদিকে বিধি বদ্ধ করিয়া যে স্বভাবের যে কার্য্য, যে অদৃষ্টের যে গতি ও স্বভাব ইহা বিধান করিতেছেন।

কীট হইতে মনুষ্যাদি পর্য্যন্ত সমস্ততেই কর্তৃত্ব সংযুক্ত কার্য্য দেখা যায়। সেই কর্তৃত্বটী কারণ মধ্যগত কিরূপে হইলেন তাহাই এই স্থানে বলা যাইতেছে।

পদ্মটী কিরূপ?—না—সর্ব্বলোক অর্থাৎ জীব ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় স্বরূপ। সেই পদ্মের মধ্যে কি আছে?—না—তাহাতে জীব ও জগতের উপাদান অর্থাৎ প্রাকৃতিক সমস্ত উপাদানই রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহাকে কারণময় বলা হইল। অর্থাৎ যে সমস্ত উপায়ে জগৎ ও জীব প্রণীত হয় তাহা এবং যাহার আশ্রয়ে জগৎ ও জীব স্থিত হয় সে সমস্ত কারণই সেই আত্মযোনি স্বরূপ পদ্মকোষ রহিয়াছে। ইহাতে কার্য্যের কারণ স্থির করা হইল। বিধি ভিন্ন কার্য্য প্রকাশ অসম্ভব। অতএব বিধাতা কে?—না—স্বয়ং ভগবান যিনি প্রলয়কালে সংকর্ষণরূপে ছিলেন; তিনি এক্ষণে বিষ্ণুরূপে বিধাতা হইবার জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিধাতা বলিতে সৃষ্টিগত সকল বিধানের কর্ত্তা। জ্ঞানাদি প্রাথর্য্য ব্যতীত বিধি প্রকাশ অসম্ভব? কারণ সদসৎ বোধ না হইলে কাহাতে কিরূপ বিধান তিনি অর্পণ করিবেন। তিনি সিদ্ধজ্ঞানী অর্থাৎ বেদময় ছিলেন। আপনি কিরূপে জগতের কার্য্য করিবেন এই বেদ অর্থাৎ জ্ঞান, ব্রহ্ম স্বভাব হেতু তাঁহাতে নিত্যছিল। সেই বেদ স্বভাব সহযোগে তিনি—বিবিদান করণার্থ কর্ত্তা হইয়া ঐ লোক ও অদৃষ্টময় পদ্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

প্রবিষ্ট হইলেন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—গুটী-পোকা যেমন আপনার শরীর গত রসে আবরণ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে আত্ম সত্তারূপী সন্তান স্থাপন করে, পরে সেইঅন্ত নিবিষ্ট সন্তান আত্মস্বভাব দ্বারা আপনার বৃদ্ধির ও ইচ্ছার সহিত সেই আবরণকে ক্রমেই বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তদ্রূপ ঈশ্বর আপনিই সংকর্ষণ রূপে প্রলয়ান্তে তত্ত্ব ও অদৃষ্টাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আবরণ করত বিষ্ণু অর্থাৎ আত্মরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার অঙ্গজাত আবরণরূপী এই জগৎটীর প্রকাশ করেন মাত্র বুঝিতে হইবে।

এই সর্ব্বকারণ মধ্যগত ঐশিক ভাবকে বিজ্ঞজনে স্বয়ম্ভুব অর্থাৎ ব্রহ্মা কহে। আপন হইতে আপনার জন্মকে স্বয়ম্ভুব কহে। ইতিপূর্ব্বে ভগবান আপনিই সংকর্ষণ ছিলেন, পরে আপনিই কারণ মধ্যগত বিষ্ণু অর্থাৎ পালন কর্ত্তা হইলেন বলিয়া আপনা হইতেই আপনার প্রকাশ সূচিত হইল, এইজন্য বিজ্ঞানে এই কর্তৃত্ব ও বিধাতৃত্ব আত্মাকে স্বয়ম্ভুব ও পুরাণে ব্রহ্মা কহে। ব্রহ্ম হইতে জগৎ

এই অর্থে ব্রহ্মন্ শব্দের উদ্ভব হয়। ব্রহ্মন্ শব্দের প্রথমার এক বচনে ও সম্বোধনে ব্রহ্মা হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মার পরিচয় দিবার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মারূপে ঈশ্বর কর্তৃত্বরূপী হইয়া প্রতি প্রলয়ান্তে প্রকাশ হয়েন; এবং ঈশ্বর স্বভাব আত্মযোনি বা সূক্ষ্ম কার্য্যকারণ রূপে প্রতি প্রলয়ান্তে প্রকাশিত হয়েন। কারণ ও কর্ত্তা এইরূপে স্থির হইল।

ঋষিগণ স্থির করিয়াছেন যে ব্রহ্ম আপনা হইতে আত্মাকে প্রকাশ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য উপকরণ তৎসহযোগে প্রদান করত তাহাকে কর্ম্মী করিবার জন্য প্রথমে বিস্ময় তাহাতে প্রকাশ করেন। ঐ বিস্ময়কে মহামায়া কহে। উহার তেজেই প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ম্ম প্রকাশ করেন।

প্রথমে ব্রহ্মা ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে অবস্থান্তরিত হইবার মাত্রে, আমি কে? যেস্থানে আছি ইহা কি, যেখানে আছি ইহার মূল কোথা বা কোন বস্তু ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। আমি কে, বলিবার তাৎপর্য্য এই যেঃ—কোন কর্ম্মের কর্ম্মী। পদ্মাদি—কি—বলিতে, উহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? মূলে কেহ আছে কি না? ইহার অর্থ এই যেঃ—কাহারো অভিপ্রায়ে আমি সকর্ম্মী কি না? এই কয়টী চিন্তা করিয়া তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য;—আত্মা পদ্মের মধ্যদিয়া পদ্মনালে প্রবেশ করিলেন। পদ্ম বলিতে ব্রহ্মাণ্ড ও নাল বলিতে ব্রহ্ম হইতে জগৎ পর্য্যন্ত কর্ম্মসূত্র। ঐ সূত্রে প্রবিষ্ট হওনের তাৎপর্য্য এই যথা—এই যে উপকরণ সমস্ত ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি এবং ইহার নেতা কেহ আছে কি না, নেতার সত্তা দেখিবার তাৎপর্য্য এই যেঃ—ঐ উপকরণরূপী বিষয়গুলী আমার জন্য—না—পরের জন্য। এই ভাবিয়া বিস্ময়ের শাসনে আত্মা কারণের ভিতরে গেলেন—বলিতে আত্মা সর্ব্বান্তে প্রবিষ্ট হইলেন বুঝিতে হইবে।

আত্মা সর্ব্বান্ত প্রবিষ্ট হইয়া উপকরণরূপী পদ্ম, প্রলয় বারি ও পদ্মের নালের কোন প্রভু দেখিতে পাইলেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সে সকল তাঁহার ব্যবহার্য্য ইহা বোধ হইল। এক্ষণে ঐ সকল বস্তু তাঁহারি বোধ হইলে তিনি তাহাদের কি করিবেন তাহা জানিবার জন্য আত্মা কি করিলেন তাহা পরে বলা হইতেছে।

অর্ব্বাক গতি বলিতে নিম্নগতি। নিম্ন বলিতে জগৎ। অর্থাৎ কারণরূপী

জগতের মধ্যে আকৃষ্ট হইলেন। একা বিস্ময়ের শাসনে আত্মা জগতের কারণের সহিত সংযুক্ত হইলেন এইভাব প্রকাশ হইল। এই স্বাভাবিক শাসন রূপী বিস্ময় দ্বারা ব্রহ্ম—নির্গুণ থাকিয়া আপনার শক্তি ও পুরুষাংশ সমূহকে সগুণ রূপে জগতে সংযুক্ত করিতেছেন। তিনি আপনি সকলের নিয়ন্তা হইয়া শাসন, শাস্ত, ও শাস্তা প্রভৃতির প্রকাশ হইয়া ও অতীত হইয়া রহিয়াছেন। কারণ ঋষিগণ স্বভাব হইতে এই যে কৌশল প্রকাশ করিয়া ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন ইহাতে কেহই সর্ব্বকারণরূপী ব্রহ্মকে কোন সগুণ জাগতিক শক্তি বা পুরুষাংশের সহিত সংলেপ দেখাইতে পারিতেছেন না। ঐ বিস্ময়রূপিণী মায়াকে বুঝিতে না পারাতে নির্গুণ ব্রহ্ম বোঝা অতীব দুরূহ!

শিঃ। মানব দেহস্থ পদ্ম বা "চক্র" কিরূপ?

গুঃ। চিন্তা ক্রিয়া প্রকাশক অনুভবের গৃহস্বরূপ শূন্য স্থানকে দেহস্থ পদ্ম বা "চক্র" কহে। তন্ত্রাদি আলোচনা করিয়া বেশ জানা যায় যে, যে সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল শিরার অনুভব ক্ষমতা আছে, তাহারা যে যে স্থানে সংযোজিত ও বিয়োজিত হইয়া অনুভাব্য ক্রিয়া প্রকাশ করে, সেই সেই স্থানই শূন্যরূপে কল্পিত এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতে পদ্ম বা "চক্র" নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবী ব্যাখ্যা পদ্ম বিষয়ক পাওয়া দুর্ল্লভ। তবে নারদ পঞ্চরাত্রে যাহা আছে, তাহার অনুভব করা দুরূহ। এমন কি যে, তন্ত্র পাঠ করে নাই তাহার পক্ষে তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। তন্ত্রে পদ্ম বিবরণ এক প্রকার বিশদরূপে বর্ণিত আছে। তন্ত্রমতে পদ্ম অনুভব করিয়া শৈব বীজ না রাখিয়া তাহাতে বৈষ্ণব বীজ স্থাপন করিলেই পাঠকে বৈষ্ণবী প্রথা হইল বুঝিবেন। সকলের সহজের জন্য আমি তন্ত্রের আশ্রয় লইলাম।

এইপদ্ম বিবরণে তন্ত্রে ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে কিঞ্চিত মত ভেদ আছে। বৈষ্ণবেরা স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার উভয় পদ্মকে একমাত্র মূলাধার আখ্যা দিয়া তালু মূলে একটী নূতন অনুভব স্থলরূপ বিশুদ্ধাগ্র পদ্মের আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তান্ত্রিকেরা বলেন তালু মূলে এমন কোন স্থান নাই যে তাহাতে অনুভব হইতে পারে। গুহ্যদেশেই দুইটী অনুভাব্য স্থান আছে। তাহার মধ্যে যেটী যোনির মূল সেইটীকে মূলাধার কহে। যেটী ইন্দ্রিয় প্রকাশক লিঙ্গের মূল সেইটী স্বাধিষ্ঠান নামে খ্যাত। তন্ত্রের মতে মূলাধার যোনিমূলে, বৈষ্ণব-

শাস্ত্রের মতে যোনি ও লিঙ্গমুখ প্রায় একস্থানে অবস্থিত ; এ বিধায় উভয় স্থানস্থ পদ্মকেই মুলাধার কহা যায়। তন্ত্রের ও বৈষ্ণবের মতে নাভিতে মণিপুর পদ্ম। তন্ত্রের ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে হৃদয়ে অনাহত। তন্ত্রের ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে কণ্ঠে বা কণ্ঠের অধোদশে বিশুদ্ধ; কেবল বৈষ্ণব মতে তালুমূলে বিশুদ্ধাগ্র। তন্ত্র ও বৈষ্ণব মতে ভ্রুদ্বয় মধ্যে আজ্ঞা পদ্ম।

এ প্রভেদ অতি সামান্য। আমার বোধ হয় বৈষ্ণবেরা ইন্দ্রিয় বিজয়ী হওয়াতে, স্বাধিষ্ঠানের কোন ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না, সেই জন্য ঐ পদ্মের ভাবনা না করিয়া প্রাণায়াম সিদ্ধ হওনার্থে তালু মূলে স্থিতি ক্রিয়া প্রতিফলিত করণার্থে নূতন ভাবে বিশুদ্ধাগ্র পদ্মের আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রত্যেক পদ্মেরই আনুভাব্য ও দেহ জাত ক্রিয়া প্রকাশক শিরা সমুহের আশ্রয় স্থল এইটী বুঝাইতে পারিলেই পদ্ম কি বস্তু পাঠকে বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে পদ্মের স্থিতি দেখাইয়া পরে তাহাতে নাড়ি সংযোজনা জানাইব।

একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, এই দেহেতে নানা অবস্থার নাড়ি আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি রসবহনকারী, কতকগুলি শোণিত-বহন-কারী, কতকগুলি চৈতন্য-রক্ষাকারী। এই দেহের গুহ্যদেশকে মধ্য সীমা কহে। ঐ মধ্য সীমার মধ্যে যে পায়ু ছিদ্র আছে, তাহার দুই কি তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে একটী স্থান আছে, তথায় প্রধান কয়েকটী চৈতন্য নাড়ির সংযোজন হইয়াছে ; তাহাকেই মূলাধার পদ্ম কহে। তন্ত্রে যোনি ও লিঙ্গ এই দুইটী শব্দের স্ত্রী পুরুষত্ব ভেদ করে নাই। বিজ্ঞানবিদেরা কাম রিপুর ক্রিয়া প্রকাশক যন্ত্রকে লিঙ্গ কহেন এবং ক্রিয়া স্থিতি স্থলকে যোনি কহেন। কোষের ও চর্ম্ম লিঙ্গের ক্রিয়া প্রকাশক যে স্থলে অপান প্রদেশ আছে, তাহাকে পুরুষের যোনি কহে। তদূর্দ্ধভাগস্থ যন্ত্রকে লিঙ্গ কহে। জরায়ু সহ ছিদ্রযুক্ত কাম প্রকাশক যন্ত্রকে স্ত্রী জাতির যোনি কহে। এবং তাহার ক্রিয়া প্রকাশক ছিদ্র যন্ত্রকে লিঙ্গ কহে। ঐ উভয় জাতির যোনি মূলে ও লিঙ্গ মূলে চৈতন্য নাড়ি সকলের প্রথম সংযোজন হইয়াছে। যোনি মুলস্থ সংযুক্ত স্থলকে মুলাধার পদ্ম কহে।

এই দেহে অসংখ্য নাড়ি আছে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি জাত রস ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত হইয়া যে ভাগ সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরকে পরিপোষণ করে তাহাই বায়ুর সহিত মিলিয়া প্রাণনামে খ্যাত হয়। যে রস

স্থূল শরীরের পুষ্টি করে তাহাকে ধাতু কহে। উহাও প্রাণাংশে মিশ্রিত হয়। তৃতীয় ভাগ অসার ভাবে মল ও মূত্রাদিতে পরিণত হয়। বায়ুতেই শরীরের তেজ প্রকাশ হয়; যখন বায়ু বা প্রাণ বায়ু ঐ সকল রসে মিলিত হইয়া নাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ঐ রসাদি মহা তেজোময় হইয়া শরীরের বলাধান করে। দেহতেও বর্দ্ধন পালনাদি সকল ক্রিয়া করে। যে সকল নাড়িতে বায়ুর গতি তাহারাই প্রাণমার্গ নামে বিখ্যাত। তাহাদের সংখ্যা চতুর্দ্দশটী। তন্মধ্যে ঈড়া ও পিঙ্গলা বিখ্যাতা। ঐ চতুর্দ্দশটী নাড়ি ঐ মূলাধারে আসিয়া সংযোজিত হইয়া আপনাপন ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে। ঐ মূলাধারে আরো অনেকগুলি চৈতন্যময় নাড়ি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছে। তাহার মধ্যে কুল-কুণ্ডলিনী নাড়িই প্রধান। সকল চৈতন্য সংস্কার এই নাড়ি হইতে হইয়া থাকে। চৈতন্যের অনুভব কর্ত্তাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানও ঐ চৈতন্য হইতে উদ্ভূত হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র হইয়া মূলাধার অবলম্বিতা সুষুম্না নামক নাড়িতে বিভাবিত হইতেছে। ঐ সুষুম্নার দুইটী মুখ আবদ্ধ। একটী মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র অতীত হইয়া নাসিকা ছিদ্রের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে রহিয়াছে, তাহাকে বামনাসা পুটস্থিত পিঙ্গলা ও দক্ষিণ নাসা পুটস্থিত ঈড়া এই দুই নাড়ি একত্রে মিলিত হইয়া আবদ্ধ করিয়া নিম্নমুখী করিয়াছে। বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে দিতেছে না। নিম্নদেশে চৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনী ত্রিকুণ্ডলভাবে আপনার পুচ্ছ প্রবেশ করাইয়া সুষুম্নার নিম্ন মুখ আবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। বায়ু প্রবেশ না হইলে কোন নাড়িতেই কোন ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। বরং বায়ু দূষিত হইলে প্রাণাদি বিনাশ হইবার সম্ভাবনা। যোগীগণ যোগবলে নিশ্বাস অবরোধ করিয়া ঈড়া ও পিঙ্গলা নামক বায়ু, পিত্ত, কফ প্রবাহিণী প্রাণ নাড়িদ্বয়কে এই জন্যে পীড়ন করেন যে, পিত্ত আর কফ বলে ঐ নাড়িদ্বয় অপর সূক্ষ্ম নাড়ি সকলকে মান্দ্য ক্রিয়াবান্ বা ক্রিয়াহীন করায় দেহী অলস, শ্রান্ত ও অজ্ঞান হইয়া থাকে। তেজের সাহায্যে কফ ও পিত্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য বায়ুকে প্রতি নাড়ি সংযুক্ত শূন্য স্থানে নিরোধ করিলে ঈড়া ও পিঙ্গলা তত্তৎস্থানে স্ফীত হইয়া বায়ু জাত তেজ বলে অপরাপর নাড়ি সকলের সহিত কফ ও পিত্ত হীন হয়। কফ ও পিত্ত নাশ হইলে বায়ু সকল নাড়িতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাতে সকল নাড়ি স্ফীত হইয়া ক্রিয়াবান হয়। প্রতি প্রধান নাড়ি মধ্যে কি প্রাণ মার্গ,

কি জ্ঞানমার্গ, কি চৈতন্যমার্গ, সকল প্রকার নাড়ি সংযোজনা থাকাতে ক্রমে ক্রমে সকলেতেই বায়ু প্রবেশ করিয়া দেহীকে পুষ্ট, কান্তিময়, শান্ত ও জ্ঞান-চৈতন্যময় করিয়া ফেলে। এই বায়ু ধারণার জন্য নানা প্রকার তপস্যার বিধি আছে। যে যোগী ঊর্দ্ধপদে নিম্নমস্তকে বায়ু সাধনা করেন, তাহার এই উদ্দেশ্য যে, নাসিকা ছিদ্রের উপরে ঈড়া ও পিঙ্গলায় সুষুম্নার ঊর্দ্ধ মুখ বদ্ধ করিয়া আছে, এস্থলে নিম্নমস্তকে বায়ু ধারণা করিলে বায়ু পীড়িত হইয়া ভ্রূমধ্যে ঈড়া ও পিঙ্গলাকে পিত্ত ও কফহীন করত লঘু করিয়া বেগে সুষুম্নায় প্রবেশ করে। সুষুম্নায় বায়ু প্রবিষ্ট হইলে যোগীর জ্ঞান প্রকাশ হইল। সুষুম্নার দ্বারা বায়ু নিম্নে যাইয়া নিম্ন মুখে যে কুণ্ডলিনী আবদ্ধ ছিল তাহাতে প্রবেশ করে। কুণ্ডলিনী জাগিলেই সকল চৈতন্য প্রকাশ হইবে। তাহাতে দূরদর্শিত্ব, বিচক্ষণত্ব, ভূত-ভবাজ্ঞত্ব উপস্থিত হইয়া যোগীকে সিদ্ধ করিয়া ফেলে। এই বিধানে প্রায় সকলেই নাড়ির ক্রিয়া ও বায়ু সাধনের প্রয়োজন বুঝিলেন।

শিঃ। কোন স্থানে বায়ু রোধ করিলে কি লাভ হয় ?

গুঃ। মূলাধার ভাবনা করিয়া বায়ু সাধন করিলে চৈতন্য ও জ্ঞান প্রকাশ হয়। মণিপুরে বায়ু সাধনা করিলে প্রাণমার্গ প্রবল হয় ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। হৃদয়ে অনাহত পদ্মে বায়ু রোধ করিলে জ্ঞানাধিক্য, চিত্ত স্থির, দূর শ্রবণ, দূর দর্শন হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ পদ্মে বায়ু রোধ করিলে চিত্ত ধারণা হয়; বাহ্য বিষয় হইতে মন নিবৃত্ত হইয়া অন্তরে নিবিষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্ব শরীরের দূষিত বায়ু নাশ হইয়া শরীরকে সুস্থ করে। বিশুদ্ধাগ্র পদ্মে বায়ুরোধ করিলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হওয়া যায় এবং স্মৃতির বিলয় হয় না। ভ্রূ মধ্যে বায়ু স্থির করিলে, পরমাত্মানুভব হয়। বিজ্ঞান প্রকাশে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। এই স্থান হইতে চৈতন্য ব্রহ্ম পদ্মে মিলিতে পারে।

শিঃ। ঐ সকল পদ্মের সাহায্যে জীবাত্মা কেমন করিয়া ইন্দ্রিয় জ্ঞানাদি চৈতন্যাদির সহিত দেহ ত্যাগ করে? এবং তাহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে?

গুঃ। প্রাণ বায়ুর সাহায্যে কি জ্ঞান কি চৈতন্য কি মন সমস্তই ক্রিয়াবান হয়। প্রাণকে বাসনা ও ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে যথায় লইয়া যাইবে তথাই চৈতন্যময় জীবাত্মার জ্ঞানাদি অনুভব হইবে। এই দেহটীতে পাঁচটী অংশ আছে:—অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, ও চৈতন্যময়। ঐ অন্নময়

অংশটীতেই ভূতের অধিকার। আর চারিটী বাসনার অধিকার। যেমন মাকড়সা আপনার উত্তাপে চর্ম্ম কোষের মধ্যস্থ ডিম্বাদিকে জীবন্ত করিয়া চর্ম্ম কোষ ভেদ করাইয়া অপর স্থানে যাইতে দেয়। তেমনি বাসনা ভূত সমন্বয় রূপ আবরণে পূর্ব্বোক্ত চারিটী তেজোময় অংশকে আবৃত করিয়া ইহ লীলা করিতেছে। যখন বাসনা চৈতন্যের সহিত মিলিয়া উহাদের একত্র করত ভূতাংশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবে তখনি পারিবে। ঐ চারিটী অংশ থাকাতেই ভূতাংশকে রূপবান, ও ক্রিয়াবান দেখা যাইতেছে। বস্তুত ভূতাংশ কিছুই নয়। যেমন কৌশলে কাষ্ঠের পুত্তলিকা নৃত্য করে, আবার কৌশলটী গ্রহণ করিলে ক্রিয়াহীন হয়, তেমনি পূর্ব্বোক্ত চারিটী ক্ষমতার সাহায্যে ভূতাংশ ক্রিয়াময় হইয়াছে। স্বভাব হইতে অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া আলস্য, জড়তা, কফ পিত্তাধিক্যে আত্ম স্বভাব ভুলিয়া ভূতাংশের বশীভূত এবং ইন্দ্রিয় বিকারীকৃত রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে।

ঐ চারি কোষের সহিত বাসনার গমনের নামই সদ্যমুক্তি। তাহাতে কি রূপে ভূতাংশ ত্যাগ করা যায় তাহার ক্রম এই যে:—প্রথমে যোগী বায়ুরোধ করিয়া আন্তরিক প্রাণকে পীড়ন করিবে। প্রাণে ও বাহ্য বায়ুতে মিলন হইলে প্রাণের অধিক বল বৃদ্ধি হইবে। সেই অবসরে গুহ্যদেশস্থ ছিদ্র মধ্যে স্বায় পদের গুল্‌ফ পীড়ন করিলে এবং সমাধি দ্বারা মূলাধারস্থ চৈতন্য জ্ঞানাদি ও ঈশ্বর সংস্থান করিয়া প্রাণকে উন্নমন শক্তি দ্বারা মণিপূরে আনিলে দেহের নিম্নভাগ একেবারে চৈতন্যহীন হইবে এবং নিম্নদেহ মৃতদেহ প্রায় বুঝিতে হইবে। মণিপূরে লাকিনী নামে প্রধানা নাড়ী সকল প্রাণের সহিত সংযোজিত আছে। প্রাণবায়ুকেই সেই লাকিনীতে প্রবেশ করাইলে মণিপূর মণ্ডলের চৈতন্য প্রাণ জ্ঞানাদি মূলাধার হইতে উন্নমিত প্রাণে মিশ্রিত হইবে। এটী আকর্ষণী শক্তির ক্ষমতা। সৎবস্তুর আধিক্য হইতে আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ হইয়া অল্প সৎবস্তুস্থ আকর্ষণ ধারণ করে ইহা বিজ্ঞান সিদ্ধ। সেই নিয়মে তত্রস্থ প্রাণাদি পূর্ব্ব প্রাণাদির সহিত মিলিলে তথা হইতে উন্নমন-শক্তির সাহায্যে প্রাণকে হৃদয়ে অনাহত পদ্মে আবদ্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলে নাভি পর্য্যন্ত কেবল ভূতাংশময় হইল। তাহাও শববৎ হইল বুঝিতে হইবে।

পরে যোগী নিম্ন ভাগস্থ প্রাণ, জ্ঞান, চৈতন্যাদি হৃদয়স্থ সমাধিময় ধারণাকে গ্রহণ করিবার জন্য কাকিনী নামক চিত্তধারিণী মহা জ্ঞানময়ী নাড়িতে প্রবেশ করাইয়া তৎসাহায্যে তত্রস্থ চৈতন্যাদিকে আকর্ষণী ক্ষমতায় হরণ করিবে। পরে উদান বায়ুর ক্ষমতায় সমস্ত সম্মিলিত প্রাণকে কণ্ঠের বিশুদ্ধপদ্মে আনয়ন করিয়া আবদ্ধ করিবে।

সেই কণ্ঠ পদ্মের সহিত অপরাপর চৈতন্যাদি নাড়ি সংযোজিতা শাকিনী নামে বিজ্ঞান নাড়ি আছে। নিম্নাগত প্রাণ তাহার সাহায্যে তৎপ্রদেশস্থ অপরাপর সকল নাড়িস্থ তেজ, হরণ করিয়া শাকিনীতে প্রবেশ করিলে জীবাত্মাময় সাধক সেই প্রাণকে অতি সাবধানে তালুমূলস্থিত বিশুদ্ধাগ্রপদ্মে লইয়া যাইবে। তথায় যাইয়া জীবাত্মা সকল চৈতন্য ও জ্ঞানাদিকে বিষয় চিন্তা হইতে বিরত দেখিয়া স্বরূপানুভব করিয়া সংস্রার ক্ষরিত ব্রহ্মানন্দ রসপান করিতে পারিবে। কারণ ঐ স্থানে জীবাত্মা চৈতন্য বলে অবস্থান করিলে ইন্দ্রিয় ক্রিয়ানাশ প্রাপ্ত হওয়ায় শুদ্ধভাবে তন্মিত হয়েন এবং শূন্য ভাবনা আসিয়া চতুর্দিক্ জ্ঞানদৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময় দেখেন এবং বাসনা তদ্দর্শনে সেই মহা-জ্যোতিতে মিলিতে ইচ্ছা করেন।

পরে সাধক তথা হইতে প্রাণকে সুষুম্না ছিদ্র দ্বারা ভ্রূর মধ্যস্থ আজ্ঞাপুরী চক্রে লইয়া যাইবেন। তথায় গমন করিলে সকল চিন্তা দূর হইবে। কেবল জ্ঞানময় হইয়া অবস্থান করত জীবাত্মা পরমাত্মাময় হইয়া যায়, অর্থাৎ বাসনা অন্য চিন্তা নাশ হইয়া সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট মহা জ্যোতিতে মিশ্রিত হইয়া যায়। বাসনায় মিলিলে জীবাত্মা জ্যোতির্ম্ময়ী ভাবে অবস্থান করেন। এই অবস্থাকেই শিবত্ব প্রাপ্তি কহে এবং বৈষ্ণব মতে ইহাকেই সারূপ্য প্রাপ্তি কহে। এই স্থানকে তন্ত্রমতে কাশী কহে। বৈষ্ণব মতে বৃন্দাবন কহে। এই স্থানে ঈড়া ও পিঙ্গলা বহমান। উহাকে পৌরাণিকেরা বরুণা ও অসি নামক গঙ্গাংশ কহে। তদূর্দ্ধে সহস্রদল পদ্ম ক্রমে ব্রহ্মারন্ধ্রে প্রাণ সচেষ্টে আপনিই গমন করে। ঐ গঙ্গারূপী ঈড়া নাড়িই তথায় যাইবার উপায় বিধান করত সংযত প্রাণবায়ু ধারণ করে। ঐ ব্রহ্ম পদ্মকেই স্বর্গের বৈকুণ্ঠ, পৃথিবীর দ্বারকা, এবং মথুরা বলিয়া পৌরাণিকেরা বিবেচনা করেন। এইস্থানে জীবাত্মা আসিলেই সচৈতন্য ব্রহ্মদ্বার দ্বারা আপনিই মুক্ত হইয়া যায়।

ভূতাংশ পতিত থাকে। সদ্যমুক্তির পথিক পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়।

আমি যে প্রকার বিশদ বর্ণনা করিলাম তাহাতেই সকলেই সদ্যমুক্ত জাত মৃত্যুতে এবং পীড়াজাত মৃত্যুতে কি প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বোধ হয় অনেকেই ঐ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইতে পারেন। যদি কোন মহাত্মা সাংখ্যযোগ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাংখ্যবিজ্ঞানে ইহা স্পষ্ট লেখা আছে যে, দ্বৈতজ্ঞান অহঙ্কার ত্যাগে একত্ব সম্পাদন হয় কি না এটী অনুভব করিতে— জীবত্বকে ঈশ্বরত্বে আরোপ করিতে হয়। তাহার অর্থ প্রমাণ এই যে—যেমন একটী বংশাধারে নানা কৌশলে ছিদ্র করিয়া কণ্ঠনালের বায়ু পেষণ ও ফুৎ-কারের তারতম্যে বংশীতে নানা স্বর শ্রুত হওয়া যায়। সেই স্বরটী কি বংশীর হইতে পারে? কখনই নহে। স্বরটী কণ্ঠজাত বায়ুর। বংশীটী ক্রিয়াগৃহ মাত্র। ক্রিয়াত্যাগ হইলেই কণ্ঠের স্বর কণ্ঠে অনুভূত হইল। তেমনি ঈশ্বর হইতে চৈতন্য জ্ঞানাদি অংশীভূত হইয়া ক্রিয়াময় হইবার জন্য ভূতের সাহায্য লয়। আবার ভূতজাত গৃহরূপ দেহত্যাগে যে তেজে ক্রিয়া প্রকাশ হইতেছিল, তাহারা সেই তেজে মিশ্রিত হইয়া জীবত্ব ত্যাগে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয়। সে অবস্থা বিজ্ঞান বুদ্ধিতে স্বপ্নালোচনা করিলে অনুভব হয়। কারণ স্বপ্নে দেহজ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না, অথচ কাল্পনিক অনুভব হইয়া থাকে।

শিঃ। যোগীগণের আসন কিরূপ?

গুঃ। ঘেরণ্ড সংহিতায় দ্বাত্রিংশদ্বিধ আসন বর্ণিত আছে যথাঃ—সিদ্ধ, পদ্ম, মুক্ত, ভদ্র, বজ্র, স্বস্তিক, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনু, মৃত, গুপ্ত, মৎস্য, মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, পশ্চিমোত্তান, উৎকট, সঙ্কট, ময়ূর, কুক্কুট, কুর্ম্ম, উত্তানকুর্ম্মক, উত্তান-মণ্ডুক, বৃক্ষ, মণ্ডুক, গরুড়, বৃষ, শলভ, মকর, উষ্ট্র, ভুজঙ্গ এবং যোগ। এইসকল আসন সিদ্ধিপ্রদ। শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে চতুরশীতি প্রকার আসন মধ্যে সিদ্ধ, পদ্ম, উগ্র ও স্বস্তিক এই চারিটী সিদ্ধি প্রদ।

সিদ্ধাসন যথাঃ—সযত্নে একটী পাদমূল দ্বারা যোনিপ্রপীড়িত করত অপরপাদ মূল লিঙ্গের উপরিভাগে স্থাপিত করিবে এবং উর্দ্ধনয়নে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল দর্শন করিবে। ইহাকেই সিদ্ধাসন কহে। বিরলে স্থির চিত্তে সমকায় হইয়া ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক এই আসন অভ্যাস করিতে হয়।

পদ্মাসন যথাঃ—দক্ষিণ পদে বাম উরুর উপরে এবং বামপাদ দক্ষিণ উরুর উপরে রাখিয়া করদ্বয় দ্বারা পৃষ্ঠদেশ হইতে চরণ দ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করত হৃদয় দেশে চিবুক সংস্থাপিত করিবে এবং নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে, এই আসন দ্বারা রোগ বিনষ্ট ও উদরানল প্রদীপিত হয়।

ভদ্রাসন যথাঃ—গুল্ফদ্বয় কোষের নিম্নে বিপরীত ভাবে রাখিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা চরণদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠভাগ দিয়া ধারণ পূর্ব্বক জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠান করিবে এবং নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে।

স্বস্তিকাসন যথাঃ—জানু ও উরুদ্বয়ের অন্তরে উভয় পাদতল সম্যকরূপে ধরিয়া সমকায়ে অবস্থিতি করাকেই স্বস্তিকাসন কহে।

শিঃ। মুদ্রা সকল কিরূপ?

গুঃ। ঘেরণ্ড সংহিতায় পঞ্চ বিংশতি মুদ্রা বর্ণিত আছে যথাঃ—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্ধর, মুলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরী, যোনি, বজ্রোণী, শক্তি চালনী, তাড়াগী, মাণ্ডবী, শাম্ভবী, পঞ্চধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী।

শিবসংহিতায় ও গ্রহযামলে লিখিত আছে যে, মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরিতকরিণী, উড্ডীয়ান, বজ্রোণী ও শক্তিচালনী এইদশটী মুদ্রা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই মুদ্রা দশটী জরা ও মৃত্যুকে পরাজিত করে।

মহামুদ্রা যথাঃ—গুহ্যদেশ বাম গুল্ফ দ্বারা দৃঢ়ভাবে পীড়ণ পূর্ব্বক দক্ষিণ চরণ বিস্তৃত করিয়া করদ্বারা পদাঙ্গুলি ধরিবে এবং কণ্ঠ সংকোচন পূর্ব্বক ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ইহাকেই মহামুদ্রা কহে। এই মুদ্রা কামধেনু স্বরূপ। ইহা আচরণ করিলে বাঞ্ছিত ফললাভ ও ইন্দ্রিয় দমন হইয়া থাকে।

মহাবন্ধ যথাঃ—দক্ষিণ পাদ বিস্তৃত করিয়া বামউরুর উপরিভাগ স্থাপন পূর্ব্বক গুহ্য ও যোনি আকুঞ্চন করিয়া অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধগত করত নাভিস্থ সমান বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিবে এবং হৃদয়স্থ প্রাণ বায়ুকে অধোমুখ করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত জঠর মধ্যে কুম্ভক যোগে সংবদ্ধ করিবে; ইহারি নাম মহাবন্ধ। ইহাদ্বারা যোগীর দেহস্থ নাড়ী সমূহ হইতে রস সকল শিরোপরি সমুদ্গত হয়। ইহার প্রভাবে সাধক যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারে।

মহাবেধ যথাঃ—প্রথমত মহাবন্ধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উড্ডীয়ান বন্ধ করিয়া কুম্ভকযোগে বায়ুরোধ করিবে, ইহারই নাম মহাবেধ। এই মহাবেধ ব্যতিরেকে মূলবন্ধ ও মহাবন্ধ উভয়ই বৃথা হইয়া থাকে। এই মহাবেধের প্রভাবে সাধক সুষুম্নাপথস্থ বায়ুদ্বারা গ্রন্থি বিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করে। ইহা অনুষ্ঠান করিলে জরামরণ নাশিনী বায়ু সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই।

খেচরী মুদ্রা যথাঃ—নিরুপদ্রব স্থানে বজ্রাসনে সমাসীন হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবে। অনন্তর জিহ্বামূলের উর্দ্ধে তালু প্রদেশে যে অমৃতকূপ আছে, তাহাতে জিহ্বাকে বিপরীতদিকে সমুত্থিত করিয়া সযত্নে সংযুক্ত করিবে। ইহাকেই খেচরী মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা সিদ্ধির জননী স্বরূপ। যে সাধক সতত এই মুদ্রাযোগে সহস্রার নির্গত সুধাধারা তালুমূলে জিহ্বাদ্বারা পান করে, তাহার শরীর সিদ্ধ হয় এবং মৃত্যুভয় থাকে না। দত্তাত্রেয় সংহিতায় লিখিত আছে যে, অন্তঃকপাল বিবরে জিহ্বাকে ব্যাবৃত্ত করিয়া বন্ধন করিবে এবং এক দৃষ্টে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই খেচরী মুদ্রা সাধিত হয়। ঘেরণ্ড সংহিতায় লিখিত আছে যে, জিহ্বার নিম্নে জিহ্বার মূলদেশের সহিত যে নাড়ী সংযুক্ত আছে তাহা ছিন্ন করিয়া সতত জিহ্বার অধোভাগে জিহ্বার অগ্রাংশকে পরিচালনা করিবে এবং নবনীত দ্বারা জিহ্বা দোহন পূর্ব্বক লৌহ লেখনী দ্বারা কর্ষণ করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে জিহ্বা ক্রমশঃ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। উহাকে এরূপ দীর্ঘ করা আবশ্যক যে, অবলীলাক্রমে উহাদ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল স্পর্শ করিতে পারে। তাহার মধ্যস্থলে যে কপাল বিবর আছে, তাহার মধ্যে জিহ্বাকে উর্দ্ধদিকে বিপরীত ভাবে প্রবেশিত করাইয়া ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ অবলোকন করিবে। ইহাকেই খেচরী মুদ্রা কহে। যে ব্যক্তি এই মুদ্রা সাধন করে, তাহার জিহ্বাতে যথাক্রমে লবণ, ক্ষার, তিক্ত, কষায়, নবনীত, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, ঘোল, মধু, দ্রাক্ষা, ও সুধা এই সকলের স্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে।

জালন্ধর বন্ধ যথাঃ—কণ্ঠ সংকোচন পূর্ব্বক হৃদয়োপরি চিবুক সংস্থাপন করাকেই জালন্ধর বন্ধ কহে। গ্রহযামলে লিখিত আছে যে কণ্ঠ আকুঞ্চন পূর্ব্বক চিবুক দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে সংন্যস্ত করিবে, ইহাকেই জালন্ধর বন্ধ কহে।

ইহার প্রসাদে সহস্রার নিঃসৃত সুধা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। শিবসংহিতায় কথিত আছে যে, জীবগণের নাভিস্থ অগ্নি সহস্রার বিনির্গত সুধাধারা পান করাতে জীবের অমরত্ব হয় না, এইজন্য জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়। উহার প্রভাবে সাধক ঐ সুধাকে নিম্নভাগে অবতারিত হইতে না দিয়া ঊর্দ্ধভাগে তালুবিবরের পথে রসনা দ্বারা পান করে, সুতরাং সেই সাধক অমরত্ব লাভে সমর্থ হয় এবং শরীর ধারণ করিয়াই ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে পারে। এই জালন্ধর বন্ধ সিদ্ধগণের সিদ্ধিপ্রদ।

বিপরীত করণী মুদ্রা যথাঃ—আপনার মস্তক ভূতলে স্থাপন পূর্ব্বক পাদদ্বয়-শূন্যে উত্তোলন করিবে এবং কুম্ভকযোগে বায়ুরোধ পূর্ব্বক অবস্থিত হইবে। ইহাকেই বিপরীত করণী মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা প্রতিদিন অভ্যাস করিলে মৃত্যু পরাজিত হয়। ঘেরণ্ড সংহিতায় লিখিত আছে যে সূর্য্যনাড়ী নাভিমূলে এবং চন্দ্রনাড়ী তালুমূলে অবস্থিত। সূর্য্যনাড়ী দ্বারা সহস্রার নির্গত সুধাধারা পীত হয়। এই জন্যই জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। চন্দ্রনাড়ী দ্বারা সেই সুধা পান করিতে পারিলে মৃত্যুকে পরাজয় করা যায়। এই কারণেই যোগবলে চন্দ্রনাড়ীকে নিম্নে এবং সূর্য্যনাড়ীকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবে। ধরাতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক করদ্বয় পতিত করিয়া পাদযুগল শূন্যে তুলিয়া কুম্ভকযোগে অবস্থিত হইবে। ইহাকেই বিপরীত করণী মুদ্রা কহে। ইহা সাধন করিলে জরা ও মৃত্যু ভয় থাকে না। এই মুদ্রা পরম গোপনীয়।

উড্ডীয়ান বন্ধ যথাঃ—শিব সংহিতায় লিখিত আছে যে, নাভীর ঊর্দ্ধ ও অধোদেশকে এবং পশ্চিম দ্বারকে সমভাবে আকুঞ্চন করিতে হইবে অর্থাৎ কুম্ভকযোগে নাভীর অধস্থ নাড়ী সমূহকে নাভীর ঊর্দ্ধে সমুত্তোলন করিবে। ইহাকেই উড্ডীয়ান বন্ধ কহে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করে, তাহার নাভি শুদ্ধি ও দেহস্থ বায়ুশুদ্ধি হইয়া থাকে। দত্তাত্রেয় সংহিতায় লিখিত আছে যে, ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, উড্ডীয়ান বন্ধ অভ্যাস করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যৌবন প্রাপ্ত হয়। ষন্মাস পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যুকে পরাজয় করা যায় সন্দেহ নাই।

বজ্রোণী মুদ্রা যথাঃ—ঘেরণ্ড সংহিতায় লিখিত আছে যে, ধরাতলে হস্ততল-দ্বয় স্থিরভাবে রাখিয়া মস্তক ও পাদদ্বয় শূন্যে উত্তোলিত করিবে; ইহাকেই

বজ্রোণী মুদ্রা কহে। ইহার দ্বারা দেহের বল বৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে, বজ্রোণী মুদ্রা সংসারান্ধকার বিদূরিত করিয়া দেয়। এই মুদ্রা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, গৃহস্থ ব্যক্তি যোগক্ত নিয়ম ব্যতিরেকে যে কোন রূপেই হউক না অবস্থিত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিলে মুক্ত হইতে পারে। এইমুদ্রা ভোগযুক্ত ব্যক্তিকেও সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা যোগীগণ যাবতীয় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শক্তিচালনী মুদ্রা যথাঃ—শিব সংহিতায় লিখিত আছে যে, কুণ্ডলীশক্তি আধার কমলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছেন। তাঁহাকে সবলে অপান বায়ুতে আরোহণ করাইতে হইবে। ইহাকেই শক্তিচালনী মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করে, তাহার রোগ বিনাশ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ইহার প্রভাবে কুণ্ডলী শক্তি জাগরিতা হইয়া ঊর্দ্ধ-গামিনী হন, সুতরাং সিদ্ধিকামী যোগীগণ ইহার অভ্যাস করিবে। সর্ব্বদা ইহার অভ্যাস করিলে অণিমাদি গুণদায়িনী বিগ্রহসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশানুসারে এই মুদ্রা সাধন করে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না। ঘেরণ্ড সংহিতায় লিখিত আছে যে আধার কমলে সার্দ্ধ ত্রিবলান্বিতা কুণ্ডলিনী শক্তি ভুজগীর আকারে প্রসুপ্তা আছেন। যে পর্যন্ত তিনি প্রসুপ্তা থাকেন, তাবৎ জীব পশুর ন্যায় অজ্ঞানে আবৃত থাকে, তখন কোটী কোটী যোগসাধন করিলেও জ্ঞান সঞ্চার হয় না। যেমন কুঞ্চিকা দ্বারা দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, তদ্রূপ কুণ্ডলীকে জাগরিত করিয়া সহস্রারে আনিতে পারিলেই ব্রহ্মদ্বার বিভিন্ন হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পথ উদ্‌ঘাটিত হয়, তখনই জীবের জ্ঞান সঞ্চার হইয়া থাকে। গুপ্ত গৃহে অবস্থিতি পূর্ব্বক নাভি বেষ্টন করিয়া এই মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়। বিতস্তী পরিমিত দীর্ঘ, চতুরঙ্গুল বিস্তৃত, কোমল শুভ্র, সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা নাভি পরিবেষ্টন করিবে। ঐ বস্ত্র খণ্ডকে কটিসূত্র দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। পরে গাত্রে ভস্ম লেপন করিয়া সিদ্ধাসনে সমাসীন হওত নাসারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া অপান বায়ুর সহিত একত্রিত করিবে। আর যাবৎ বায়ু সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে গমন না করে, তাবৎ অশ্বিনী মুদ্রা দ্বারা গুহ্য আকুঞ্চন করিতে হইবে। এই প্রকারে কুম্ভকযোগে বায়ু আবদ্ধ করিলেই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হন, এবং সহস্রারে পরমাত্মসহ মিলিত হইয়া

থাকেন। এই মুদ্রা সাধন করিতে না পারিলে যোনি মুদ্রা সিদ্ধি হয় না, অতএব অগ্রে এই মুদ্রা অভ্যাস করিয়া পরে যোনি মুদ্রার অভ্যাস করিতে হয়। শিব সংহিতায় লিখিত আছে যে, এই দশটী মুদ্রার ন্যায় মুদ্রা আর নাই, ইহার একটী অভ্যাস করিতে পারিলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

দক্ষিণা মূর্ত্তি সংহিতাতে কথিত আছে যে, অঞ্জলি পুট ঊর্দ্ধে বিশ্লিষ্ট ও নিম্নে সংশ্লিষ্ট করিয়া, আবাহনী মুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা বিপরীত হইলে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে সংশ্লিষ্ট ও নিম্নে বিশ্লিষ্ট হইলে স্থাপনী মুদ্রা হইবে। দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধ করিয়া বদ্ধমুষ্টি সংযুক্ত করিলে সন্নিধাপনী মুদ্রা হইবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যে রাখিয়া, ঐরূপ হস্তদ্বয়ের মুষ্টি বন্ধন করিলে সন্নিরোধনী মুদ্রা হইবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিয়া মধ্যমাদ্বয়ের সহিত তর্জ্জনী দ্বয়ের যোগ, এবং অনামিকা দ্বয়ের সহিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়ের যোগ করিলে ধেনু মুদ্রা হইবে। অঞ্জলি পুটের ঊর্দ্ধ বিশ্লিষ্ট ও নিম্ন সংশ্লিষ্ট করিয়া উভয় হস্তের অনামিকার সহিত তর্জ্জনীর পরস্পর যোগ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি দ্বয়ের অগ্রভাগের সংযোগ করিলে যোনিমুদ্রা হইবে। দক্ষিণ হস্তের অনামিকার সহিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের যোগ করিলে তত্ত্ব মুদ্রা হইবে।

শিঃ। যম নিয়মাদি কিরূপ?

গুঃ। আদি যামলে লিখিত আছে যে শান্তি, সন্তোষ আহার ও নিদ্রার অল্পতা চিত্তদমন এবং অন্তঃকরণের শূন্যতা ইহাকেই যম বলা যায়। চাঞ্চল্য, ত্যাগ, মনের স্থৈর্য্য, সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা উদাসীনভাব, সর্ব্বত্র নিস্পৃহতা, যথা লাভেই তৃপ্তি, পর ব্রহ্মে চিত্ত এবং মানদানাদি পরিত্যাগ এই সকলের নাম নিয়ম।

শিঃ। আসন ভেদ কিরূপ?

গুঃ। সম্মোহন তন্ত্রে লিখিত আছে যে, তুলা, কম্বল, বস্ত্র সিংহ ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম ও মৃগাজিন এই সকল দ্বারা আসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক পূজাদি করিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়; কিন্তু কেবল মাত্র বস্ত্রাসন প্রশস্ত নহে, অন্য কোন আসনের উপরে বস্ত্রাসন আবৃত করিয়া পূজা করিতে পারে। হয়গ্রীবমাহেশ্বরে লিখিত আছে যে, কম্বল, কৌষ, দারুনির্ম্মিত ও চর্ম্মাসনই পূজাদিতে প্রশস্ত; তন্মধ্যে রক্তকম্বলাসন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তি কদাচ কৃষ্ণসারাজিনে বসিয়া কার্য্য করিবে না।

শিঃ। মাতৃকা যন্ত্র কিরূপ?

গুঃ। হ, স, ঔ, ঃ বিসর্গ এই কয়েকটী বর্ণ একত্র করিলে "হেসৌঃ" হয়। এই বীজকে কর্ণিকা করিয়া দুই দুইটী স্বরবর্ণ দ্বারা কেশর বিন্যস্ত করিবে। অনন্তর অষ্টদলবিশিষ্ট কমল অঙ্কিত করিয়া উহার অষ্টদলে আটটী বর্গ লিখিবে। পদ্মের বাহিরে চারিটী দ্বার ও চারিটী কোণ অঙ্কিত করত পদ্ম বেষ্টন করিবে। এইরূপ করিলেই মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত হইল। এই যন্ত্র সৌভাগ্য প্রদ। এই যন্ত্রের চারিদিকে রং এবং চারি কোণে ঠং লিখিতে হয়।

শিঃ। প্রাণায়াম কিরূপ?

গুঃ। প্রাণায়াম ত্রিবিধ; (মতান্তরে বহুবিধ আছে) অগ্রে বাম নাসিকার রন্ধ্রমধ্যে ধীরে ধীরে বায়ুপূরণ করিবে। অনন্তর সেই বায়ু দৃঢ়রূপ ধারণপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে কুম্ভক করিবে। পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ নাসিকার রন্ধ্র দিয়া সেই বায়ু রেচণ করিতে হইবে। এই প্রকার প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে দেহ জ্যোতির্ম্ময় ও বায়ুপূর্ণ হইয়া থাকে। নিবন্ধে লিখিত আছে যে, কি শুভ কি অশুভ সমস্ত কার্য্যের আদিতে ও অন্তে প্রাণায়াম করিতে হয়। কালিকা হৃদয়ে কথিত আছে যে, মূলমন্ত্র অথবা ওঙ্কার দ্বারা বারত্রয় প্রাণায়াম করিতে হয়। অনন্তর চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুটে ষোড়শবার জপ দ্বারা বায়ুপূর্ণ করত চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করত দ্বাত্রিংশদ্বার জপদ্বারা বাম নাসিকায় পরিত্যাগ করিবে। পরে আবার ষোড়শ বার জপদ্বারা বাম-নাসাপুটে বায়ুগ্রহণ ও চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করতঃ দ্বাত্রিংশবার জপ করত দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচণ করিবে। এই প্রকারে প্রাণায়াম সাধন করিতে হয়।

মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রহ্ম মন্ত্র সাধন করিতে হইলে মূলমন্ত্র দ্বারা অথবা কেবল প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা, বাম নাসাপুট ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে অষ্টবার মূলমন্ত্র (বা প্রণব) জপ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাধারণ পূর্ব্বক কুম্ভকযোগ করিয়া (শ্বাসরোধ

করিয়া) দ্বাত্রিংশংবার ঐরূপ জপ করিবে। অনন্তর (দক্ষিণ নাসা ত্যাগ করিয়া) দক্ষিণ নাসা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিবে। পশ্চাৎ ঐ রূপ বাম নাসা পুটেও পূরক কুম্ভক ও রেচক করিবে অর্থাৎ অষ্টবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে বামনাসা পুটে শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আকর্ষণ করিবে। পশ্চাৎ বায়ু রোধ করিয়া দ্বাত্রিংশংবার মন্ত্র জপ করিবে। পরে বামনাসা পুট ত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসাতে এবং বাম নাসাতে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশঃ পূরক কুম্ভক ও রেচক করিবে।

শিঃ। মন্ত্রের সংস্কার কি রূপ ?

গুঃ। গৌতমীয়ে লিখিত আছে যে জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার। বিনা সংস্কারে মন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহা বিফল হয়। মাতৃকা যন্ত্র হইতে যে মন্ত্র বর্ণের উদ্ধার, তাহাকে জনন বলে। উদ্ধৃত বর্ণ সমূহের প্রত্যেককে পংক্তি অনুসারে ওঙ্কার দ্বারা পুটিত করত এক একটী বর্ণ একশত বার জপ করাকে জীবন কহে। চন্দন জল দ্বারা মন্ত্রের বর্ণ সকলকে বং এই মন্ত্রে তাড়ন করিবে, তাহাকেই তাড়ন বলে। বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মন্ত্রের অক্ষর সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিয়া সেই অক্ষর সংখ্যক করবীর কুসুম দ্বারা রং এই মন্ত্রে হনন করিবে, তাহাকেই মন্ত্রের বোধন কহে। মন্ত্রের অক্ষর সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে লিখিয়া অক্ষর সংখ্যক রক্ত করবীর পুষ্প দ্বারা রং এই মন্ত্রে এক একবার অক্ষর সমূহ অভিমন্ত্রিত করত তত্তন্মন্ত্র বিধানে অশ্বত্থপল্লব দ্বারা অক্ষর সংখ্যার অভিসিঞ্চন করিবে, তাহাকেই অভিষেক কহে। সুষুম্নার মূল ও মধ্যস্থানে দেয় মন্ত্র ভাবনা পূর্ব্বক জ্যোতি মন্ত্রে (ওঁ হৌঁ এই মন্ত্রে) মলত্রয় ভস্মীভূত করিবে, তাহাকে বিমলীকরণ কহে। স্বর্ণ, কুশ জল বা পুষ্প বারি দ্বারা জ্যোতির্ম্মন্ত্রে মন্ত্রবর্ণকে আপ্যায়ন করাকেই আপ্যায়ন বলা যায়। জ্যোতির্ম্মন্ত্রে সলিল দ্বারা মন্ত্রবর্ণের তর্পণ করাকেই তর্পণ কহে। ওঁ হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্রে দীপন করাকেই মন্ত্রের দীপন বলা যায়। জপ্যমান মন্ত্রের অপ্রকাশকেই গোপন কহে। এই দশবিধ সংস্কার সাধককে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। ইহা সর্ব্ব তন্ত্রেই গোপনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত।

শিঃ। মালা সংস্কার কি রূপ?

গুঃ। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, কার্পাস সূত্রে মালা গাঁথিয়া জপ করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়, ঐ সূত্র ব্রাহ্মণ কন্যা দ্বারা নির্ম্মাণ করাইতে হয়; শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ, অথবা পট্ট সূত্র দ্বারা মালা গাঁথিবে। শান্তি কর্ম্মে শ্বেতবর্ণ, বশ্যাদি অভিচার কর্ম্মে রক্ত, মুক্তি কামনায় পীত এবং জয়াদি কর্ম্মে কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা মালা গাঁথিতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা রক্তবর্ণ সূত্রই শ্রেষ্ঠ। সূত্র ত্রিগুণ করিয়া পুনরায় তাহাকে ত্রিগুণ করত যথাবিধি শিল্পশাস্ত্রানুসারে মালা গাঁথিবে। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে যে, এই প্রকারে মালা গাঁথিয়া শোধন করিতে হয়। পদ্মাকারে নয়টী অশ্বত্থপত্র রাখিয়া তাহার উপরে মাতৃকামন্ত্র ও মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মালা গাঁথিবে। তৎপরে সদ্যোজাত ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা ধৌত করিয়া বামদেব মন্ত্রে চন্দন, অগুরু, গন্ধ প্রভৃতি লেপন করিবে। পরে অঘোর মন্ত্রে ধূপ ও তৎপুরুষ মন্ত্রে চন্দন দিয়া পঞ্চম মন্ত্র প্রত্যেক মালাতে শতবার জপ করিবে। মেরুতেও শতবার মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে। অনন্তর দেবতার আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা পূর্ব্বক হোম করিবে। হোমে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিতে হয়। যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে দেবতার মন্ত্রে মালা সংস্কার করিবে, সেই মালায় অন্য দেবতার মন্ত্র জপ করিবে না। জপকালে আপনার দেহকম্পন করিলে সিদ্ধি হানি এবং মালা কম্পন করিলে বহুদুঃখ হইয়া থাকে। যদি জপ কালে মালাতে শব্দ হয়, তাহা হইলে রোগ, করস্খলিত হইলে এবং সূত্র ছিন্ন হইলে সাধকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শিঃ। ভূতশুদ্ধি কিরূপ?

গুঃ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে যে সাধক শ্রেষ্ঠ উত্তান করতল দ্বয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মনকে মূলাধার চক্রে স্থাপন পূর্ব্বক হুঙ্কার দ্বারা কুণ্ডলীকে উত্থাপিত করিয়া হংস, এই মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীর সহিত সেই কুণ্ডলী শক্তিকে, স্বীয় অধিষ্ঠান চক্রে আনয়ন পূর্ব্বক পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমুদায় জলাদি তত্ত্ব সমুদায়ে লীন করিবে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ প্রভৃতির সহিত সমুদায় পৃথিবী জলে লীন করিবে। পরে রসেনেন্দ্রিয় রস প্রভৃতির সহিত জল, অগ্নিতে লীন করিবে। অনন্তর শব্দ সহিত আকাশ, অহঙ্কার তত্ত্বে লীন করিয়া অহঙ্কার, তত্ত্ব ও বুদ্ধি

তত্ত্বে লীন করিবে। অনন্তর বুদ্ধিতত্ত্বও প্রকৃতিতে লীন করিয়া, ব্রহ্মেতে ঐ প্রকৃতির লয় করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের লয় করিয়া চিন্তা করিবে যে, বামকুক্ষিতে, রক্তবর্ণ চক্ষু ও রক্তবর্ণ নয়ন বিশিষ্ট পুরুষ অবস্থান করিতেছে। এই পুরুষ রক্তচর্ম্মধারী ও ক্রোধন-স্বভাব। ইহার আকার অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। এই পুরুষ পাপময় ও সর্ব্বদা অধোমুখে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর বাম নাসাতে ধূম্রবর্ণ যং এই বীজ চিন্তা করিয়া, ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে ঐ বামনাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে। পরে সাধক শ্রেষ্ঠ, ভাবনা করিবে যে, ঐ আকৃষ্ট বায়ুদ্বারা পাপময় দেহ শুষ্ক হইয়াছে। অনন্তর নাভিদেশে রং এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ধ্যান করিয়া, কুম্ভক অর্থাৎ বায়ু রোধ পূর্ব্বক ঐ রং বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে, তদুৎপন্ন বহ্নিদ্বারা পাপাসক্ত নিজ শরীর দগ্ধ করিবে। পরে ললাটদেশে শুক্লবর্ণ বং এই বরুণ বীজ চিন্তা করিয়া, নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে, দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিয়া, ঐ বরুণ বীজ সমুৎপন্ন অমৃত বারি দ্বারা, নিজ দগ্ধ শরীর আপ্লাবিত করিবে। এইরূপে আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত, অমৃত বারিদ্বারা আপ্লাবিত করিয়া নূতন দেবতাময় শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, ভাবনা করিবে। অনন্তর মূলাধারে পীতবর্ণ লং এই পৃথিবী বীজ চিন্তা করিয়া; সেইবীজ পাঠ পূর্ব্বক দিব্য অবলোকন দ্বারা, অর্থাৎ নিমেষশূন্য নয়নে দর্শন দ্বারা নিজ শরীর দৃঢ় করিবে।

গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, আপনার অঙ্কে উত্তান হস্তদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক "সোহং" মন্ত্রে প্রদীপ কলিকাবৎ হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে মূলাধারস্থ কুল-কুণ্ডলিনীর সহ মিলিত করিয়া সুষুম্না পথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞানামক চক্র ছয়টী ভেদ করিবে এবং শিরস্থ অধোবদন সহস্রার পদ্মের কর্ণিকার অভ্যন্তরস্থ পরমশিবে একত্রিত করিয়া তাহাতে পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিলীন চিন্তা করিয়া বামনাসিকায় বায়ুবীজ (যং) ভাবনা করিবে; পরে ষোড়শবার বায়ুবীজ জপ করিয়া দেহ পরিপূর্ণ করত নাসাপুট-দ্বয় ধারণ পূর্ব্বক চতুঃষষ্টিবার বায়ু বীজদ্বারা কুম্ভক করিয়া বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত শরীর শোষণ করিবে, তৎপরে ঐ বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিয়া বায়ুরেচণ করিতে হয়। তৎপরে দক্ষিণ নাসাপুটে বহ্নিবীজ (রং) চিন্তা করিয়া ষোড়শবার ঐ বীজ জপপূর্ব্বক বায়ুদ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে এবং উভয়

নাসাপুট ধরিয়া চতুঃষষ্টিবার রং বীজ জপদ্বারা কুম্ভক যোগে কৃষ্ণবর্ণ পাপ পুরুষের সহিত শরীরকে মূলাধারস্থ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। পরে দ্বাত্রিংশদ্বার রং-বীজ জপ করিয়া বামনাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিয়া ফেলিবে। অনন্তর বামনাসাপুটে শ্বেতবর্ণ চন্দ্রবীজ (ঠং) চিন্তা করিয়া ষোড়শ বার ঐ বীজ জপ দ্বারা ললাটে লইয়া যাইবে এবং নাসিকাদ্বয় ধারণ করিয়া চতুঃষষ্টিবার বরুণ বীজ (বং) জপ পূর্ব্বক ললাটদেশস্থ চন্দ্র হইতে বিনির্গত সুধাধারা দ্বারা মাতৃকাবর্ণময় সমস্ত দেহ রচিত করিবে, পরে দ্বাত্রিংশদ্বার পৃথিবীবীজ (লং) জপ দ্বারা দেহকে দৃঢ়ীভূত ভাবনা করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়।

শিঃ। গুরুঃ ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত মননাদিরূপ জ্ঞান ও নিদিধ্যাসন জনিত আত্ম সাক্ষাৎকার স্বরূপ বিজ্ঞান এই দুইটী বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন।

গুঃ। শরীর প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ আমার নহে। কিন্তু ঐ সকল আমার বলিয়া প্রতীতি হওয়ার নাম মায়া এবং ইহা দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হইয়া থাকে; হে বৎস! ঐ মায়ার আদি দুই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে,—বিক্ষেপ শক্তি ও আবরণ শক্তি; ইহার মধ্যে প্রথমটী মহত্তাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে বিশ্বকে প্রকাশ করে, এবং অপরটী অখিল জ্ঞান আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে। চৈতন্য অপ্রকাশিত থাকিলে মনুষ্যেরা বিক্ষেপ শক্তি কল্পিত জগতকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় করে। ভ্রান্তি বশতঃ রজ্জুতে যেমন ভুজঙ্গ জ্ঞান হয়; সেইরূপ অধিষ্ঠান তত্ত্বজ্ঞান বিচার করিলে কিছুই নাই; মনুষ্যেরা যাহা কিছু শ্রবণ করে, দর্শন করে, সে সমস্তই স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। এই দেহ সংসাররূপ বৃক্ষের দৃঢ় মূল স্বরূপ, এবং তাহাই পুত্র দারাদির উৎপত্তির মূল— অতএব ঐ দেহ না থাকিলে আমার কিছুই নাই। অর্থাৎ পুত্রাদির উৎপত্তি হয় না। দেহ দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ স্থূল পঞ্চভূত (অর্থাৎ ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আকাশ এই সমস্ত পদার্থময়)। সূক্ষ্ম শরীরের নাম লিঙ্গ দেহ—ঐ লিঙ্গ দেহ সূক্ষ্মভূত (অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ) এবং অহঙ্কার, বুদ্ধি ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয় এই অষ্টাদশ পদার্থের স্বরূপ, ঐ দেহেতে মনুষ্যেরা অহং বুদ্ধি করিয়া থাকে। কে

বৎস! মনুষ্যাদি শরীর বিকৃতি (অর্থাৎ জন্য), ঈশ্বর শরীর মূল প্রকৃতি (অর্থাৎ নিত্য); এই শরীর জড় পদার্থ, এই কারণে পণ্ডিতেরা ইহাকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,জীব দেহ হইতে বিভিন্ন,জীব হইতে নিরাময় পরমাত্মার বৈলক্ষণ্য নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা জীব হইতে পরমাত্মাকে কখনই ভিন্ন জ্ঞান করিবে না এবং অভিমান দম্ভ হিংসা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। সংকৃত নিন্দা সহন কায়মনোবাক্য দ্বারা ভক্তি দ্বারা সদ্গুরু সেবন ও সর্ব্ব প্রাণীর সহিত সরল ব্যবহার করিবে এবং বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ অবলম্বন করিবে। পরের অনিষ্ট চিন্তা, পরনিন্দা ও পরকে হস্তাদি দ্বারা প্রহার করিবে না, এবং নিরহঙ্কার হইয়া দেহের জন্ম জরা মরণ আলোচনা করিবে, স্নেহশূন্য হইয়া পুত্র দারা ধনাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং ইষ্টানিষ্ট সমাগমে চিত্তকে সমভাবে রাখিয়া ঈশ্বরে অনন্য বিষয়ামতি অর্পণ করিবে। জন সম্বাধ রহিত বিশুদ্ধ স্থানে বাস করিয়া প্রাকৃত জন সমূহের সহবাস পরিত্যাগ করিবে। অনবরত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানে উদ্যোগ ও সময়ে সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থালোচনা করিবে।

হে বৎস! আত্মা, বুদ্ধি, প্রাণ, মন ও দেহ ও অহঙ্কার হইতে অতিরিক্ত চিদাত্মস্বরূপ এবং নিত্য ও শুদ্ধ এই প্রকার নিশ্চয় যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞানের নাম জ্ঞান—পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের নাম বিজ্ঞান; ঐ বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অদ্বয় নিরুপাধি এবং সর্ব্বদা সমানাবস্থাপন্ন স্বপ্রকাশ-দ্বারা দেহাদি প্রকাশক, সুতরাং স্বয়ং প্রকাশবিশিষ্ট সঙ্গরহিত অদ্বিতীয় সত্য জ্ঞান স্বরূপ এবং স্বকীয় প্রভা দ্বারা সমস্ত জগতের দ্রষ্টা সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়।

শিঃ। গুরু! এক্ষণে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি।

গুঃ। যাবৎকাল জীবাত্মা অবিবেকবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মদীয়ত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ না করেন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনিই সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা বিষয় ভাবনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া যেমন স্বপ্নাবস্থায় ঐ চিন্তিত বিষয়ের মিথ্যা সমাগম লাভ করে এবং ঐ অবস্থায় ঐ অলীক বস্তু হইতে স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বিবেক শক্তি দ্বারা নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ জীব দেহাভিমানাবস্থায় মিথ্যা সংসার আরোপ

করিয়া ঐ অবস্থায় স্বয়ং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। জীবাত্মা অবিদ্যা প্রভাবে দেহাভিমানী হইয়া রাগ দ্বেষাদি সঙ্কুল মিথ্যা সংসারে আবদ্ধ হন। অন্তঃকরণই সংসারের কারণ ও সুখ দুঃখাদি ভোক্তা জীবাত্মা অন্তঃকরণের সহিত মিলিত তদ্‌গত সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। অলক্তসন্নিহিত নির্ম্মল স্ফটিক মণি স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ হইলেও অলক্তের প্রতিবিম্ব সম্পর্কে যেরূপ রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সন্নিধানে সংসারী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। হে বৎস! জ্ঞানাদি গুণ বিশিষ্ট আত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা অনুমান করিয়া স্থির করিতে হয়, ঐ আত্মা অন্তঃকরণ সম্বন্ধ বশতঃ অন্তঃকরণের অবিবেক রূপ গুণলাভ করিয়া বিষয়াদি ভোগ করতঃ রাগদ্বেষাদি রূপ অন্তঃকরণ গুণ আবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছুক হইয়া ও সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকেন, জীবাত্মা, রাগ দ্বেষাদি রূপ অন্তঃকরণ গুণলাভ করিয়া সদসৎ কার্য্য করেন; সেই সদসৎ কার্য্য বশতঃ তাহার সদসদ্গতি লাভ হয় জীব খণ্ড প্রলয় পর্য্যন্ত এইরূপে ভ্রমণ করেন, খণ্ড প্রলয় সময়ে বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া (অর্থাৎ উভয়ে একতা লাভ করিয়া অনাদ্য বিদ্যায় লীন হইয়া থাকেন, পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে পূর্ব্ববাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবির্ভূত হন; এইরূপে জীবাত্মা কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। যে সময় জীব পূর্ব্বকৃত পুণ্য বলে শান্ত প্রকৃতি সাধু জনের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, সেইকালে ঈশ্বরে ভক্তি এবং তাঁহার লীলা শ্রবণে অতিশয় শ্রদ্ধা লাভ করেন; অনন্তর ভক্তি হইলেই তাহার অনায়াসে ঈশ্বর স্বরূপ বিজ্ঞান হয়। বিজ্ঞান হইবা মাত্র জীবাত্মা আচার্য্যোপদিষ্ট শাস্ত্র শ্রবণ ও মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সত্য আনন্দময় আত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন এবং দেহ, ইন্দ্রিয়,মন,প্রাণ, ও অহঙ্কার হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিয়া সত্বর মুক্তিলাভ করেন, ইহা আমি নিশ্চয় উপদেশ করিলাম। যে ব্যক্তি এই সমস্ত আমার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিয়া অনবরত মনে মনে আলোচনা করে, সংসার দুঃখ তাহাকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবে না। হে বৎস! তুমিও পবিত্রান্তঃকরণ হইয়া মদুপদিষ্ট বাক্য সকল মনে মনে আলোচনা কর, তাহা হইলে সংসার রূপ দুঃখরাশি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।